গোলাম হোসায়ন সলীম

বাংলার ইতিহাস

[রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ]

আকবরউদ্দীন

অনূদিত

প্রথম সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ ইদ্রিস

মুদ্রণ
মতি আর্ট প্রেস
৬, গোবিন্দ দাস লেন, আরমানিটোলা
ঢাকা-১

প্রসঙ্গ-কথা

বিখ্যাত ইতিহাসবিদ গোলাম হোসায়ন সলীম কর্তৃক ফারসী ভাষায় লিখিত 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন' গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ পাঠকের হাতে তুলে দিতে সমর্থ হয়ে বাংলা একাডেমীর পক্ষ থেকে আমি গভীর আত্মতৃপ্তি অনুভব করছি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক ইতিহাস—অর্থাৎ এক কথায় বাংলাদেশের অতীতকে সঠিকভাবে জানতে হলে এই গ্রন্থের ওপর যে কত বেশী নির্ভর করতে হয়, ইতিহাস-বেত্তা মাত্রেই তা অবগত আছেন। সুতরাং 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন' গ্রন্থের নতুন করে পরিচয় দেবার ধৃষ্টতা আমার নেই—আমার বা কারো প্রশংসাপত্র নিয়ে এই গ্রন্থকে সুধী সমাজের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে না—গ্রন্থটির যা কিছু মূল্য তা আপন গৌরবেই ভাস্বর। তবে, বাংলা ভাষায় আমাদের দেশে এমন মূল্যবান একটি গ্রন্থের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটলো, আর সেই প্রকাশনার গৌরব বাংলা একাডেমীর। অনুবাদ কতটা মূলানুগ ও সার্থক হয়েছে সে বিচার করবেন সুধী পণ্ডিত সমাজ। গ্রন্থটি মূল ফারসী থেকে অনূদিত হয় নি—আবদুস সালাম কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত গ্রন্থ থেকে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। যিনি অনুবাদ করেছেন তিনি একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত। সেদিক থেকে আমাদের বিশ্বাস, অনুবাদের জন্য একজন যোগ্য ব্যক্তির ওপরেই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। আমার ধারণা, অনুবাদ সার্থক, সুখপাঠ্য ও মূলানুসারী হয়েছে। ভরসা করি, অধ্যাপক, ছাত্রসমাজ ও পণ্ডিতব্যক্তিদের মধ্যে গ্রন্থটি সমাদৃত হবে। সাধারণ পাঠকের নিকটও বইটি ভাল লাগবে বলে আমরা আশা পোষণ করি।

একটি কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। আবদুস সালাম অনূদিত ইংরেজী গ্রন্থের যে বিরাট পরিসর টীকা এক সময় উক্ত অনূদিত গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল, বাংলায় অনুবাদক জনাব আকবরউদ্দীন

পরিশিষ্টে তা সংযোজন করেছেন। এই টীকাগুলোর সত্যিকার মূল্য এক শতাব্দী বা অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যে গুরুত্বে বিচার্য হ'ত, বর্তমানে তা হ'তে পারে না। বিষয়সমূহ সম্পর্কে এখন আলোচনার পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের সংখ্যা বেড়েছে বিপুল পরিমাণে। অনুবাদক যদি এ সম্পর্কে আলোকপাত করতেন অথবা নিজে প্রাসঙ্গিক তথ্য বা গ্রন্থ আলোচনা করে পৃথক একটি টীকা দিয়ে দিতেন, তবে বঙ্গানুবাদকৃত এই গ্রন্থের মূল্য আরো বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেত।

এই গ্রন্থের নাম 'বাংলার ইতিহাস' হতে পারে কিনা, তাও একটি বিতর্কিত বিষয় বলে মনে হতে পারে। সুলতানদের বিবরণ একটি দেশের সামগ্রিক ইতিহাস হ'তে পারে না।

এগুলো এক একটি সমালোচনার বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাই বলে বইটির ব্যাপক মূল্যকে অস্বীকার করার সাধ্য নেই।

যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ অনূদিত হ'েছে, তা সফল হোক।

মযহারুল ইসলাম
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

অনুবাদকের নিবেদন

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মালদহ কুঠির বাণিজ্য বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক —অন্য কথায় কুঠিয়াল জর্জ উডনির নির্দেশে অথবা অনুরোধে তাঁর ডাক-মুন্সি গোলাম হোসায়ন সলীম জইদপুরী ফার্সী ভাষায় 'রিয়াজ-উস্-সালাতীন' গ্রন্থটি রচনা করেন ১৭৬৬-১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। পুস্তকের নাম থেকে দেখা যায়, গোলাম হোসায়ন ১৭৮৮ সালে রচনা সম্পূর্ণ করেছিলেন (৩১৯ পৃষ্ঠার ৪নং টীকা এবং ৩২১ পৃষ্ঠার ১৯ নং টীকা দ্রষ্টব্য)। বর্তমান শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে (সম্ভবতঃ ১৯০৪ সালে) অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মরহুম মওলবী আবদুস সালাম সাহেব রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির অনুরোধে মূল ফার্সী থেকে পুস্তকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। অনুবাদ ছাড়াও তিনি প্রচুর মূল্যবান টীকা সংযোজন করেন, যার ফলে মূল পুস্তকের মূল্য বহুগুণ বর্ধিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মূল পুস্তক লিখবার সময় গ্রন্থকার গোলাম হোসায়ন যেমন অন্য বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুস্তকের এবং ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, ইংরেজী অনুবাদক সালাম সাহেব তাঁর চাইতে আরো অনেক বেশী গবেষণা করেছেন মনে হয়। সরকারী চাকুরীতে থাকাকালে তিনি বাংলা ও বিহারের বহু স্থানে ছিলেন এবং সর্বত্র অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বহু তথ্য আবিষ্কার ও লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি সালাম সাহেবের ইংরেজী অনুবাদ থেকে (টীকাসহ) বাংলায় অনুবাদ করেছি।

বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে "বাংলার মুসলমানদের ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাসগুলোর মধ্যে 'রিয়াজে' পূর্ণতম বিবরণী থাকায় এটাকে অত্যন্ত মূল্য দেয়া হয়।" প্রকৃতপক্ষে, 'রিয়াজ-উস-সালাতীন' বাংলায় মুসলমান আমলের সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম পূর্ণ ইতিহাস।

বিগত অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশ (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে বহু নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং গবেষকগণ মূল 'রিয়াজ' ও ইংরেজী অনুবাদক সালাম সাহেবের টীকাসমূহের সাথে পরবর্তী আবিষ্কৃত তথ্যাবলীর সমন্বয়ে এদেশের আরো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে পারেন। প্রাচীন 'বঙ্গ', বাঙ্গালা, হরিকেন, বরেন্দ্র এবং সমতট ও পুণ্ড্রবর্ধনের অংশবিশেষের সমন্বয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশকে কেন্দ্র ক'রে নতুনভাবে বাংলার ইতিহাস রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্য হয়েছে। আশা করি, ইতিহাসবেত্তাগণ এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সাধনে অগ্রসর হবেন। স্মরণযোগ্য যে, বর্তমান বাংলাদেশই বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত সুবে বাংলার কেন্দ্র ছিল। নতুবা সুবে বাংলা নামকরণ হতো না এবং রাজধানী গৌড় বা লখনৌতি, বিক্রমপুর, সোনারগাঁও ও ঢাকা হতো না। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালীদের কুলজীর সন্ধান নিলে দেখা যাবে তাদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষের বাস ছিল এই বাংলাদেশে।

'রিয়াজে' 'বঙ্গের' উৎপত্তি সম্পর্কে এক কৌতুহলোদ্দীপক কাহিনী সংযোজিত হয়েছে। গোলাম হোসায়ন এবং তাঁর পূর্ববর্তী ফেরেশতা প্রমুখ মুসলমান ঐতিহাসিকগণ 'বঙ্গ' দেশের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কাহিনী লিখেছেন। তাঁদের বিশ্বাস, হজরত নূহ পয়গম্বরের আমলে এক অভাবনীয় বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত হওয়ায় হজরত নূহ ও তাঁর যে কয়জন সঙ্গী ও পশুপক্ষী তাঁর বৃহৎ নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিল, তারা ছাড়া আর কেউ জীবিত ছিল না। হজরত নূহ পয়গম্বরের পুত্র হাম ; হামের পুত্র হিন্দ্ ; হিন্দের দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল 'বঙ্গ'। 'বঙ্গ' এখানে এসে উপনিবেশ স্থাপন করায় এই দেশের নাম হয়েছে 'বঙ্গ' (১৬-১৭ পৃঃ দ্রঃ)।

এই প্রকার কতকগুলো কল্প-কাহিনী থাকা সত্ত্বেও 'রিয়াজে' বহু মূল্যবান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সালাম সাহেবের টীকাগুলোও অত্যন্ত মূল্যবান তথ্যপূর্ণ।

মূল ফার্সী গ্রন্থটি কোথায় আছে আমি জানি না—সম্ভবতঃ কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি অথবা জাতীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যেতে পারে। যদি তা হয়, তা'হলে উক্ত গ্রন্থের একটি ফটোস্টাট কপি আমাদের

এখানে এশিয়াটিক সোসাইটিতে অথবা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংগ্রহ করে রাখা উচিৎ। সালাম সাহেবকৃত ইংরেজীতে অনূদিত বইটিও দুর্লভ। যতদূর জানি, ১৯০৪ সালে বা ঐরূপ সময়ে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর আর কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার কথা আমার জানা নেই। আমার জানা মতে ঢাকায় মাত্র তিনটি কপি আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সিরাজুল ইসলামের নিকট একটি কপি আছে। তিনি আমাকে বইটি দিয়েছিলেন। বইটি জীর্ণ হয়ে পড়েছে। আমি সেই কপি থেকে অনুবাদ করেছি প্রায় চার বৎসর পূর্বে।

তাঁর বইটি নির্দ্বিধায় আমাকে কয়েক মাসের জন্যে দেয়ায় আমার পক্ষে অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছিল। এজন্যে আমি অনুজপ্রতিম ডক্টর সিরাজুল ইসলামের নিকট কৃতজ্ঞ। বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক জনাব কবীর চৌধুরী একাডেমী থেকে বইটি প্রকাশ করতে সম্মত হওয়ায় আমি তাঁর নিকটও কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে উল্লেখ্য, বর্তমানে আমি উনআশি পেরিয়ে আশিতে পড়েছি। তার উপর -এর নভেম্বরে এবং এর অক্টোবরে দু'বার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আমি বেশ কিছুটা কাবু হয়ে পড়েছি। সেইজন্যে বইটির সমস্ত প্রুফ দেখা ও সংশোধন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে একটি মারাত্মক ভুল চোখে পড়েছে। ৩৬৯ পৃষ্ঠার ১৯ ছত্রে 'রক্ষিত' শব্দটি 'বঞ্চিত' হবে। অন্য যা মুদ্রণ প্রমাদ আছে, সেগুলো পাঠক-গণ ক্ষমা করবেন আশা করি।

অস্তাচলের পাড়ে দাঁড়িয়ে সকলের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি।

বিনীত
আকবরউদ্দীন

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব

দ্বিতীয় পর্ব : প্রথম পরিচ্ছেদ

দিল্লীর সম্রাটদের প্রতিনিধিরূপে (ভাইসরয়) যে সকল মুসলমান শাসনকর্তা বাংলা রাজ্য শাসন করেছিলেন তাঁদের শাসনের বিবরণী

তৃতীয় পর্ব : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলা রাজ্যের স্বাধীন মুসলমান রাজাগণ

চতুর্থ পর্ব : তৃতীয় পরিচ্ছেদ (ক)

দিল্লীর তৈমুর বংশীয় বাদশাহদের দ্বারা নিয়োজিত বাংলা নিজামতের নাজিমদের শাসনের বিবরণী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (খ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (গ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (ঘ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (ঙ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (চ)

পঞ্চম পর্ব : চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

ইংরেজী অনুবাদক মওলবী আবদুস সালাম
সাহেবের টীকা

প্রথম পর্ব

গ্রন্থকারের নিবেদন

"পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার নামে
(আরম্ভ করিতেছি)"

সেই বিশ্বস্রষ্টা, যিনি স্বীয় পূর্ণ শক্তিবলে এই পৃথিবীকে সজ্জিত ও সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দরবারে সীমাহীন প্রশংসা পেশ করছি। সেই শ্রেষ্ঠতম রচয়িতা—যিনি সৃষ্টির পৃষ্ঠায় স্বীয় পূর্ণ কারুশিল্প দ্বারা বহুবর্ণ-রঞ্জিত জীবনের চিত্র অঙ্কিত করেছেন, সীমাহীন প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। পরম বিজ্ঞ আল্লাহ্ তা'আলা এই পৃথিবীর সকল সময়ের ও মানুষের এবং সকলের কল্যাণ সাধন ও সকল শ্রেণীর মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন রাজাদের উপর, এবং তিনি (আল্লাহ্ তা'আল) বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাজ (বা ব্যবসায়) করবার অথবা বন্ধ করবার ক্ষমতা দিয়েছেন রাজাদের। আল্লাহ্ তা'আলা এই বিশ্বের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা ; মানব জাতির সর্বপ্রকার কার্য করার অথবা বন্ধ করার এবং পৃথিবীতে অবস্থানকারী সকলের কল্যাণ ও অকল্যাণ পৃথিবীর উপযোগী পরিমাণে নির্ধারণ ক'রে প্রত্যেক দেশে ও অঞ্চলে এক একজন শাসনকর্তা দিয়েছেন।

তাঁর করুণাপ্রদত্ত মেঘে এই পৃথিবী-রূপী
উদ্যান হয়েছে সবুজ।
তাঁর বদান্যতার মৃদুমন্দ বায়ুপ্রবাহে এই মাটির
কুঞ্জবন হয়েছে সবুজ।
তাঁর সৃষ্টির বর্ণবৈচিত্র্যময় চিত্রাঙ্কনে
মনের মধ্যের পাল্লা হয়ে যায় সবুজ।

প্রভুরই (প্রাপ্য) সকল প্রশংসা, তাঁর মর্যাদা ও
প্রশংসা উচ্চ।

তাঁর করুণা ও বদান্যতা বিশ্বব্যাপী।

তাঁর দানের জন্য সকল প্রশংসা তাঁরই (প্রাপ্য)।

তাঁর করুণাময় দরবার থেকে যে সকল দূত প্রেরণ করেছেন অর্থাৎ পয়গম্বরদের, বিশেষতঃ পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট তিনি তাঁর করুণার প্রতীকরূপে প্রেরণ করেছেন, বিশ্বাসীদের সেই অগ্রদূত, সেই শেষ পয়গম্বর, সেই সত্য পথপ্রদর্শক, পৃথিবী সৃষ্টির সেই মৌল কারণ, যাঁর জন্ম সর্বপ্রথম ও যাঁর প্রকাশ সর্বশেষ,[১] অর্থাৎ সকল পয়গম্বরের গর্ব, নির্দোষ মানুষদের নেতা,[২] শেষ বিচার দিনের উকীল তাঁর দ্বারা নির্বাচিত মুহম্মদ (দঃ)—বিশেষরূপে তাঁর নির্বাচিত আহমদ —তাঁদের সকলেরই প্রশংসা প্রাপ্য; শুভ্র ও পবিত্র জ্যোতির্ময়। আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ দয়া ও শান্তি বর্ষিত হউক শেষ মহানবী ও তাঁর বংশধরদের ও তাঁর পবিত্র গৃহের সকলের ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ ও সাহাবাগণের উপর।

আল্লাহ্ তা'আলা ও পয়গম্বরের[৩]—যাঁর (শেষ বিচারের দিন) মধ্যস্থতালাভের আশা করি—এই বিনীত বান্দা—যার নাম গোলাম হোসায়েন ও যার উপাধি সলীম জইদপুরী[৪]—বিবৃত করি যে, কিছুদিন যাবৎ কালক্রমে আমি মিঃ জর্জ উডনির অধীনে কাজ করছি। মিঃ উডনি একজন উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক; তাঁর চরিত্র সুন্দর, হৃদয় দয়ালু, মেজাজ নরম, আচরণ প্রশংসাজনক এবং তিনি অত্যন্ত দানশীল। দানশীলতায় তিনি হাতিমের[৫] তুল্য; বিচারে নওশেরোয়ার[৬] তুল্য; তিনি একালের একজন মহানুভব ব্যক্তি; জনপ্রিয়তা ও প্রশংসালাভ উভয়তেই তিনি নির্বিকার।

আল্লাহ্ তাঁর সেই ভাগ্য বজায় রাখুন এবং তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন; তাঁর পদোন্নতি দান করুন; এবং তাঁর জীবন ও সম্মান বিগুণিত করুন। — এবং সে (গোলাম হোসায়েন) তাঁর অধীন একজন

কর্মচারী; বরাবর তাঁর নিকট অনুগ্রহ পেয়ে আসছে ও এখনও পাচ্ছে। সংক্ষেপে, একালে তাঁর মতো সদগুণভূষিত, বদান্য ও বোধ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি একক ও অতুলনীয়।

তিনি সকল সদগুণের আকর
তিনি সর্বপ্রকার প্রশংসার ঊর্ধ্বে
তিনি জ্ঞানী ও পুরাকালের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতো
সকল বিষয়ে সত্যদৃষ্টিসম্পন্ন—
কিন্তু তাঁর আছে পূর্ণবয়স্কের তুল্য সৌভাগ্য,
বয়স ও মর্যাদা।
কথা বলার সময় ওজন করে তিনি বলেন ও সেগুলি অর্থপূর্ণ,
হাতের তালু দিয়ে যেমন, তেমনি তাঁর দুই ঠোঁট দিয়েও
কথাবার্তায় মুক্তা ছড়ায়।
দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তের জন্য তাঁর দানপাত্র সদামুক্ত;
তিনি সর্বদাই স্বর্ণ ও দীনার[৭] দুঃস্থদের জন্য রাখেন।

যেহেতু তাঁর মহৎ হৃদয় সর্বদা ইতিহাস ও ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে উৎসুক এবং সর্বপ্রকার জ্ঞান ও সংস্কৃতির অনুসন্ধিৎসু, সেইহেতু ১২০০ হিজরী অর্থাৎ ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে অতীতকালে প্রদেশসমূহের মধ্যে বেহেশত[৮] এই বাংলায় যে-সকল রাজা ও শাসনকর্তা নিজেদের পতাকা সমুন্নত করেছেন ও যাঁরা অনন্তের গোপন রাজ্যে মিশে গিয়েছেন তাঁদের জীবনী ও কর্মজীবন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভার্থে উৎসুক হয়েছিলেন। তদনুযায়ী সমস্ত ইতিহাস পুস্তক থেকে যতটা সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করে সকলের বোধগম্য হয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এইরূপ সহজ ভাষায় উক্ত বিষয় লিখিবার জন্য এই অক্ষম ব্যক্তির উপর হুকুম হয়। এই অন্ধ ও সীমাবদ্ধ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রভুর আদেশ পালন করা তার অবশ্য কর্তব্য গণ্য ক'রে উক্ত প্রস্তাবে স্বীকৃত হয় এবং সেজন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করার জন্য কোমর বাঁধে

এবং এই ইতিহাস সংকলন ও রচনার জন্য দুই বৎসরকাল যাবৎ প্রত্যেক সূত্র থেকে বাক্যের পর বাক্য সংগ্রহ করেছে। রচনা সম্পন্ন হওয়ার পর যে-তারিখে তা শেষ হয় সেই তারিখ অনুযায়ী বইয়ের নামকরণ করেছে 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'।[৯] প্রত্যেক গুণী ব্যক্তি এই পুস্তক অনুমোদন করবেন বলে আশা করা যায়। আশা করা যায় যে, অতীতকাল সম্বন্ধে অবহিত ব্যক্তিগণ যদি কোনও ভুল অথবা অনবধানতাবশতঃ ত্রুটি দেখতে পান তা হলে মার্জনা করবেন। কারণ, এই নগণ্য ব্যক্তি ত্রুটিহীন নয়, এবং তাঁদের সাধ্যমত ভুলত্রুটি সংশোধন করে নেবেন। যদি না পারেন তবে সেগুলি উপেক্ষা করবেন।

এই বইয়ের পরিকল্পনা হচ্ছে একটি ভূমিকা ও চারটি পরিচ্ছেদ। সেগুলি নিম্নোক্তরূপে সাজানো হয়েছে ঃ

(ক) ভূমিকা চার ভাগে বিভক্ত—

প্রথম ভাগে বাংলাদেশের অধিবাসীদের বিবরণ এবং বাংলার সীমানা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সংক্রান্ত বিবরণী।

দ্বিতীয় ভাগে উক্ত দেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বিবৃত হয়েছে।

তৃতীয় ভাগে দেশের কতকগুলি নগরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ ভাগে হিন্দুস্তানের 'রায়নে' (শাসকদের) সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে দিল্লীর সম্রাটদের ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধিরূপে মুসলমান শাসকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে-সকল মুসলমান সুলতান বাংলার মসনদে গদিনসীন হয়ে সার্বভৌমিকতার চিহ্নস্বরূপ নিজেদের নামে খোৎবা পড়িয়েছেন।[১০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদে চুগতাই[১১] অর্থাৎ মুঘল সম্রাটদের অধীনে নাজিম[১২] পদে নিয়োজিত হয়ে নিজামত পরিচালনা করেছেন যাঁরা, তাঁদের বৃত্তান্ত দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ দুই অংশে বিভক্ত—

প্রথম অংশে পর্তুগীজ, ফরাসী প্রভৃতি খ্রীস্টানদের দক্ষিণে ও বাংলায় আগমনের বিবরণ।

দ্বিতীয় অংশে বাংলা ও দক্ষিণে ইংরেজ খ্রীস্টানদের আধিপত্যের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

ভূমিকা

১. বাংলাদেশের সীমানা ও পারিপার্শ্বিকতার বিবরণ

বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণকারী ও ইতিহাস পাঠকদের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, সুবে[১৩] বাংলা দ্বিতীয় ইকলিমে[১৪] অবস্থিত। ইসলামাবাদ[১৫]—যে স্থান চট্টগ্রাম নামে পরিচিত—থেকে তেলিয়াঘরি[১৬] অর্থাৎ পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪০০ করোই[১৭] (ক্রোশ) এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ, অর্থাৎ উত্তরে পর্বত থেকে সুবার দক্ষিণ সীমান্তস্থ সরকার মান্দারণ[১৮] পর্যন্ত হচ্ছে ২০০ ক্রোশ প্রস্থ। জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ গাজীর আমলে কালাপাহাড়[১৯] কর্তৃক সুবে উড়িষ্যা বিজয়ের পর উক্ত সুবা দিল্লীর বাদশাহের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ও এই অঞ্চলকে সুবে বাংলার অংশ করা হয়। শেষোক্ত সুবার আয়তন দৈর্ঘ্যে ৪৩ ক্রোশ ও প্রস্থে ২০ ক্রোশ বর্ধিত হয়। এই সুবার দক্ষিণ সীমান্তে সমুদ্র এবং উত্তর ও পূর্ব দিকে উচ্চ পর্বতমালা, এবং পশ্চিম দিক সুবে বিহারের সংলগ্ন। সম্রাট আকবরের শাসনকালে ঈশা খান[২০] আফগান পূর্বদিকের প্রদেশসমূহ জয় করেন ও সুবে বাংলার অন্তর্গত করেন এবং আকবরের নামে খোৎবা পাঠ করান। এই সুবায়[২১] ২৮টি সরকার ও তদধীনে ৮৭টি মহল ছিল।[২২] অতীতে এই সুবার নির্দিষ্ট রাজস্ব ছিল ৫৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৩১৯ দাম—যা সিক্কা টাকায় প্রায় ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৪৮২ টাকা পনেরো আনার সমান। এই সুবার স্থায়ী সামরিক বাহিনীতে ছিল ২৩,৩৩০ জন অশ্বারোহী সৈন্য, ৮,০১,১৫৮ জন পদাতিক সৈন্য, ১৮০টি হাতী, ৪,২০৬টি কামান, ৪,৪০০ খানা যুদ্ধ-নৌকা। চট্টগ্রাম-এর উত্তর সংলগ্ন অঞ্চল ছিল

টিপারা (ত্রিপুরা) রাজার শাসনাধীন। এই দেশটিও বিস্তৃত। এই দেশের রাজাদের উপাধি মাণিক—যথা ন্যায়মাণিক। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের উপাধি ছিল 'নারায়ণ'।[২৩] ঐ দেশের রাজার এক হাজার হাতী ও দু'লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। ঘোড়া সেখানে পাওয়া যায় না। বাংলার উত্তর ও পশ্চিমের মধ্যে উত্তরমুখী অঞ্চলে কুচবিহার অবস্থিত। বিজিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত পরগণা ভিটারবন্দ[২৪] থেকে সুরাং অঞ্চলের সীমান্তে পাটগাঁও[২৪] পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিমে এই রাজ্যের দৈর্ঘ্য ৫৫ ক্রোশ; এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে, অর্থাৎ বিজিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত পরগণা নাজহাট থেকে খোন্তাঘাটের[২৪] সংলগ্ন পুশাকরপুর পর্যন্ত প্রস্থে ৫০ ক্রোশ। হিন্দুস্তানের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এই অঞ্চলের পানি মিষ্টি, মৃদু ও স্বাস্থ্যপরতা ও অধিবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্য উন্নততর। এখানে বড় কমলালেবু ও অন্যান্য ফল প্রচুর জন্মায়। এখানে গোলমরিচের গাছ জন্মায়; এই গাছের শিকড় সরু এবং এর শাখাপ্রশাখা পুকুরের পাড়ে লতিয়ে থাকে। আঙ্গুরের লতির মতো এর লতিগুলোও ডাল থেকে ঝুলে থাকে। এখানকার অধিবাসীরা 'মাখ' ও 'কুজ'[২৫] এই দুই গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এদের রাজা প্রথমোক্ত গোষ্ঠীভুক্ত। এরা স্বর্ণমুদ্রা তৈরী করে ও এর নাম 'নারায়ণী'। প্রসিদ্ধ রাজারা এখানে শাসন করেছেন। রাজার অধীনে সর্বদা একলক্ষ এক হাজার পদাতিক সৈন্য থাকতো।

কামরূপ অঞ্চল—যেটাকে কামরু[২৬] অথবা কামতাও বলা হয়—এই রাজাদের অধীন। কামরূপের অধিবাসীদের চেহারা সুন্দর এবং যাদুবিদ্যায় এরা পারদর্শী। এ বিষয়ে বহু অবিশ্বাস্য গল্প বলা হয়ে থাকে। এখানকার ফুল সম্বন্ধে কথিত হয় যে, ফুল তোলার কয়েক মাস পর পর্যন্ত সমান সুগন্ধী থাকে এবং এগুলি দ্বারা হার তৈরী করা হয়; এবং গাছগুলো কাটার পর একপ্রকার তরল পদার্থ বের হয়। পুকুর পাড়ে আমগাছের সারি থাকে ও তাতে আম হয়। অনুরূপ আরো গল্প বিবৃত হয়।

ভুটিয়াদের আবাসভূমি ভুটান পর্বত কুচবিহারের দক্ষিণ দিকে

অবস্থিত। এই সকল পর্বতে তাঙ্গন[২৭] ঘোড়া, ভুট ও বারি ঘোড়া এবং মৃগনাভি-হরিণ পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটি নদী প্রবাহিত। নদিটির প্রস্থ কম; কিন্তু অত্যন্ত গভীর ও স্রোত প্রবল। নদীর উপরে একটি লোহার শিকল দুই পাড়ে পাহাড়ের সঙ্গে আটকানো। এই শিকলের উপর মানুষের মাথা সমান উঁচুতে আর একটি শিকল এইরূপে আটকানো। পথিকেরা উপরের শিকল হাত দিয়ে ধরে নীচের শিকলের উপর পা দিয়ে দিয়ে নদী পার হয়। আরো আশ্চর্যজনক এই যে, ঘোড়া ও মালপত্র এই শিকলের সাহায্যে নদী পার করা হয়। এই অঞ্চলের বাশিন্দাদের রং লালচে ও তারা মোটা; তাদের মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত ঝুলে থাকে। গুপ্ত অঙ্গ আবরিত করার মতো পর্যাপ্ত একটুকরো কাপড় এদের মোট পোশাক। এখানকার পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা একই রকম পোশাক পরে। এদের কথার উচ্চারণ (ভাষা) কুচবিহারের অনুরূপ। কথিত হয় যে, এই পর্বতে নীলকান্তমনি পাথরের খনি আছে।

বাংলার উত্তর ও পশ্চিমের মধ্যে কামরূপ অঞ্চলের সীমান্তে আসাম প্রদেশ অবস্থিত। এর মধ্য দিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত। পশ্চিম থেকে পূর্ব অর্থাৎ গৌহাটি থেকে সদিয়া পর্যন্ত আসামের দৈর্ঘ্য প্রায় দুইশত 'করোহ্' বা ক্রোশ; এবং উত্তর অর্থাৎ মারি, মাজমি, দাফলা ও ভালান্দা[২৮] উপজাতিদের পার্বত্য বাসস্থান থেকে নান্দা উপজাতির পার্বত্য বাসস্থান পর্যন্ত প্রস্থ প্রায় সাত/আট দিনের পথ। এর (আসামের) দক্ষিণ দিকে পর্বতশ্রেণী লম্বালম্বিভাবে খাসিয়া, কাছাড় ও কাশ্মীরের[২৯] সংলগ্ন; এবং দক্ষিণ দিকে নাগা উপজাতিদের বাসস্থান আভ্'তান বা আতোয়ানের সংলগ্ন। এর উত্তরের পর্বত লম্বালম্বিভাবে কামরূপের উচ্চ পর্বতমালার পাশ ঘেঁষে গিয়েছে; এবং প্রস্থের দিকে ভালান্দা উপজাতির পর্বতমালার মুখোমুখি রয়েছে। গৌহাটি থেকে মারি ও মাজমি উপজাতিদের বাসস্থান পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরাঞ্চলের নাম উত্তরাকুল, এবং দক্ষিণকুল (ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণাঞ্চল) নাকিতিরানি[৩০] অঞ্চল থেকে সদিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত।

ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবহাওয়া বিদেশীদের পক্ষে বিষতুল্য। (বৎসরে) আট মাস বৃষ্টি হয় এবং শীতকালের চার মাসের মধ্যেও বৃষ্টি হয়ে থাকে। হিন্দুস্তান ও বাংলার ফুল ও ফল এখানে পাওয়া যায়; তাছাড়া হিন্দুস্তানে পাওয়া যায় না এমন ফুল এবং ফলও এখানে পাওয়া যায়। গম, বার্লি, ও ডাল এখানে হয় না; কিন্তু এখানকার জমি সকল প্রকার ফসলের আবাদের উপযোগী। লবণ দুষ্প্রাপ্য ও আক্রা। কোনও কোনও গিরিসংকট থেকে যে লবণ পাওয়া যায় তা তিক্ত ও ঈষৎ লোনা। প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তীশালী ও বৃহৎ হলেও এদেশের লড়াইয়ে-মোরগগুলি কিছুতেই পিছু হটে না। এরা এমন লড়াই করে যে, এদের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হয়ে যায় ও সেজন্য মরে যায়। জঙ্গলে ও পাহাড়ে বৃহৎ সুগঠিত দেহ হস্তী প্রচুর আছে। হরিণ, বুনো ছাগল, বুনো গরু ও শিংওয়ালা লড়াইয়ে-মেষ প্রচুর পাওয়া যায়। ব্রহ্মপুত্র নদের বালিতে সোনা পাওয়া যায়। বারো হাজার অসমীয়াকে এই কাজে নিযুক্ত করা হয়। এরা প্রত্যেকে বাৎসরিক এক তোলা সোনা রাজার খাজাঞ্চিখানায় দেয়। কিন্তু এই সোনা বিশুদ্ধ নয়; সেইজন্য এক তোলা সোনা আট/নয় টাকা মূল্যে বিক্রি হয়। টাকশালে রাজার নামে স্বর্ণমুদ্রা তৈরী হয়। কড়ি প্রচলিত আছে; কিন্তু তামার পয়সা প্রচলিত নয়। আসামের পাহাড়ে মৃগনাভী-হরিণ পাওয়া যায়। মৃগনাভির থলিগুলো বড় ও এর মধ্যে বড় বড় মৃগনাভির টুকরো পাওয়া যায় এবং এগুলি দেখতে সুন্দর। কামরূপ, সদিয়া ও লাখুগিরার পাহাড়ে চন্দন কাঠ পাওয়া যায় এবং এগুলি ভারী ও সুগন্ধি। প্রজাদের নিকট থেকে কোন কর আদায় করা হয় না। প্রত্যেক বাড়ির তিনজনের মধ্যে একজনকে রাজার কাজ করতে হয়; কেউ কাজে গাফিলতি করতে পারে না; গাফিলতি দেখা গেলে তাকে হত্যা করা হয়। এখানকার রাজা এক সুড়ঙ্গ প্রাসাদে বাস করেন; তিনি মাটিতে পা দেন না। মাটিতে পা দিলেই তাকে রাজ্যচ্যুত করা হয়। এদেশের লোকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা স্বর্গে বাস করতো এবং কোনো

এক সময় সোনার সিঁড়ি লাগিয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল ও সেই কাল থেকে তারা পৃথিবীতে বাস করছে। সেজন্য এখানকার রাজাকে 'স্বর্গী' বলা হয়—হিন্দী ভাষায় স্বর্গ অর্থ বেহেশত (heaven)। এদেশের রাজারা শক্তিশালী ও খ্যাতিমান। কথিত হয় যে, যখন এখানকার রাজার মৃত্যু হয়, তখন তার ঝি-চাকর, কতকগুলি সুবিধা-জনক ও আবশ্যকীয় জিনিসপত্র, গালিচা, কাপড়-চোপড়, খাদ্যদ্রব্য ও একটা তেলের চেরাগ জ্বালিয়ে সমাধি-সৌধের মধ্যে দিয়ে শক্ত কাঠ দিয়ে সুন্দরভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়।[৩১]

আসামের সংলগ্ন হচ্ছে তিব্বত এবং তিব্বতের সংলগ্ন হচ্ছে খাটা ও মাচিন।[৩২] খাটার রাজধানী হচ্ছে খান-বালিগ[৩৩] ও এই নগর সমুদ্র থেকে চার দিনের পথ দূরে। কথিত হয় যে, খান-বালিগ থেকে সমুদ্রোপকুল পর্যন্ত একটা খাল খনন করা হয়েছে এবং দুই পাড়ে শক্ত বাঁধ তৈরী করে দেয়া হয়েছে। আসামের পূর্ব দিকে উতরাকুলের দিকে ,পনের দিনের পথ দূরে মারি ও মাজমি উপজাতিরা বাস করে। ঐ পাহাড়ে কালো হরিণ ও হাতী পাওয়া যায়। এই সব পর্বত থেকে রৌপ্য, তাম্র ও টিন সংগ্রহ করা হয়। মারি ও মাজমি উপজাতিদের আচার-প্রথা অসমীয়াদের মতোই। তবে এদের স্ত্রীলোকেরা অসমীয়াদের অপেক্ষা সুন্দরী ও মার্জিত। এরা বন্দুককে অত্যন্ত ভয় করে; বলে—"এটা অতি মন্দ জিনিস, চীৎকার করে অথচ স্থানচ্যুত হয় না; আর এর পেটের ভেতর থেকে একটা শিশু বের হয়ে আসে ও মানুষ হত্যা করে।"

বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ অঞ্চল অবস্থিত। এই অঞ্চলের নাম আরখাঙ (আরাকান)।[৩৪] চট্টগ্রাম এই অঞ্চলের সংলগ্ন। এখানে নর-হাতী প্রচুর পাওয়া যায়; ঘোড়া প্রায় দেখা যায় না; উট ও গাধা উচ্চমূল্যে পাওয়া যায়। গরু অথবা মোষ এখানে দেখা যায় না। কিন্তু গরু-মোষের মতো এক শ্রেণীর পিঙ্গল বর্ণের জন্তু দেখা যায়; এগুলো দুধ দেয়। এখানকার অধিবাসীদের ধর্ম ইসলাম ও হিন্দুধর্ম থেকে ভিন্ন। কেবল মাতা

ভিন্ন অন্য সকল স্ত্রীলোককে এরা স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে—দৃষ্টান্তস্বরূপ, ভাই বোনকে বিয়ে করে। এখানকার রাজাকে বলে 'ওয়ালি'। লোকে রাজাকে ভক্তি করতে কখনো ত্রুটি করে না এবং রাজার প্রতি তাদের আনুগত্য সর্বদা দৃঢ়। দরবারে নারী সৈন্যরা উপস্থিত থাকে ও এদের স্বামীরা বাড়ীতে থাকে। অধিবাসীরা সকলেই কৃষ্ণবর্ণের ও এদের পুরুষেরা দাড়ি রাখে না।

বাংলার দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আরখাঙের (আরাকানের) সংলগ্ন দেশের নাম পেগু।[৩৫] হস্তী-যূথ ও পদাতিক সৈন্যদের দ্বারা এই দেশের সামরিক বাহিনী গঠিত। এখানকার জঙ্গলে শ্বেতহস্তী দেখা যায় এবং সীমান্ত অঞ্চলে খনিজদ্রব্য ও মূল্যবান পাথরের খনি আছে। এইজন্য পেগুবাসী ও আরাকানীদের মধ্যে শত্রুতা আছে।

এই অঞ্চলের সীমান্তে মগদের[৩৬] দেশ অবস্থিত। এখানকার বাসিন্দারা মানুষের আকৃতিতে জানোয়ারের মতো। মাটি ও সমুদ্রের সব রকম পশু এরা আহার করে। কোনো পশু বাদ দেয় না। এদের ধর্ম ও আইন ত্রুটিপূর্ণ। এরা বৈমাত্রেয় ভগ্নীদের বিবাহ করে। এদের ভাষার উচ্চারণ তিব্বতীদের ভাষার অনুরূপ।

বাংলার দক্ষিণ সীমান্তে ওডিসা (উড়িষ্যা) অঞ্চল অবস্থিত। এই দেশের (অঞ্চলের) সীমানা হ'ল লাগুাহ্‌দাস্থল থেকে মালোয়া ও চিল্কা হ্রদের পথ পর্যন্ত। সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহ গাজীর রাজত্বকালে কালাপাহাড়[৩৭] এই দেশ জয় করে দেওয়ানী আকবরের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তা বাংলার নিজামতের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, কালাপাহাড় বাবুরের একজন আমীর ছিলেন; তিনি সাহসী ও আশ্চর্যজনক কাজ সম্পন্ন করতে পারতেন। মুহম্মদ আকবর বাদশাহের হুকুম মতো তিনি বারো হাজার বাছাই অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এই দেশ জয় করতে প্রবৃত্ত হন। দেশের রাজা মাকান্দ দেও (মুকুন্দ দেব) অত্যন্ত বিলাস-প্রিয় ও অলস ছিলেন। তিনি জনসাধারণকে ছ'মাস দেখা দিতেন ও দেশের কাজকর্ম দেখাশুনো করতেন; এবং বাকী ছ'মাস শরীরকে

বিশ্রাম দিতেন ও নিদ্রায় কাল যাপন করতেন। নিদ্রার সময় কেউ তার ঘুম ভাঙালে তার মৃত্যু ছিল সুনিশ্চিত। কালাপাহাড়ের অধীনে সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর আগমনবার্তা শুনে রাজা সুদৃঢ় বারঘাটি দুর্গ[৩৮] নিজ নিরাপত্তার জন্য তৈরী করেন ও সেখানে ঘাঁটি করেন। শত্রুর মোকাবেলার জন্য যথোপযুক্ত সৈন্য মোতায়েন করে রাজা তাঁর পুরানো অভ্যাস মতো ঘুমুতে লাগলেন। কালাপাহাড় পরপর বহু যুদ্ধে রাজার সৈন্যদের পরাজিত করেন ও সমগ্র ওড়িসা (উড়িষ্যা) দখল করেন। এমন কি, তিনি বাড়ীর সমস্ত জিনিসপত্রসহ রানীকে নিয়ে যান। তথাপি প্রাণ হারাবার ভয়ে কেউ নিদ্রামগ্ন রাজার ঘুম ভাঙাতে সাহস করে নাই। সুতরাং কালাপাহাড়ের কোনো বাধা ছিল না। সমস্ত দেশ অধিকার সম্পন্ন করার পর কালাপাহাড় রাজার নিদ্রাস্থল বারঘাটি ঘেরাও করেন ও যুদ্ধ আরম্ভ করেন। রাজার[৩৯] কর্মচারীরা তখন তুর্য-বাদকদের দ্বারা তুর্যধ্বনি করে সমস্ত ঘটনা রাজাকে জানায়। কালাপাহাড়ের সংবাদ পাওয়া মাত্রই মৃত্যুতুল্য নিদ্রাভিভূত রাজার নিকট কবরে নিদ্রিত ব্যক্তিদের নিকট বিচারদিনের কথা যেরূপ মনে হয়, এই ঘটনাও সেইরূপ মনে হয়েছিল এবং ভেরীধ্বনি শুনে হতভম্ব হয়ে লম্ফ দিয়ে উঠে নিহত পশুর মতো ইসলামী যোদ্ধাদের তরবারির সামনে মাথা পেতে দিলো। উড়িষ্যা ও বারাঘাটি দুর্গ দখল করে সমগ্র অঞ্চল মুসলমান সম্রাটদের শাসনাধীনে আনীত হয়। সুদৃঢ় মুসলমান ধর্ম ও আলোকপ্রাপ্ত ইসলামী আইনকানুন এই দেশে প্রবর্তিত হয়। ইতিপূর্বে এই দেশের উপর মুসলমান বাদশাহদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।[৪০] কালাপাহাড়ের[৪১] অলৌকিক কার্যাবলীর মধ্যে একটা ছিল এই যে, সেই দেশের যে-কোনো স্থানে তাঁর দামামা-ধ্বনি পৌঁছালেই হিন্দুরা যে-সকল প্রতিমা পূজা করতো সেইসব প্রস্তরমূর্তির হাত, পা, কান, নাক খসে পড়ে যেতো। সেই জন্য আজও ঐ দেশের কয়েক স্থানে প্রস্তরমূর্তিগুলির হাত-পা ভাঙা এবং নাক-কান কাটা দেখা যায়। হিন্দুরা মিথ্যার অনুসারী হয়ে অন্ধ অন্তরে, সমস্ত জানা সত্ত্বেও (এই সব মূর্তির) পূজা করে থাকে।

পাথর থেকে যা হয় সে ত' জানা আছে।
এর পূজা করে লজ্জা ব্যতীত আর কি লাভ হয়?

কথিত হয় যে (উড়িষ্যা থেকে) প্রত্যাবর্তনের সময় কেঁওঝারের জঙ্গলে একটি ঢাক ফেলে এসেছিলেন; সেটি উল্টো অবস্থায় পড়ে আছে। শোনা যায়, প্রাণের ভয়ে কেউ সেটাকে সোজা করে না।

হিন্দুদের বৃহৎ জগন্নাথ মন্দির এই সুবায় অবস্থিত। কথিত হয় যে হিন্দুরা যখন জগন্নাথের পূজা দেয়ার জন্য পারশূতম (পুরুষোত্তম) পৌঁছায়, তখন তারা মুসলমানদের মতো মস্তক মুণ্ডন করে এবং শেখ কবীরের[১২] বাড়ীর প্রথম দুয়ারে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করে; দেশের ভাষায় এটাকে বলা হয় 'তরাণি'। শেখ কবীর সেকালের একজন মহান ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন; তাঁর মাতাপিতা তাঁতী ছিলেন। 'তরাণি' গ্রহণ করার পর হিন্দুরা জগন্নাথের দেবতার পূজার জন্য যায়। কিন্তু অন্যত্র তাদের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে হিন্দুরা পরশূতমে মুসলমান ও অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রে আহার করে। বাজারে সকল প্রকার রাঁধা খাবার বিক্রি হয়; হিন্দু ও মুসলমানেরা সেগুলো খরিদ করে একত্রে পানাহার করে।

২. বাংলাদেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা

অতীতের মুক্তাসম কাহিনীসমূহের মূল্য নির্ধারণকারীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতিহাসবেত্তাদের অনেকে বর্ণনা করেছেন যে নূহ পয়গম্বরের (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) পুত্র হাম তাঁর পূত-পবিত্র পিতার অনুমতি অনুযায়ী (পৃথিবীর) দক্ষিণ দিকে মনুষ্য বসতির জন্য মনস্থ করেন। সেই উদ্দেশ্য কার্যকরী করার জন্য তিনি তাঁর পুত্রদের দিকে দিকে মানুষের বসতি স্থাপনের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর (হামের) প্রথম পুত্রের নাম হিন্দ; দ্বিতীয়ের সিন্ধ; তৃতীয়ের হাবাশ; চতুর্থের জানায; পঞ্চমের বার্বার; এবং ষষ্ঠের নাম নিউবাহ। যে সকল অঞ্চলে তাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করেন, সেগুলির নাম তাঁদের নামানুসারে রাখা

হয়েছে। জ্যেষ্ঠ সন্তান হিন্দ হিন্দুস্তানে আসার দরুন এই অঞ্চলের নাম তাঁর নামানুসারে রাখা হয়। সিন্ধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে এসে সিন্ধুদেশে বসতি স্থাপন করায় এই অঞ্চলের নাম তাঁরই নামানুসারে সিন্ধু রাখা হয়। হিন্দের চার পুত্র ছিল। প্রথম—পুরব ; দ্বিতীয়—বঙ্গ ; তৃতীয়—দখিন ; চতুর্থ—নাহারওয়াল। এরা যে যে অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তার প্রতিটির নাম তাঁদেরই প্রত্যেকের নামানুযায়ী রাখা হয়। হিন্দের পুত্র দখিনের তিন পুত্র ছিল এবং দখিন দেশটি তাঁদের মধ্যে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই তিন পুত্রেব নাম ছিল সারহাট, কানার, তালং। দক্ষিণ-দেশবাসীরা সকলে এদের বংশধব এবং এখন পর্যন্ত এই তিনটি জাতি (বা গোষ্ঠী) এই অঞ্চলে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

এবং, নাহারওয়ালের ছিল তিন পুত্র—বারুজ, কনোজ ও মালরাজ। এঁদের নামানুসারে নগরীসমূহের নামকরণ করা হয়েছে।

হিন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরবের বিয়াল্লিশটি পুত্র ছিল। অল্পকালের মধ্যে এঁদের বংশ বৃদ্ধি হয় ও তাঁরা বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ (বা বসতি) স্থাপন করে। এবং যখন তাদের সংখ্যা খুব বেশী হয়ে গেলো, তখন তারা সমগ্র এলাকার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানেব জন্য নিজেদের মধ্য থেকে একজন প্রধান নিযুক্ত করে।

হিন্দের পুত্র বং (বঙ্গ) এর সন্তানেরা বাংলায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। আদিতে বাংলার নাম ছিল বং। এর সঙ্গে 'আল' শব্দ যোগ হওয়ার কারণ হচ্ছে এই ঃ বাংলা ভাষায় 'আল' অর্থ বাঁধ। যাতে বন্যার পানি বাগানে অথবা আবাদী জমিতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জমির চারিদিকে বাঁধ দেয়া হোত। প্রাচীন কালে বাংলার প্রধানেরা পাহাড়ের পাদদেশে নিচু জমিতে দশ হাত উঁচু, কুড়ি হাত চওড়া স্তূপ তৈরী করে তার উপর বাড়ী, চাষাবাদ করতেন। লোকে এগুলোকে বলতো 'বাঙালা'।[৪৩] বাংলার আবহাওয়া মাঝারি এবং সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় ও অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য অত্যন্ত ভিজা। বর্ষাঋতু আরম্ভ হয় 'উর্দী বিহিশ্‌ত'[৪৪] মাসে। হিন্দীতে এই মাসের নাম 'জৈঠ'। ছ'মাস কাল বর্ষা থাকে। এটা হিন্দুস্তানের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন ;

অন্যান্য অঞ্চলে বর্ষা আরম্ভ হয় 'খুরদাদ' মাসে—হিন্দীতে বলা হয় 'আষাঢ়' এবং 'শাহরিয়ার'—হিন্দীতে যাকে বলে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এই চার মাস বর্ষা থাকে। বর্ষার মওসুমে বাংলার নিচু জমি বন্যায় ডুবে যায় ও আবহাওয়া তখন—বিশেষতঃ বর্ষার শেষ দিকে খারাপ থাকে। মানুষ ও পশু উভয়েরই অসুখ করে ও মরে। মাটি অত্যন্ত ভিজা থাকায় অনেক স্থানে লোকে চুন ও টিন দিয়ে দোতলা ঘর তৈরী করে। যদিও তারা চুন ও ইট দিয়ে মেঝে তৈরী করে, তথাপি নিচের তলার ঘর বাসের অযোগ্য হয়। যদি কেউ সেখানে বাস করে, তাহলে শীঘ্রই তার অসুখ হয়—অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্য বাংলার মাটি অত্যন্ত উর্বর। যথা, কোনো কোনো শ্রেণীর ধানের গাছ পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে বড় হতে থাকে—অবশ্য, যদি বন্যায় ভাসিয়ে না নিয়ে যায়। ধান গাছগুলো পানির উচ্চতা ছাড়িয়ে আরো উপরে ওঠে; শীষগুলো পানিতে ডোবে না। কোনো কোনো শ্রেণীর ধানের একটি বীজ থেকে ২/৩ সের ধান পাওয়া যায়। অধিকাংশ জমিতে বছরে তিনটি ফসল হয়। এদেশের একমাত্র শস্য হচ্ছে সরু ও মোটা উভয় প্রকার ধান। গম, বার্লি, ডাল ইত্যাদি অন্য রকমের শস্য বিরল। অদ্ভুত বিষয়, ধান এতই প্রচুর জন্মায় যে, তজ্জন্য শুকনোর সময়ও বৃষ্টি অথবা কুয়া বা নদীর পানির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বর্ষা ঋতুতে অনাবৃষ্টি হলে ধানশস্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।[৪৫]

পল্লীবাসীরা তাদের শাসকদের অনুগত ও বশীভূত এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য প্রদেশের জমিদার ও প্রজাদের মতো এরা তাদের শাসকদের সঙ্গে লড়াই করে না। তারা আট মাসে আট কিস্তিতে জমির রাজস্ব দিয়ে থাকে এবং প্রজারা স্বয়ং কাছারীতে খাজনা দিয়ে থাকে। 'নসকে'র[৪৬] ভিত্তিতে প্রত্যেক শস্যের মূল্য স্থির করা হয়। 'নসক' একটা দলীল, যা মুহুরী[৪৭] ও পাটোয়ারী[৪৮] ও 'কারকুনের'[৪৯] নিকট থাকে; এই দলীলে আমিনের শীলমোহর দেয়া থাকে। কিন্তু লেন-দেন, খরিদ-বিক্রি ও অন্যান্য সাংসারিক বিষয়ে পৃথিবীর

আর কোথাও বাঙালীদের মতো দুর্নীতিপরায়ণ, ছল, প্রতারক, দুর্জন দেখা যায় না। এরা ঋণ শোধ করতে হবে বলে মনে করে না; এবং কোনো কাজ একদিনে করার প্রতিশ্রুতি দিলে এক বছরেও তা করে না। এই রাজ্যের উচ্চ-নীচ সকল বাশিন্দার খাদ্য হচ্ছে মাছ, ভাত, সরিষার তৈল, দধি, ফল ও মিষ্টি। এরা প্রচুর পরিমাণে লাল মরিচ ও লবণ খায়। এই দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে লবণ দুষ্প্রাপ্য। এই দেশের অধিবাসীদের রুচি, আচরণ ও পোশাক নিকৃষ্ট ধরনের। এরা গম ও বার্লির রুটি মোটেই খায় না। ছাগ ও মুরগীর গোশ্‌ত ও ঘি এদের ধাতে সহ্য হয় না। এদের অনেকে যদিও বা এসব দ্রব্য আহার করে, তাহলেও হজম করতে পারে না, বমি করে দেয়। উচ্চ-নীচ উভয় শ্রেণীর পুরুষ ও নারীদের পোশাক কেবল এক টুকরো কাপড় যা কেবল তাদের গুপ্ত অঙ্গ আবরণের মতো যথেষ্ট হয়ে থাকে। পুরুষেরা এক টুকরো সাদা কাপড় পরে; সাধারণতঃ একে ধুতি বলে; নাভির নিচে বেঁধে পায়ের নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয় এবং মাথার পাশে দু'তিন হাত লম্বা একটা ছোট পাগড়ী বাঁধে; মাথার খুলি (তালু) ও চুল দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা শাড়ি নামক এক টুকরো কাপড় পরে। নাভির নিচে থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা থাকে অর্ধেক দিয়ে ও বাকী অর্ধেক পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘাড়ের নিচে ঝুলিয়ে দেয়। তাদের মাথা খালি থাকে; ওরা অন্য কোনো কাপড় পরে না; জুতো-মোজা পরে না। পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা উভয়েই সর্বাঙ্গে সরিষার তৈল মাখে এবং পুকুর বা নদীতে গোসল করে। বাঙালী স্ত্রীলোকেরা পর্দা করে না। পায়খানা করার ও অন্য গৃহকর্ম করার জন্য এরা বাড়ীর বাহিরে যায়। এদেশের জঙ্গল ও বাড়ী একই রকমের এই কারণে যে লোকেরা বাঁশ ও খড় দিয়ে কুঁড়ে-ঘর তৈরী করে। এদের বাসন-কোসন সাধারণতঃ মাটির তৈরি—অল্পই তামার। যখনই এরা একস্থান থেকে অন্যত্র যায়, তখনই সেখানে গিয়ে পূর্বের মতোই কুঁড়েঘর তৈরী করে ও মাটির বাসন-কোসন সংগ্রহ করে। এদের অধিকাংশ বাসস্থান বনে-জঙ্গলে, যে জন্য এদের

কুঁড়ে ঘরগুলো গাছপালায় ঘেরা থাকে। আর যদি একটি কুটিরে আগুন লাগে, তবে সবগুলো পুড়ে যায় এবং তাদের বাসস্থানের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না--কেবল কুটিরগুলোর চারিদিকের গাছগুলো থাকে। অধিকাংশ লোক জলপথে চলাচল করে—বিশেষতঃ বর্ষার সময়। বর্ষার সময় যাতায়াতের জন্য ছোট-বড় নৌকা রাখে। স্থলপথে যাতায়াতের জন্য এরা সিংহাসন,[৩০] পাল্কি ও জওয়ালা ব্যবহার করে। দেশের কোনো কোনো অংশে হাতী ধরা হয়। ভাল ঘোড়া পাওয়া যায় না—পেলেও মূল্য অত্যধিক। দুর্গ অধিকারের জন্য এরা এক প্রকার অদ্ভুত নৌকা তৈরী করে। সেগুলো হচ্ছে এই রকমঃ নৌকাগুলি বৃহৎ; এর সামনের দিকটা—যাকে দেশী ভাষায় 'গল্হি' (গলুই) বলা হয়—এতই উঁচু যে, যখন নৌকাগুলি দুর্গের দেয়ালের পাশে রাখা হয়, তখন লোকেরা নৌকা থেকে দেয়ালের উপর উঠে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। তিসি গাছের (লতার) সুতো দিয়ে এক প্রকার গালিচা তৈরি করা হয়, যা অত্যন্ত সুন্দর ও খুব পছন্দসই। মুক্তা, পান্না প্রভৃতি মূল্যবান পাথর এদেশে পাওয়া যায় না। অন্য দেশ থেকে এগুলো এই সুবার বন্দরগুলোতে আমদানি করা হয়। আম এদেশের শ্রেষ্ঠ ফল। কোনো কোনো অঞ্চলের আম বড় মিষ্টি, সুস্বাদু ও আঁশহীন; ভিতরে একটা ছোট পাথর (আঁটি) থাকে। মানুষ-সমান উঁচু তিন বছরের গাছে ফল ধরে। বড় বড় কমলালেবু—যাকে কৌঁলা ও ছোট জাতের কমলা—যাকে নারঙ্গি বলা হয়—এদেশে ভাল জন্মায়। নানা রকমের জামির (জাম্বুরা) এখানে পাওয়া যায়। পাতিলেবু, আনারস, নারিকেল, সুপুরি, তাল, কাঁঠাল ও কলা অশেষ। আঙ্গুর ও খরমুজ ইত্যাদি এখানে পাওয়া যায় না। খরমুজের বীজ ও আঙ্গুরের কলম প্রায়ই লাগানো হয়, কিন্তু কখনো সতেজ হয় না। লাল, সাদা ও কাল রং-এর মিষ্টি-মধুর ভাল ইক্ষু প্রচুর জন্মায়; আদা ও লঙ্কা কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচুর জন্মায়; পান প্রচুর জন্মায়; ভাল রেশম প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভাল রেশমের দ্রব্য (কাপড় ইত্যাদি) এদেশে তৈরী হয়; ভাল জাতের সুতি-কাপড়ও তৈরী হয়। এদেশে বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ

নদী আছে; পুকরিণী খনন এদেশে অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। সর্বত্র প্রচুর পুকুর ও নদীর পানি পাওয়া যায় বলে এদেশের লোকে কদাচিৎ কুয়ার পানি পান করে। কুয়ার পানি সাধারণতঃ লোনা হয়ে থাকে; কিন্তু অল্প খুঁড়লেই পানি বের হয়।

নদীগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে গ্যাঞ্জেস (গঙ্গা) এবং এই নদীর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে হিন্দুস্তানের উত্তর দিকের পর্বতমালার মধ্যস্থ 'গোমুখা' নাকম স্থানে এবং হিন্দুস্তানের প্রদেশগুলোর ভেতর দিয়ে ফরাক্কাবাদ, এলাহাবাদ, বিহার ও বাংলার মধ্য দিয়ে এ নদী প্রবাহিত। বাংলায় বাব্‌বাকাবাদ সরকারের মধ্যস্থ কাজিহাটা[৫১] নামক স্থানে এর নাম হয়েছে পদ্মা। এখান থেকে গঙ্গার একটি শাখা আলাদা হয়েছে এবং মুর্শিদাবাদের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীয়ায় জলন্দী নদীর সাথে এর যোগ হয়েছে ও তারপর সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই শাখাকে বলে ভাগিরথী এবং এটা সমুদ্রের ভেতর দিয়ে চট্টগ্রামের দিকে গিয়েছে। এলাহাবাদে গঙ্গার যোগ হয়েছে 'জোন' (যমুনা) ও 'সুরসতির' সঙ্গে। হাজিপুরে এসে গঙ্গা মিশেছে গণ্ডক, সারু ও সোন নদীর সঙ্গে এবং এখানে অত্যন্ত প্রশস্ত হয়েছে। হিন্দুরা এই তিনটি নদীর মিলনস্থানকে বলে ত্রিবেণী এবং তাদের নিকট এর পবিত্রতা অপরিমেয়। গঙ্গা, সুরসতি ও জোন (বা যমুনা) চট্টগ্রাম ও সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হওয়ার পথে এগুলো থেকে হাজারো ছোট ছোট শাখা-নদী বেরিয়েছে। হিন্দুরা এই নদীগুলোর পবিত্রতা সম্বন্ধে বহু সংখ্যক বই লিখেছে। হিন্দুদের মতে এই নদীগুলোর পানি পবিত্র। কাজেই এই পানিতে গোসল করে তারা সারাজীবনের পাপ থেকে মুক্ত হয়। বিশেষতঃ, বেনারস, এলাহাবাদ ও হরিদ্বারের মতো কয়েকটি ঘাটে গোসল করাকে হিন্দুরা অত্যন্ত পবিত্র গণ্য করে। ধনী হিন্দুরা দূরদূরান্ত থেকে গঙ্গার পানি সংগ্রহ ক'রে বিশেষ যত্নের সঙ্গে রাখে ও কয়েকটি শুভ দিনে তা দিয়ে পূজা করে। বিষয়টির সত্য কথা হচ্ছে এই যে, গঙ্গার পানি মিষ্টতা ও স্বাদে অতুলনীয় এবং এই নদীর পানি যত দিনই রাখা হোক না কেন, দুর্গন্ধ হয় না। বাংলায় এর চাইতে

বড় নদী আর নাই।

বাংলার আর একটি বৃহৎ নদীর নাম হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র। খটা অঞ্চল থেকে কোচের দিকে এই নদী প্রবাহিত এবং সেখান থেকে বাজুহা হয়ে সমুদ্রে পড়েছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাশে এর নাম হয়েছে মেঘনা। ছোট ছোট নদীর সংখ্যা অসংখ্য। অধিকাংশ নদীর তীরে ধানের আবাদ করা হয়। এই দেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য—যা হিন্দুস্তানের অন্য কোনো অঞ্চলে নাই—হচ্ছে, আম ও লেবুর কলম লাগালে প্রথম বছরেই ফল হয়।

৩. বাংলাদেশের কয়েকটি শহরের বিবরণ এবং কয়েকটি নগর প্রতিষ্ঠার বিবরণ

অতীতের বাংলার রাজধানী লখনৌতি নগর সঙ্গলদিব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কথিত হয় যে, হিন্দুস্তানের রাজা ফিরোজ রায় যুদ্ধে রুস্তম দাস্তান[৫২] কর্তৃক পরাজিত হয়ে তিরহুতের দিকে পলায়ন করেন এবং সেখান থেকে ঝাড়খণ্ড[৫৩] ও গণ্ডওয়ারার[৫৪] পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন ও সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ঔদ্ধত্যে অসন্তুষ্ট হয়ে রুস্তম হিন্দুস্তানের রাজ্য তাঁর সন্তানদের না দিয়ে সুরজ[৫৫] নামক জনৈক হিন্দুকে দান করেন। সুরজ শক্তিশালী রাজা হয়েছিলেন এবং দখিন ও বাংলা রাজ্যদ্বয় জয় করেন। সুরজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহরাজ রাজা হন। কিন্তু তাঁর সময়ে রাজ্যের চারিদিকে অরাজকতা দেখা দেয়; সকলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে; ফলে সওয়ালিকের পার্বত্য অঞ্চল থেকে আগত কেদার নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজা হন। তাঁর রাজত্বের শেষদিকে বাংলার সীমান্ত-সংলগ্ন 'কুচ' অঞ্চল থেকে সঙ্গলদিব[৫৬] নামক একব্যক্তি এসে প্রথমে বাংলা ও বিহার জয় করেন এবং কেদারের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে লখনৌতি[৫৭] নগর তৈরী করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। দু'হাজার বৎসর কাল এই নগরী বাংলার রাজধানী ছিল। মুঘল বাদশাহদের সময় এই

নগরী ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর পরিবর্তে টাণ্ডায় সুবাদারের রাজধানী স্থাপিত হয়। এর পর টাণ্ডাও ধ্বংস হয়ে যায়; এবং জাহাঙ্গীরাবাদ ও সর্বশেষে মুর্শিদাবাদ সুবাদারের রাজধানী হয়। 'গৌড়' নামকরণের আদি কারণ অজ্ঞাত। কিন্তু অনুমান করা হয় যে, নথগোরিয়ার সন্তানদের রাজত্বকালে এই নাম দেয়া হয়েছিল। বাদশাহ হুমায়ুন গৌড় নাম অশুভ গণ্য করেন এবং তা পরিবর্তন করে 'জিন্নতাবাদ' রাখেন। নগরটি বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে বাঘ ও সিংহের বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। দুর্গের সিংহদ্বারের চিহ্ন ও ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ী এবং মসজিদ ও কবরস্থানের পাকা বাড়ীর ভিত্ ভিন্ন আর কিছুর অস্তিত্ব নাই।

যে স্থানে সম্রাটেরা বন্ধুগণসহ উদ্যানে বসতেন, তা এখন কাক ও শকুনের এবং সিংহ ও শৃগালের বাসস্থান হয়েছে। গৌড়ে একটি বৃহৎ দুর্গ ছিল। এর চিহ্ন এখনো দেখা যায়। নগরের পূর্বদিকে ঝাটিয়া, ভাটিয়া ও অন্যান্য হ্রদ আছে। সেকালের বাঁধ[৫৮] এখনো আছে, কিন্তু পূর্বে যখন নগরের অবস্থা উন্নত ছিল, তখন বর্ষাকালে বন্যার পানি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্য বাঁধ আরো শক্ত ছিল। বর্তমানে বর্ষাকালে এখান দিয়ে নৌকা চলাচল করে ও সমস্তটা বন্যায় ভেসে যায়। প্রাচীন কালে দুর্গের উত্তর দিকে এক ক্রোশ দূরে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল এবং পিয়াসবাড়ী নামে একটি পুকুর ছিল। এই পুকুরের পানি অত্যন্ত ক্ষতিকর ছিল—যে পান করতো উদরাময় রোগে তার মৃত্যু হ'ত। কথিত হয় যে, প্রাচীন কালে অপরাধীদের এই পুকুরে কারারুদ্ধ করে রাখা হ'ত এবং এর পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মৃত্যু হ'ত। বাদশাহ আকবর দয়াপরবশ হয়ে এই ধরনের শাস্তি দেয়া বন্ধ করে দেন।

মুর্শিদাবাদ নগর

মুর্শিদাবাদ[৫৯] ভাগিরথী নদীর তীরে অবস্থিত একটি বৃহৎ নগর। নদীর উভয় তীরে লোকবসতি আছে। গোড়ায় মখসুস খান নামক

জনৈক ব্যবসায়ী এখানে একটি সরাই বা অতিথিশালা তৈরী করে এ-স্থানের নাম রাখেন 'মখসুসাবাদ'। সেখানে কয়েকজন দোকানদার বাড়ী করেছিল। বাদশাহ আওরঙ্গযেব আলমগীরের রাজত্বকালে উড়িষ্যার দেওয়ান নওয়াব জাফর খান নাসিরিকে করতলব খান উপাধি দিয়ে বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়। সেই সময় জাহাঙ্গীর নগর (অন্য নাম ঢাকা) ছিল সুবাদারের রাজধানী এবং বাদশাহ আওরঙ্গযেব কর্তৃক নিয়োজিত সুবাদার শাহজাদা আজিম-উশ্-শান (পরে এঁর আরো বিবরণ দেয়া হবে) এখানে বাস করতেন। জাফর খান জাহাঙ্গীর নগর এসে বুঝতে পারেন যে, শাহজাদার সঙ্গে তাঁর বনিবনা হবে না। তখন বাংলার মহলগুলো এখান থেকে অনেক দূর, এই অজুহাতে শাহ-জাদার সংসর্গ ত্যাগ করে মখসুসাবাদে নিজ দফতরখানা সরিয়ে নেন এবং রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট জমিদারদের আমলা, কানুনগো ও অন্যান্য কর্মচারীদের দফতরসমূহ সেখানে স্থাপন করান। দোঘরিয়া নামক স্থানটি ছিল জঙ্গলাবৃত। তিনি এখানেই প্রাসাদ তৈরী করেন এবং দেওয়ানখানা ও রাজস্ব আদালত স্থাপন করতঃ বাদশাহী রাজস্ব আদায় করতেন। পরে যখন তাঁকে মুরশিদকুলী খাঁ উপাধিসহ মূল্যবান খেলাত, নিজস্ব পতাকা, নাকারা (রাজকীয় দামামা), ও মসনব দিয়ে দেওয়ানী ছাড়া স্থায়ীভাবে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়; তখন তিনি মখসুসাবাদে পৌঁছে নগরের উন্নতি সাধন করেন ও নিজ নামানুসারে 'মুর্শিদাবাদ' নাম রাখেন। সেখানে একটি টাকশাল[১০] স্থাপন করেন ও মুদ্রার উপর 'মুর্শিদাবাদে তৈরী' ছাপ থাকতো। এই সময় থেকে এই নগর সুবাদারের রাজধানী হয়। নগরটি সুন্দর। এখানকার অধিবাসীরা সুবাদারের সাহচর্যে ও দিল্লীর বাশিন্দাদের সংসর্গে এসে আচরণ ও কথাবার্তায় হিন্দুস্তানের লোকের মতো মার্জিত ছিল—বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা যা ছিল না। অট্টালিকা-গুলোর মধ্যে নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলার তৈরী ইমামবাড়া ছাড়া অন্য কোনটি উল্লেখযোগ্য ছিল না। এই অট্টালিকাটি প্রশংসার অতীত। সারা হিন্দুস্তানে এর তুলনা নাই। যদিও বর্তমানে এর এক-দশমাংশেরও

অস্তিত্ব নাই, তথাপি যেটুকু আছে তাতেই মূল অট্টালিকার নিদর্শন পাওয়া যায়। মওলানা উর্ফি শিরাজীর[৬১] নিম্নোক্ত পদ দু'টি বর্তমান ক্ষেত্রে উপযোগী বিধায় নিম্নে অনূদিত হলোঃ

এর দ্বারপ্রান্তের অধিবাসীরা প্রভাতের কতটুকুই বা জানে,
(তারা কি জানে যে) এর আশেপাশে সূর্যাস্তের
প্রবেশাধিকার নাই;
এই অট্টালিকার সৌন্দর্য এতই মনোহর যে এর দিকে
দৃষ্টিপাত করলে
এর দেয়ালের দিক থেকে দৃষ্টি আর
ফিরে আসে না।

মতিঝিল[৬২] ও হীরাঝিল অট্টালিকাগুলোও অত্যন্ত সুন্দর ছিল। বর্তমানে এগুলোর ভিত্ পর্যন্ত খুঁড়ে তুলে ফেলা হয়েছে ও সম্পূর্ণ ধ্বংসাবস্থায় রয়েছে।

হুগলী ও সাতগাঁও বন্দর

হুগলী ও সাতগাঁও[৬৩] বন্দর দু'টির মধ্যে ব্যবধান আধ ক্রোশ মাত্র। পূর্বে সাতগাঁও একটি জনবহুল বৃহৎ নগর ছিল ও গবর্নরের বাসস্থান ছিল। এখানে খ্রীস্টান, পর্তুগীজ ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কুঠি ছিল। নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় সাতগাঁও ধ্বংস হয় ও হুগলী বন্দর জনবহুল হয়ে ওঠে। দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক এই বন্দরের ফৌজদার সরাসরি নিযুক্ত হ'ত। বাংলার নাজিম অথবা ভাইস্‌রয়ের সঙ্গে তার (ফৌজদারের) প্রায় কোনই সম্পর্ক ছিল না। নওয়াব জাফর খান এই বন্দরের ফৌজদারি নিজের অধীন করেন এবং বাংলার নিজামত ও দেওয়ানীর অন্তর্ভুক্ত করেন। আল্লার মর্জি হ'লে এ-বিষয় পরে বিবৃত হবে। উক্ত নওয়াব এই বন্দরের রাজস্ব বাংলাদেশের রাজস্বের সঙ্গে যোগ করে নিয়েছিলেন; এবং ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে শুল্ক

আদায় করে বাংলার রাজস্বের সঙ্গে যোগ করেছিলেন। তিনি ইংলণ্ড, চীন, পারস্য ও তুরানী সওদাগরদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ও উদার সম্পর্ক রাখতেন। আইনসঙ্গত আমদানী দ্রব্যাদির উপর তিনি অত্যাচারমূলক অথবা প্রচলিত প্রথার অতিরিক্ত এক 'দাম'ও (পয়সা) আদায় করতেন না। সেই জন্য তাঁর আমলে হুগলী বন্দর পূর্বাপেক্ষা অধিক জনবহুল হয়েছিল। আরব ও আযমের[৬৪] সওদাগরগণ ও জাহাজের মালিক ইংরেজ খ্রীস্টানগণ ও ধনী মুঘলেরা এখানে বাস করতো, কিন্তু অন্যদের তুলনায় মুঘল সওদাগরদের সুনাম বেশি ছিল। কোনও প্রকার গম্বুজ, বাজারের জন্য অট্টালিকা অথবা দুর্গ ও গড় তৈরী ইংরেজদের জন্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এর পর যখন ফৌজদারদের অত্যাচার ও বলপূর্বক শুল্ক আদায় করা বৃদ্ধি পায় তখন হুগলী বন্দরের অবনতি হয়, এবং ইংরেজদের উদারতা, নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা ও শুল্কের হার কম হওয়ায় কলকাতা জনবহুল হয়ে ওঠে।

কলকাতা নগর

অতীতে কলকাতা নগর[৬৫] কালীর সেবার জন্য একটি তালুকের গ্রাম হিসেবে নির্দিষ্ট ছিল। কালীর প্রতিমা সেখানে আছে। বাংলা ভাষায় 'কর্তা' অথবা 'কত্তার' অর্থ 'মালিক' বা 'প্রভু'। সেইজন্য এই গ্রামের নাম ছিল 'কালীকতা'; অর্থাৎ গ্রামের মালিক কালী। ক্রমে উচ্চারণের পরিবর্তনের দরুণ 'আলেফ' ও 'ইয়া' বাদ হয়ে নাম হয় 'কালকাতা' (কলকাতা)। এই নগর ও ইংরেজদের কুঠি প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত নিম্নে দেয়া হ'ল:

নওয়াব জাফর খানের নিজামতী আমলে ইংরেজ কোম্পানীর হুগলীস্থ কুঠি ছিল লাখোঘাট ও মুঘলপুরার নিকটে। হঠাৎ একদিন সূর্যাস্তের সময় ইংরেজ প্রধানগণ যখন ভোজনরত ছিলেন সেই সময় কুঠি ভেঙে পড়তে শুরু করে। ইংরেজ প্রধানগণ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে

এসে ধ্বংসের কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করেন। কিন্তু তাদের সমস্ত তৈজসপত্র ও সম্পত্তি জোয়ারে ভেসে যায়। বহু গরু-বাছুর এবং মানুষেরও মৃত্যু হয়। ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান মিঃ চার্নক কোম্পানীর গোমস্তা বেনারসের শহর সংলগ্ন লাখোঘাটস্থ বাগান খরিদ করেন ও বৃক্ষাদি কেটে একটি কুঠির ভিত্ পত্তন করেন এবং দো-তলা, তিন-তলা অট্টালিকা তৈরী করতে আরম্ভ করেন। অট্টালিকাগুলোর দেয়াল তৈরীর পর যখন ছাদের উপর আড়া বসানো আরম্ভ করা হয়, তখন সৈয়দ ও মুঘল গোষ্ঠীর ধনী সওদাগরেরা হুগলীর ফৌজদার মীর নাসিরের নিকট অভিযোগ করেন যে, বাইরের (অপরিচিত) লোকেরা এই প্রকার উঁচু অট্টালিকার ছাদে উঠলে তাদের অন্দরের গোপনীয়তা নষ্ট হবে। ফৌজদার অভিযোগের বিবরণ নওয়াব জাফর খানকে জানান এবং পরে মুঘল ও অন্যান্য সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তাদের অভিযোগ পেশ করার জন্য নওয়াবের নিকট প্রেরণ করেন। নওয়াব ইংরেজদের ইটের উপর ইটের গাঁথুনি করা ও আড়ার উপর আড়া স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে ফৌজদারের নিকট এক হুকুমনামা প্রেরণ করেন। হুকুমনামা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদার রাজমিস্ত্রী ও ছুতোরদের এই সকল অট্টালিকার কাজ করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং সেই জন্য অট্টালিকাগুলো অসম্পূর্ণ থেকে যায়, ফলে মিঃ চার্নক ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল খুব কম ও একটি মাত্র জাহাজ থাকায় এবং তদুপরি নওয়াব জাফর খানের কর্তৃত্ব বা শক্তি ভীতিপ্রদ, মুঘলদের সংখ্যাধিক্য এবং শক্তিশালী ফৌজদার মুঘলদের পক্ষে থাকায় হাত-পা ছোড়া অপ্রয়োজন মনে করে তিনি (চার্নক) জাহাজের নোঙর তোলেন। জাহাজের পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে এই শহর ও চন্দন নগরের নদীর ধারে জনবহুল অংশের দিকে তাক্ করে একটি অগ্নি-নিক্ষাশক যন্ত্র ছুড়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন; তারপর জাহাজ নিয়ে যাত্রা করলেন। ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের জন্য ফৌজদার মাঘোয়া সেনানিবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে লিখে পাঠালেন, এই জাহাজকে যেন চলে যেতে না দেয়া হয়। উক্ত কর্মচারী নদীর

এপার-ওপার পর্যন্ত একটা লোহার শিকল আটকে দিলেন। এই শিকলের প্রতিটি গিঁটের ওজন দশ সের। আরাকানি ও মগ দস্যুদের জাহাজ প্রবেশ আটক করার জন্য এই শিকলটি দুর্গের প্রাচীরের পাশে রাখা হ'ত। (চার্নকের) জাহাজ শিকলের কাছে এসে আটকে গেল; আর অগ্রসর হ'তে পারল না, কিন্তু মিঃ চার্নক একটি ইংলিশ তরবারি দিয়ে শিকল কেটে পথ করে নিলেন এবং জাহাজ নিয়ে সমুদ্রপথে দক্ষিণ দেশের দিকে চলে গেলেন। এই সময় বাদশাহ আওরঙ্গযেব দক্ষিণে ছিলেন। মারাঠা লুঠেরারা চারিদিকের খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করায় বাদশাহের সামরিক বাহিনীতে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কর্নাটিকের ইংরেজ কুঠির প্রধান বাদশাহের সামরিক বাহিনীকে জাহাজ-যোগে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করেন এবং এতদ্বারা আনুগত্য প্রদর্শন ও উত্তম সাহায্য করেন। বাদশাহ আওরঙ্গযেব ইংরেজদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তারা কি প্রার্থনা করে তা জানতে চান। ইংরেজ প্রধান বাদশাহের রাজ্যে কুঠি স্থাপনের এবং বিশেষতঃ বাংলায় কুঠি তৈরীর সনদ প্রার্থনা করে। বাদশাহ তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং ইংরেজ কোম্পানীর জাহাজের শুল্ক আদায় মাফ করেন ও সরকারী শুল্ক বাবদ মোট তিন হাজার টাকা দেয়ার ও একটি কুঠি তৈরী করার সনদ দান করেন। মিঃ চার্নক সম্রাটের ফরমান ও হুকুমনামাসহ দক্ষিণ বাংলায় ফিরে আসেন এবং চানক (বারাকপুর) নামক স্থানে অবতরণ করেন। সেখান থেকে তিনি নওয়াব জাফর খানের নিকট উপহার, কর ইত্যাদি প্রেরণ করতঃ সম্রাটের ফরমান অনুযায়ী কলকাতায় কুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভ করেন। এখানে একটি কুঠি তৈরী করে শহরের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন এবং বাংলায় ব্যবসায় কর্ম আরম্ভ করেন। আজ পর্যন্ত এই কুঠি প্রসিদ্ধ।

ভাগিরথী নদীর তীরে অবস্থিত কলকাতা একটি বৃহৎ নগর। এটি একটি বৃহৎ বন্দর এবং ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য কেন্দ্র ও তাদের অধীন। এক-মাস্তুলওয়ালা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ প্রায় প্রত্যেক বৎসর চীন, ইংলণ্ড ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে এখানে আসে এবং অনেকগুলো এখানে থাকে। বর্তমানে এই নগর ইংরেজ প্রধানদের,

অফিসারদের ও কর্মচারীদের বাসস্থান। অট্টালিকাসমূহ চুন-সুরকি দিয়ে দৃঢ়ভাবে তৈরী। সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় এখানকার মাটি ভিজে ও লোনা; সেই জন্য এই নগরের অট্টালিকাসমূহ দ্বিতল ও ত্রিতল। একতলার ঘরগুলো বাসের অযোগ্য। ইংলণ্ডের অনুকরণে অট্টালিকাসমূহ তৈরী; বাতাস খেলে, বড়, উঁচু। রাস্তাগুলো প্রশস্ত; ইট-ভাঙা দিয়ে উপরটা বাঁধানো। ইংরেজ প্রধানরা ছাড়াও এখানকার বাঙালী, আর্মেনীয় প্রভৃতি লোকেরাও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। এই নগরের কুয়ার পানি লোনা হওয়ায় পানের অযোগ্য। যদি কেউ পান করে তাহলে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অত্যন্ত ভোগে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে নদীর পানিও তিক্ত ও লোনা হয়ে যায়। কিন্তু পুকুরের সংখ্যা অনেক ও সেই পানি পান করা হয়। সমুদ্র এখান থেকে চল্লিশ ক্রোশ দূরে। প্রতিটি দিন ও রাত্রির মধ্যে একবার করে জোয়ার ও ভাটা হয়। পূর্ণিমার সময় একটি দিন ও রাত্রির মধ্যে তিনবার প্রচণ্ড জোয়ার আসে। তখন একটা আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত প্রচণ্ডতা দেখা যায়। নদীর ধারের বহু নৌকা আছড়ে পড়ে ও ভেঙে যায়। কিন্তু যে-সকল নৌকা নদীর ধারে থাকে না, সেগুলোর কোন ক্ষতি হয় না। সেই কারণে এখানে সেদিন নৌকাগুলি নোঙর করে রাখা হয় না। বাংলা ভাষায় এই জোয়ারকে 'বান' বলে এবং প্রতিদিন যেটা আসে সেটাকে 'জোয়ার' বলে। নগরের বাইরে দক্ষিণ দিকে একটি মাটির তৈরী দুর্গ আছে। অবতল বাড়ী তৈরী করতে ইংরেজরা সুদক্ষ। তাদের কাজের প্রশংসা লিখে প্রকাশ করা কঠিন। বুঝতে হলে চোখে দেখতে হয়। বাইরে চারিদিকের যে-কোন দিক থেকে এই চতুষ্কোণ প্রাকার দেখতে পুকুরের পাড়ের মত ঢালু মনে হবে। কিন্তু ভিতরে গেলে দেখা যাবে এগুলো খুব উঁচু। দুর্গের মধ্যে বৃহৎ ও সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহ রয়েছে। দুর্গ নির্মাণে আশ্চর্য রকমের দক্ষতা দেখানো হয়েছে। এই নগরে আরো কৌতু-হলোদ্দীপক বিরল কারুকার্য দেখা যায়। একমাত্র দিল্লী ব্যতীত এখানকার অট্টালিকাগুলোর মতো অতুলনীয় সুন্দর ও কারুকার্য অন্য কোথাও দেখা যায় না। কিন্তু এর ত্রুটি হ'ল এই যে, এখানকার

বাতাসে পচা গন্ধ, পানি লোনা এবং মাটি এতই ভিজে যে, উপরে ছাদ এবং মেঝে ইট ও চুন দিয়ে গাঁথনি করা সত্ত্বেও অতিরিক্ত আর্দ্রতার জন্য স্যাঁতসেঁতে এবং দুয়ার-জানালাও দু'তিন হাত পর্যন্ত ভিজে ও স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে। শীত ঋতুর চার মাস আবহাওয়া ততোটা অস্বাস্থ্যকর নয়; কিন্তু গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের আট মাস আবহাওয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা ইংরেজ কোম্পানীর প্রধানদের অধীন হওয়ার পর বর্তমানে এই নগরেই সরকারের দফতর-খানা অবস্থিত। সরকারের প্রধানকে গভর্নর-জেনারেল বলা হয়, তিনি এই নগরেই থাকেন। তিনি প্রতিনিধি নিয়োগ করে প্রত্যেক শহরে পাঠান; তারা প্রত্যেক জেলা[১১] থেকে রাজস্ব আদায় করে প্রেরণ করে। বোর্ড অব রেভিনিউর অফিসারগণ কলকাতায় থাকেন।

বাংলার কলকাতা নগরী একটি আশ্চর্য নগর;
কারণ, এটা চীন ও ইংলণ্ডের ছাঁচে তৈরী।
এর অট্টালিকাসমূহ মন ও আত্মাকে আনন্দ দেয়
এবং এগুলি শূন্যে বহুদূর উঁচু;
সুদক্ষ কারিগর এরূপ কারুকার্য করেছে,
যেন সবই সত্ত রং করা ও সবই সুন্দর।
ইংরেজদের সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে
চিন্তা করলে যুক্তি তালগোল পাকিয়ে যায়।
হ্যাট-পরা ইংরেজরা এখানে বাস করে,
তারা সবাই সত্যবাদী ও তাদের আচরণ ভাল।
বাড়ীগুলি এই রকম, বাশিন্দারাও ঐ রকম;
তাদের প্রশংসা আর কতটা করতে পারি?
এখানকার রাস্তাগুলি পরিষ্কার, বাঁধানো
প্রত্যহ সকালে বাতাস ব'য়ে যায় ও (রাস্তা) ঝাঁট দেয়।
প্রত্যেক গলিতে চাঁদের মতো মানুষ চলে,
তাদের পোশাক সুন্দর ও পরিষ্কার।
চাঁদের কিরণের মতো তাদের মুখ উজ্জ্বল;

বলতে পার, চাঁদ যেন মাটির উপর বেড়াচ্ছে।
কোনোটা চাঁদের মতো, কোনোটা জুপিটারের মতো,
কোনোটা ঔজ্জ্বল্যে ভেনাসের মতো।
যখন অনেকে একসঙ্গে ভ্রমণশীল তারকার মতো ঘুরে বেড়ায়
তখন গলিগুলোকে নীহারীকাপুঞ্জের মতো মনে হয়।
বাজারে গেলে দেখবে
পৃথিবীর সকল আশ্চর্য জিনিস।
পৃথিবীর সর্বত্র যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব আছে;
খোঁজাখুঁজি না করেই বাজারে তা দেখতে পাবে।
এখানকার লোকের শিল্পকলা বর্ণনা করার চেষ্টা করলে
আমার কলম সেই ছবির বর্ণনা করতে পারবে না
সকলে এটা জেনে রাখুন।
এখানকার শিল্পকলা চীন ও ইংলণ্ডের মতো উচ্চ শ্রেণীর।
আকাশের মতোই এর মাটি সমতল,
তার উপর রাস্তা স্থির হয়ে আছে যেন বিষুব রেখার মত।
লোকে বাগানে বেড়াবার সময়
ভ্রমণশীল তারকার মত পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।
বাঙালীদের দেশে এই প্রকার নগরী,
কেউ দেখে নি, কেউ কখনো শোনে নি।

চন্দন নগর[৬৭]

চন্দন নগরের অন্য নাম ফরাসডাঙ্গা—কলকাতা থেকে বারো ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে খ্রীস্টান ফরাসীদের কুঠি আছে। ভাগীরথী নদীর তীরে এটি একটি ক্ষুদ্র শহর। এখানে একজন ফরাসী প্রধান থাকেন। তিনি এই শহরের ব্যবসায়িক বিষয়সমূহ পরিচালনা করেন।

এখানে ইংরেজ প্রধানদের কোনো ক্ষমতা নাই। অনুরূপভাবে চুচুড়া (চিনসুড়া[৬৮]) ডাচদেব অধীন।

চুচুড়া বা চিনসুড়া হুগলী বন্দরের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। তেমনি চিরামপুর (সিরামপুর[৬৯]) এই নদীব তীরে চানকেব (বারাকপুরেব) বিপরীত দিকে অবস্থিত। এখানে দিনেমারদের কুঠি আছে এবং একে দিনেমাব নগর বলা হয়। এই সকল স্থানে কুঠির মালিকগণ ব্যতীত অন্য কাবো কর্তৃত্ব নাই।

পুর্ণিয়া শহর[৭০]

পূর্বে এই স্থানের নাম ছিল পরগণা-ই-হাভিলি। এখানকার রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩২,০০০ টাকা। যেহেতু বীরনগরের রাজার ১৫,০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল ও এই অঞ্চলের অধিবাসী চাকোয়ার প্রভৃতি গোষ্ঠী দুর্দান্ত ও লুঠেরা প্রকৃতির ছিল ও পথিকদের উপর অত্যাচার করতো, সেইহেতু মুরং[৭১]-এর সীমান্তে পূর্ণিয়া থেকে দুই ক্রোশ দূরে জালালগড় দুর্গ[৭২] তৈরি করা হয় এবং একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে দুর্গের ভার দেওয়া হয়। প্রথম আমীর খানের পৌত্র নওয়াব সয়েফ খান ছিলেন সৈয়দ বংশোদ্ভূত খ্যাতনামা আমীর এবং রাজ-পরিবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল। নওয়াব সয়েফ খান[৭৩] দরখাস্ত পেশ করায় নওয়াব জাফর খান তাকে নিয়োগের জন্য বাদশাহ আওরঙ্গযেবের নিকট দরখাস্ত পেশ করেন। ঐ (মুরং) অঞ্চলের দুর্দান্ত উপজাতিগুলোকে ও বীরনগরের রাজাকে[৭৪] শায়েস্তা করার জন্য সয়েফ খানকে প্রেরণ করা হয়। এইরূপ ব্যক্তিকে পাওয়া খুব সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে নওয়াব জাফর খান তাকে জিলা পূর্ণিয়ার ফৌজদার ও জালালগড় দুর্গের সেনাপতি নিযুক্ত করেন; এতদ্ব্যতীত বিহার অঞ্চলস্থ পূর্ণিয়ার অংশ বীরনগর—অন্য নাম ধরমপুর[৭৫] ও গোণ্ডওয়ারা এবং উক্ত দুর্গের সংলগ্ন মহলগুলো তাঁকে জায়গীর দেন। উক্ত খান

জেলার স্বাধীন শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পর বীরনগরের রাজা দুর্জন সিং[৭৬]-এর পুত্র বিদ্রোহী ও দুর্দান্ত বীরশাহকে বহিষ্কৃত করে দেন। তিনি অন্যান্য দুর্দান্ত উপজাতিগুলোকে সম্পূর্ণ শায়েস্তা করে উক্ত পরগণা স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন ও পথচারীদের বিপদ মুক্ত করেন। তিনি বাদশাহের নিকট দরখাস্ত দ্বারা জানান যে, এই মহলটি ক্ষুদ্র ও তাঁর পক্ষে লাভবান নয়। ফলে, বাদশাহ আওরঙ্গযেব জাফর খানকে লিখেছিলেন, 'আমি তোমার নিকট এক সিংহ পাঠিয়ে খাঁচায় আবদ্ধ করেছি। যদি সে তার খাদ্য না পায়, তাহলে তোমাকে মুশকিলে ফেলবে।' উক্ত নওয়াব এই প্রকার এক ব্যক্তির উপস্থিতি সৌভাগ্যের বিষয় গণ্য করে তাঁর সমস্ত বকেয়া রাজস্ব মাফ করে দেন। তিনি তাঁর মর্যাদা ও পদের যোগ্য ভরণ-পোষণের ব্যবস্থার জন্য এই সুবিধা দান করেন। উক্ত খান জাফর খানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জেলার সমস্ত জমিদারকে কারারুদ্ধ করেন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য সর্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন করেন। এইরূপে আঠারো লক্ষ টাকা আদায় করে তিনি নিজের কোষাগার পূর্ণ করেন। এভাবে দিন দিন তাঁর আর্থিক অবস্থা উন্নত ও সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। মুরং-এর জমিদারদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে তিনি জঙ্গল পরিষ্কার করে আবাদ করতে থাকেন। মুরং পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত অর্ধেক অনাবাদী জমি আবাদ করে তিনি সেই অঞ্চল নিজ শাসনাধীনে আনয়ন করেন এবং নিজের এলাকা ও সম্পদ বৃদ্ধি করেন। জাফর খান এইসব দেখেশুনেও উপেক্ষা করেন। বর্তমানে পুর্ণিয়া[৭৭] একটি বৃহৎ শহর; কুশি সুঁড়া নদী এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। স্থানটি নিচু ও জলমগ্ন। বর্ষাকালে মুরং পাহাড় থেকে বন্যা এসে মাঠ-প্রান্তর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বন্যায় আবাদের অধিকাংশ ধ্বংস হয়ে যায়। ধান, গম, ডাল, সরিষা ও অন্যান্য খাদ্যশস্য এখানে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। তিল, তেঁতুল, পানিতে খাওয়ার ও গোলাবারুদ তৈরিতে ব্যবহারের জন্য সোরা, লঙ্কা, বড়-এলাচ, তেজপাতা ও বিরাট বিরাট আবলুস কাঠের গাছ এখানে ভাল জন্মায়। এখানে অত্যন্ত সুগন্ধি জুঁই, বেল ও লাল-গোলাপ ও অন্যান্য ফুলের

গাছ জন্মায়। মুরং-এর পর্বতমালা পুর্ণিয়ার উত্তর দিকে ছয় দিনের পথ দূরে অবস্থিত। মুয়াণ্ডি কাঠ—যাকে বাহাদুরি কাঠ বলা হয়—এই সকল পর্বত থেকে পাওয়া যায়। এই পর্বতের শিখর থেকে নেপাল ও কাশ্মীরে যাওয়ার পথ অতি নিকটবর্তী; কিন্তু, পথগুলো অত্যন্ত বন্ধুর। পুর্ণিয়ার মহলগুলোর অর্ধেক বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু পুর্ণিয়া বাংলার মধ্যে। এটি শীতপ্রধান অঞ্চল এবং এই অঞ্চলের আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর। এই অঞ্চলের পুরুষ ও স্ত্রীলোক, এমনকি পশুপক্ষীও সাধারণতঃ গলগণ্ড রোগগ্রস্ত। পাকা বাড়ীর সংখ্যা খুবই কম। কেবল দুর্গ,[৭৮] লালবাগ[৭৮] ও অন্য কয়েকটি পাকা বাড়ী আছে। পূর্বে পুর্ণিয়া অপেক্ষা সারনা অধিকতর জনবহুল ছিল। এবং গঙ্গাতীরস্থ গান্দাগোলাতে (কারাগোলা)[৭৯] বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যবসায়ী ও মহাজনেরা আসতো। খাদ্যদ্রব্য ও আরামের দ্রব্যাদি সস্তা থাকায় ভূস্বামী, পথিক ও ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন স্থান থেকে এসে এখানে বাস করতো। সীমানা নিয়ে প্রায়ই মুরং-এর রাজার সঙ্গে লড়াই হ'ত। সয়েফ খান প্রত্যেক দিন নওয়াব জাফর খানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মুর্শিদাবাদ যেতেন। নওয়াব তাঁর সঙ্গে ভ্রাতার মতো ব্যবহার করতেন। যখনই এই অঞ্চলে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিতো, তখনই নওয়াব (জাফর খান) সৈন্য সাহায্য পাঠাতেন। গান্দাগোলা (কারাগোলা) থেকে মুরং-এর গঙ্গাতীরের মধ্যবর্তী পুর্ণিয়ার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল প্রায় দশ দিনের পথ বিস্তৃত। মুরং-এর পর্বত থেকে কুচবিহার ও আসামে যাওয়ার একটি পথ আছে[৮০]। মুরং-এর রাজা পশুপাল দ্বারা কর দিতেন।

ঢাকা—অন্য নাম জাহাঙ্গীর নগর[৮১]

এই নগর বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত। পদ্মা (এখানে গঙ্গার নাম) এই নগর থেকে তিন ক্রোশ দূর দিয়ে প্রবাহিত। বাদশাহ নুরুদ্দীন

মুহম্মদ জাঁহাঙ্গীরের আমলে এই নগরকে জাহাঙ্গীর নগর বলা হ'ত। সেই সময় থেকে বাদশাহ আওরঙ্গযেবের রাজত্বের শেষ দিক পর্যন্ত এই নগর বাংলার সুবাদারের রাজধানী ছিল। বর্তমানে ইংরেজ কোম্পানীর প্রধানদের পক্ষে একজন জেলা-প্রশাসক এখানে আছেন। উৎকৃষ্ট সাদা মসলিন এখানে তৈরী হয়।

সরকার সোনারগাঁও[৮২]

জাহাঙ্গীর নগরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছয় ক্রোশ দূরে সরকার সোনারগাঁও অবস্থিত। এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম মসলিন এখানে তৈরী হয়। এবং কাত্রাসুন্দর মৌজায় পানির একটি হাউজ আছে। এই পানিতে যে কাপড়ই ধৌত করা হোক, তা সাদা সুতী কাপড়ে পরিণত হয়।

ইসলামাবাদ বা চাটগাঁও[৮৩]

ইসলামাবাদ বা চাটগাঁও (চিটাগাং) প্রাচীন কাল থেকে জঙ্গল-বেষ্টিত একটি বৃহৎ নগর। এই নগর মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সমুদ্রের ধারে অবস্থিত ও পূর্বকালে এটা একটা বৃহৎ বন্দর ছিল। প্রত্যেক দেশের বিশেষতঃ খ্রীস্টান বণিকদের জাহাজ এখানে প্রায়ই আসতো। কিন্তু বর্তমানে কলকাতা বৃহৎ বন্দর হওয়ায় বাংলার অন্য বন্দরগুলো ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। কথিত হয়, যে-সকল জাহাজ সমুদ্রের অন্যান্য অংশে পথ হারায় (বা ভেঙ্গে যায়) সেগুলো পুনরায় এই বন্দরে আবির্ভূত হয়। এই কাহিনী যারা বলেন, তাদেরই উপর এর প্রমাণ দেয়ার ভার। এখানেও সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা হয়। এই অঞ্চলের মোরগ-লড়াই বিখ্যাত।

সরকার বোগ্‌লা[৮৪]

সরকার বোগ্‌লা সমুদ্র তীরবর্তী অন্য একটি বন্দর এবং এর চতুর্দিক বৃক্ষারণ্য-বেষ্টিত। এখানেও সামুদ্রিক জোয়ার-ভাটা হয়, যেমন হয়ে থাকে সমুদ্র তীরবর্তী অন্যান্য স্থানে ও কলকাতার আশেপাশে। বাদশাহ আকবরের রাজত্ব কালের উনত্রিশতম বৎসরে একদিন দিবা শেষের এক ঘণ্টা পূর্বে এক অদ্ভুত বন্যায় সমস্ত শহর ডুবে গিয়েছিল। শহরের রাজা নৌকাযোগে পলায়ন করেন। ঝড়, বিদ্যুৎ ও বজ্রের উগ্রতা পাঁচ ঘণ্টাকাল স্থায়ী ছিল। দু'লক্ষ মানুষ ও পশু তাতে ধ্বংস হয়েছিল।

সরকার রংপুর ও ঘোড়াঘাট[৮৫]

রংপুর ও ঘোড়াঘাটে রেশম উৎপন্ন হয় এবং ভুটান থেকে টঙন ঘোড়া বিক্রি হয়। 'লটকন' নামক আখরোটের আকৃতির এক প্রকার ফল এখানে উৎপন্ন হয়। এই ফলের স্বাদ ডালিমের মতো এবং এতে তিনটি বীজ থাকে।

সরকার মাহমুদাবাদ[৮৬]

সরকার মাহমুদাবাদ নদীবেষ্টিত একটি দুর্গ ছিল। শেরশাহ যখন বাংলা জয় করেন, সেই সময় এখানকার রাজার কতকগুলো হাতী জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেই সময় থেকে এই সকল জঙ্গলে হাতী পাওয়া যায়। এই সকল অঞ্চলে গোলমরিচ জন্মায়।

সরকার বারবাকাবাদ[৮৭]

বারবাকাবাদে গঙ্গাজল নামক এক প্রকার ভাল কাপড় তৈরী হয়। বড় বড় কমলালেবুও এখানে প্রচুর জন্মায়।

সরকার বাজুহা[৮৮]

সরকার বাজুহা একটি অরণ্যাঞ্চল। এখানে বাড়ী ও নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় আবলুস কাঠের জঙ্গল আছে। লোহার খনিও এই অঞ্চলে দেখা যায়।

সরকার সিলহট[১]

সরকার সিলহট একটি পার্বত্য অঞ্চল। এখানে অতি উত্তম পশমের ঢাল তৈরী হয় ও হিন্দুস্তানের সর্বত্র তা সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। কমলালেবু ইত্যাদি সুস্বাদু ফল এখানে পাওয়া যায়। এখানকার পাহাড়ে প্রচুর মুসব্বর পাওয়া যায়। কথিত হয়, বর্ষা মওসুমের শেষ মাসে 'উদ্' বৃক্ষ কেটে পানিতে খোলা বাতাসে ফেলে রাখা হয়, এবং তার থেকে যে সকল অঙ্কুর বের হয় সেগুলো ব্যবহার করা হয় এবং যে অংশগুলো পচে যায় তা ফেলে দেয়া হয়। 'বনরাজ' নামক এক শ্রেণীর পাখী সহজেই ফাঁদ পেতে ধরা যায়। এই পাখীর রং কালো, চোখ লাল, লম্বা লেজের পালক বিভিন্ন রঙের, দেখতে সুন্দর, ডানাগুলো বড়। সহজে পোষ মানানো যায়। যে-কোনো পশুর স্বর এই পাখী অনুকরণ করতে পারে। এইরূপে শিরগঞ্জ নামক আর এক প্রকার পাখী পাওয়া যায়। বনরাজের সঙ্গে এর পার্থক্য এই মাত্র যে, এগুলোর পা ও চঞ্চু লাল। এই উভয় জাতীয় পাখী গোশ্ত খায়; এবং চড়ুই প্রভৃতি ছোট ছোট পাখী শিকার করে।

সরকার শরিকাবাদ[২]

ভারী বোঝা বহনক্ষম বড় বড় গরু, বড় বড় ছাগল ও বড় বড় লড়াইয়ে-মোরগ এখানে পাওয়া যায়।

সরকার মাদারন[১১]

বাংলা রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে সরকার মাদারন অবস্থিত। এখানে ক্ষু‍্রায়তন একটি হীরার খনি আছে।

আকবর নগর[১২]

আকবর নগর (অন্য নাম রাজমহল) গঙ্গাতীরে অবস্থিত। পূর্বে এটি একটি বৃহৎ ও জনবহুল নগর ছিল। বাংলার নাজিমের পক্ষে মর্যাদাসম্পন্ন একজন ফৌজদার এখানে থাকতেন। বর্তমানে এই নগর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

মালদহ[১৩]

মালদহ শহর মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে পবিত্র পাণ্ডুয়া (শহর)।[১৪] এখানে হযরত মখদুম শাহ-জালাল তাব্রেজী (আল্লাহ্ তাঁর মাজার পবিত্র করুন)[১৫] এবং হযরত নূর কুতবুল-আলম বাঙালীর[১৬] (আল্লাহ্ তাঁর মাজার মোবারক উজ্জ্বল করুন) পবিত্র মাজার অবস্থিত। এগুলো লোকের তীর্থস্থান, দুঃস্থ ও দুর্দশাগ্রস্তদের আশ্রয়স্থল, এবং নানা প্রকার অনুগ্রহের মাধ্যম। যথা, প্রত্যেক সফরকারী ও ভিক্ষুক এখানে এসে রাত্রিবাস করলে তিন বেলার আহার্য তাকে তৈরী ক'রে খেতে হয় না। সাধারণ ভাণ্ডারের চাকররা তাদের রান্না করা আহার্য দেয়; অথবা তাদের মর্যাদা অনুসারে চাল, ডাল, লবণ, তৈল, গোশ্‌ত ও তামাক সরবরাহ করে। প্রত্যেক বৎসর শবে-বরাত অথবা জিলহজ্জ মাসের যেটি শুকনো মওসুমে পড়ে, তখন এখানে একটি মেলা হয়; তাতে বহু লোকসমাগম হয়ে থাকে। হুগলী,

সিলহট, জাহাঙ্গীরনগর প্রভৃতি দশ পনের দিনের পথের দূরবর্তী স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এসে জমায়েত হয় ও তীর্থযাত্রার পুণ্য লাভ করে। মালদহ ও এর আশেপাশে রেশমের কাপড় ও মসলিনের মতো এক প্রকার সুতী কাপড় তৈরী হয়। রেশমের পোকা প্রচুর দেখা যায় ও তা থেকে কাঁচা রেশম তৈরী করা হয়। কিছুকাল যাবৎ ইংরেজ কোম্পানীর কুঠি মহানন্দার অপর তীরে অবস্থিত। ইংরেজ কোম্পানীর প্রধানদের নির্দেশমতো তারা (কুঠির কর্মচারীরা) সুতী ও রেশমী কাপড় খরিদ করে; 'বাই-সল্লম' রূপে এরা অগ্রিম দাদন দেয়। কুঠিতে কাঁচা রেশমও তৈরী হয়। কুঠির নিকটে দু'-তিন বৎসব যাবৎ একটি নীল-কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোম্পানী নীল তৈরী করে ও ক্রয় করে, জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে রফতানী করে। অনুরূপভাবে, গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের অদূরে গোয়ামালতি গ্রামে একটি ইষ্টক-নির্মিত পাকা কুঠি তৈরী করা হয়েছে। এখানেও নীল তৈরী করা হয়। যদিও মালদহ শহরের বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন ছিল না, তথাপি যেহেতু আমার প্রভু মিঃ উড্‌নি (তাঁর সৌভাগ্য সর্বদা কায়েম থাক) দুই বৎসর কাল কোম্পানীর এই কুঠির প্রধান ছিলেন এবং এই নগণ্য নওকর এই পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত ছিল, সেইহেতু এই শহরের বৃত্তান্ত দেয়া হ'ল।[৯৭]

৪. বাংলা রাজ্যে পুরাকালের হিন্দু 'রায়ান' রাজা বা প্রধানদের শাসনের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

হিন্দের পুত্র বঙ্গের প্রশংসনীয় চেষ্টায় বাংলা অঞ্চলে জনবসতি হয়। তাঁর বংশধরেরা এই অঞ্চলকে বাসযোগ্য ও সুন্দর করেন এবং তাঁরা এই দেশ শাসন করেন। প্রথম যে ব্যক্তি এই দেশের সার্বভৌম শাসনকর্তা হয়েছিলেন, তাঁর নাম রাজা ভগীরথ।[৯৮] তিনি ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর লোক ছিলেন। তিনি বহুকাল বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন।

অবশেষে তিনি দিল্লীতে মহাভারতের যুদ্ধে যোগদান করেন ও দুর্যোধনের[৯৯] সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। তিনি ২৫০ বৎসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। এরপর তাঁর বংশধরেরা পরপর প্রায় ২২০০ বৎসর[১০০] কাল রাজত্ব করেন। এরপর কায়স্থ গোষ্ঠীর 'নোজ গৌড়িয়ার'[১০১] হাতে রাজত্ব চলে যায়। তাঁর আটজন বংশধর ২৫০ বৎসর[১০২] কাল রাজত্ব করেন। রাজত্ব করার সৌভাগ্য এরপর আদীশূরের[১০৩] বংশে চলে যায়। ইনিও কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। তাঁর বংশধরেরা ৭১৪ বৎসর কাল বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন। এরপর রাজত্ব চলে যায় ভুপাল কায়স্থের বংশে। তিনি ও তাঁর দশজন বংশধর ৬৯৮ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এদের সৌভাগ্যের দিন শেষ হওয়ার পর সুখসেন কায়স্থ সাত জন বংশধরসহ বাংলা রাজ্যে ১৬০ বৎসর[১০৪] কাল রাজত্ব করেন। এই একষট্টি ব্যক্তি মোট ৪৪২০ বৎসর[১০৫] কাল পূর্ণ আধিপত্যের সাথে (বাংলায়) রাজত্ব করেছিলেন। তাদের সৌভাগ্যের দিন শেষ হয়ে গেলো। বৈদ্য গোষ্ঠীর (জাতির) সুখসেন[১০৬] তিন বৎসর কাল রাজত্ব করেন ও তাঁর মৃত্যু হয়। এরপরে লক্ষ্মণ সেন রাজত্ব করেন সাত বৎসর, মধু সেন দশ বৎসর, কয়লু সেন পনের বৎসর, সদা সেন আঠার বৎসর; এরপর নৌজ[১০৭] তিন বৎসর। এদের পালা শেষ হওয়ার পর লক্ষ্মণের পুত্র রাজা লখ্‌মনিয়া[১০৮] সিংহাসনে বসেন। এই সময় বাংলার রায়দের রাজকীয় দফতরের অবস্থিতি ছিল নদীয়ায়।[১০৯] নদীয়া একটি সুপরিচিত নগর ও হিন্দুদের জ্ঞানকেন্দ্র। পূর্বের তুলনায় যদিও এখন অনেক ধ্বংস হয়ে গিয়েছে; তথাপি বিদ্যার জন্য এইস্থান এখনো প্রসিদ্ধ। এখানকার জ্যোতির্বিদেরা জ্যোতির্বিদ্যায় ও ভবিষ্যৎ গণনার জন্য জগদ্বিখ্যাত। তাঁরা সকলে একবাক্যে লখ্‌মনিয়ার মাতাকে বলেন যে, এই সময় সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার ভবিষ্যৎ অশুভ হবে এবং যদি দু'ঘণ্টা পরে জন্মগ্রহণ করে তবে সেই সন্তান সিংহাসনে বসবে। বীরনারী তাঁর পা দুটো উপরদিকে বেঁধে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখতে হুকুম দেন। দু'ঘণ্টা পর তাঁকে নামিয়ে আনা হ'লে সন্তান জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু মাতার মৃত্যু হয়।[১১০] রাজা লখমনিয়া

৮০ বৎসর কাল রাজত্ব করেছিলেন। সুবিচার ও দানশীলতায় তাঁর তুল্য আর কেউ ছিলেন না। তাঁর জীবনের শেষ দিকে[১১১] যখন তাঁর রাজত্বের পূর্ণতা ক্ষয়প্রাপ্ত হ'তে থাকে, সেই সময় সেখানকার জ্যোতির্বিদেরা রাজা লখ্‌মনিয়াকে বলেনঃ 'আমাদের জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞান থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, শীঘ্রই আপনার রাজত্বকাল শেষ হবে ও আপনার রাজ্যে আপনার ধর্ম চালু থাকবে না।' রাজা লখ্‌মনিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য মনে না ক'রে অবজ্ঞা ও অজ্ঞতার তুলো দিয়ে কান বন্ধ করেন। কিন্তু নগরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গোপনে নগর ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে যায়। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বখ্‌তিয়ার খালজীর আক্রমণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল। এ বিষয় পরে বর্ণনা করা হবে।

বাংলা রাজ্যে কয়েকজন হিন্দু রায়দের রাজত্বের এবং হিন্দুস্তানে মূর্তিপূজা প্রবর্তনের বিবরণ

একথা অপ্রকাশ রাখার প্রয়োজন নাই যে, পুরাকালে বাংলা রাজ্যের রায়েরা শক্তিশালী ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হিন্দুস্তানের মহারাজাদের আনুগত্য স্বীকার করতেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সুরজ[১১২]—যিনি একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন—দক্ষিণ রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করেছিলেন। সেই সময় তাঁর প্রতিনিধিরা (রাজ্য) গ্রাস ও আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করে। হিন্দুস্তান রাজ্যে মূর্তিপূজা তাঁর সময় থেকে আরম্ভ হয়। কথিত হয় যে, নূহের (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) পুত্র হামের আচরণ দেখে ও শুনে তাঁর পুত্র হিন্দ নিজে আল্লার (God) পূজা করতেন এবং তাঁর বংশধরেরাও সেইভাবে পূজা করতেন। অবশেষে রায় মহারাজ[১১৩] নামক এক ব্যক্তি পারস্য থেকে এসে সূর্য-উপাসনা প্রবর্তন ক'রে মানুষকে পথভ্রষ্ট করেন। কালক্রমে কিছু লোক হয়ে যায় সূর্য-উপাসক ও কিছু হয় অগ্নি-উপাসক।

রায়-সুরজের আমলে ঝাড়খণ্ডে[১৪] পার্বত্য অঞ্চল থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসে তাঁর (সুরজের) অধীনে চাকুরী নেয় ও হিন্দুদের প্রতিমাপূজা শিক্ষা দেয় এবং প্রচার করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার পিতা ও পিতামহের একটি সোনা বা রূপা বা পাথরের মূর্তি তৈরী ক'রে সেটা পূজা করতে হবে। অন্যান্য প্রথার সঙ্গে এটাও একটা সাধারণ প্রথা হ'য়ে যায়। এবং বর্তমান কালে হিন্দুদের ধর্মীয় প্রথার মধ্যে মূর্তিপূজা, সূর্যপূজা ও অগ্নিপূজা অত্যন্ত প্রচলিত। কেউ কেউ বলেন, পারস্যের সম্রাট গশ্‌টাশ্‌পের[১৫] আমলে ইব্‌রাহীম জারদাশ্‌ত[১৬] অগ্নিপূজার প্রচলন করেন এবং তা কাবুল, সিস্তান ও সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যে বিস্তারলাভ করে। কালক্রমে বাংলা রাজ্য হিন্দুস্তানের রায়দের অধীন হয় ও বাংলার রায়গণ তাঁদের রাজস্ব ও অন্যান্য কর দিতেন। এরপর, সঙ্গল-দিপ[১৭] কোচ অঞ্চল[১৮] থেকে বেরিয়ে কেদারকে পরাজিত করেন ও গৌড় নগদের পত্তন ক'রে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি কিছুকাল বাংলা রাজ্য ও সমগ্র হিন্দুস্তান সাম্রাজ্য শাসন করেন। সঙ্গলদিপ চার হাজার হাতী, এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ও চার লক্ষ পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করার পর তাঁর মস্তিষ্কে ঔদ্ধত্যের বীজ প্রবেশ করে এবং হিন্দুস্তানের রায়গণ পারস্যের সম্রাটকে যে কর দিতেন[১৯] তা দেয়া বন্ধ করেন। যখন আফ্রাসিয়াব[২০] কর দাবী করার জন্য একজনকে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাকে তিরস্কার ও অপমান করেন। আফ্রাসিয়াব ক্রুদ্ধ হয়ে পঞ্চাশ হাজার রক্ত-লিপ্সু মঙ্গল সৈন্যকে সেনাপতি পিরান-ডিসাহ-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। ঘোড়াঘাটের সীমান্তে কোচের পার্বত্য অঞ্চলে দু'দিনব্যাপী যুদ্ধ হয়। বীরত্ব প্রকাশ ও পঞ্চাশ হাজার শত্রু সৈন্য বধ করা সত্ত্বেও ভারতীয় (ইণ্ডিয়ান) সৈন্যদের অতিরিক্ত সংখ্যাধিক্য বশত তারা (মঙ্গলরা) সফল হ'তে পারে নাই। মঙ্গলদেরও আঠার হাজার সৈন্য নিহত হয়। তৃতীয় দিনে পরাজয়ের চিহ্ন দেখে তারা পশ্চাদপসরণ করে। ভারতীয় (ইণ্ডিয়ান) বাহিনী জয়ী হওয়ায় ও মঙ্গলদের দেশ দূরবর্তী হওয়ায় মঙ্গলেরা যুদ্ধ ত্যাগ করে পার্বত্য অঞ্চলে একটি সুরক্ষিত স্থানে পশ্চাদপসরণ ক'রে আফ্রাসিয়াবকে অবস্থায়

বিবরণ জানায়। সেই সময় আফ্রাসিয়াব খাটা ও চীনের মধ্যপথে গাংডোজ শহরে ছিলেন। খানবালিগের[১২১] বিপরীত দিকে গাংডোজ এক মাসের পথ দূর। পরিস্থিতি অবগত হয়েই তিনি এক লক্ষ বাছাই অশ্বারোহী সৈন্যসহ মঙ্গলদের সাহায্যার্থে দ্রুত অগ্রসর হন। এবং যে সময় সঙ্গল পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের রায়দের সাহায্যে পিরানের উপর কঠোর চাপ দিয়ে তার বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করার উপক্রম করছিলেন, সেই সময় আফ্রাসিয়াব তাকে পথে আক্রমণ করেন। প্রথম আক্রমণেই হিন্দুরা নিরাশ ও হতাশ হয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলের মতো ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পিরান অবরোধের উদ্বেগ থেকে মুক্ত হয়ে আফ্রাসিয়াবের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ সম্ভ্রম প্রকাশ করেন। আফ্রাসিয়াব হিন্দু বাহিনীর যতগুলো সম্ভব ধ্বংস করেন। সঙ্গল পরাজিত সৈন্যবাহিনীর অবশিষ্টাংশ নিয়ে লখ্‌নৌতি শহরে পশ্চাদপসরণ করেন, কিন্তু আফ্রাসিয়াব তাকে অনুসরণ করায় তিনি সেখানে একদিনের বেশী থাকতে পারেন নাই এবং তিরহুতের পাহাড়ে আশ্রয় নেন। মঙ্গলেরা বাংলা রাজ্যকে লুণ্ঠন করে ও আবাদির চিহ্ন পর্যন্ত ধ্বংস করে দেয়। আফ্রাসিয়াব তিরহুত অভিযানের বন্দোবস্ত করায় সঙ্গল বিজ্ঞ দূত মারফত ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং একটি তরবারি ও কাফনের কাপড়সহ আফ্রাসিয়াবের নিকট উপস্থিত হন এবং তুরান দেশে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আফ্রাসিয়াব সন্তুষ্ট হয়ে বাংলা রাজ্য ও সমগ্র হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য সঙ্গলের পুত্রকে দান করেন এবং সঙ্গলকে সঙ্গে নিয়ে যান। হামারাওয়ানের যুদ্ধে সঙ্গল রুস্তমের[১২২] হাতে নিহত হন। এবং রাজা জয়চাঁদের[১২৩] রাজত্বকালে তার অবহেলার দরুন হিন্দুস্তানের কয়েকটি প্রদেশের অবনতি হয় ও বহুদিন হিন্দুস্তান স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পায় নি এবং সমগ্র সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়। সেই সময় বাংলার কয়েকজন রাজা সুযোগ পেয়ে স্বাধীন হন। এবং তখন 'ফার' (পোরাস)[১২৪] নামক কুমায়ুনের রাজার জনৈক আত্মীয় বেরিয়ে এসে প্রথমে কুমায়ুন প্রদেশ অধিকার করেন ও তারপর জয়চাঁদের ভ্রাতা রাজা দহ্‌লুকে যুদ্ধে বন্দী করেন। তিনি (জয়চাঁদ) দিল্লী নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন[১২৫]। এরপর তিনি (ফার) কনৌজ

অধিকার করেন ও সৈন্যবাহিনীসহ অগ্রসর হয়ে সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র বাংলা অধিকার করেন। এই পোরাসই তিনি, যিনি আলেকজাণ্ডার কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। এরপর রাজা মদিও রাঠোর[২৩]—যার তুল্য শক্তিশালী রাজা হিন্দুস্তানে খুব কম ছিল—সৈন্যবাহিনীসহ অগ্রসর হয়ে লখ্নৌতি রাজ্য দখল করেন এবং শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সুনিয়ন্ত্রিত করে ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে এই রাজ্য (লখ্নৌতি) ভাগ করে দিয়ে বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ কনৌজ ফিরে যান। কালক্রমে বাংলার রাজারা স্বাধীনভাবে শান্তির সঙ্গে রাজত্ব করতে থাকেন[২৪]।

যেহেতু মুসলমান শাসনকর্তাদের ইতিহাস বিবৃত করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, সেই হেতু হিন্দু রায়দের রাজত্বের বিশদ বিবরণী ব্যক্ত না ক'রে তিনি (ইতিহাসের) উপত্যকার এই অংশ থেকে স্বীয় লেখনীর কালো সুন্দর ঘোড়ার গতি ফিরিয়ে মুসলমান শাসকবর্গ ও রাজন্যবর্গের বিশদ ইতিহাস লিখার দিকে ছুট্তে অনুমতি দিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব

মুহম্মদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)

মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজীর আগমন এবং ঐ রাজ্য অধিকার করার ফলে মুহম্মদের (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) পৃথিবী-আলো করা ধর্মের কিরণে বাংলার অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আলোকিত হওয়ার প্রারম্ভিক বিবরণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ

দিল্লীর সম্রাটদের প্রতিনিধিরূপে (ভাইস্‌রয়) যে সকল মুসলমান শাসনকর্তা বাংলা রাজ্য শাসন করেছিলেন তাঁদের শাসনের বিবরণী।[১]

ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী

মুসলমান বাদশাহ ও শাসকবর্গের ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের একথা অনবহিত রাখা উচিত নয় যে, বাংলা রাজ্য মুসলমান ধর্মের উজ্জ্বল সূর্যালোকে প্রথম উদ্ভাসিত হয়েছিল দিল্লীর বাদশাহ সুলতান কুতবুদ্দীন আইবেকের রাজত্বকালে[২]। তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলী দুর্বল ছিল, এই হ'ল 'আইবেক' উপাধির মূল সূত্র। ৫৯০ হিজরীতে যখন সুলতান কুতবুদ্দীন বলপূর্বক হিন্দুদের নিকট থেকে 'কোল' দুর্গ অধিকার করেন এবং এক হাজার অশ্ব ও প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি পান, তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, সুলতান মুঈজুদ্দীন মুহম্মদ সাম—যাঁকে সুলতান শাহাবুদ্দীন বলা হ'ত—কনৌজ ও বেনারস বিজয়ের উদ্দেশ্যে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা করেছেন। সুলতান কুতবুদ্দীন তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য 'কোল' থেকে অগ্রসর হন এবং 'কোলে' প্রাপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ও অন্যান্য মূল্যবান উপহার তাঁকে পেশ করেন। সেই জন্য তিনি (কুতবুদ্দীন) বিশেষ খেলাত পান এবং সম্রাটের বাহিনীর পুরোভাগে অভিযান যাত্রা করার অনুমতি লাভ করেন। তিনি বেনারসের রাজার সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধে পরাজিত করেন; এবং পরিশেষে বেনারসের রাজা জয়চাঁদকে নিহত করেন ও বিজয়ী হন। সুলতান শাহা-

বুদ্দীন পশ্চাৎ থেকে অগ্রসর হয়ে বেনারস নগরে প্রবেশ করেন এবং বাংলার সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল ধ্বংস করে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ও মণিমুক্তা লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যান। এর পর সুলতান গজনী ফিরে যান। দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হিসেবে বাংলা রাজ্য কুতবুদ্দীনের অধীনে দিয়ে যান। সুলতান কুতবুদ্দীন বিহার ও লখনৌতি প্রদেশ-গুলোতে[৩] মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজীকে প্রতিনিধির (বা ভাইস্‌রয়ের) দায়িত্ব অর্পণ করেন। মুহম্মদ বখতিয়ার, ঘোর[৪] ও গারমসিরের একজন প্রধান ছিলেন। তিনি সাহসী, সুগঠিত দেহ ও অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন।[৫] প্রথমে তিনি গজনীতে সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরির অধীনে চাকরী করতেন। তাঁকে সামান্য ভাতা দেয়া হ'ত; কারণ, বাহ্যত তিনি চিত্তাকর্ষক ছিলেন না, অথবা তাঁর চেহারাও জমকালো ছিল না। নিরাশ হয়ে মুহম্মদ বখতিয়ার সুলতানের সঙ্গে হিন্দুস্তানে আসেন ও এখানেই থেকে যান। এখানেও তিনি হিন্দুস্তানের উজীরদের সুনজরে পড়তে পারেন নাই। সেখান থেকে তিনি বদাউনে[৬] যান। এখানে আঙ্গাল বেগ দোআব অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। এখানে তিনি উন্নতি করেন ও প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। তাঁকে কাম্বালাহ্[৭] ও বেতালি জায়গীর দেয়া হয়। সেখান থেকে তিনি আউধ সুবায় মালিক হাসাম উদ্দীনের[৮] অধীনে চাকরী নেন। সেই প্রদেশ দখল করায় তাঁর পদমর্যাদা বৃদ্ধি হয়। যখন তাঁর বীরত্ব ও উদারতার সংবাদ সারা হিন্দুস্তানে ছড়িয়ে পড়ে, তখন সুলতান কুতবুদ্দীন—তখনো তিনি দিল্লীর মসনদে বসেন নাই—লাহোরে ছিলেন। সেখান থেকে তিনি তাঁকে (বখতিয়ারকে) মূল্যবান খেলাত প্রেরণ করেন ও আমীরের মর্যাদাজনক ফরমান দ্বারা তাঁকে বিহারের প্রধান নিযুক্ত ক'রে সেখানে পাঠিয়ে দেন। মুহম্মদ বখতিয়ার দ্রুত সেখানে (বিহারে) পৌঁছে হত্যা ও লুণ্ঠনের কিছু বাকী রাখেন নাই।[৯] কথিত হয়, বিহারের একটি হিন্দু পাঠাগার মুহম্মদ বখতিয়ারের হস্তগত হয়। তিনি এই সকল পুস্তক সংগ্রহের কারণ ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণরা উত্তরে জানায় যে, সমগ্র শহরটাই একটা কলেজ বা

মহাবিদ্যালয় এবং হিন্দী ভাষায় একে বলে 'বিহার'; সেই জন্য এই শহরের নাম বিহার। অতঃপর মুহম্মদ বখতিয়ার[৯] বিজয়ী হয়ে যখন সুলতানের নিকট ফিরে আসেন, তখন তাঁর খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ে ও অনেকে তজ্জন্য ঈর্ষান্বিত হয়। এবং তাঁর পদমর্যাদা এতই উন্নত হয় যে, সুলতান কুতবুদ্দীনের অন্যান্য কর্মচারীরা ঈর্ষায় ও লজ্জায় জ্বলতে লাগলেন এবং তারা সকলে তাঁকে বহিষ্কার ও ধ্বংস করার জন্য জোট বাঁধে। একদিন তাঁর সাহস ও বীরত্ব সম্বন্ধে সুলতানের সামনে তারা সকলে বলেন যে, বখতিয়ার নিজের শক্তির প্রাচুর্যে হাতীর সঙ্গে লড়াই করতে চান। সুলতান বিস্মিত হ'য়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। মুহম্মদ বখতিয়ার এই মিথ্যা অহঙ্কারের কথা অস্বীকার করলেন না—যদিও তিনি জানতেন, রাজার কর্মচারীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে ধ্বংস করা। একদিন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও জনসাধারণ দরবারে জমায়েত হওয়ার পর শ্বেত-দুর্গ (কসবি-সফেদ) থেকে একটি শ্বেত বর্ণের পাগলা হাতী আনা হয়। মুহম্মদ বখতিয়ার কোমরে কাপড় জড়িয়ে মাঠে বেরিয়ে একটি গদা দিয়ে হাতীর শুঁড়ে আঘাত করেন। হাতী আঘাত পেয়ে গর্জন করতে করতে পলায়ন করে। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিগণ ও অন্য সকল দর্শক স্তম্ভিত হয়ে উচ্চ-প্রশংসাধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়ে তোলে। মালিক মুহম্মদ বখতিয়ারকে সুলতান বিশেষ খেলাত ও অনেক পুরস্কার দান করেন এবং আমীরদেরও উপহার দিতে বলেন। তারাও তখন তাঁকে বহু উপহার দেন। সেই সভাতেই মুহম্মদ বখতিয়ার উক্ত উপহার দ্রব্যাদির সহিত নিজে আরো কিছু যেদা দিয়ে সমস্তই উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ভাগ করে দেন। সেই সময় বিহার ও লখনৌতির ভাইসরয়ের পদ তাঁকে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর শান্তিপূর্ণ মনে তিনি রাজধানী দিল্লীতে যান। সেই বৎসর[১০] বিহার সুবা বশীভূত করে তিনি সেখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। পরের বৎসর বাংলা রাজ্যে এসে তিনি বিভিন্ন স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং বাংলার তৎকালীন রাজধানী নদীয়ার দিকে অগ্রসর হন। সেখানকার

রাজার নাম ছিল লখমনিয়া ; তিনি আশি বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। এই সময় তিনি আহার[১১] করছিলেন। রাজা কিছু জানবার পূর্বেই মুহম্মদ বখতিয়ার আঠারো জন অশ্বারোহীসহ প্রাসাদের অভ্যন্তরে হঠাৎ প্রবেশ করেন এবং বজ্রসম চক্চকে তরবারির আঘাতে বহু লোককে হত্যা করেন। রাজা লখমনিয়া হৈ চৈ চীৎকার শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সমস্ত সম্পদ, চাকরবাকর ও সৈন্যদের ফেলে খালি পায়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে নৌকাযোগে কামরূপ[১২] পলায়ন করেন। বখতিয়ার শহরটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করেন ও বাংলার প্রাচীন রাজধানী লখনৌতি নতুন করে গ'ড়ে তোলেন এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন ক'রে শান্তির সহিত বাংলা শাসন করতে থাকেন, খোতবা প্রচলন করেন ; সুলতান কুতবুদ্দীনের নামে টাকশালে মুদ্রা তৈরী করেন এবং মুসলমান ধর্মানুযায়ী[১৩] আইনকানুন প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। সেই সময় থেকে বাংলা রাজ্য দিল্লীর সম্রাটের অধীন হয়।[১৪] মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বখতিয়ার বাংলার প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা ছিলেন। ৫৯৯ হিজরীতে সুলতান কুতবুদ্দীন কলিঞ্জর দুর্গ[১৫] জয়ের পর মহুবা[১৬] (স্থানটি কাল্পীর[১৭] নিচের দিকে) জয় করেন ও সেখান থেকে বদাউনের দিকে অগ্রসর হ'তে থাকেন।[১৮] এই সময় মালিক মুহম্মদ বখতিয়ার বিহার থেকে গিয়ে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে প্রচুর নগদ অর্থ, মণিমাণিক্য ও বাংলার মূল্যবান দ্রব্যাদি উপহার পেশ করেন। কিছুদিন সুলতানের সঙ্গে থাকার পর তিনি তাঁর অনুমতি নিয়ে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুদিন বাংলায় রাজত্ব করার সময় তিনি মন্দির ধ্বংস ও মসজিদ নির্মাণে প্রবৃত্ত হন।

অতঃপর বাংলার উত্তর-পূর্ব দিকের গিরিপথ দিয়ে তিনি খাটা[১৯] ও তিব্বত জয়ের উদ্দেশ্যে বারো হাজার[২০] বাছাই অশ্বারোহী সৈন্যসহ অগ্রসর হন। মুহম্মদ বখতিয়ার জনৈক কোচ-প্রধানকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন ও তার নাম রেখেছিলেন আলী মিচ। এই ব্যক্তি পথ দেখিয়ে তাঁকে ঐ পর্বতমালা পর্যন্ত নিয়ে যায়। বখতিয়ারের সৈন্য-বাহিনীকে আলী মিচ একটা দেশে নিয়ে যায় ; সেখানকার শহরের

নাম আবর্ধন[২১] এবং বরাহমনগদি। কথিত হয়, এই শহর সম্রাট গরশাপ কর্তৃক[২২] প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই শহরের অপর দিকে নমকদি[২৩] নামক একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গা অপেক্ষা এই নদী গভীরতা ও প্রশস্ততায় তিন গুণ বড়। এই নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল এবং গভীর ও প্রশস্ত হওয়ায় পার হওয়া কঠিন। তাই তাঁরা নদীর তীর দিয়ে আরো দশ দিনের[২৪] পথ অতিক্রম ক'রে একটি স্থানে পৌঁছালেন। সেখানে প্রাচীনকালের লোকদের তৈরী উনত্রিশটি খিলান বিশিষ্ট একটি পাথরের তৈরী পুল দেখতে পান।[২৫] কথিত হয়, সম্রাট গরশাপ হিন্দুস্তান আক্রমণের সময় এই পুল তৈরী করেছিলেন ও কামরূপ দেশে পৌঁছেছিলেন। সংক্ষেপে, মুহম্মদ বখতিয়ার ঐ পুল দিয়ে সৈন্যবাহিনী পার করার ও দু'জন সৈনাধ্যক্ষকে কিছু সৈন্যসহ পুল রক্ষার জন্য রেখে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। কামরূপের রাজা তাঁকে অগ্রসর হ'তে বিরত করার চেষ্টা করেন ও বলেন, যদি তিনি (মুহম্মদ বখতিয়ার) তিব্বত যাত্রা সে বৎসর স্থগিত রাখেন ও পর-বৎসর যান, তা' হলে রাজা উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহ ক'রে শক্তিশালী বাহিনীসহ তাঁর সঙ্গে যাবেন। "আমি ও এই মুসলিম অগ্রগামী হব ও পূর্ণ আত্মত্যাগের জন্য কোমর বাঁধবো।" মুহম্মদ বখতিয়ার তাঁর পরামর্শ একেবারে অগ্রাহ্য ক'রে অগ্রসর হ'তে থাকেন এবং ষোল দিন[২৬] পর তিব্বত পৌঁছান। এখানে রাজা গরশাপ পূর্বে একটি সুদৃঢ় দুর্গ তৈরী করেছিলেন। সেই দুর্গ আক্রমণ দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে কোনো লাভ হয় নাই বরং বহু মুসলিম সৈন্য নিহত হয়। সেখানে যাদের বন্দী করা হয়েছিল তাদের নিকট থেকে জানা গিয়েছিল যে, এই দুর্গ থেকে পাঁচ 'ফারসাং' দূরে একটি বৃহৎ ও জনবহুল নগর আছে।[২৭] সেখানে পঞ্চাশ হাজার বক্তলিপ্স্ মোঙ্গল অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ সৈন্য সমবেত হয়েছে। সেই নগরের বাজারে প্রত্যহ পাঁচশ' থেকে হাজার ঘোড়া বিক্রি হয় এবং লখনৌতি প্রেরিত হয়।[৮] এবং তারা বলেছিল, "এই সামান্য সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হওয়া তোমার একটা অসম্ভব মতলব।" মুহম্মদ বখতিয়ার এই অবস্থা অবগত হয়ে নিজের পরিকল্পনার জন্য লজ্জিত হয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধি

না করেই পশ্চাদপসরণ করেন। সেখানকার আশেপাশের অধিবাসীরা পশুর খাদ্য ও মানুষের খাদ্যশস্য সব পুড়িয়ে দিয়ে নিজেদের তৈজসপত্র নিয়ে পাহাড়ে চলে গিয়েছিল। প্রত্যাবর্তনের সময়[২৯] পনের দিন পর্যন্ত সৈন্যরা এক মুঠো খাদ্যশস্য ও পশুর খাদ্য পায় নাই।

মানুষ গোলাকৃতি সূর্য ব্যতীত একটিও রুটী দেখতে
পায় নাই,
পশুপালও রামধনু ব্যতীত খাওয়ার শস্য পায় নাই।

অত্যধিক ক্ষুধার তাড়নায় সৈন্যরা ঘোড়ার গোশত খেয়েছিল এবং ঘোড়াগুলোও শুধু জানে বেঁচে থাকার পরিবর্তে মৃত্যুই শ্রেয় মনে ক'রে ছোরার নিচে গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

মোটের উপর এই প্রকার দুরবস্থার মধ্যে তারা সেই পুল পর্যন্ত পৌঁছালো। সেখানে যে দু'জন সৈনাধ্যক্ষকে রেখে যাওয়া হয়েছিল তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ ক'রে পুল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তখন সেখানকার লোকেরা পুল ভেঙ্গে দিয়েছিল। ধ্বংসাবস্থা দেখে ছোট-বড় সকলের অন্তর হঠাৎ চীনে মাটির পেয়ালার মতো ভেঙ্গে যায়। মুহম্মদ বখতিয়ার বিব্রত ও হতাশ হয়ে উদ্ধারের কোনো পন্থা খুঁজে পেলেন না। অনেক চেষ্টার পর তিনি সংবাদ পেলেন যে, অদূরে একটি অতি বৃহৎ মন্দির[৩০] আছে এবং মন্দিরের প্রতিমাগুলো সোনারূপার তৈরী ও অত্যন্ত জমকালো। কথিত হয় যে, উক্ত মন্দিরে এক হাজার মণ ওজনের একটি প্রতিমা ছিল। মুহম্মদ বখতিয়ার সসৈন্যে সেই মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করতে থাকেন। কামরূপের রাজা[৩১] তাঁর সৈন্যগণ ও প্রজাদেরকে উক্ত অঞ্চলের চতুর্দিক ধ্বংস করতে আদেশ দেন। সেই দেশের লোকেরা দলে দলে সৈন্য পাঠিয়ে মন্দির ঘেরাও করে এবং বাঁশের বর্শা তৈরী ক'রে একটির সঙ্গে আর একটি বেঁধে প্রাচীরের মতো তৈরী করে। মুহম্মদ বখতিয়ার দেখলেন যে, উদ্ধারের সমস্ত পথ ক্রমে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং ছোরা হাড় পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে। সেই জন্য তিনি সৈন্যদের নিয়ে বাঁশের বেড়ার গুরুতর অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে আসেন। সেই দেশের বিধর্মীরা নদীর তীর পর্যন্ত

তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে এবং লুণ্ঠন ও হত্যা করতে থাকে। (বখতিয়ারের) সৈন্যদের কতক অংশ নিহত হয়, কতক বন্যায় ভেসে যায়। নদীর তীরে পৌঁছে মুসলমান সৈন্যরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে পড়ে। হঠাৎ একজন সৈন্য অশ্বসহ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও একটা তীর ছুড়লে যতদূর যায় ততদূর যাওয়ার পর আর একজন এইভাবে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নদীর তলা বালুময় হওয়ায় একটু নড়াচড়া করতেই সবাই ডুবে যায়। কেবল মুহম্মদ বখতিয়ার ও এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য (অন্য মতে তিন শ') নদী পার হ'তে সক্ষম হয়েছিল।[৩২] অন্য সকলে নদীতে ডুবে গিয়েছিল। প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী নদী নিরাপদে পার হওয়ার পর যে সকল সৈন্য নদীতে ডুবে গিয়েছিল তাদের স্ত্রীলোকেরা ও সন্তানেরা গলিতে গলিতে ও ঘরের বারান্দা থেকে তাঁকে অভিশাপ দিতে থাকে; সেই কারণে অত্যধিক ক্রোধ ও অপমানে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন এবং দেওকোট[৩৩] পৌঁছে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্যান্য বিবরণীতে জানা যায় আলী মর্দান খালজী নামক একজন কর্মচারী বখতিয়ারের অসুখের সময় তাঁকে হত্যা করে ও লখনৌতি রাজ্য অধিকার করে; মালিক ইখতিয়ার-উদ-দীন মুহম্মদ বখতিয়ার বারো বৎসর কাল বাংলা শাসন করেছিলেন। যখন বখতিয়ার এই নশ্বর ধাম ত্যাগ ক'রে[৩৪] অনন্ত ধামে চলে যান, তখন মালিক আজুদ্দীন খালজী[৩৫] বাংলায় তাঁর স্থানে শাসনকর্তা হয়েছিলেন। আট মাস অতীত না হ'তেই আলী মর্দান খালজী তাঁকে হত্যা করেন।

আলী মর্দান খালজীর শাসন

আজুদ্দীন নিহত হওয়ার পর তাঁর হত্যাকারী আলী মর্দান খালজী বাংলার শাসনকর্তা হ'য়ে সুলতান আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করেন এবং নিজের নামে খোত্‌বা পাঠ ও মুদ্রা প্রবর্তন করেন।[৩৬] তাঁর মস্তিষ্ক তখন ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার হাওয়ায় ভর্তি হয়। তিনি অত্যাচার,

উৎপীড়ন ও নতুন নতুন নিয়ম প্রবর্তন করতে আরম্ভ করেন। তিনি দু'বৎসর রাজত্ব করেন। অবশেষে দিল্লী থেকে বাদশাহের সৈন্যবাহিনী এসে বংলায় পৌঁছায়। খালজী-গোষ্ঠী সম্রাটের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আজুদ্দীনের হত্যার প্রতিশোধ নেয়। এরপর রাজ্যের শাসনভার গিয়াসউদ্দীন খালজীর হাতে চলে যায়।

গিয়াসউদ্দিন খালজীর শাসন

গিয়াসউদ্দীন খালজী[৩৭] বাংলার শাসনকর্তার পদে স্থলাভিষিক্ত হন। ৬০৭ হিজরীতে সুলতান কুতুবউদ্দীন লাহোরে পোলো খেলার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে যান ও তাতে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আরাম শাহ দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন এবং সাম্রাজ্য ক্ষয় হ'তে থাকে। গিয়াসউদ্দীন এই প্রদেশের উপর পূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন, নিজ নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রা তৈরী করেন এবং কতকটা সার্বভৌম ক্ষমতা কবলস্থ ক'রে এই দেশ শাসন করতে থাকেন। ৬২২ হিজরীতে সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ সিংহাসন অধিকার ক'রে দিল্লীর গৌরব ফিরে পাওয়ায় তিনি সৈন্য-বাহিনীসহ বিহারের দিকে অগ্রসর হন ও লখনৌতি আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ প্রতিহত করার মতো শক্তি গিয়াসউদ্দীনের না থাকায় তিনি সম্রাটকে ৩৮টি হস্তী, আশি হাজার টাকা ও অন্যান্য মূল্যবান উপ-ঢৌকন পেশ করেন ও বাদশাহের সমর্থক শ্রেণীভুক্ত হন। সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ নিজ নামে খোতবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন এবং তাঁর পুত্রকে সুলতান নাসিরুদ্দীন উপাধি দিয়ে লখনৌতি রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন ও সেই সঙ্গে তাঁকে রাজকীয় ছত্র ও দণ্ড উপহার দেন। তারপর তিনি রাজধানী দিল্লী ফিরে যান। সুলতান গিয়াসউদ্দীন ন্যায়পরায়ণ ও উদার ছিলেন। তিনি বারো বৎসব রাজত্ব করেছিলেন।

দিল্লীর বাদশাহ সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীনের শাসনকাল

সুলতান নাসিরুদ্দীন বাংলার শাসনকর্তার পদে স্থলাভিষিক্ত হন। সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করার পর গিয়াসউদ্দীন —যিনি কামরূপ রাজ্যের দিকে গিয়েছিলেন—ফিরে এসে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সুলতান নাসিরুদ্দীন তাঁকে নিহত করেন এবং বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য পেয়ে তিনি অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি উপহারস্বরূপ তাঁর দিল্লীবাসী পরিচিত ব্যক্তিদের নিকট প্রেরণ করেন। তিন বৎসর কয়েক মাস তিনি বাংলা শাসন করেছিলেন। ৬২৬ হিজরীতে লখনৌতিতে তিনি মৃত্যুর তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করেন।[৩৮] এবং হুশামুদ্দীন খালজী নামক মুহম্মদ বখতিয়ারের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাংলার শাসনকর্তা হন।

আলাউদ্দীন খানের শাসনকাল

সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশ তাঁর প্রিয় পুত্রের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়ার পর প্রথমে পুত্রের পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন; এবং নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল সেই অগ্নি নির্বাপিত করার জন্য ৬২৭ হিজরীতে লখনৌতি অভিমুখে যাত্রা করেন। মালিক হুশামুদ্দীন খালজী বিদ্রোহী হ'য়ে বাংলার শাসনকার্যে সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলেন। সুলতান শামসুদ্দীন তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী করেন। বিদ্রোহের মূলোৎপাটন ও বিশৃঙ্খলা দমন করার পর তিনি ইজ্জুল-মুল্‌ক মালিক আলাউদ্দীন খানকে[১] রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করেন। আলাউদ্দীন বিদ্রোহীদের বশীভূত ও শাসন ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল করার পর সম্রাটের নামে খোতবা প্রবর্তন করেন। তিন বৎসর শাসন-কার্য পরিচালনার পর তাঁকে (দিল্লী) ডেকে পাঠানো হয়।

সায়েফুদ্দীন তর্কের শাসনকাল[৪০]

ইজ্জুল-মুল্‌ক আলাউদ্দীনের স্থলে সায়েফুদ্দীন তুর্ক বাংলার ভাইস্‌রয় পদের রাজকীয় ফরমান লাভ করেন। তিনিও তিন বৎসর কাল শাসনকার্য পরিচালনার পর বিষ প্রয়োগে মৃত্যুবরণ করেন।

ইজুদ্দীন তুঘন খানের শাসনকাল[৪১]

এই সময় পরিবর্তনশীল ভাগ্যের ফলে সুলতান শামসুদ্দীন আলতা-মাশের কন্যা সুলতানা রাজিয়ার[৪২] হাতে দিল্লী সাম্রাজ্যের ভার চলে গিয়েছিল। তার রাজত্বকালে লখনৌতির সুবাদারি (ভাইস্‌রয় পদ) ইজুদ্দীন তুঘন খানকে দেয়া হয়েছিল। তিনি দেশের শাসনকার্যে আত্ম নিয়োগ ক'রে কিছুদিন কৃতকার্য হয়েছিলেন। ৬৩৯ হিজরীতে যখন সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন, তখন তুঘন খান বহু উপঢৌকন ও মূল্যবান দ্রব্য দিল্লীর সম্রাটের নিকট সরফ-উল-মুল্‌ক সংকারির মারফত প্রেরণ করেন। সম্রাট অযোধ্যার শাসনকর্তা কাজী জালালুদ্দীনের মারফতে তুঘন খানকে একটি মতি-বসানো ছত্র ও বিশেষ সম্মানজনক খেলাত প্রেরণ করেন। ৬৪২ হিজরীতে চেঙ্গিজ খানের ত্রিশ হাজার মুঘল সৈন্য উত্তরের পার্বত্য গিরিপথ দিয়ে লখনৌতিতে হামলা ক'রে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। মালিক ইজুদ্দীন সম্রাট আলাউদ্দীনকে এই সংবাদ দেন। এই সংবাদ শুনে সুলতান আলাউদ্দীন খাজা তা'শের অন্যতম কর্মচারী মালিক কুরাবেগ তামার খানের অধীনে একটি বৃহৎ বাহিনী তুঘন খানের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। দুই পক্ষ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় মুঘলেরা পরাজিত হয়ে নিজেদের দেশে ফিরে যায়। ইতিমধ্যে কয়েকবার ইজুদ্দীন তুঘন খান ও মালিক কুরাবেগ তামার খানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। 'দুই শাসনকর্তা এক দেশ শাসন করতে পারে না'—এই নীতি অনুযায়ী

সুলতান আলাউদ্দীন লখনৌতির শাসনকর্তারূপে মালিক কুরাবেগ তামার খানকে নিযুক্ত করেন এবং মালিক ইজুদ্দীন তুঘন খানকে দিল্লী ডেকে পাঠান। তুঘন খান তেরো বৎসর কয়েক মাস শাসন করেছিলেন।

মালিক কুরাবেগ তামার খানের শাসনকাল[৪৩]

মালিক ইজুদ্দীন তুঘন খানের অপসারণের পর কুরাবেগ তামার খান লখনৌতির শাসনকর্তা হওয়ার পর তিনি প্রশাসনিক কার্যে আত্ম-নিয়োগ করেন। দশ বৎসর শাসন করার পর তাঁর মৃত্যু হয়। ৬৫৫ হিজরীতে সুলতান শামসুদ্দীন আলতামাশের পুত্র সম্রাট নাসিরুদ্দীন[৪৪] মাহমুদের রাজত্বকালে লখনৌতির ভাইসরয়ের পদ মালিক জালালউদ্দীন খানকে দেয়া হয়।

মালিক জালালউদ্দীন খানের শাসনকাল[৪৫]

মালিক জালালউদ্দীন খান লখনৌতির ভাইসরয় হওয়ার পর আন্দাজ এক বৎসর কাল শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। এর পর তাঁর স্থানে আরসলান খানকে এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

আরসলান খানের শাসনকাল[৪৬]

আরসলান খান লখনৌতির ভাইসরয় হওয়ার পর তিনি প্রশাসনিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কতকটা স্বাধীনভাবে কাজ কর-ছিলেন। ৬৫৭ হিজরীতে তিনি সুলতান নাসিরুদ্দীনকে দু'টি হাতী ও অনেক মণিমুক্তা প্রেরণ করেন। এর অব্যবহিত পরে লখনৌতিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুহম্মদ তাতার খানের শাসনকাল [৭]

আরসলান খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মুহম্মদ তাতার খান—যিনি সাহসিকতা, উদারতা, বীরত্ব ও সততার জন্য বিখ্যাত ছিলেন—স্বাধীনভাবে লখনৌতি শাসন করতে থাকেন এবং সম্রাট নাসিরুদ্দীনের নিকট বিশেষ নতি স্বীকার করেন নাই। কিছুকাল পরে তিনি নিজ নামে খোতবা প্রবর্তন করেন ও এইভাবে কাজ চালাতে থাকেন। ৬৬৪ হিজরীতে সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পর—যখন দিল্লীর মসনদের গৌরব বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত সম্রাটের খ্যাতি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঐশ্বর্যের সংবাদ চতুর্দিকে দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে, তখন মুহম্মদ তাতার খান দূরদৃষ্টির সাথে তেষট্টিটি হস্তী ও অন্যান্য উপহার দিল্লী প্রেরণ করেন। সেটা সুলতান গিয়াসউদ্দীনের শাসনকালের প্রথম বৎসর হওয়ায় তিনি একে শুভচিহ্ন হিসাবে গণ্য ক'রে নগরী আলোক-সজ্জায় সজ্জিত করেন। আমীর ওমরাহ, অধীনস্থ শাসনকর্তা ও অন্যান্য প্রধান কর্মচারীগণ সম্রাটকে নজর পেশ করেন এবং তৎপরিবর্তে সম্রাটও তাঁদের উপহার দেন। মুহম্মদ তাতার খান এবং দূতগণকে বহু উপহার দেয়া হয় ও তাদের ফিরবার অনুমতি দেয়া হয়। তাতার খান উপহার লাভ ক'রে আনন্দিত হয়ে নিজেকে সম্রাটের আমীর শ্রেণীর অন্তর্ভু'ক্ত করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন তুঘরল নামক জনৈক তুর্কী গোলামকে লখনৌতির ভাইসরয় পদে নিযুক্ত করেন। [৮]

সুলতান মুঘীসুদ্দীন উপাধি নিয়ে তুঘরলের শাসনকাল

তুঘরল লখনৌতির রাজ প্রতিনিধি (ভাইসরয়) হলেন। ঔদার্য, সাহসিকতায়, বীরত্ব ও বিজ্ঞতায় তার তুল্য আর কেউ ছিল না। সেইজন্য তিনি অল্প কালের মধ্যে লখনৌতি বশীভূত করেন এবং তথায় শৃঙ্খলা স্থাপন করেন; এবং কামরূপ (পশ্চিম আসাম) জয় করেন;

সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি লখনৌতি থেকে জাজনগর অগ্রসর হ'ন এবং তথাকার রাজাকে পরাজিত ক'রে বহুসংখ্যক হস্তী, বিপুল সম্পদ ও জিনিসপত্র পেয়েছিলেন। যেহেতু এই সময় সুলতান গিয়াসউদ্দীন বৃদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রদ্বয় বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ মুলতানে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেইহেতু লখনৌতির দিকে দৃষ্টিপাতের সুযোগ হয় নাই। এই পরিস্থিতির জন্য তুঘরল সম্রাটের নিকট হস্তী ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি প্রেরণ করেন নাই। উপরন্তু এই সময় সম্রাট দিল্লীতে অসুস্থ হয়ে এক মাস কাল প্রাসাদের বাইরে আসতে পারেন নাই। ফলে তাঁর মৃত্যুর গুজব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তুঘরল সম্পূর্ণ ফাঁকা মাঠ পেয়ে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করেন এবং নিজেকে সুলতান মুঘিসুদ্দীন ব'লে ঘোষণা ক'রে রাজকীয় লাল-ছত্র উন্মুক্ত করেন ও নিজের নামে খোত্‌বা পড়াতে আরম্ভ করেন। এই সময় সম্রাট রোগ-মুক্ত হ'য়ে ওঠেন এবং তাঁর রোগমুক্তি সংক্রান্ত পরোয়ানা এসে পৌঁছায়। তুঘরল কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত না হয়ে রাজদ্রোহী হয়ে বিরোধিতা করতে থাকেন। গিয়াসউদ্দীন বলবন এই সংবাদ অবহিত হয়ে অযোধ্যার শাসনকর্তা আমিন খান উপাধি-ধারী দীর্ঘ-কেশী (এঁর চুল লম্বা ছিল) মালিক আবতাকিনকে প্রধান সেনাপতি ও লখনৌতির শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত ক'রে অভিযানে প্রেরণ করেন। তাঁর সঙ্গে তামার খান শামসী, আলী খানের পুত্র[৪১] তাজুদ্দীন ও জামালউদ্দীন কান্দাহারি প্রমুখ সম্রান্ত ব্যক্তিকে তুঘরলকে দমন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এবং যখন মালিক আবতাকিন এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী নিয়ে 'সরো' নদী পার হয়ে লখনৌতি অভিমুখে অগ্রসর হ'ন, তখন তুঘরলও এক বৃহৎ বাহিনীসহ তাঁকে প্রতিরোধ করতে আসেন। যেহেতু সাহসিকতা ও বদান্যতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়, সেইহেতু কিছু সংখ্যক আমীর এবং সৈন্য আমিন খানের পক্ষ ত্যাগ করে তাঁর (তুঘরলের) সঙ্গে যোগ-দান করে। তার ফলে যুদ্ধে আমিন খানের পরাজয় হয়। আমিন খান পরাজিত হয়ে অযোধ্যায় পশ্চাদপসরণ করার সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছাতে তিনি উদ্বিগ্ন ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন এবং অযোধ্যার

সিংহদ্বারে আমিন খানকে ফাঁসি দেয়ার আদেশ দেন। এর পর তুঘরলকে দমন করার জন্য তিনি এক বৃহৎ বাহিনীসহ মালিক তাবামীনকে প্রেরণ করেন। তুঘরল সাহসের সঙ্গে আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে এই বাহিনীকেও পরাজিত করেন এবং অনেক দ্রব্য লুঠ ক'রে পান।

ভাগ্যের জোরে
সেই দুর্দান্ত সিংহ
দু'বার শত্রুসৈন্যদের ছত্রভঙ্গ ক'রেছিল।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন এই অশুভ সংবাদ পেয়ে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হ'য়ে পড়েন; তারপর সাহসের সাথে তিনি নিজেই অভিযান পরিচালনা করার বিষয় সাব্যস্ত করেন। 'যোন' ও 'গঙ্গা' নদীদ্বয়ে বহু সংখ্যক নৌকা একত্রিত করার হুকুম দেন এবং নিজে শিকার করার অজুহাতে সনোম ও সামানাহ অভিমুখে যান। অনুপস্থিতি কালের জন্য মালিকুল ওমরাহ ফখরুদ্দীন আহমদ কোতোয়ালকে দিল্লীতে তাঁর প্রতিনিধিরূপে রেখে তিনি গঙ্গা পার হন এবং বর্ষার মওসুম হওয়া সত্ত্বেও দ্রুত লখনৌতি অভিমুখে অগ্রসর হন। তুঘরল ইতিমধ্যে তাঁর সুদক্ষ সৈন্যদের একত্রিত ক'রে বিরাট বাহিনীসহ জাজনগর অধিকার করার উদ্দেশ্যে সেই দিকে অগ্রসর হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সম্রাট দিল্লী প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত তিনি লখনৌতি ফিরে আসবেন না। কিন্তু সম্রাট লখনৌতি পৌঁছে সেখানে কয়েক দিন অপেক্ষা করার পর সেনাপতি হাশামুদ্দীন উকীলদার বারবগকে (সেক্রেটারি অব স্টেট) লখনৌতি রাজ্য বশীভূত করার জন্য রেখে যান, এবং তুঘরলকে শাস্তি দেয়ার জন্য সম্রাট নিজে জাজনগরের দিকে অগ্রসর হন।[৫০] হাশামুদ্দীন 'তারীখ-ই-ফিরোজশাহী' পুস্তকের লেখকের পিতামহ ছিলেন। সম্রাট সোনারগাঁও এলাকায় পৌঁছানোর পর সেখানকার জমিদার ভুজরায়[৫১] সম্রাটের অনুগতদের দলে যোগ দেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, তুঘরল নদী[৫২] পার হওয়ার চেষ্টা করলে তিনি তাঁকে বাধা দেবেন। কিন্তু দ্রুত অগ্রসর হয়ে কয়েক মনজিল অতিক্রম করার পর সম্রাট তুঘরলের আর কোনো চিহ্ন পান নাই এবং কেউ তাঁর (তুঘরলের) অবস্থিতির সংবাদ

দিতে পারে নাই। সম্রাট তখন মালিক বারবক বারাসকে[৫৩] সাত হাজার বাছাই অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দশ-বারো ক্রোশ অগ্রসর হ'তে আদেশ দেন। সর্বপ্রকারে পশ্চাদ্ধাবন ও সন্ধান করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও তারা তুঘরলের কোনো চিহ্ন খুঁজে পান নাই। একদিন কোয়েলের শাসনকর্তা মালিক মুহম্মদ তীরন্দাজ[৫৪] ও তাঁর ভ্রাতা মালিক মুকাদ্দার অগ্রগামী সৈন্যদের থেকে আলাদা হ'য়ে ৩০/৪০ জন সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হ'তে থাকেন। হঠাৎ এক মাঠে কয়েকজন মুদির সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। এদের গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন এবং তাদের ভয় দেখাবার জন্য এক জনের ঘাড় ভেঙ্গে হত্যা করেন। তখন অন্যেরা চীৎকার করে বলে, 'যদি আমাদের জিনিস-পত্র ও খাদ্যদ্রব্যাদি নেয়ার ইচ্ছা আপনাদের থাকে, সবই নিতে পারেন; তবে আমাদের জীবন বাঁচান।' মালিক মুহম্মদ তীরন্দাজ বলেন, 'তোমাদের জিনিসপত্রের সঙ্গে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই; আমরা তুঘরলের সন্ধান চাই। যদি তোমরা পথ দেখাতে পার, দ্রব্যাদিসহ তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে। নতুবা এরপর যা হবে সে তোমাদের অসদাচরণেরই ফল।' মুদিরা বলে, 'আমরা তুঘরলের[৫৫] শিবিরে খাদ্যশস্য নিয়ে গিয়েছিলাম। আমরা এখন সেখান থেকে ফিরছি। আপনাদের এবং তুঘরলের মধ্যে দূরত্ব মাত্র অর্ধ কারসাখ। আজ তিনি সেখানে শিবির স্থাপন করেছেন; আগামীকাল জাজনগর অভিমুখে অগ্রসর হবেন।' মালিক মুহম্মদ তীরন্দাজ দু'জন সৈনিকের পাহারায় মুদি-দেরকে মালিক বারবক বারাসের নিকট প্রেরণ করেন এবং ব'লে পাঠান যে, মুদিদের নিকট থেকে সত্য নির্ধারণ ক'রে তিনি যেন দ্রুত অগ্রসর হন, যাতে বাংলা রাজ্যের অধীন জাজনগরে গিয়ে তুঘরল সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে যোগ দিতে জঙ্গলে লুকোতে না পারে। তিনি নিজে অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে তুঘরলের শিবির দেখতে পান। তখন তার (তুঘরলের) সৈন্যবাহিনী নিরাপদ মনে ক'রে বিশ্রাম করছিল এবং হাতী ও ঘোড়াগুলো চ'ড়ে বেড়াচ্ছিল। সুযোগ বুঝে তিনি অশ্বারোহীদের নিয়ে তুঘরলের শিবিরের দিকে বেগে অগ্রসর হন।

তুঘরলের বাহিনীর সৈনাধ্যক্ষগণ মনে করে, কেউ তাদের বাধা দেয় নাই। তুঘরলের শিবিরের নিকটস্থ হ'য়ে হঠাৎ তারা খাপ থেকে তলোয়ার খুলে সাক্ষাৎ দেয়ার শিবির কক্ষের সকলকে হত্যা করে এবং চীৎকার ক'রে বলতে থাকে, 'বাংলা রাজ্য বলবনের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।' তুঘরলের ধারণা হ'ল যে, সম্রাট নিজেই পৌঁছেছেন। সম্পূর্ণ বিব্রত ও হতবুদ্ধি হ'য়ে তিনি গোসলখানার দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটি ঘোড়ার পীঠে চ'ড়ে নিজ সমর্থকদেরকে একত্রিত না ক'রেই অব্যবস্থিতচিত্ত অবস্থায় সৈন্যদের আবাসস্থলের নিকটবর্তী স্থানে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে নদী পার হ'য়ে জাজনগর যাওয়ার মতলব করলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তুঘরলের অনুপস্থিতিতে তাঁর কর্মচারী, সৈন্য ও অনুসারিগণ চারদিকে ছড়িয়ে গেল। এবং মালিক মুকাদ্দার—যার হাতে তুঘরলের হত্যা পূর্বনির্ধারিত হয়ে ছিল—তুঘরলের অনুসরণ ক'রে নদীর তীরে তাঁর মোকাবেলা করেন। মালিক মুকাদ্দার এক তীর ছুড়ে তুঘরলের কাঁধে আঘাত করেন এবং তাঁকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে এবং নিজেও ঘোড়া থেকে নেমে তুঘরলের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। তুঘরলের অনুসারীরা তাকে খোঁজ করছে দেখে মালিক মুকাদ্দার নদীর ধারে কাদার মধ্যে তুঘরলের মস্তক পুঁতে রাখেন ও তাঁর দেহ নদীতে ফেলে দেন এবং নিজে নিজের কাপড় ধুতে আরম্ভ করেন। সেই মুহূর্তে তুঘরলের সৈন্যগণ 'পৃথিবীর অধীশ্বর' 'পৃথিবীর অধীশ্বর' বলে চীৎকার করতে করতে তুঘরলের সন্ধানে এসে পৌঁছায়। কিন্তু তাঁকে দেখতে না পেয়ে তারা পালিয়ে যায়।

> তারা তার বুকে তীর ছুড়লো
> ঘোড়া থেকে তাকে নামালো ও মাথা কেটে নিলো।
> তুঘরল যখন নিজের অনবধানতার জন্য
> সেখানে নিহত হ'ল
> চারিদিক থেকে একটা চীৎকার উঠলো।
> . . . তুঘরলের সমর্থকরা সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো,
> . . . নেতার অভাবে তারা সকলে ভীত হয়ে পড়লো।[৩৬]

এমনি সময় মালিক বারবাক বারাস[৫৭] সেখানে পৌঁছালেন। মুকাদ্দার দৌড়ে গিয়ে তাঁকে বিজয়ের আনন্দ সংবাদ দেন। মালিক বারবাক তাঁর প্রশংসা করলেন। বিজয়ের সংবাদ সম্রাটের নিকট পাঠালেন; সেই সঙ্গে তুঘরলের মস্তকও। পরদিন সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য ও তুঘরলের বন্দী সৈন্যসহ তিনি সম্রাটের নিকট উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ বিজয়ের বিবরণ পেশ করলেন। এবং মালিক মুহম্মদ তীরন্দাজকে[৫৮] প্রথম শ্রেণীর মর্যাদা দেয়া হ'ল এবং তাঁর ভ্রাতা মালিক মুকাদ্দারকে[৫৯] 'তুঘরল কোশ' (তুঘরল-হন্তা) উপাধি দিয়ে আমীরের মর্যাদা দেয়া হ'ল। এর পর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন লখনৌতি ফিরে গেলেন এবং তুঘরলের সমর্থকদেরকে শাস্তি দিতে লাগলেন। নগরের বাজারের রাস্তার উভয় পার্শ্বে ফাঁসিকাঠ তৈরী ক'রে সম্রাট বন্দী তুঘরল সমর্থকদেরকে ফাঁসি দিলেন, এবং তাদের স্ত্রী পুত্র কন্যাদের যেখানে যাকে পাওয়া গিয়েছিল, অবর্ণনীয় অত্যাচার করার পর তাদের হত্যা করা হ'ল। ইতিপূর্বে দিল্লীর সম্রাটগণ কখনো দুষ্কৃতিকারীদের সন্তান ও স্ত্রীদের হত্যা করেন নাই।[৬০] অতঃপর সম্রাট লখনৌতি রাজ্য তাঁর পুত্র বঘরা খানকে[৬১] দেন এবং সেই সঙ্গে কেবল হস্তী ব্যতীত তুঘরল খানের থেকে প্রাপ্ত সমস্ত অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি তাঁকে দেন। বঘরা খানকে সুলতান নাসিরুদ্দীন উপাধি ও রাজছত্র দেন, এবং তাঁর নামে খোত্‌বা পাঠ ও মুদ্রা তৈরীর অনুমতি দেন। যাত্রার পূর্বে সম্রাট পুত্রকে কতকগুলি উপদেশ[৬২] দেনঃ "লখনৌতির রাজা আত্মীয় হউন বা অন্য কেউ হউন তাঁর পক্ষে দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে বিবাদ অথবা যুদ্ধ করা সমীচীন নয়। যদি দিল্লীর সম্রাট লখনৌতি (সৈন্য বাহিনীসহ) আসেন, তা হলে লখনৌতির রাজার পক্ষে দূরে কোথাও আশ্রয় নেয়া উচিত এবং দিল্লীর সম্রাট ফিরে যাওয়ার পর আবার লখনৌতি ফিরে এসে যথাবিধি কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর উচিত। প্রজাদের নিকট রাজস্ব আদায়ের সময় তাঁর মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত; অর্থাৎ, এত কম রাজস্ব আদায় করা উচিত হবে না, যাতে তাদের পক্ষে বিরোধী ও বিদ্রোহী হওয়া সম্ভব হবে; অথবা এত অধিকও আদায় করা উচিত নয় যাতে

তারা নিষ্পেষিত ও অত্যাচারিত হয়। কর্মচারীদের এমন বেতন দেয়া উচিত যাতে প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে তাদের কষ্ট না হয়? প্রশাসনিক ব্যাপারে আন্তরিকতাসম্পন্ন, অনুগত ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে তার পরামর্শ করা উচিত। আত্ম চরিতার্থ করার জন্য হুকুম দেয়া উচিত নয়, অথবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অবিচারমূলক কাজ করাও তাঁর উচিত নয়। সৈন্যদের অবস্থা (সুখ স্বাচ্ছন্দ্য) সম্বন্ধে তাঁর অবহেলা করা উচিত নয়। তাদের ভালমন্দ বিবেচনা করা ও তাদের অন্তর জয় করা তাঁর একান্ত কর্তব্য, এবং যে কোনো ব্যাপারে অবহেলা করা অথবা অলস হওয়া উচিত হবে না। যে কেউ তোমাকে এ-থেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলে, তাকেই তোমার দুশমন গণ্য করা উচিত এবং তার কথা শুনবে না। যারা পার্থিব বিষয়াদি ত্যাগ ক'রে আল্লার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তুমি তাঁদের নিকট আশ্রয় নিও (অর্থাৎ তাঁদের পরামর্শ নিও)।"

দরবেশদের পুরাতন খেলকার সাহায্য
আলেকজাণ্ডারের এক শ' প্রাচীরের শক্তি অপেক্ষাও
অধিকতর শক্তিশালী।

পুত্রকে এই প্রকার পরামর্শ দিয়ে সম্রাট দ্রুতগতিতে দিল্লী পৌঁছালেন তিন মাস পরে। [১] তুঘরল বাংলায় পঁচিশ বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করেছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন উপাধিধারী বঘরা খানের শাসনকাল

সুলতান নাসিরুদ্দীন লখনৌতি রাজ্যের শাসনকর্তা হওয়ার কিছুদিন পর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুলতান মুহম্মদ—যিনি 'খান ই-শহীদ' নামে মুলতানে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন

বলবন তাঁর প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে সুলতান গিয়াসউদ্দীন অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়েন এবং নাসিরুদ্দীনকে লখনৌতি থেকে দিল্লী তলব করেন। নাসিরুদ্দীন দিল্লী পৌঁছানোর পর ভ্রাতার জন্য শোক প্রকাশজনিত কার্যাদি সম্পন্ন করেন এবং পিতাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করেন। সম্রাট বলেনঃ 'তোমার ভ্রাতার মৃত্যু আমাকে অসুস্থ ও দুর্বল করেছে এবং এই পৃথিবী থেকে আমার বিদায় নেয়ার সময় নিকটবর্তী। এই সময় আমার নিকট থেকে তোমার বিচ্ছেদ ঠিক নয়। কারণ, তুমি ব্যতীত আমার অন্য কোনো উত্তরাধিকারী নাই। তোমার পুত্র কায়কোবাদ ও তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র কয়খসরু যুবক; জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের নাই। যদি এই সাম্রাজ্য তাদের হস্তগত হয়, তা'হলে তারা এটা রক্ষা করতে পারবে না এবং তাদের মধ্যে কেউ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করলে তোমাকে তাদের বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। সুতরাং, আমার কাছেই তোমার থাকা উচিত।' পিতার উপদেশ মতো নাসিরুদ্দীন তাঁর কাছে রইলেন। কিন্তু, পিতাকে কিছুটা সুস্থ হ'তে দেখে, নাসিরুদ্দীন তাঁকে না জানিয়ে শিকারে যাওয়ার অজুহাতে দিল্লী ত্যাগ ক'রে লখনৌতি ফিরে যান। এতে আঘাত পেয়ে সম্রাট আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৬৮৫ হিজরীতে নশ্বরধাম ত্যাগ করেন। পিতামহের মৃত্যুর পর নাসিরুদ্দীনের পুত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় সুলতান মুঈজুদ্দীন কায়কোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং যৌবনের চাপল্য ও চরিত্রহীনতায় মগ্ন হয়ে পড়েন। নারী ও মদ্য[৬৪] ব্যতীত সাম্রাজ্যের কোনো কাজে তার খেয়াল ছিল না। মালিক নিজামুদ্দীন, বলবনী বংশকে ধ্বংস করার মতলবে মুলতান থেকে কয়খসরুকে তলব করার জন্য এবং পথে তাকে হত্যা করার ও অনুগত আমীরগণকে পদচ্যুত করতে মুঈজুদ্দীনকে প্ররোচিত করেন। পুত্রের অবহেলা ও মালিক নিজামুদ্দীনের ঔদ্ধত্যের সংবাদ লখনৌতিতে সুলতান নাসিরুদ্দীন বঘরা খান পেয়ে পুত্রকে পরামর্শ দিয়ে এবং নিজামুদ্দীনের মতো ধূর্ত শত্রু সম্বন্ধে সাবধান থাকার জন্য উপদেশ দিয়ে কতকগুলো পত্র লিখেছিলেন।

তাতে কোনোই ফল হয় নাই। সুলতান বলবনের মৃত্যুর দু'বছর পর ৬৮৭ হিজরীতে সুলতান নাসিরুদ্দীন নিরাশ হ'য়ে দিল্লী প্রদেশ জয় করার ও পুত্রকে সমুচিত শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে সৈন্যবাহিনীসহ দিল্লী যাত্রা করেন। বিহার পোঁছে 'সরু' নদী অতিক্রম ক'রে সুলতান নাসিরুদ্দীন শিবির স্থাপন করেন।[৫৩]

পৃথিবীর সম্রাটের ঝাণ্ডা স্থাপিত হ'ল
ঘাগর নদীর তীরে, শহরের পাশে।
ঘাগর নদী (শহবের এক দিকে) আব 'সরু' অন্যদিকে
অতিরিক্ত গরমে সৈন্যদের মুখ দিয়ে ফেনা উঠছিল।
নদীর অপর দিক থেকে পুবালী তলোয়ার (অর্থাৎ
সূর্যোদয়) দেখা দিয়েছিল
এবং সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল।
নদীর দুই তীরে সৈন্যদের সারিবদ্ধতা
দু'দিকে দুই সূর্যের মতো ঝক্‌মক্‌ করছিল।

অবশেষে নিকটবর্তী হয়ে সুলতান নাসিরুদ্দীন দিল্লী জয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করেন ও সন্ধির প্রস্তাব করেন। মালিক নিজামুদ্দীনের উস্কানীতে সুলতান মুঈজুদ্দীন সন্ধি করতে অস্বীকার করেন ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকেন। বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে তিন দিন আলাপ-আলোচনার পর সুলতান নাসিরুদ্দীন স্বহস্তে পত্র লেখেনঃ

"পুত্র! তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি অত্যন্ত উদগ্রীব। তোমার বিচ্ছেদে আমি ধৈর্যহারা হয়ে পড়েছি। দুর্ভাগ্যপীড়িত আমাকে যদি তুমি এমন কোনো পন্থা দেখাতে পার যাতে ইয়াকুবের মতো আমার যে চক্ষু অন্ধ হয়ে এসেছে, সেই চক্ষু ইউসুফকে দেখে আবার দৃষ্টিমান হয়েছিল, সেইরূপে তোমাকে দেখতে পাই; তাতে তোমার রাজত্ব ও আনন্দে কোনো ব্যাঘাত হবে না।"

সুলতান পত্রের শেষে কবিতার এই চরণ দু'টি উদ্ধৃত করেছিলেনঃ

"যদিও বেহেশত একটা সুখময় স্থান,
তথাপি, মিলনের আনন্দ অপেক্ষা অনন্দজনক
আর কিছু নাই।"

পিতার এই পত্র পেয়ে সুলতান মুঈজুদ্দীন অভিভূত হয়ে একা গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। নিজামুদ্দীন তাতে বাধা দেন এবং তার ব্যবস্থা মোতাবেক সম্রাট রাজকীয় জাঁকিজমক ও সম্ভারসহ পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ঘাগর নদীর তীর থেকে এক ময়দানের দিকে গিয়ে 'সক' নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেন। তারপর বঘরা খান নৌকাযোগে নদী পার হয়ে মুঈজুদ্দীন কায়কোবাদের শিবিরের দিকে অগ্রসর হন। কায়কোবাদ ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে সিংহাসন থেকে নেমে পিতার পায়ের সামনে ভূমিষ্ঠ হন এবং পিতা-পুত্র উভয়েই অশ্রুবিসর্জন করতে করতে পরস্পরকে মাথায়-মুখে চুম্বন করেন। এর পর পিতা পুত্রের হাত ধরে তাকে সিংহাসনে বসান ও তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পুত্র সিংহাসন থেকে নেমে পিতাকে সেখানে বসান ও নিজে তাঁর সামনে সম্ভ্রমের সাথে বসেন। এরপর আনন্দোৎসব হয়। কিছুক্ষণ পরে সুলতান নাসিরুদ্দীন নদী পার হয়ে নিজ শিবিরে ফিরে আসেন। উভয়পক্ষের মধ্যে উপহার বিনিময় হয়। পরপর কয়েকদিন সুলতান নাসিরুদ্দীন পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও উভয়ে পরস্পরের কাছে থাকেন। যাত্রার দিন কতকগুলো উপদেশ[১৬] দিয়ে নাসিরুদ্দীন পুত্রকে কোলে বসিয়েছিলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে নিজ শিবিরে ফিরে এসেছিলেন। সেদিন তিনি কিছু আহার করেন নাই ও বিশ্বাসভাজন লোকদের বলেছিলেন, "আমি আজ আমার পুত্রের নিকট থেকে শেষ বিদায় নিলাম।" অতঃপর সেখান থেকে রওয়ানা হ'য়ে তিনি নিজ রাজ্যে ফিরে আসেন। পরে ৬৮৯ হিজরীতে যখন সুলতান মুইজুদ্দীন কায়কোবাদকে হত্যা করা হয়[১৭] এবং ঘোরি বংশীয় খালজী উপজাতীয় সুলতান জালালুদ্দীন খালজীর[১৮] নিকট সাম্রাজ্য হস্তান্তরিত হয়, তখন সুলতান নাসিরুদ্দীন গত্যন্তরবিহীন হয়ে দিল্লীর নতুন সুলতানের নিকট বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করেন, রাজছত্র ও নিজ নামে খোতবা পাঠ ত্যাগ করেন এবং লখনৌতির জায়গীর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। সুলতান আলাউদ্দীন ও সুলতান কুতবুদ্দীনের[১৯]

রাজত্বকাল পর্যন্ত সুলতান নাসিরুদ্দীন বঘরা খান এভাবেই চালিয়েছিলেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন ছয় বৎসর কাল বাংলা শাসন করেছিলেন।

বাহাদুর শাহের শাসনকাল

সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে সুলতান নাসিরুদ্দীনের অন্যতম আত্মীয়[10] ও সুলতান আলাউদ্দীনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় আমীর বাহাদুর খানকে বাংলার রাজপ্রতিনিধি পদে নিয়োগ করা হয়। বহু বৎসর তিনি রাজপ্রতিনিধির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং দিল্লীর সম্রাটের নামে খোতবা পড়াতেন ও মুদ্রা তৈরী করাতেন। কিন্তু সুলতান কুতবুদ্দীন খালজীর শাসনকালে তিনি বাংলারাজ্য অন্যায়ভাবে দখল করেন, নিজ নামে খোতবা ও মুদ্রার প্রচলন করেন এবং প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে থাকেন। কিছুদিন এভাবে তিনি চালিয়ে যান। কিন্তু ৭২৪ হিজরীতে যখন দিল্লীর সিংহাসন গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহের[11] হস্তগত হয় তখন লখনৌতির শাসনকর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সম্রাটের নিকট বাহাদুর শাহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হয়। সুলতান তুঘলক শাহ এক সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীসহ বাংলার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। যখন তিনি তিরহুত পৌঁছান, তখন সুলতান নাসিরুদ্দীন[12]—যার জায়গীর তাঁর সদাচরণের জন্য সুলতান আলাউদ্দীন কর্তৃক বাজেয়াফত করা হয় নাই ও যিনি লখনৌতির এক কোণে বাস করতেন—দিল্লীর সম্রাটের শক্তির মোকাবিলা করতে অক্ষম মনে ক'রে লখনৌতি থেকে তিরহুত পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সম্রাটকে বহু উপহার প্রদান করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন তুঘলক তাঁর সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার ক'রে রাজছত্র ও রাজদণ্ড প্রদান করেন এবং পূর্ব প্রথানুযায়ী সুলতান নাসিরুদ্দীনের জায়গীর অনুমোদন করেন। বিদ্রোহী বাহাদুর শাহকে তলব ক'রে তাঁকে সভাসদ শ্রেণীভুক্ত করেন। তিনিও (বাহাদুর শাহ) সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার ক'রে সভাসদের মতোই ব্যবহার করতে থাকেন। সম্রাট গিয়াসউদ্দীন তাঁর পুত্র তাতার খানকে সোনার গাঁওয়ের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন

এবং নাসিরুদ্দীনকে সোনারগাঁও, গৌড় ও বাংলার প্রধান নিযুক্ত ক'রে দিল্লী ফিরে যান।[১৩] কিন্তু অব্যবহিত পরে সুলতান নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু হয়। বাহাদুর শাহ আটত্রিশ বৎসর কাল বাংলা শাসন করেছিলেন।

কদর খানের শাসনকাল

বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় দিল্লী পৌঁছাবার পূর্বেই পথিমধ্যে ৭২৫ হিজরীর রবি-উল-আউয়াল মাসে একটি নতুন মঞ্চে চাপা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র উলুগ খান[১৭] দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন ও মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করেন এবং সমস্ত উচ্চপদ ও জায়গীর বিতরণ করেন। অন্যতম নেতৃস্থানীয় আমীর মালিক বেদার খালজীকে কদর খান উপাধি দিয়ে সুলতান নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুজনিত লখনৌতির শূন্যপদে নিয়োগ করেন। তাতার খানকে—যাকে তুঘলক শাহ সোনার গাঁওয়ের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেছিলেন ও যিনি সুলতান মুহম্মদ শাহের পালিত ভাই ছিলেন—একদিনে একশত হস্তী, এক হাজার অশ্ব, এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা, রাজছত্র ও রাজদণ্ড দিয়ে বাংলা ও সোনার গাঁওয়ের রাজপ্রতিনিধি (ভাইসরয়) পদে নিয়োগ করেন ও সসম্মানে তাঁকে সেখানে পাঠান। চৌদ্দ বৎসর শাসনকার্য পরিচালনার পর কদর খান তাঁর চাকর ফখরুদ্দীন কর্তৃক নিহত হন। সে কথা পরে বিবৃত হবে।

তৃতীয় পর্ব

বাংলারাজ্যের স্বাধীন মুসলমান রাজাগণ—যাঁরা নিজেদের নামে খুতবা পড়িয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একথা জানা থাকা উচিত যে, সুলতান কুতবুদ্দীন আইবেক থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ তুঘলক শাহ পর্যন্ত সতেরো জন সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে ১৫০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। এই সময় বাংলার শাসনকর্তাগণ দিল্লীর সম্রাটদের প্রতিনিধিস্বরূপ বাংলায় শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন এবং সম্রাটদের নামে খুতবা চালু করেছিলেন। যদি কোনো শাসনকর্তা বিদ্রোহী হয়ে নিজ নামে খুতবা পড়াতেন অথবা মুদ্রা প্রবর্তন করতেন, তা'হলে দিল্লীর সম্রাট ত্বরিত তার শাস্তিবিধান করতেন। মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে কদর খান লখনৌতির শাসনকর্তা নিয়োজিত হয়ে চৌদ্দ বৎসর কাল এই রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। তারপর, কদর খানের অস্ত্রাগার তত্ত্বাবধায়ক মালিক ফখরুদ্দীন প্রশাসনিক কার্যে হস্তক্ষেপ ক'রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন ও প্রতিনিধির (ভাইস্-রয়ের) পদ নিজে নেয়ার সুযোগ সন্ধান করতে থাকেন। কদর খানকে অসাবধান দেখে ফখরুদ্দীন বিদ্রোহী হ'য়ে নিজ প্রভুকে হত্যা ক'রে বাংলারাজ্যের ভাইস্‌রয় পদ হস্তগত করেন। যখন দিল্লীর সম্রাট মুহম্মদ শাহের সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রায়, সেই সময় ফখরুদ্দীন সম্রাটকে বন্দী বা গ্রেফতার করার মতলব করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে দিল্লীর সম্রাটের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করেন ও নিজেকে

স্বাধীন রাজারূপে (সুলতান) ঘোষণা করেন।[১] সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলার দরুন সম্রাট বাংলার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। সেই সময় থেকে দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীনতা ছিন্ন ক'রে বাংলারাজ্য স্বাধীন হয়। ফখরুদ্দীনই প্রথম রাজা (সুলতান) যিনি স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ বাংলারাজ্যে সর্বপ্রথম নিজের নামে খুতবা প্রচলিত করেন।[২]

সুলতান ফখরুদ্দীনের রাজত্বের বিবরণ[৩]

সুলতান ফখরুদ্দীন বাংলারাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁর কর্মচারী মুখলিস খানকে এক সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীসহ বাংলার প্রান্তবর্তী প্রদেশগুলি বশীভূত করার জন্য প্রেরণ করেন। কদর খানের প্রধান সেনাপতি মালিক আলী মুবারক এক বৃহৎ বাহিনীসহ তাঁর মোকাবিলা করেন ও অনেক লড়াইয়ের পর মুখলিস খানকে হত্যা ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করেন। সুলতান ফখরুদ্দীন অল্পদিন পূর্বে সিংহাসন দখল করায় কর্মচারীদের আনুগত্য সম্পর্কে তখনো নিঃসন্দেহ হ'তে পারেন নাই এবং সেই কারণে আলী মুবারককে আক্রমণ করতে সাহস করেন নাই। মালিক আলী মুবারক এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ ক'রে নিজেকে সুলতান আলাউদ্দীন নামে ঘোষণা করেন। আলাউদ্দীন সৈন্যবাহিনীসহ সুলতান ফখরুদ্দীনের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি ৭৪১ হিজরীতে যুদ্ধে সুলতান ফখরুদ্দীনকে পরাজিত ও বন্দী করেন এবং তাঁকে হত্যা ক'রে কদর খানের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।[৪]

অতঃপর, সুলতান আলাউদ্দীন লখনৌতি রক্ষার জন্য সুদক্ষ সৈন্যদল রেখে বাংলারাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি জয় করার জন্য নিজে অগ্রসর হন। সুলতান ফখরুদ্দীন দু'বছর পাঁচ মাস রাজত্ব করেছিলেন।

সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি নিয়ে আলী মুবারকের সিংহাসনে আরোহণ

কথিত হয় যে, মালিক আলী মুবারক প্রথমে মালিক ফিরোজ রজবের একজন বিশ্বস্ত চাকর ছিলেন। মালিক ফিরোজ ছিলেন সুলতান গিয়াস-উদ্দীন তুঘলক শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ও সুলতান মুহম্মদ শাহের চাচাতো ভাই। সুলতান মুহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর রাজত্বের প্রথম বৎসরে মালিক ফিরোজকে নিজের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করেন। সেই সময় আলী মুবারকের পালক-ভ্রাতা হাজী ইলিয়াসের কোনো একটা অপরাধজনক কার্য প্রকাশ পায়। সেজন্য হাজী ইলিয়াস দিল্লী থেকে পলায়ন করেন। যখন মালিক ফিরোজ তাকে (ইলিয়াসকে) তার সমক্ষে উপস্থিত করতে আলী মুবারককে বলেন, তখন মুবারক তার সন্ধান করেন। যখন কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন আলী মুবারক তার পলায়নের কথা মালিক ফিরোজকে জানান। মালিক ফিরোজ তাকে তিরস্কার করেন এবং নিজের সামনে থেকে তাড়িয়ে দেন। আলী মুবারক তখন বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি হযরত শাহ মাখদুম জালালুদ্দীন তাব্রেজীকে[৫] (আল্লাহ তাঁর মাজার পবিত্র করুন) স্বপ্নে দেখতে পান এবং বিনয় ও নম্রতা প্রদর্শন দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। তিনি তাকে (মুবারককে) বলেন, "আমরা তোমাকে বাংলা সুবা দান করেছি; কিন্তু তুমি আমাদের পবিত্র মাজার তৈরী করে দিও।" আলী মুবারক তাতে সম্মত হ'য়ে কোথায় মাজার তৈরী করতে হবে জিজ্ঞাসা করেন। দরবেশ উত্তরে বলেন, "পাণ্ডুয়া শহরের একস্থানে একটির উপর আর একটি, এইরূপে অবস্থিত তিনটি ইট দেখতে পাবে এবং ঐ ইটগুলির নীচে একটি একশ' পত্রবিশিষ্ট তাজা গোলাপ দেখতে পাবে। সেখানে মাজার তৈরী করতে হবে।" আলী মুবারক বাংলায় পৌঁছে কদর খানের অধীনে চাকুরী নেন এবং ক্রমে প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত হন। যখন মালিক ফখরুদ্দীন কদর খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে নিজ উপকারী ব্যক্তিকে হত্যা ক'রে রাজ্য দখল করেন, তখন মালিক

মুবারক সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি নিয়ে নিজেকে সুলতান ব'লে ঘোষণা করেন এবং পূর্ব বর্ণনানুযায়ী ফখরুদ্দীনকে হত্যা ক'রে উপকারীর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সুলতান আলাউদ্দীন অত্যন্ত তৎপরতার সাথে লখনৌতিতে একদল সৈন্য রেখে বাংলার অন্যান্য প্রদেশ জয় করতে মনোনিবেশ করেন। আলাউদ্দীন নিজ নামে খুতবা ও মুদ্রা প্রচলন করার পর বিলাসিতা ও আনন্দোৎসবে মত্ত হয়ে দরবেশের নির্দেশ ভূলে গিয়েছিলেন। অবশেষে এক রাত্রে দরবেশ স্বপ্নে তাঁকে বলেন, "আলাউদ্দীন, তুমি বাংলারাজ্য পেয়েছ, কিন্তু আমার আদেশ ভুলে গিয়েছ।" আলাউদ্দীন পরদিন সেই ইটগুলি সন্ধান করেন ও দরবেশের কথিত স্থানে সেগুলি দেখতে পান এবং সেখানে একটি মাজার তৈরী করেন। এর চিহ্ন আজও দেখতে পাওয়া যায়। সেই সময় হাজী ইলিয়াসও পাণ্ডুয়া আসেন। সুলতান আলাউদ্দীন কিছুদিন তাকে বন্দী করে রাখেন; কিন্তু পরে ইলিয়াসের মাতার—যিনি আলাউদ্দীনের পালক-মাতা ছিলেন—অনুরোধে ইলিয়াসকে মুক্তি দেন ও তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দিয়ে সামনে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি দেন। অল্পদিনের মধ্যে হাজী ইলিয়াস সৈন্যবাহিনীকে হস্তগত করেন এবং একদিন খোজাদের সাহায্যে সুলতান আলাউদ্দীনকে হত্যা করেন ও শামসুদ্দীন ভাংড়া উপাধি নিয়ে লখনৌতি ও বাংলার প্রদেশসমূহ দখল করেন। সুলতান আলাউদ্দীন এক বৎসর পাঁচ মাস রাজত্ব করেছিলেন।

সুলতান শামসুদ্দীন উপাধিধারী হাজী ইলিয়াসের রাজত্বকাল

যখন সুলতান আলাউদ্দীন নিহত হন, তখন বাংলার রাজত্ব হাজী ইলিয়াস আলাইয়ের হাতে চলে যায়। সুলতান শামসুদ্দীন উপাধি গ্রহণ ক'রে তিনি পবিত্র নগর পাণ্ডুয়ার[৬] সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ভাং খেতেন; সেজন্য তাঁকে শামসুদ্দীন ভাংড়া বলা হ'ত।

দেশের লোককে বশীভূত করার ও সৈন্যদের অন্তর জয় করার জন্য তিনি নানা প্রকার মহৎ চেষ্টা করতেন। কিছুদিন পর সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ ক'রে তিনি জাজনগর গিয়েছিলেন এবং সেখানে বহু মূল্যবান দ্রব্য, উপহার ও বৃহৎ হস্তী পেয়ে রাজধানীতে ফিরে আসেন। সুলতান মুহম্মদ শাহের আমল থেকে দিল্লী সাম্রাজ্যের পতন হতে থাকায় তেরো বৎসর কাল দিল্লীর সম্রাটেরা বাংলার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নাই। সুলতান শামসুদ্দীন[৭] সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাংলার শাসনকার্যে মনোনিবেশ করেন ; তিনি বানারস পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল ক্রমশঃ বশীভূত করেন এবং নিজের জাঁকজমক ও ক্ষমতা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি করেন। রজবের পুত্র ফিরোজ শাহ[৮] পুনরায় বাংলা বিজয়ের চেষ্টা করেন। কথিত হয় যে, সেই সময় সুলতান শামসুদ্দীন দিল্লীর 'শামছি'-গোসলখানার (হাম্মামের) মতো একটি হাম্মাম তৈরী করেছিলেন। সুলতান ফিরোজ শাহ ক্রোধান্ধ হ'য়ে ৭৫৪ হিজরীতে শামসুদ্দীনের বিরুদ্ধে লখনৌতি অভিযান পরিচালনা করেন। দ্রুত অগ্রসর হ'য়ে তিনি পাণ্ডুয়া শহরের নিকটবর্তী হন। সেই সময় পাণ্ডুয়া বাংলার রাজধানী ছিল। সম্রাট যে স্থানে শিবির স্থাপন করেছিলেন এখনো সেস্থান ফিরোজপুরাবাদ[৯] নামে কথিত হয়। সেখান থেকে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে তিনি পাণ্ডুয়া দুর্গ অবরোধ করেন। সুলতান শামসুদ্দীন তাঁর পুত্রের অধীনে একদল সৈন্য পাণ্ডুয়া রক্ষার জন্য রেখে নিজে সসৈন্যে পরিখা-বেষ্টিত একডালা দুর্গে অবস্থান করেন। একডালা দুর্গ তখন অত্যন্ত দুর্ভেদ্য ছিল। ফিরোজ শাহ পাণ্ডুয়ার সাধারণ লোকদের উপর কোনো প্রকার অত্যাচার না ক'রে সুলতান শামসুদ্দীনের পুত্রকে বন্দী ক'রে একডালা দুর্গের দিকে অগ্রসর হন।[১০]

প্রথম দিন এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়। অতঃপর তিনি (ফিরোজ শাহ) বাইশ দিন দুর্গ[১১] অবরোধ ক'রে রাখেন। অকৃতকার্য হ'য়ে ফিরোজ শাহ গঙ্গা-তীরে শিবির স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর তিনি একা শিবির স্থাপনের উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে বের হন। সুলতান শামসুদ্দীন মনে করলেন যে, ফিরোজ শাহ পশ্চাদপসরণ করছেন এবং তখন তিনি দুর্গের বাইরে এসে সৈন্য সমাবেশ করেন।

তরবারি, তীব, বর্শা ও বন্দুকের জন্য
উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের বাজার গরম হয়ে উঠলো।
বীরদের আত্মা দেহশূন্য হ'তে লাগলো ;
(লাল) গোলাপের মতো তাদের মুখের উপর জখম
প্রস্ফুটিত হ'তে লাগলো।

যুদ্ধে উভয় পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। অবশেষে বিজয়ের বায়ুহিল্লোল ফিরোজ শাহের পতাকা স্পর্শ করলো। শামসুদ্দীন পরাভূত হ'য়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নেন। জাজনগর থেকে আনীত তাঁর চুয়াল্লিশটি হাতী, রাজছত্র, (অন্য) পতাকা ও অন্যান্য রাজকীয় দ্রব্যাদি ফিরোজ শাহের সৈন্যদের হাতে আসে। কথিত হয়, সেই সময় আউলিয়া শেখ রাজা বিয়াবানির[১১] মৃত্যু হয়। সুলতান শামসুদ্দীন দরবেশের পোশাক পরিধান ক'রে দুর্গের বাহিরে এসে শেখের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে তিনি একা ফিরোজ শাহকে দেখতে যান। ফিরোজ শাহ তাঁকে চিনতে পারেন নাই। শামসুদ্দীন ফিরে আসেন। পরে সুলতান এই সংবাদ শুনে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। মোটের উপর, অবরোধের কাল প্রলম্বিত হয় ; কারণ বর্ষাকাল এসে পড়ে এবং যেহেতু বর্ষাকালে বাংলা জলমগ্ন হ'য়ে যায়, সেইহেতু ফিরোজ শাহ সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করেন। অবরোধের ফলে সুলতান শামসুদ্দীনও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ায় আংশিক বশ্যতা স্বীকার করেন ও সন্ধি স্থাপন করতে চান। ফিরোজ শাহ সুলতান শামসুদ্দীনের পুত্র ও লখনৌতি রাজ্যের অন্য বন্দীদের মুক্তি দিয়ে ফিরে যান। ৭৫৫ হিজরীতে সুলতান শামসুদ্দীন বিজ্ঞ দূতদের মারফতে বহু উপহার ও দুর্লভ জিনিস ফিরোজ শাহের নিকট প্রেরণ করেন। ফিরোজ শাহও দূতদের বিশেষ খাতির ক'রে ফেরত পাঠান। ফিরোজ শাহের জন্য সুলতান শামসুদ্দীনের অত্যন্ত উদ্বেগ থাকায় ৭৫৭ হিজরীতে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান দূতদের দিল্লী প্রেরণ করেন। ফিরোজ শাহ সম্মত হয়ে বহু উপহার ও বিশেষ সম্মানের সাথে দূতদের ফেরত পাঠান। সেই সময় থেকে দিল্লী ও বাংলা রাজ্যদ্বয়ের সীমানা স্থির হয় ; এবং দিল্লীর সম্রাটগণ সন্ধিচুক্তি মোতাবেক বাংলারাজ্যের শাসন-

কার্যে কখনো হস্তক্ষেপ করেন নাই। পারস্পরিক উপহার বিনিময়ের দ্বারা দুই রাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সংরক্ষিত হয়। পুনরায় ৭৫৮ হিজরীতে সুলতান শামসুদ্দীন বহু উপহারসহ মালিক তাজুদ্দীন ও কয়েকজন আমীরকে দূতস্বরূপ দিল্লী প্রেরণ করেন। ফিরোজ শাহ এই দূতদের পূর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান প্রদর্শন করেন এবং মালিক সয়েফুদ্দীন শাহনাফিকের অধীনে অনেকগুলি আরবী ও তুর্কী-ঘোড়া এবং অন্যান্য মূল্যবান উপহার প্রতিদানস্বরূপ প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে বাংলায় সুলতান শামসুদ্দীনের মৃত্যু হয়।[১৩] মালিক তাজুদ্দীন ও মালিক সয়েফুদ্দীন বিহার পর্যন্ত পৌঁছে সুলতান শামসুদ্দীনের মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পান। মালিক সয়েফুদ্দীন এই সংবাদ দিল্লীতে প্রেরণ করেন এবং সম্রাটের আদেশ অনুসারে বিহারে অবস্থিত বাদশাহী সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে ঘোড়া ও উপহারগুলি তাদের মধ্যে ভাগ করে দেন। মালিক তাজুদ্দীন বাংলায় ফিরে আসেন। শামসুদ্দীন ষোল বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করেছিলেন।

শামসুদ্দীনের পুত্র সিকান্দার শাহের রাজত্ব

সুলতান শামসুদ্দীন ভাংড়া এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার তিন দিন পরে আমীরগণ ও সেনাপতিগণের সম্মতি অনুযায়ী সিকান্দার শাহ বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সুবিচার ও বদান্যতার দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ করেন। সুলতান ফিরোজ শাহকে সন্তুষ্ট রাখা সুবিধাজনক গণ্য করে তিনি উপহারস্বরূপ তাঁর নিকট পঞ্চাশটি হাতী ও অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে ৭৬০ হিজরীতে তিনি বাংলারাজ্য অধিকার করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন।[১৪] তিনি জাফরাবাদ পৌঁছানোর পর বর্ষা আরম্ভ হয়।[১৫] সম্রাট সেখানে শিবির স্থাপন করতঃ সিকান্দার শাহের নিকট দূত

প্রেরণ করেন। সিকান্দার শাহ দিল্লীর সম্রাটের অভিপ্রায় সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন; এই সময় ফিরোজ শাহের দূতগণ উপস্থিত হন। সিকান্দার শাহ তাঁর দেহরক্ষীকে পাঁচটি হাতী ও অন্যান্য উপহারসহ প্রেরণ করেন এবং শান্তির জন্য আলোচনা আরম্ভ করেন; কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। বর্ষার মওসুম শেষ হওয়ার পর সুলতান ফিরোজ শাহ লখনৌতি অভিমুখে যাত্রা করেন। যখন সুলতান পাণ্ডুয়ার আশেপাশে শিবির স্থাপন করেন, তখন সিকান্দার শাহ বুঝতে পারলেন যে, তাঁর শক্তি সম্রাটের তুল্য নয়। তখন তিনি পিতার কৌশল অনুসরণ করেন ও একডালা দুর্গে শিবির স্থাপন করেন। ফিরোজ শাহ প্রবলভাবে অবরোধ করেন। যখন দুর্গস্থ সৈন্যগণের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে তখন সিকান্দার শাহ চল্লিশটি হাতী, অন্যান্য দ্রব্য, মূল্যবান উপহার ও দুর্লভ সামগ্রী প্রেরণ করেন এবং বাৎসরিক কর দেয়ার অঙ্গীকারে সন্ধি প্রার্থনা করেন। ফিরোজ শাহ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে দিল্লী ফিরে যান। অতঃপর কয়েক বৎসর সিকান্দার শাহ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ৭৬৬ হিজরীতে তিনি আদিনা মসজিদ[১৬] তৈরী করেন; কিন্তু নির্মাণকার্য শেষ হওয়ার পূর্বেই তার মৃত্যু হওয়ায় মসজিদ অর্ধসমাপ্ত থাকে। পাণ্ডুয়া শহর থেকে এক ক্রোশ দূরে এই মসজিদের কিছু কিছু চিহ্ন এখনো আছে। এই গ্রন্থকার তা দেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে মসজিদটি সুন্দর ও নির্মাণকার্যে বিপুল অর্থ নিশ্চয়ই ব্যয়িত হয়েছে। এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। কথিত হয় যে, সিকান্দার শাহের প্রথম স্ত্রীর গর্ভে সতেরটি পুত্র জন্মেছিল এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত মাত্র একটি পুত্র ছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র গিয়াসুদ্দীন মার্জিত আচরণ ও অন্যান্য গুণে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। শাসনকার্যেও তিনি দক্ষ ছিলেন। এই কারণে, প্রথমা স্ত্রী ঈর্ষা ও হিংসাপরায়ণা হয়ে গিয়াসুদ্দীনকে ধ্বংস করার সুযোগ সন্ধান করছিলেন। একদিন সুযোগ লাভ করে তিনি বুকের উপর হাত রেখে সুলতানের নিকট ইচ্ছা প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বেগমের আচরণ থেকে তাঁর উদ্দেশ্য অনুমান ক'রে সুলতান বললেন, "যা বলতে চাও বল।" বেগম বললেন, "আমার ইচ্ছা

পূরণ করার জন্য সুলতান যদি প্রতিশ্রুতি দেন ও তা পূরণের চেষ্টা করেন, তবে আমি বলতে পারি।" সুলতান প্রতিশ্রুতি দেন ও কিঞ্চিত ফাঁক রাখার জন্য বলেন, "তোমার অন্তরের বাসনা ব্যক্ত কর এবং তোমার ওষ্ঠ তোমার অন্তরের ধূলির আয়না (আর্শি) হোক।" চতুর রানী বললেন, "গিয়াসুদ্দীনের ব্যবহারে আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। সে সুলতানকে ও আমার পুত্রদের হত্যা ক'রে সিংহাসন দখল করার মতলব করছে। যদিও সে আমার পুত্রতুল্য এবং আমি তার মৃত্যু চাই না, তথাপি সুলতানের জীবনের নিরাপত্তা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। সেইজন্য আপনার অসতর্ক হওয়া উচিত নয় ও আগে থেকেই দুর্দৈবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে, হয় আপনি তাকে কারারুদ্ধ করুন, অথবা অন্ধ ক'রে দিন।" সুলতান এই কথা শুনে বিচলিত হয়ে বললেন, "কি তোমার উদ্দেশ্য যা আমার মঙ্গলের সাথে মিশ্রিত করেছ? আর, কি তোমার এই ঈর্ষার অগ্নি যা আমার উপকারের সাথে মিশ্রিত করেছ? তোমার লজ্জা করে না যে, তোমার সতেরটি পুত্র আছে এবং ঐ দুর্বল (বা শীর্ণকায়া) মহিলার আছে মাত্র একটি সন্তান। তুমি নিজের জন্য যা চাও না, অন্যদের জন্যও তা ইচ্ছা করো না।" রানী পুনরায় উদ্বিগ্নভাবে বললেন, "আমার এই প্রস্তাবের সাথে হিংসা বা ঈর্ষার কোনই সম্পর্ক নেই। আপনার মঙ্গলের জন্য যা অবশ্য প্রয়োজন মনে করেছি, তাই আমি বলেছি; এরপর আমার প্রভু (বা রাজা) যা ইচ্ছা তা করবেন।" সুলতান জিভের দ্বারে তালাবদ্ধ ক'রে নীরব হয়ে রইলেন এবং নিজের মনে ভাবলেন, "যেহেতু গিয়াসুদ্দীন কর্তব্যপরায়ণ পুত্র ও তার শাসন করার ক্ষমতা আছে, সেইহেতু সে যদি আমার জীবন নেয় (অর্থাৎ, হত্যা করে), তবে তাই হোক। পুত্র যদি কর্তব্যপরায়ণ হয়, সেটা তো আনন্দের কথা। আর, যদি সে কর্তব্যপরায়ণ না হয়, তবে সে ধ্বংস হোক।" এরপর তিনি শাসনভার সম্পূর্ণরূপে গিয়াসুদ্দীনের হাতে ছেড়ে দেন। কিন্তু, গিয়াসুদ্দীন রানীর চাতুর্য ও কূটকৌশল সম্বন্ধে সর্বদা

সন্নিহান ছিলেন। একদিন শিকারের অজুহাতে তিনি সোনারগাঁয়ে চলে যান এবং অল্পদিনের মধ্যে বৃহৎ সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ ক'রে তিনি পিতার নিকট সিংহাসন দাবী করেন। অব্যবহিত পরে রাজ্য ছিনিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি সোনারগাঁও থেকে বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ যাত্রা করেন ও সোনারগাড়িতে:[৭] শিবির স্থাপন করেন। অন্যপক্ষ থেকে পিতাও এক শক্তিশালী বাহিনীসহ অগ্রসর হলেন। পরদিন গোয়াল-পাড়ার:[৮] যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষ যুদ্ধের জন্য সৈন্য সজ্জিত করলেন।

পুত্র পিতার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়েছিলেন ঃ
বিচলিত অন্তর থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিলো।
পিতা দয়া ও স্নেহের বন্ধন ছিন্ন ক'রে ফেললেন ঃ
বলতে পারো, ভালবাসা পৃথিবী থেকে
অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

যদিও গিয়াসুদ্দীন সৈন্যদের ও সেনাপতিদের বড়জোর সুলতানকে বন্দী করার জন্য কঠোর আদেশ দিয়েছিলেন, তথাপি নিয়তির ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। গিয়াসুদ্দীনের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ অজান্তে সিকান্দার শাহকে হত্যা করে। হত্যাকারী তখনো তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিল ; সেই সময় একজন জিজ্ঞাসা করলো, 'কে তাঁকে হত্যা করেছে ?' সে বললো, 'আমি হত্যা করেছি।' অন্য লোকটি বললো, "সুলতান সিকান্দারের জন্য তোমার একটুও দয়া হ'ল না ?" তখন উভয়ে ভীত হয়ে গিয়াসুদ্দীনের নিকট গিয়ে বলে, "যদি অস্ত্র সংযত করার জন্য আমাদের নিহত হওয়ার আশংকা থাকে, তা'হলে আমরা কি তাঁকে হত্যা করতে পারি ?" গিয়াসুদ্দীন বললেন, "নিশ্চয়ই তোমরা পারো।" অতঃপর কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে তিনি বললেন, "স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তোমরা সুলতানকে মেরে ফেলেছ।" হত্যাকারী বললো, "হ্যাঁ, আমি না জেনে রাজার বুকে বর্শা বিদ্ধ করেছি। এখনো তাঁর জীবনের কিছু চিহ্ন আছে।" গিয়াসুদ্দীন দ্রুত সেখানে গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পিতার মস্তক কোলের উপর নিলেন ; তাঁর চোখ থেকে অশ্রু পড়তে লাগলো এবং তিনি বললেন, "পিতা, চোখ খুলুন : আপনার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা প্রকাশ করুন যাতে

আমি তা পূর্ণ করতে পারি।" সুলতান চোখ খুলে বললেন, "আমার জীবনের কাজ শেষ হয়েছে ; এখন রাজ্য তোমাকে আহ্বান করছে।

তুমি তোমার রাজত্বকালে যেনো উন্নতি করতে পারো,
এখন আমি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।"

এই কথা বলতে বলতে তাঁর আত্মা-পাখী উড়ে গেল। আর অপেক্ষা ক'রে লাভ নেই দেখে গিয়াসুদ্দীন কয়েকজন আমীরকে পিতার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার জন্য মোতায়েন ক'রে নিজে পাণ্ডুয়া গিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সিকান্দার শাহ[১৯] ন'বছর কয়েক মাস রাজত্ব করেছিলেন। তিনি আউলিয়া আলা-উল-হকের[২০] সমসাময়িক ছিলেন।

সিকান্দার শাহের পুত্র গিয়াসুদ্দীনের রাজত্বকাল[২১]

সিকান্দার শাহকে দাফন করার পর বাংলার সিংহাসনে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আরোহণ করায় (সিংহাসন) বিশেষ গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে। প্রথমে তিনি বৈমাত্রেয় ভাইদের অন্ধ ক'রে তাদের মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেন ও এইরূপে নিজ সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেন। অতঃপর তিনি সুবিচার করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে আজীবন শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ছিলেন। কথিত হয় যে, একবার সুলতান গিয়াসুদ্দীন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হন ; জীবনের আশা ছিল না। তখন তিনি হেরেমের তিনটি দাসীকে মৃত্যুর পর তাঁকে গোসল দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাদের একজনের নাম 'সরভ' ; দ্বিতীয়টির নাম 'গুল' ও তৃতীয়টির নাম 'লালা'। আল্লার কৃপায় রোগমুক্ত হওয়ার পর তিনি শুভচিহ্নস্বরূপ গণ্য ক'রে অন্যদের অপেক্ষা এদের প্রতি বেশী মনোযোগ দেন। (মৃত্যু অন্তে) গোসল করানো নিয়ে অন্য দাসীরা এদের ঠাট্টা করতো। একদিন সুলতানের মেজাজ যখন ভাল ছিল সেই সময় এরা বিষয়টি তাঁর নিকট বর্ণনা করে। সুলতান নিম্নোক্ত চরণটি বলেন :

"সাকী, এ হচ্ছে সরভ (সাইপ্রেস—এক প্রকার বৃক্ষ),
গুল (গোলাব) ও লালার (এক প্রকার সুন্দর ফুলের) গল্প।"

কিন্তু এই কবিতার দ্বিতীয় চরণটি সুলতান অথবা সভার অন্য কোনো কবি পূরণ করতে পারেন নাই। তারপর, সুলতান এই ছত্রটি লিখে সিরাজের শামসুদ্দীন হাফিজের নিকট দূত মারফত প্রেরণ করেন।[২১] হাফিজ ত্বরিত পরবর্তী চরণ পূরণ করেন:

"এই গল্প তিন জন গোসল দায়িনী সম্পর্কে"

এই দ্বিতীয় ছত্রেও কৌশলপূর্ণ শ্রেয়তার অভাব নেই এবং তিনি (হাফিজ) আর একটি নিজের গজল পাঠান। প্রতিদানে সুলতান তাঁকে মূল্যবান উপহার পাঠিয়েছিলেন। সেই গজল থেকে নিম্নোক্ত চরণগুলি উদ্ধৃত হল:

"হিন্দুস্তানের সকল তোতা পাখী চিনি ঝরাবে
পারস্যের এই মিছরী যা বাংলায় যাচ্ছে।
হাফিজ, সুলতান গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গলাভের জন্য
বিরত থেকো না; কারণ তোমার এই
গীতি-কবিতা বিলাপের ফল[২৩]

মোটের উপর, সুলতান গিয়াসুদ্দীন একজন সুশাসক ছিলেন এবং পবিত্র আইনের নির্দেশ তিনি কঠোরভাবে পালন করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কথিত হয় যে, একদিন তীর ছোড়া অভ্যাস করার সময় সুলতানের একটি তীর দৈবক্রমে এক বিধবার পুত্রকে আঘাত করে। বিধবা কাজী সিরাজুদ্দীনের নিকট এর প্রতিকার প্রার্থনা করে। কাজী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কারণ, যদি তিনি সুলতানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন, তা'হলে তিনি আল্লাহর দরবারে দোষী হবেন, এবং যদি তিনি তা না করেন তবে সুলতানকে হাজির হতে বলাও কঠিন হবে। অনেক চিন্তার পর তিনি সুলতানকে তলব করার জন্য একজন পেয়াদা পাঠালেন এবং নিজে বিচারাসনে বসলেন ও মসনদের নীচে একটি বেত রাখলেন। কাজীর পেয়াদা প্রাসাদে পৌঁছে সুলতানের নিকটস্থ হওয়া অসম্ভব দেখে আযান দিতে আরম্ভ করে। অসময়ে আযানধ্বনি শুনে সুলতান মোয়াজ্জিনকে তাঁর সামনে উপস্থিত করতে হুকুম দিলেন। চাকররা তাকে সুলতানের সামনে উপস্থিত করার পর তিনি এই প্রকার অসময়ে আযান দেয়ার

কারণ জিজ্ঞাসা করেন। পেয়াদা বললো, "আপনাকে বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজী সিরাজুদ্দীন আমাকে পাঠিয়েছেন। সুলতানের নিকটস্থ হওয়া অসম্ভব দেখে আমি এই কৌশল অবলম্বন করেছি। এখন আপনি উঠুন, আপনাকে আদালতে হাজির হ'তে হবে। আপনি যে বিধবার পুত্রকে জখম করেছেন, সে-ই হচ্ছে ফরিয়াদী।" সুলতান তৎক্ষণাৎ উঠলেন ও একটি ক্ষুদ্র তরবারি বগলের মধ্যে লুকিয়ে নিলেন ও আদালতে যাত্রা করলেন। কাজীর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার পর কাজী সুলতানের প্রতি কোন প্রকার সম্ভ্রম না দেখিয়ে বললেন, "এই বৃদ্ধাকে সন্তুষ্ট করুন।" সুলতান তাঁর নিজস্ব পন্থায় স্ত্রীলোকটিকে সন্তুষ্ট করলেন ও বললেন, "কাজী, বৃদ্ধা এখন সন্তুষ্ট হয়েছে।" কাজী বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ক্ষতিপূরণ পেয়েছ ও সন্তুষ্ট হয়েছ?" স্ত্রীলোকটি বললো, "হ্যাঁ, আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।"[২৭] অতঃপর কাজী সানন্দে উঠে সুলতানকে সম্মান প্রদর্শন করেন ও মসনদে বসান। সুলতান বগলের মধ্য থেকে তলোয়ার বে'র ক'রে বললেন, "কাজী, পবিত্র আইনের বিধান অনুযায়ী আমি আপনার আদালতে উপস্থিত হয়েছি। আপনি যদি আইনের বিধানের এক চুল ব্যতিক্রম করতেন তা'হলে এই তরবারি দ্বারা আমি আপনার শিরশ্ছেদ করতাম—আল্লার নিকট শুকরিয়া যে, সব ঠিকমত হয়ে গেলো।" কাজীও মসনদের নীচে থেকে বেত বে'র ক'রে বললেন, "যদি আজ আমি আপনাকে আল্লার পবিত্র আইনের বিধান বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করতে দেখতাম, তা'হলে এই বেতের আঘাতে আপনার পিঠ লাল ও কালো করতাম।"[২৫] আবো বললেন, "একটা বিপর্যয় উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু ভালয় ভালয় মিটে গেলো।"[২৬]

সুলতান সন্তুষ্ট হয়ে কাজীকে উপহার দিয়ে ফিরে আসেন। আউলিয়া নূরে কুত্‌ব্‌-উল-আলম সুলতানের সমসাময়িক ও সহপাঠী ছিলেন। তাঁর উপর গোড়া থেকেই সুলতানের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। উভয়েই শেখ হামিদউদ্দীন কুঞ্জনশীন নগোরির[২৭] নিকট শিষ্যত্ব লাভ করেছিলেন। পরিশেষে ৭৭৫ হিজরীতে উক্ত অঞ্চলের জমিদার রাজা কংশের কুটকৌশলে সুলতানকে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হত্যা করা হয়।

গিয়াসুদ্দীন সাত বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করেছিলেন। অন্য মতে, তিনি ষোল বৎসর পাঁচ মাস তিন দিন রাজত্ব করেছিলেন।[২৮]

সুলতান-উস-সালাতীন উপাধিধারী সয়েফুদ্দীনের রাজত্বকাল

যখন সুলতান গিয়াসসুদ্দীন সংকীর্ণ মানবদেহ থেকে আত্মার বিস্তৃত শূন্যে চলে যান, তখন ওমরাহ ও সেনাপতিগণ তাঁর পুত্র সয়েফুদ্দীনকে সুলতান-উস-সালাতীন উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান।

একজন চলে যায়, অন্যজন আসে তার স্থানে
পৃথিবী কখনো প্রভুশূন্য থাকে না।

তিনি সংযত-চরিত্র, বদান্য ও সাহসী ছিলেন। তিনি দশ বৎসর বাংলায় রাজত্ব করেন। ৭৮৫ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। কারো কারো মতে তিনি তিন বৎসর সাত মাস পাঁচ দিন রাজত্ব করেছিলেন। কোন্‌টা সত্য আল্লাহ জানেন।

সুলতান-উস-সালাতীনের পুত্র শামসুদ্দীনের[২৯] রাজত্ব

সুলতান-উস-সালাতীনের মৃত্যুর পর সভাসদ, পরামর্শদাতা ও সরকারী কর্মচারীদের অনুমোদন অনুযায়ী তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রাচীন প্রথানুযায়ী সিংহাসনের অধিকারী হওয়ার সমস্ত উৎসব পালন করেন ও কিছুদিন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে অতিবাহিত করেন। ৭৮৮ হিজরীতে স্বাভাবিক রোগ অথবা রাজা কংশের কুট-কৌশলের জন্য তাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় রাজা কংস অত্যন্ত শক্তি-শালী হয়ে উঠেছিলেন। কেউ কেউ লিখেছেন যে, শামসুদ্দীন প্রকৃত-পক্ষে সুলতান-উস-সালাতীনের আপন পুত্র ছিলেন না—পালক পুত্র ছিলেন ও তাঁর নাম ছিল শাহাবুদ্দীন। যাইহোক, তিনি তিন বৎসর

চার মাস ছ'দিন রাজত্ব করেছিলেন। সত্য ঘটনা এই যে, ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা কংস[৩০] তাঁকে আক্রমণ ক'রে হত্যা করেন ও সিংহাসন দখল করেন।

জমিদার রাজা কংস কর্তৃক সিংহাসন অধিকার[৩১]

সুলতান শামসুদ্দীনের মৃত্যুর পর রাজা কংস নামক একজন হিন্দু জমিদার সমগ্র বাংলা অধিকার ক'রে সিংহাসন দখল করেন এবং অত্যাচার করতে থাকেন। মুসলমানদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে তিনি বহুসংখ্যক আলেম ও দরবেশকে হত্যা করেন। রাজ্য থেকে ইসলাম-ধর্ম নির্মূল করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কথিত হয়, একদিন শেখ মুঈনুদ্দীন আব্বাসের পিতা শেখ বদরুল ইসলাম তাকে (কংসকে) অভিবাদন না করেই তাঁর সামনে বসেছিলেন। তাতে তিনি (কংস) জিজ্ঞাসা করেন, "শেখ, কেন আপনি আমাকে অভিবাদন করেননি?" শেখ বললেন, "বিদ্বান ব্যক্তিদের পক্ষে পৌত্তলিকদের সালাম করা শোভন নয়—বিশেষতঃ তোমার মতো নিষ্ঠুর ও রক্ত-লিপ্সু বিধর্মী—যে মুসলমানদের রক্তপাত করছে।" এই কথা শুনে সেই অপবিত্র পৌত্তলিক নীরব হয়ে রইল ও সাপের মতো কুণ্ডলী পাকাতে লাগলো এবং তাঁকে হত্যা করার মতলব করলো। একদিন কংস একটি নীচু ও সংকীর্ণ দ্বার-বিশিষ্ট কক্ষে বসে শেখকে ডেকেছিল। শেখ পৌঁছে রাজার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আগে পা ঘরের মধ্যে দিয়ে পরে মস্তক নত না ক'রে কক্ষে প্রবেশ করেন। পৌত্তলিক ক্রোধান্ধ হয়ে শেখকে তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে সান্নিবদ্ধ ক'রে দাঁড় করাবার আদেশ দিল। তৎক্ষণাৎ শেখকে হত্যা করা হয় এবং অন্য আলেমদের নৌকাযোগে নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে দেয়া হয়। এই পৌত্তলিকের অত্যাচারে ও মুসলমানদের হত্যায় ধৈর্যহারা হয়ে আউলিয়া নূরে কুত্‌ব্‌-উল-আলম সুলতান ইবরাহীম শর্কীকে[৩২] পত্র লেখেন। ইবরাহীম শর্কী তখন বিহারের প্রান্তসীমা

পর্যন্ত অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। আউলিয়া পত্রে লিখেছিলেন, "কংস নামক এই দেশের শাসনকর্তা বিধর্মী পৌত্তলিক। সে অত্যাচার ও রক্তপাত করছে। সে বহুসংখ্যক আলেম ও দরবেশকে হত্যা করেছে ও তাদের ধ্বংস করেছে। এখন অবশিষ্ট মুসলমানদের হত্যা করা ও এদেশ থেকে ইসলামধর্ম নির্মূল করা তার উদ্দেশ্য। যেহেতু মুসলমানদের সাহায্য ও রক্ষা করা মুসলমান বাদশাহদের অবশ্য কর্তব্য—এই দেশের অধিবাসীদের (মঙ্গলের) জন্য ও আমাকে কৃতজ্ঞ করার জন্য এবং অত্যাচারীর পীড়ন থেকে মুসলমানদের উদ্ধার করার জন্য আমি এখানে আপনার শুভাগমণ প্রার্থনা করি। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।" যখন এই পত্র সুলতান ইবরাহীমের নিকট পৌঁছায় তখন তিনি অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সেটা খুলে পড়লেন। কাজী শাহাবুদ্দীন জৌনপুরী[৩৩] তৎকালের আলেমদের মধ্যে প্রধান ছিলেন; সুলতান ইবরাহীম তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতেন ও শুভকার্যের সময় তাঁকে একটি রৌপ্যনির্মিত আসনে বসাতেন। কাজী সাহেবও সুলতানকে অত্যন্ত প্ররোচিত করেন ও বলেন, "আপনার তাড়াতাড়ি যাত্রা করা উচিত। কারণ, এই আক্রমণ দ্বারা পার্থিব ও ধর্মীয় উপকার আপনি লাভ করবেন। যথা: বাংলাদেশ জয় করা হবে এবং পার্থিব ও পরকালীন উপকারের উৎস আউলিয়া শেখ নূরে কুত্‌ব্‌-উল-আলমের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হবে; এবং মুসলমানদের উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়ে একটি ধর্মীয় কার্যও সম্পন্ন করবেন।" সুলতান ইবরাহীম শিবির ভেঙ্গে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হলেন এবং দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীসহ বাংলায় পৌঁছালেন ও ফিরোজপুরে[৩৪] শিবির স্থাপন করলেন। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর রাজা কংস হতভম্ব হয়ে আউলিয়া নূরে কুত্‌ব্‌-উল-আলমের নিকট উপস্থিত হলেন। বশ্যতা স্বীকার ক'রে বিনীতভাবে কাঁদতে কাঁদতে রাজা বললেন, "এই পাপীর অপরাধের খাতায় লেখার উপর মার্জনার কলম চালনা করুন এবং সুলতান ইবরাহীমকে এই দেশ অধিকার করা থেকে বিরত করুন।" আউলিয়া উত্তর দিলেন, "একজন অত্যাচারী বিধর্মী পৌত্তলিকের জন্য আমি একজন মুসলমান সুলতানের নিকট

অনুরোধ করতে পারব না—বিশেষতঃ যিনি আমার ইচ্ছা ও অনুরোধে এসেছেন।" নিরাশ হয়ে কংস আউলিয়ার পদতলে মস্তক রাখলেন ও বললেন, "আউলিয়া যা বলেন আমি তাই করব।" আউলিয়া বললেন, "যতক্ষণ তুমি ইসলামধর্ম গ্রহণ না কর, ততক্ষণ আমি তোমার পক্ষে কোনো কথা বলতে পারব না।" কংস রাজী হলেন; কিন্তু তাঁর স্ত্রী এই বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে ইসলামধর্ম গ্রহণে বিরত করেন। অবশেষে কংস তাঁর বারো বৎসর বয়স্ক পুত্র যদুকে আউলিয়ার সম্মুখে উপস্থিত ক'রে বললেন, "আমি বৃদ্ধ হয়েছি ও পার্থিব কার্য থেকে অবসর নিতে চাই। আপনি আমার এই পুত্রকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত ক'রে বাংলারাজ্য তাকে দিতে পারেন।" আউলিয়া কুত্‌ব্‌-উল আলম নিজের মুখ থেকে চিবুনো সুপারি বের ক'রে যদুর মুখে দিলেন এবং কলেমা পড়িয়ে তাকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করলেন ও তার নাম রাখলেন জালালুদ্দীন। এই সংবাদ সর্বত্র প্রচার ক'রে রাজ্যে তার নামে খোতবা পাঠের নির্দেশ দিলেন। সেইদিন থেকে আবার বাংলায় মুসলমানী আইন জারী হল। অতঃপর, আউলিয়া কুত্‌ব্‌-উল-আলম সুলতান ইবরাহীমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান ও দুঃখ প্রকাশ ক'রে তাঁকে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন। সুলতান এই অনুরোধে বিরক্ত হয়ে কাজী শাহাবুদ্দীনের দিকে তাকালেন। কাজী বললেন, "আউলিয়া, সুলতান আপনার তলবে এসেছেন; এখন আপনি আবার কংসের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করছেন মনে হয়। আপনার উদ্দেশ্য কি?" আউলিয়া বললেন "সেই সময়, (যখন আমি আসতে তলব করেছিলাম) একজন অত্যাচারী শাসনকর্তা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছিল। এখন সুলতানের শুভাগমনের ফলে সে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে। জেহাদ (পবিত্র যুদ্ধ) বিধর্মীদের বিরুদ্ধে পরিচালনার নির্দেশ আছে—মুসলমানদের বিরুদ্ধে নয়।" কাজী এর জওয়াব দিতে না পেরে চুপ ক'রে রইলেন। কিন্তু, যেহেতু সুলতান রাগত হয়েছিলেন, সেইহেতু কাজী আউলিয়ার জ্ঞান ও অলৌকিক কার্যের পরীক্ষা করতে আরম্ভ করেন। অনেক প্রশ্নোত্তরের পর আউলিয়া বললেন, "আউলিয়াদের হেয় করার ও তাদের পরীক্ষা করার

চেষ্টা নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়। অধিক দিন গত হওয়ার পূর্বে আপনার দুঃখজনক অবস্থায় মৃত্যু হবে।" সেইসঙ্গে আউলিয়া সুলতানের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন। মোটের উপর, সুলতান বিরক্ত হয়ে জৌনপুর ফিরে যান। কথিত হয় যে, অল্পদিন পরেই সুলতান ইবরাহীম ও কাজী শাহাবুদ্দীনের মৃত্যু হয়।

"যে আউলিয়াদের সঙ্গে বিবাদ করে, সে দুঃখভোগ করে।"

রাজা কংস সুলতান ইবরাহীমের মৃত্যু-সংবাদ শুনে সুলতান জালালুদ্দীনকে অপসারিত ক'রে নিজেই আবার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মিথ্যা ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী রাজা কয়েকটি সোনার গরু তৈরী করান এবং জালালুদ্দীনকে গরুর মুখের দিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে পশ্চাদ্দিক দিয়ে টেনে বে'র করে নেন এবং এরপর গরুর মূর্তিগুলি ব্রাহ্মণদের দান করেন। এইরূপে তিনি তাঁর পুত্রকে আবার নিজ বিভ্রান্তিজনক মতে ধর্মান্তরিত করেন। কিন্তু, যেহেতু জালালুদ্দীন আউলিয়া কুত্‌ব্‌-উল-আলম কর্তৃক ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, সেইহেতু ইসামের উপর বিশ্বাস তিনি ত্যাগ করেন নাই; এবং বিধর্মীদের প্ররোচনা তাঁর অন্তরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। রাজা কংস পুনরায় পীড়ন আরম্ভ করেন ও মুসলমানদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করতে থাকেন। যখন তাঁর অত্যাচার সীমা অতিক্রম করে গেল, তখন একদিন আউলিয়া কুত্‌ব্‌-উল-আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার অত্যাচারীর নির্যাতন সম্বন্ধে পিতার নিকট অভিযোগ ক'রে বলেন, "দুঃখের বিষয় যে, এই সময় আপনার মতো একজন পবিত্র আউলিয়া থাকা সত্ত্বেও মুসলমানেরা বিধর্মীদের দ্বারা নিপীড়িত ও অত্যাচারিত হয়ে ধ্বংস হচ্ছে।" আউলিয়া তখন উপাসনা ও ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। পুত্রের মন্তব্য শুনে আউলিয়া ক্রুদ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন, "মাটি তোমার রক্তে রঞ্জিত হলেই তবে এই অত্যাচার বন্ধ হবে।" শেখ আনোয়ার উত্তমরূপে জানতেন যে, তাঁর পবিত্র পিতার মুখনিঃসৃত বাণী নিশ্চিত সত্য হবে এবং এক মুহূর্ত পরে বললেন, "আমাকে আপনি যা বললেন তা সঙ্গত ও যথার্থ। কিন্তু আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ জাহিদ সম্বন্ধে আপনার ইচ্ছা কি?"

আউলিয়া বললেন, "জাহিদের সদ্‌গুণের দামামা পুনরুত্থানের দিবস পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হবে।" মোটের উপর, রাজা কংস পূর্বাপেক্ষা অধিকতর অত্যাচার ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে থাকেন; ক্রমে আউলিয়ার নিজের চাকরদের ও প্রতিপালিত ব্যক্তিদের উপরও অত্যাচার করতে থাকেন; তাদের সম্পত্তি ও জিনিসপত্র লুঠ করেন এবং শেখ আনোয়ার ও শেখ জাহিদকে কারারুদ্ধ করেন। শেখ জাহিদ সম্বন্ধে আউলিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রাজা শুনেছিলেন। সেইজন্য তাঁকে হত্যা করতে সাহসী না হয়ে তাঁদের সোনারগাঁয়ে বহিষ্কার করেন এবং লুক্কায়িত সম্পদের সংবাদ তাঁদের নিকট থেকে নির্ধারণ ক'রে তাঁদের উভয়কে হত্যা করার আদেশ দেন। শেখদ্বয়েব সোনারগাঁয়ে পৌঁছানোর পর কংসের লোকেরা তাঁদের উপর নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করতে থাকে। কিন্তু যখন তাঁদের নিকট কোনো সন্ধান পেল না, তখন তারা প্রথমে শেখ আনোয়ারকে হত্যা করে। অতঃপর যখন তারা শেখ জাহিদকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন তিনি তাদের বলেন যে, একটি গ্রামে একটি বৃহৎ কড়াই লুক্কায়িত আছে। মাটি খুঁড়ে তারা মাত্র একটি স্বর্ণমুদ্রাসহ একটি কড়াই দেখতে পায়। তারা জিজ্ঞাসা করলো, "বাকী কি হল?" জাহিদ বললেন, "কেউ চুরি করেছে বলে মনে হয়।" এই ঘটনাটি একটি অলৌকিক ব্যাপারের ফল। কথিত হয়, যেদিন এবং ঠিক যে মুহূর্তে সোনারগাঁয়ের মাটি আনোয়ারের পবিত্র রক্তে রঞ্জিত হয়, সেই সময় রাজা কংসও নরকগামী হন। কোনো কোনে বিবরণীতে দেখা যায়, তাঁর পুত্র জালালুদ্দীনকে তিনি কারারুদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। জালালুদ্দীন চাকরদের সাহায্যে কংসকে হত্যা করেন। এই অত্যাচারী অধার্মিকের শাসনকাল ছিল সাত বৎসর।

রাজা কংসের পুত্র জালালুদ্দীনের রাজত্ব[৩৫]

অতঃপর জালালুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ ক'রে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তাঁর পিতার নীতির বিরুদ্ধে তিনি বহু

পৌত্তলিককে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন এবং যারা স্বর্ণ-নির্মিত গরু নিয়েছিল তাদের গো-মাংস খেতে বাধ্য করেন। সোনারগাঁও থেকে দরবেশ শেখ জাহিদকে ফিরিয়ে এনে তাঁর প্রতি সর্বপ্রকার সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তিনি প্রায়ই তাঁর নিকট যেতেন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করতেন। তাঁর রাজত্বকালে জনসাধারণ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিনাতিপাত করতো। কথিত হয়, তাঁর আমলে পাণ্ডুয়া শহর অবর্ণনীয়রূপে জনবহুল (বা সমৃদ্ধ) হয়েছিল। গৌড়ে তিনি একটি মসজিদ, একটি হাউজ, জালালী পুকুর ও পান্থনিবাস তৈরী করেছিলেন। তাঁর সময় গৌড় নগরী পুনরায় জনবহুল হয়ে ওঠে। তিনি সতের বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। ৮১২ হিজরীতে[৩৬] তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সমাধি-স্তম্ভে এখনো একটি বৃহৎ বুরুজ বিদ্যমান আছে। তাঁর বেগম ও পুত্রের সমাধি তাঁর সমাধি-স্তম্ভের পাশেই অবস্থিত।

জালালুদ্দীনের পুত্র আহমদ শাহের[৩৭] রাজত্ব

সুলতান জালালুদ্দীনকে সমাধিস্থ করার পর তাঁর পুত্র আহমদ শাহ আমীর ও সেনাপতিদের সম্মতি অনুসারে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত খিট্‌খিটে, অত্যাচারী ও রক্ত-লিপ্সু ছিলেন। অকারণে তিনি রক্তপাত করতেন এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের দেহ কাট্‌-তেন। যখন তাঁর অত্যাচার চরমে ওঠে এবং উচ্চ-নীচ সকলে তাঁর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন আমীরশ্রেণীভুক্ত তাঁর দু'জন গোলাম —শাদি খান ও নাসির খান ষড়যন্ত্র ক'রে আহমদ শাহকে হত্যা করে। এই ঘটনা ৮৩০ হিজরীতে ঘটেছিল। তিনি ষোল বছর রাজত্ব করেছিলেন—অন্য মতে আঠারো বছর।

গোলাম নাসির খানের রাজত্ব

আহমদ শাহ নিহত হওয়ার পর যখন সিংহাসন শূন্য হয়, তখন শাদি খান নাসির খানকে সরিয়ে নিজে রাজ্যের প্রধানকর্তা হওয়ার ইচ্ছা করেন। নাসির খান তার মতলব বুঝতে পেরে আগেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং শাদি খানকে হত্যা ক'রে সাহসের সহিত সিংহাসনে ব'সে হুকুম জারি করতে আরম্ভ করেন। আহমদ শাহের অনুসারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও মালিকগণ তার অধীনতা স্বীকার না ক'রে তাকে হত্যা করেন। তার রাজত্ব সাত দিন মাত্র স্থায়ী হয়েছিল ; এবং অন্য এক বিবরণী মতে মাত্র অর্ধ দিন।

নাসির শাহের রাজত্ব[৩৮]

যখন কুকাণ্ডের ফলস্বরূপ দাস নাসির খান নিহত হন তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ও সেনাপতিগণ একত্রিত হ'য়ে সুলতান শামসুদ্দীন ভাংড়ার এক পৌত্রকে নাসির শাহ নাম দিয়ে সিংহাসনে বসান। নাসির শাহের এই গুরুতর দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা ছিল। নাসির শাহ সুবিচার ও উদারতার সাথে কার্য পরিচালনা করায় যুবক বৃদ্ধ জনসাধারণ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিল এবং আহমদ শাহের বহুতরো অত্যাচারের আঘাত লোকে ভুলে যায়। এই উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সুলতান গৌড়ের প্রাসাদসমূহ ও দুর্গ তৈরী করেছিলেন। বত্রিশ বৎসর বাংলায় রাজত্ব করার পর তিনি তাঁর পূর্ববর্তী সুলতানদের মতো ধরাধাম ত্যাগ করেন। অন্য বিবরণী মতে তাঁর রাজত্বকাল সাতাশ বছরের অধিক ছিল না।

নাসিরুদ্দীনের পুত্র বরবক শাহের রাজত্ব[৩৯]

নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর বরবক শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বিচক্ষণ ও আইনানুগ নরপতি ছিলেন। তাঁর আমলে সৈন্যরা

সুখী ও সন্তুষ্ট ছিল এবং তিনি নিজেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন। ৮৭৯ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সতেরো বা ষোলো বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।

ইউসুফ শাহের রাজত্ব

বরবক শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যের আমীর ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্মতি অনুযায়ী তাঁর পুত্র ইউসুফ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নরম স্বভাবের সুলতান ছিলেন; প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন, এবং সৎ, বিদ্বান ও ধার্মিক ছিলেন। তিনি সাত বৎসর ছয় মাস রাজত্ব করেন ও ৮৮৭ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪০]

ইউসুফ শাহের পুত্র ফতেহ শাহের রাজত্ব

ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ[৪১] সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর একটু পাগলামির সিট্ ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য পরিচালনার যোগ্যতা তার না থাকায় আমীর ও অন্য নেতৃবৃন্দ সেইদিনই তাকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং ফতেহ শাহ নামক ইউসুফ শাহের অন্য এক পুত্রকে সিংহাসনে বসান। ইনি বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ছিলেন। অতীতের শাসনকর্তা ও সুলতানদের প্রথা বিচক্ষণতার সাথে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত পদানুযায়ী মর্যাদা দান ও প্রজাদের সম্বন্ধে উদার নীতি অবলম্বন করেন। তাঁর রাজত্বকালে প্রজাদের সামনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দ্বার মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। তখন বাংলায় একটা প্রথা চালু ছিল যে, প্রত্যেক রাত্রে পাঁচ হাজার পাইক উপস্থিত হয়ে গান-বাজনা করতো এবং রাজা সকালে কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে তাদের

সালাম নিতেন ও তাদের বিদায় হওয়ার অনুমতি দিতেন। তারপর আর এক নতুন পাইকের দল তাদের পরিবর্তে উপস্থিত হ'ত। ফতেহ শাহের খোজা বারবাগ পাইকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এবং ফতেহ শাহকে হত্যা করে। ৮৯৬ হিজরীতে এই[৪২] ঘটনা ঘটেছিল। ফতেহ শাহ সাত বৎসর পাঁচ মাস রাজত্ব করেছিলেন।

সুলতান শাহজাদা উপাধিধারী খোজা বারবাগের রাজত্ব

বিশ্বাসঘাতক দুষ্ক্রিয়াকারী খোজা বারবাগ নিজ প্রভুকে হত্যা ক'রে সেই প্রবাদবাক্য অনুযায়ী নিজেই সিংহাসনে বসলো—

'যখন জঙ্গলে অন্য পশু থাকে না, তখন শিয়ালও সিংহের মেজাজ দেখায়।'

সে সুলতান শাহজাদা উপাধি গ্রহণ করেছিল। সে সব স্থান থেকে খোজাদের জমায়েত করেছিল এবং বিধর্মী বা নীচু লোকদের মোটা পুরস্কার দিয়ে তাদেরে নিজের পক্ষভুক্ত ক'রে নিজের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করেছিল। কেবল তার সমপর্যায়ের লোকেরাই তার অধীনতা স্বীকার করছে দেখে সে উচ্চ ও প্রভাবশালী আমীরদের ধ্বংস করার চেষ্টা করছিলো। আমীরদের মধ্যে প্রধান হাবসী (আবিসিনীয়) মালিক আন্দিল সীমান্ত অঞ্চলে ছিলেন। খোজার মতলবের সংবাদ পেয়ে খোজাকে হত্যা ক'রে নিজ যোগ্য পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার মতলব করেন। এই সময় ভাগ্যাহত খোজা কৌশলে মালিক আন্দিলকে কারারুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তাঁকে তলব করার মতলব করছিলো। মালিক আন্দিল তার তলব করার প্রকৃত উদ্দেশ্য আন্দাজ করেন এবং বহু অনুচরসহ খোজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। মালিক দরবারে প্রবেশ ও নির্গমনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করায় খোজা নিজের মতলব

কার্যকরীকরণে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। ফলে একদিন খোজা ভোজের আয়োজন করেও মালিক আন্দিলের প্রতি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা দেখায় এবং পবিত্র কুরআন রেখে তাঁকে বলে, "এই পবিত্র পুস্তকের উপর হাত রেখে বলুন যে, আপনি আমার কোনো ক্ষতি করবেন না।" মালিক আন্দিল প্রতিজ্ঞা করলেন, "যতদিন আপনি সিংহাসনে থাকবেন ততদিন আমি ক্ষতি করব না।" সকলেই এই দুষ্ক্রিয়াকারী খোজাকে ধ্বংস করার মতলব করছিল; মালিক আন্দিলও তাঁর উপকারীর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার মতলব করছিলেন এবং দ্বার-রক্ষীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে সুযোগ খুঁজছিলেন। এক রাত্রে যখন সেই দুষ্ক্রিয়াকারী অতিরিক্ত মদ্যপানে অজ্ঞান হয়ে সিংহাসনের উপর ঘুমিয়েছিল, সেই সময় দ্বার-রক্ষকেরা পথ দেখায় ও মালিক আন্দিল তাকে হত্যা করার জন্য হারেমে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাকে সিংহাসনের উপর ঘুমাতে দেখে প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সেই দুষ্ক্রিয়াকারীর উপর তখন বিধাতার অমোঘ আদেশ হয়েছিল—তাকে সিংহাসনের গর্ব থেকে অবজ্ঞার ধূলায় ঠেলে দিতে এবং অন্যের মাথায় মুকুট পরাতে—সেইজন্য মাতাল অবস্থায় সে সিংহাসন থেকে নিচে পড়ে যায়। এই ঘটনায় মালিক আন্দিল আনন্দিত হয়ে তরবারি নিষ্কাশন করেন; কিন্তু তাকে আঘাত করতে পারেন নাই। সুলতান শাহজাদা এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে সামনে খোলা তলোয়ার দেখে মালিক আন্দিলকে জাপ্টে ধরে এবং শক্তিশালী হওয়ার দরুন ধস্তাধস্তিতে মালিক আন্দিলকে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর বসে। মালিক আন্দিল খোজার মাথার চুল জোর করে চেপে ধরেছিলেন এবং কিছুতেই ছাড়ছিলেন না। এই সময় ইউগ্‌রুশ খান কামরার বাহিরে দাঁড়িয়েছিলেন। মালিক আন্দিল চীৎকার ক'রে তাকে ডাকলেন। ইউগ্‌রুশ খান তুর্কী কয়েকজন হাবসীসহ তৎক্ষণাৎ কক্ষের মধ্যে প্রবেশ ক'রে মালিক আন্দিলকে খোজার নীচে দেখে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করতে ইতস্তত করছিলেন। ইতিমধ্যে কুস্তিগীরদ্বয়ের হাত ও পায়ের ধাক্কা লেগে আলো পড়ে নিভে গিয়ে ঘর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। মালিক আন্দিল চীৎকার ক'রে

ইউগ্‌রুশ খানকে বললেন, "আমি খোজার মাথার চুল ধরে আছি; তার দেহ এতই চওড়া ও মোটা যে, সে আমার উপর ঢালের মতো হয়ে আছে; তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে দ্বিধা করো না; কারণ, তার দেহ ভেদ ক'রে আমার পর্যন্ত তা পৌঁছাবে না; আর যদি পৌঁছায়ও তাতে আসে যায় না; কারণ, আমি ও আমার মতো লাখো লোক আমাদের মৃত প্রভুর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রাণ দিতে পারি।" ইউগ্‌রুশ খান সুলতান শাহজাদার পিঠে ও কাঁধে আস্তে আঘাত করেন। শাহজাদা মৃত্যুর ভান ক'রে পড়ে রইলো। তখন মালিক আন্দিল উঠে ইউগ্‌রুশ খান ও অন্য হাবসীদের সঙ্গে কক্ষের বাহিরে যান। তওয়াচিবাশি সুলতান শাহজাদার শয়নকক্ষে প্রবেশ ক'রে আলো জ্বালিয়ে দিল। সুলতান শাহজাদা তাকে মালিক আন্দিল মনে ক'রে আলো জ্বালবার পূর্বেই সিংহাসনে উঠ্‌তে না পারার ভয়ে মাটির তলার একটি ক্ষুদ্র কক্ষে পালিয়ে গিয়েছিল। তওয়াচিবাশি সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হয় ও সেখানে প্রবেশ করে। সুলতান শাহজাদা পুনরায় মৃতের ভান ক'রে পড়ে থাকে। বাশি চীৎকার ক'রে বললো, "দুঃখের বিষয় বিদ্রোহীরা আমার প্রভুকে হত্যা করেছে ও রাজ্যের সর্বনাশ করেছে।" সুলতান শাহজাদা তাকে নিজের একজন অনুগত লোক মনে ক'রে জোরে বললো, "দেখ, চেঁচিও না; আমি এখনো জীবিত আছি" এবং মালিক আন্দিল কোথায় জিজ্ঞাসা করলো। তওয়াচি বললো, "সুলতানকে নিহত করেছে মনে ক'রে সে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী গিয়েছে।" সুলতান শাহজাদা বললো, "যাও আমীরদের ডাকো ও মালিক আন্দিলকে হত্যা ক'রে তার মাথা আনতে বল; এবং সদর দরজায় পাহারা বসাও ও তাদের সতর্ক থাকতে বল।" হাবসী তওয়াচি বললো, "ঠিক আছে; আমি এবার গিয়ে এর পাকা ব্যবস্থা করছি।" বাহিরে এসে সে সমস্ত ব্যাপার মালিক আন্দিলকে বললো। মালিক আন্দিল তখন ফিরে গিয়ে ছোরার আঘাতে খোজাকে শেষ করেন এবং কক্ষের দরজায় তালা দিয়ে বাহিরে এসে উজীর খান

জাহানকে ডাকতে একজনকে পাঠান। উজীর আসবার পর তিনি (মালিক আন্দিল) একজন সুলতান নির্বাচনের জন্য পরামর্শসভার অধিবেশন করেন। ফতেহ শাহের পুত্রের বয়স তখন মাত্র দু'বছর হওয়ায় আমীরগণ তাকে সিংহাসনে বসাতে দ্বিধা বোধ করছিলেন। অবশেষে সকলে একমত হয়ে ফতেহ শাহের বিধবা রানীর নিকট গিয়ে রাত্রির ঘটনা ব্যক্ত করেন ও বলেন, "শাহজাদা এখনো শিশু; সেইজন্য শাহজাদা বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সরকারী কার্যাদি পরিচালনার জন্য কাউকে নিয়োগ করা আপনার উচিত।" তাদের উদ্বেগের কথা শুনে এর কি উত্তর দিতে হবে, রানী তা জানতেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ্র নামে আমি প্রতীক্ষা করেছিলাম, যে ব্যক্তি ফতেহ শাহের হত্যাকারীকে হত্যা করতে পারবে, তাকেই আমি এই রাজ্য দেবো।"[৪৩] মালিক আন্দিল প্রথমে রাজ্যের ভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে আমীরগণ একত্রিত হয়ে একমতে তাঁকে অনুরোধ করায় তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এক বিবরণী অনুসারে সুলতান শাহজাদা আট মাস রাজত্ব করেছিলেন; অন্যমতে মাত্র আড়াই মাস। সুলতান শাহজাদা সংক্রান্ত এই ঘটনার পর বাংলায় প্রথা চালু ছিল যে, যে-কোনো ব্যক্তিই শাসক সুলতানকে হত্যা ক'রে সিংহাসনে বসলে, সকলে বিনা প্রতিবাদে তার প্রতিই আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করবে।[৪৪] এক পুস্তিকায় প্রকাশ, সুলতান শাহজাদা ছয় মাস রাজত্ব করেছিলেন। কেবল আল্লাহ্ সত্য জানেন।

ফিরোজ শাহ উপাধিধারী হাবসী মালিক আন্দিলের রাজত্ব[৪৫]

যখন মালিক আন্দিল সৌভাগ্যবশতঃ বাংলার সুলতানরূপী বঁধূকে কোলে তুলে নিলেন, তখন তিনি ফিরোজ শাহ উপাধি গ্রহণ করেন

এবং গৌড়ে গিয়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সুবিচার ও উদারতার ক্ষেত্রে তিনি মহৎ প্রচেষ্টা করেন এবং প্রজাদের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করেন। আমীর থাকাকালে মালিক আন্দিল মহৎ ও বীরত্বব্যঞ্জক কার্যসমূহ সম্পন্ন করায় তাঁর সৈন্য ও প্রজারা তাঁকে ভয় করতো এবং বিরুদ্ধে যেতো না। উদারতা ও বদান্যতায় তিনি ছিলেন তুলনাহীন। পূর্বতন সুলতানরা বহু চেষ্টা ও কষ্ট ক'রে যে বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সে-সমস্ত দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করেন। কথিত হয়, এক সময় এক দিনে তিনি দরিদ্রের মধ্যে এক লক্ষ টাকা দান করেন। সরকারী কর্মচারীরা এই প্রকার অমিতব্যয়িতা পছন্দ করতেন না এবং পরস্পরের মধ্যে আলাপ করতেন, "বিনা পরিশ্রমে এই অর্থ হাতে পেয়েছে, তাই হাবসী এর মূল্য বুঝতে পারে না। কাজেই সেইরূপ শিক্ষা দেয়ার একটা উপায় আমাদের অবলম্বন করা উচিত যাতে সে অর্থের মূল্য বুঝতে পারে।" এরপর একদিন তাঁরা সমস্ত ধনদৌলত মেঝের উপর স্তূপীকৃত করলেন ; উদ্দেশ্য, সুলতান যাতে অর্থের পরিমাণ স্বচক্ষে দেখে ইহার মূল্য বুঝতে পারেন। সুলতান দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "এসব এখানে পড়ে আছে কেন?" কর্মচারীরা বললেন, "গরীবদের দেয়ার জন্য যা বরাদ্দ করেছেন, এ সেই অর্থ।" সুলতান বললেন, "এতে হবে কেন? এর সঙ্গে আর এক লাখ টাকা যোগ দাও।" সরকারী কর্মচারীরা হতভম্ব হয়ে সেই অর্থ ভিক্ষুকদের মধ্যে বিলি ক'রে দেন। তিন বৎসর রাজত্ব করার পর মালিক আন্দিল (ফিরোজ শাহ) অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তবে অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিবরণীতে প্রকাশ, ফিরোজ শাহ পাইকদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন। একটি মসজিদ, একটি উচ্চ-চুড়া ও একটি হাউস তিনি গৌড় নগরে তৈরী করেছিলেন।

ফিরোজ শাহের পুত্র সুলতান মাহমুদের রাজত্ব[৪৬]

ফিরোজ শাহ যখন অস্তিত্বহীনতার গোপন গৃহে চলে গেলেন,

তখন ওমরাহ ও উজীরগণ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহমূদকে সিংহাসনে বসালেন। হাবাশ খান নামক একজন হাবসী গোলাম অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রধান পরিচালক হলেন। সকল সরকারী কার্যে তাঁর প্রভাব ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। সুলতান উপাধি ব্যতীত মাহমূদ শাহের অন্য কোনোই ক্ষমতা ছিল না এবং তাঁকে এই ভাবেই দিনাতিপাত করতে হ'ত। অবশেষে সিদি বদর নামক অন্য একজন হাবসী এই পরিস্থিতিতে নিরাশ হয়ে হাবাশ খানকে হত্যা ক'রে নিজে সরকারী কার্যের পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে পাইকদের সৈনাধ্যক্ষের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে তিনি মাহমূদ শাহকে হত্যা করেন এবং পরদিন সকালে প্রাসাদের আমীর বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সম্মতি অনুযায়ী (এরা তাঁর দলের লোক ছিলেন) মুজাফ্‌ফর শাহ উপাধি ধারণ ক'রে সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাহমূদ শাহ এক বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। হাজী মুহম্মদ কান্দাহারীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, সুলতান মাহমূদ শাহ[৪৭] ছিলেন ফতেহ শাহের এক পুত্র। জশন খান[৪৮] নামক বারবক শাহের এক গোলাম সুলতান ফিরোজ শাহের আদেশ অনুসারে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন; এবং সুলতান ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাকে সিংহাসনে বসানো হয়। ছয় মাস পরে হাবাশ খান নিজে সুলতান হওয়ার কল্পনা করেন। মালিক বদর দিওয়ানা হাবাশ খানকে হত্যা ক'রে (পূর্বেই এ বিষয় বিবৃত হয়েছে) নিজে সিংহাসন দখল করেন।

মুজাফ্‌ফর শাহ উপাধিধারী সিদি বদরের রাজত্ব

মুজাফ্‌ফর শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করার পর অত্যন্ত রক্ত-লিপ্সু ও উদ্ধত হয়ে পড়েন। তিনি বহুসংখ্যক বিদ্বান, ধার্মিক ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে হত্যা করেন; এবং বাংলার সুলতানের বিরোধী বহুসংখ্যক বিধর্মী রাজাকেও হত্যা করেন। তিনি সৈয়দ হোসেন শরীফ

মন্ত্রীকে উজীর এবং সরকারী কার্য-পরিচালক নিযুক্ত করেন। তিনি একান্তভাবে সম্পদ সঞ্চয়ে মনোনিবেশ করেন এবং সৈয়দ হোসেনের পরামর্শ অনুযায়ী সৈন্যদের বেতন হ্রাস করেন ও রাজভাণ্ডার তৈরী করেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি অত্যাচার-উৎপীড়ন করতেন। ফলে, জনসাধারণ মুজাফ্‌ফর শাহের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। ক্রমে সৈয়দ হোসেনেরও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। শেষ পর্যন্ত ৯০৩ হিজরীতে প্রধান আমীরদের অধিকাংশ সুলতানকে ত্যাগ ক'রে নগরের বাহিরে চলে যান। সুলতান মুজাফ্‌ফর শাহ পাঁচ হাজার হাবসী এবং তিন হাজার আফগান ও বাঙ্গালী নিয়ে গৌড় দুর্গে ঘাঁটি স্থাপন করেন। চার মাসকাল নগরের ভিতরের ও বাইরের লোকদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে ও তাতে প্রত্যহ বহু লোক নিহত হ'ত।[৪৯] কথিত হয়, সুলতান মুজাফ্‌ফর গৌড় নগরীর দুর্গে অবরুদ্ধ থাকাকালে যখনই কাউকে বন্দী ক'রে তার সামনে উপস্থিত করা হ'ত, তখনই তিনি হাবসীদের স্বভাবজাত নির্মমতার সাথে নিজের হাতে তাকে হত্যা করতেন। এইভাবে তিনি চার হাজার লোককে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন। অবশেষে মুজাফ্‌ফর শাহ[৫০] সসৈন্যে নগর থেকে বেরিয়ে আমীরদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। সৈয়দ হোসেন শরীফের নেতৃত্বে আমীরগণ যুদ্ধ করেন। তরবারি ও তীরের আঘাতে উভয় পক্ষের কুড়ি হাজার লোক নিহত হয়।

> প্রান্তরে মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে উঠলো :
> বলতে পারো, যেন আর একটি প্রাচীর তৈরী
> করা হয়েছে।

অবশেষে, আমীরগণের পতাকা বিজয়ের বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হল। বহুসংখ্যক সহযোগী ও সমর্থকসহ মুজাফ্‌ফর শাহ যুদ্ধে নিহত হন। হাজী মুহম্মদ কান্দাহারির বিবরণী অনুসারে যুদ্ধের আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলমান ও হিন্দু উভয় মতাবলম্বী এক লাখ কুড়ি হাজার লোক নিহত হয়েছিল। এবং সৈয়দ হোসেন শরীফ মক্কী সিংহাসনে আরোহণ ক'রে সুলতানী পতাকা উত্তোলন করেন। নিজামউদ্দীন আহমদের[৫১] ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মুজাফ্‌ফর শাহের

অসদাচরণে জনসাধারণ বিরক্ত হয়ে ওঠে, তখন সৈয়দ শরীফ মক্কী তাদের মনোভাব বুঝতে পেরে প্রাসাদরক্ষীদের সৈনাধ্যক্ষকে হস্তগত ক'রে এক রাত্রে তেরো জন লোকসহ অন্দরমহলে প্রবেশ ক'রে মুজাফ্‌ফর শাহকে হত্যা ক'রে পরদিন সকালে নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। মুজাফ্‌ফর শাহ তিন বৎসর পাঁচ মাস রাজত্ব করেছিলেন। অন্যান্য ইষ্টক নির্মিত বাড়ীর মধ্যে তাঁর নির্মিত একটি মসজিদের অস্তিত্ব গৌড়ে আছে।

আলাউদ্দীন হুসেন শাহ মক্কীর রাজত্ব[৩২]

ওজারতি করার সময় সৈয়দ হুসেন শরীফ মক্কী লোকজনের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করতেন। তিনি তাদের বলতেন, "মুজাফ্‌ফর শাহ অত্যন্ত কৃপণ এবং তাঁর ব্যবহারও রূঢ়। যদিও আমি তাঁকে সৈন্য-বাহিনীর ও আমীরগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে পরামর্শ দিই এবং মন্দকার্য থেকে বিরত থাকতে বলি, কিন্তু সবই বৃথা হয়। কারণ, তিনি সম্পদ সঞ্চয়ে আগ্রহশীল।" ফলে, আমীরগণ সৈয়দ হুসেনকে তাদের বন্ধু, মুরুব্বী ও সহানুভূতিশীল বলে মনে করতেন। তাঁর (হুসেনের) সদ্‌গুণ ও মুজাফ্‌ফর শাহের ত্রুটি জনসাধারণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জানা ছিল। সেজন্য যেদিন মুজাফ্‌ফর শাহ নিহত হন সেইদিনই সুলতান নির্বাচনের উদ্দেশ্যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সকলে এক পরামর্শসভায় মিলিত হয়ে সৈয়দ হুসেন শরীফ মক্কীর পক্ষ সমর্থন করেন ও বলেন, "যদি আমরা আপনাকে সুলতান নির্বাচন করি, তা'হলে আপনি আমাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবেন?" শরীফ মক্কী উত্তরে বলেছিলেন, "আমি আপনাদের সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করবো এবং এই শহরে মাটির উপর যা কিছু আছে সব অনতিবিলম্বে আপনাদের জন্য বরাদ্দ করবো এবং মাটির নীচে যা আছে সেইসব আমি নিজের জন্য রাখবো। এই লোভনীয়

প্রস্তাবে আশরাফ আতরাফ সকলেই অবিলম্বে সমস্ত গৌড় নগরী লুঠতরাজ করতে বেরিয়ে গেলো ; অথচ, এই গৌড় নগরী তৎকালে (সম্পদের ক্ষেত্রে) কায়রোকে অতিক্রম করে গিয়েছিল।

এইরূপে একটি নগর লুণ্ঠিত হ'ল,
বলতে পার, যেন লুঠনের ঝাঁটা দিয়ে
ঝাঁট দেয়া হ'ল।

সৈয়দ শরীফ মক্কী এই প্রকার সহজ কৌশলে রাজছত্র ধারণ ক'রে নিজ নামে খুত্‌বা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলন করলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখছেন যে, তাঁর নাম ছিল সৈয়দ শরীফ মক্কী[৫৩] এবং সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি আলাউদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু আমি দেখছি, সমগ্র বাংলারাজ্য ও গৌড়ের আশেপাশে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ও জনসাধারণের নিকট তাঁর নাম হুসেন শাহ। ইতিহাসে হুসেন শাহের নাম না পেয়ে আমার সন্দেহ হয়েছিল। বহু গবেষণা, অদ্যাবধি বিদ্যমান গৌড় নগরীর ধ্বংসাবশেষে, কদমরসুল-অট্টালিকায়,[৫৪] সোনা মসজিদের ও অন্যান্য মাজারে উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠোদ্ধার ক'রে দেখেছি, এগুলো সুলতান হুসেন শাহ ও পুত্র নসরত শাহ ও মাহমুদ শাহ তৈরী করেছিলেন ; এবং এই হুসেন শাহ ছিলেন সৈয়দ আশরাফুল হুসেইনির পুত্র সৈয়দ আলাউদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর হুসেন শাহ। সৈয়দ শরীফ মক্কীর (রাজত্ব) কালের মাস ও বৎসরের সঙ্গে এই সকল শিলালিপির তারিখের সঙ্গে মিল হয় এবং তাতেই সকল সন্দেহের নিরসন হয়। স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা সৈয়দ আশরাফুল হুসেইনি মক্কা শরীফ ছিলেন এবং সেই কারণে পুত্রও শরীফি-মক্কী নামে পরিচিত ছিলেন। অথবা, তাঁর নাম ছিল সৈয়দ হুসেন। একটি পুস্তিকায় দেখেছি, হুসেন শাহ ও তাঁর ভ্রাতা ইউসুফ ও তাঁদের পিতা আশরাফুল হুসেন, তারমুজ[৫৫] শহরের অধিবাসী ছিলেন। দৈবক্রমে তাঁরা বাংলায় এসে রাঢ়[৫৬] জেলার মৌজা চাঁদপুরে বাস করতে থাকেন এবং উভয় ভ্রাতা সেখানকার কাজীর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। তাঁদের সম্ভ্রান্ত বংশ পরিচয় অবগত হয়ে কাজী তাঁর কন্যার সঙ্গে হুসেন শাহের বিবাহ

দেন। এর পর তিনি (হুসেন শাহ) মুজাফ্‌ফর শাহের অধীনে চাকুরী নেন এবং ক্রমে পূর্ব-বর্ণিত মতে উজীর পদে উন্নীত হন। গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করার কয়েক দিন পর তিনি শহর লুণ্ঠন করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন; কিন্তু জনসাধারণ যখন সেই আদেশ শুনলো না, তখন তিনি বারো হাজার লুণ্ঠনকারীকে হত্যা করেন। অতঃপর তারা লুঠ করা বন্ধ করে। অনুসন্ধান ক'রে তিনি তেরো শ' সোনার বাসন সহ বহু লুক্কায়িত সম্পদ উদ্ধার করেন। পুরাকাল থেকে লখনৌতি ও পূর্ববঙ্গে ধনী ব্যক্তিরা সোনার বাসন তৈরী করিয়ে তাতে আহার করতেন এবং উৎসবে অনুষ্ঠানে যিনি যতো অধিক সংখ্যক সোনার বাসন বে'র করতে পারতেন, তাঁর সম্মান ততো বৃদ্ধি হ'ত। অদ্যাবধি ধনী ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে।

সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সুলতান ছিলেন এবং তিনি প্রভাবশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে সুবিবেচনার সাথে ব্যবহার করতেন। বাছাই করা কর্মচারীদের উচ্চ ও বিশ্বস্ত পদে নিয়োগ করতেন। রাজা-নিধন ও বিশ্বাসঘাতকতা, পাইকদের বৈশিষ্ট্য হওয়ায় তিনি তাদের প্রাসাদে পাহারা দেয়া থেকে বাদ দেন এবং যাতে তাঁর কোনো বিপদ না হয় সেজন্য সম্পূর্ণরূপে তাদের দল ভেঙ্গে দেন। পাহারা-কক্ষে ও রঙ্গমঞ্চে পাইকদের পরিবর্তে তিনি অন্য দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন এবং হাবসীদের তাঁর রাজ্য থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করেন।

হাবসীরা বদমাশী, রাজা-হত্যা ও অসদাচরণের জন্য কুখ্যাত ছিল, তাই তারা জৌনপুর ও হিন্দুস্তানে আশ্রয় না পেয়ে গুজরাট ও দক্ষিণে চলে যায়। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহ সুবিচার করার জন্য কোমর বাঁধেন (অর্থাৎ দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন) এবং বাংলার অন্য রাজাদের পন্থা অনুসরণ না ক'রে তিনি গৌড় নগরীর নিকটবর্তী একডালায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বাংলার রাজা ও সুলতানদের মধ্যে হুসেন শাহ ব্যতীত অন্য কেউ পাণ্ডুয়া ও গৌড় ছাড়া অন্য কোথাও রাজধানী স্থাপন করেন নাই। তিনি নিজে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয় হওয়ায় "সব কিছু মূলের (বংশ ধারার আভিজাত্যের) উপর নির্ভর করে" এই প্রবাদ অনুযায়ী

সৈয়দ, মুঘল ও আফগানদের আহ্বান করেন এবং বিভিন্ন স্থানে দক্ষ জেলা-কর্মচারী নিযুক্ত করেন। ফলে হাবসী সুলতানদের সময় দেশে যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, তা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয় ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল অননুগত শ্রেণীসমূহকে বশীভূত করা হয়। সীমান্তবর্তী রাজাদের বশীভূত করেন ও উড়িষ্যা পর্যন্ত জয় ক'রে তিনি কর আদায় করেন। অতঃপর বাংলার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত আসাম জয় করার পরিকল্পনা করেন। বিপুল সৈন্যবাহিনী ও বিরাট নৌবহরসহ উক্ত রাজ্যাভিমুখে অগ্রসর হয়ে তিনি ঐ দেশ জয় করেন। তিনি কামরূপ, কামতা এবং রূপনারায়ণ, মালকুনওয়ার, গাসা লক্ষণ, লছমি নারায়ণ ও অন্যান্য শক্তিশালী রাজাদের অধীন অঞ্চলসমূহ জয় ক'রে বিজিত অঞ্চল থেকে প্রচুর সম্পদ সংগ্রহ করেন। আফগানেরা ঐ সকল রাজাদের বাড়ী ধ্বংস ক'রে তৎপরিবর্তে বহু নতুন বাড়ী তৈরী করে। আসামের রাজা তাঁকে বাধা দিতে অক্ষম হয়ে দেশ ত্যাগ ক'রে পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। সুলতান নিজের পুত্রকে[৫৭] বিজিত দেশে সুব্যবস্থা স্থাপন করার জন্য বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ রেখে নিজে বিজয়ী হয়ে বাংলায় ফিরে আসেন। সুলতানের প্রত্যাগমনের পর তাঁর পুত্র বিজিত দেশে শান্তি ও তা সুরক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু, বর্ষার সময় বন্যায় রাস্তা, পথঘাট বন্ধ হয়ে যায় এবং রাজা তাঁর সমর্থকগণসহ পাহাড় থেকে বেরিয়ে সুলতানী বাহিনী ঘেরাও করেন ও যুদ্ধ আরম্ভ করেন, খাদ্য সরবরাহ বন্ধ ক'রে দেন এবং মোটের উপর সকলকে হত্যা করেন। সুলতান ভাটা[৫৮] নদীর তীরে একটি দুর্গ তৈরী করেন এবং বাংলারাজ্যের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সবিশেষ চেষ্টা করতে থাকেন। প্রত্যেক জেলার বিভিন্ন স্থানে মসজিদ ও সরাইখানা তৈরী ও প্রতিষ্ঠা করেন এবং আউলিয়া দরবেশগণকে বহু দান খয়রাত করেন।[৫৯] প্রসিদ্ধ আউলিয়া নূরে কুত্‌ব্‌-উল-আলমের জন্য তৈরী সরাইখানার নামে কয়েকটি গ্রাম দান করেন। প্রত্যেক বৎসর তিনি একডালা থেকে পাণ্ডুয়ার মহান আউলিয়ার[৬০] মাজারে তীর্থে আসতেন। অমায়িক ও মধুর ব্যবহার, সবিশেষ সুবিবেচনা ও বিজ্ঞতার দরুন তিনি দীর্ঘকাল সম্পূর্ণ

স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। ৯০০ হিজরীতে জৌনপুর রাজ্যের শাসনকর্তা সুলতান হোসেন শর্কী সুলতান সিকান্দার কর্তৃক পরাজিত হয়ে কেলেগং (কাহলগাঁও)[৬১] অভিমুখে গিয়ে সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতান হুসেন শাহ আশ্রয়প্রার্থীর মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন এবং সেই কারণে সুলতান হোসেন শর্কী জীবনের অবশিষ্টাংশ ঐ স্থানেই অতিবাহিত করেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বের (বাংলায়) শেষ দিকে বাদশাহ মুহম্মদ বাবুর হিন্দুস্তান আক্রমণ করেন। ৯২৭ হিজরীতে সুলতান হুসেন শাহের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তিনি সাতাশ বৎসর—কারো মতে ২৪ বৎসর, আবার কারো কারো মতে ২৯ বৎসর ৫ মাস—রাজত্ব করেছিলেন। বাংলার শাসকগণের মধ্যে আলাউদ্দীন হুসেন শাহের তুল্য আর কেউ ছিল না। এই দেশে তাঁর বদান্যতার চিহ্ন সর্বজনবিদিত। তাঁর আঠারটি পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর নসরত শাহ বাংলার সুলতান হন।

আলাউদ্দীন হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের রাজত্ব[৬২]

সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের মৃত্যুর পর রাজ্যের অনুগত ব্যক্তিগণ ও সরকারের সদস্যগণ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরত শাহকে (সাধারণতঃ নসিব শাহ নামে পরিচিত) গদিনশিন করেন। তিনি বিজ্ঞ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন; সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতেন। রাজকার্য পরিচালনায় অন্য ভ্রাতাদের অপেক্ষা দক্ষ ছিলেন। সর্বাপেক্ষা প্রসংশনীয় যে-কাজ তিনি করেছিলেন সেটা হচ্ছে এই যে, ভ্রাতাদের কারারুদ্ধ না ক'রে, পিতা তাদের যে-ভাতা দিতেন তা দ্বিগুণ ক'রে দেন। তিরহুতের রাজাকে বন্দী ক'রে তাকে তিনি হত্যা করেন। হুসেন শাহের জামাতাদ্বয় আলাউদ্দীন ও মখদুম আলিম ওরফে শাহ আলিমকে তিরহুত ও হাজী-

পূরের সীমান্ত জয় করার জন্য প্রেরণ করেন[৬৩] এবং তাঁদের সেখানে (প্রহরাকার্যে) নিযুক্ত করেন। সুলতান সিকান্দার লোদীর পুত্র সুলতান ইব্‌রাহীমকে[৬৪] পরাজিত ক'রে বাদশাহ বাবুর যখন বৃহৎ হিন্দুস্তান সাম্রাজ্য জয় করেন, তখন বহুসংখ্যক আফগান আমীর পলায়ন ক'রে এসে নসরত শাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। অবশেষে সুলতান ইব্‌রাহীমের ভ্রাতা সুলতান মাহমূদ[৬৫] তাঁর রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বাংলায় আসেন। নসরত শাহ তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে প্রত্যেককে মর্যাদা ও অবস্থা অনুযায়ী এবং রাজ্যের (বাংলার) সম্পদের সাথে সঙ্গতি রেখে পরগণা, গ্রাম ইত্যাদি বরাদ্দ করেন। সুলতান ইব্‌রাহীমের কন্যাও বাংলায় এসেছিলেন। তিনি (নসরত শাহ) তাঁকে বিবাহ করেন। মুঘল সৈন্যদের দমন করার উদ্দেশ্যে তিনি এক বৃহৎ সৈন্যদলসহ বাহ্‌রাইচ[৬৬] অভিমুখে কুত্‌ব্‌ খানকে প্রেরণ করেন। কুত্‌ব্‌ খান মুঘলদের সঙ্গে কয়েকটি যুদ্ধ করেন এবং কিছুকাল বিরোধী সৈন্যগণ সেখানেই ঘাঁটি ক'রে যুদ্ধ চালাতে থাকে। কিন্তু, বাদশাহ বাবুরের জামাতা খান জামান[৬৭] জৌনপুর পর্যন্ত জয় করেন। ৯৩০ হিজরীতে বাদশাহ বাবুর যখন জৌনপুরে এসে উক্ত অঞ্চল ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ জয় করেন এবং বাংলাদেশ জয় করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা করেন, তখন নসরত শাহ ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে বিজ্ঞ দূতদের দ্বারা বহু মূল্যবান উপহার প্রেরণ করেন এবং বশ্যতা স্বীকার করেন। তৎকালীন জরুরী প্রয়োজনীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে বাদশাহ বাবুর নসরত শাহের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন ও ফিরে যান। ৯৩৭ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের ৫ তারিখে বাদশাহ বাবুরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তখন গুজব রটে যে, দিল্লীর বাদশাহ বাংলা জয়ের পরিকল্পনা করছেন। এমতাবস্থায় ৯৩৯ হিজরীতে নসরত শাহ নিজের আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব প্রমাণ করার জন্য খোজা মালিক মারজানের তত্ত্বাবধানে বহু দুর্লভ উপহার সুলতান বাহাদুর গুজরাটির[৬৮] নিকট প্রেরণ করেন। মাণ্ডু দুর্গে মালিক মারজানের সাথে সুলতান বাহাদুরের সাক্ষাৎ হয় এবং সুলতান তাঁকে বিশেষ খেলাত প্রদান করেন।

ইতিমধ্যে, সৈয়দ হওয়া সত্ত্বেও নসরত শাহ দুশ্চরিত্রতা ও অন্যান্য অকথ্য অত্যাচারে লিপ্ত হন। পৃথিবী তাঁর অত্যাচারের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিলো। এই সময় নসরত শাহ গৌড় নগরীর আকনাকাহ্নতে তাঁর পিতার কবর জিয়ারত করতে অশ্বারোহণে গিয়েছিলেন। দৈবক্রমে সেখানে তিনি এক খোজাকে কোনো একটি দোষের জন্য শাস্তি দেন। প্রাণের ভয়ে সেই খোজা অন্য খোজাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ও প্রাসাদে ফিরে আসবার পর ৯৪৩ হিজরীতে তাঁকে হত্যা করে। নসরত শাহ ১৬ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন, তবে কারো কারো মতে ১৩ বৎসর; আবার অন্যদের মতে তেরো বৎসরেরও কম রাজত্ব করেছিলেন। তিনি কদমরসূল[৬৯] অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ৯৩৯ হিজরীতে[৭০] এবং সোনা মসজিদের[৭১] ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন ৯৩২ হিজরীতে। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের অট্টালিকাসমূহের মধ্যে এগুলির দরজা ও প্রাচীরের অস্তিত্ব আজও আছে। এই সুলতানের মহান কার্যসমূহের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে সাদুল্লাপুরে মহান আউলিয়া মখদুম আখি সিরাজুদ্দীনের গৌরবময় মাজারের ভিত্তি।[৭২]

[গ্রন্থকার সলিমের টিকা: বর্তমানে সমস্ত প্রস্তরে উৎকীর্ণ সুলতানের নাম হচ্ছে সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ। ইতিহাসসমূহে তাঁর নাম লিখিত হয়েছে নসিব শাহ। এটা নিশ্চয়ই ভুল। কারণ, শিলালিপিতে ভুল হওয়ার অবকাশ নাই।]

নসরত শাহের পুত্র ফিরোজ শাহের রাজত্ব[৭৩]

যখন নসরত শাহ মৃত্যুর তিক্ত রস পান করেন, তখন আমীরদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর পুত্র ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

তিনি তিন[৭৪] বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। এই সময় সুলতান আলা-উদ্দীন হুসেন শাহের অষ্টাদশ পুত্রের অন্যতম সুলতান মাহমুদ বাঙালী—যাকে নসরত শাহ আমীরের মর্যাদা দিয়েছিলেন ও যিনি নসরতের জীবিত-কালে আমীরের মতোই চলতেন—সুযোগ পেয়ে ফিরোজ শাহকে হত্যা ক'রে পিতার উত্তরাধিকারিত্বের অধিকারে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আলাউদ্দীনের পুত্র সুলতান মাহমুদের রাজত্ব[৭৫]

যখন মাহমুদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁর শ্যালক হাজিপুরের গভর্নর মখদুম আলম বিদ্রোহ করেন এবং শের খানের[৭৬]—যিনি তখন বিহারে ছিলেন—সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগদান করেন। মাহমুদ শাহ মুঙ্গেরের সেনাপতি কুত্‌ব্‌ খানকে বিহার প্রদেশ জয় করার ও মখদুম আলমকে শাস্তি দেয়ার জন্য প্রেরণ করেন। শের খান সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরিশেষে আফগানদের সম্মতি অনুসারে মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধ করতে সংকল্প করেন। উভয় বাহিনী সম্মুখীন হওয়ায় ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কুত্‌ব্‌ খান নিহত হন এবং শের খান তাঁর হস্তী ও জিনিসপত্র পেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। অতঃপর মখদুম আলম প্রতিশোধ গ্রহণের অথবা সিংহাসন দখল করার জন্য বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করেন। যুদ্ধে মাহমুদ শাহ নিহত হন। ইতিমধ্যে শের খান আফগান[৭৭] দিল্লীর সিংহাসন দখল করেন এবং বাংলা অভিমুখে সৈন্য-বাহিনী চালনা করেন। বাংলার আমীরেরা তেলিয়াগড়ি ও শকরিগলির[৭৮] গিরিপথ প্রতিরোধ ক'রে একমাস যুদ্ধ পরিচালনা করেন। অবশেষে তেলিয়াগড়ি ও শকরিগলির গিরিপথ অধিকৃত হয় এবং শের খান বাংলায় প্রবেশ করেন। মাহমুদ শাহ সৈন্যবাহিনীসহ তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সম্মুখ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুনের নিকট সাহায্য লাভের জন্য দূত প্রেরণ করেন।

৯৪৪ হিজরীতে হুমায়ুন শাহ জৌনপুর প্রদেশ জয় করতে অগ্রসর হন। শেব খান তখন বাংলায় থাকায় হুমায়ুন বাদশাহ চুনার দুর্গ[৭৯] অবরোধ করেন। শের খানের পক্ষে গাজী খান সুর উক্ত দুর্গ রক্ষা করছিলেন এবং তিনি প্রতিরোধের পতাকা উত্তোলন করেন। ছয় মাসকাল এই অবরোধ চলে।[৮০] রুমি খানের[৮১] চেষ্টায় সিঁড়ি লাগিয়ে প্রাচীর পার হয়ে হুমায়ুন দুর্গ দখল করেন। শের খানও গৌড় দুর্গ অধিকারের জন্য প্রচণ্ড চেষ্টা করছিলেন এবং দুর্গস্থ সৈন্যগণ অত্যন্ত চাপে পড়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বিহারের একজন জমিদার বিদ্রোহী হয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করায় শের খান গৌড়ে অবস্থান অসমীচীন বিবেচনা ক'রে পুত্র জালাল খান ও খাওয়াস খান নামক একজন বিশ্বাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গৌড় দুর্গ অবরোধের জন্য রেখে নিজে বিহার অভিমুখে অগ্রসর হন। শের খানের পুত্র জালাল খানেব সঙ্গে মাহমূদ শাহের যুদ্ধ হতে থাকে; দুর্গস্থ সৈন্যগণ অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হয় এবং খাদ্যশস্যও দুর্লভ হয়ে ওঠে। ফেব্রুয়ারী মাসের ১৩ তারিখে অর্থাৎ ৯৪৪ হিজরীর ৬ই জিলকদ তারিখে[৮২] জালাল খান ও খাওয়াস খান প্রমুখ অন্য আমীরগণ যুদ্ধের দামামা ধ্বনি করেন। অবরোধের ফলে সুলতান মাহমূদ অত্যন্ত চাপে পড়েছিলেন; তিনিও যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে আসেন। যেহেতু তখন তাঁর ভাগ্য অবনতির দিকে এবং ভাগ্য শের খানকে সাহায্য করছিলো, সেইহেতু সুলতান মাহমূদ যুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে ভাটা[৮৩] অভিমুখে পলায়ন করেন এবং মাহমূদ শাহের পুত্রদেব বন্দী করা হয়। গৌড় দুর্গ ও অন্যান্য দ্রব্য শের খানের পুত্র জালাল খানের হস্তগত হয়। জালাল খান ও খাওয়াস খান দুর্গে প্রবেশ ক'রে সৈন্যদের হত্যা ও বন্দী এবং লুঠ করতে থাকেন। বিহারের গোলযোগ থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে শের খানও সুলতান মাহমূদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। পরস্পর নিকটবর্তী হওয়ায় সুলতান মাহমূদকে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হয় এবং তাতে গুরুতর জখম হয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন। বিজয়ী শের খান দ্রুত গৌড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে বাংলার প্রভু হন। সুলতান আলাউদ্দীন হুসেন শাহের

পুত্র সুলতান মাহমূদের তৈরী সাদুল্লাপুরের[৮৪] জামে মসজিদ আজও বিদ্যমান। উক্ত মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, তিনি (সুলতান মাহমূদ) সুলতান আলাউদ্দীন শাহের এক পুত্র ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল পাঁচ বৎসর বলে প্রতীয়মান হয়।[৮৫]

নাসিরউদ্দীন মুহম্মদ হুমায়ুন বাদশাহের গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ

শের খানের সঙ্গে যুদ্ধে সুলতান মাহমূদ আহত হয়ে বাদশাহ সুলতান মুহম্মদ হুমায়ুনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যান। যখন বাদশাহ হুমায়ূন চুনার দুর্গ অধিকার করেন তখন সুলতান মাহমূদ দরবেশপুর[৮৬] পোঁছে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাত করেন ও তাঁকে বাংলা আক্রমণ করার জন্য অনুরোধ উপরোধ করেন। মাহমূদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে বাদশাহ চুনার দুর্গের ভার মির্জা দোস্ত বেগের[৮৭] উপর দিয়ে ৯৪৫ হিজরীর[৮৮] গোড়ার দিকে বাংলা বিজয়ের জন্য অগ্রসর হন। শের খান[৮৯] এই সংবাদ শুনে জালাল খান ও খাওয়াস খানকে বাংলায় প্রবেশের গিরিপথ তেলিয়াগড়ি রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। তেলিয়াগড়ি ও শকরিগলি গিরিপথ বিহার ও বাংলার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত এবং দুর্ভেদ্য। এর এক দিকে সুউচ্চ পর্বত ও গভীর জঙ্গল—যা সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য ও অন্যদিকে গঙ্গা নদী—যা পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বাদশাহ হুমায়ুন তেলিয়াগড়ি ও শকরিগলি দখলের জন্য জাহাঙ্গীর বেগ[৯০] মুঘলকে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে জালাল খান ও খাওয়াস খান একদল সুদক্ষ সৈন্যসহ দ্রুত অগ্রসর হয়ে সেখানে পৌঁছান এবং সঙ্গে সঙ্গে জাহাঙ্গীর বেগকে আক্রমণ করেন। মুঘল সৈন্য মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে পরাজিত হয় এবং জাহাঙ্গীর বেগ আহত অবস্থায় অসহায়ভাবে বাদশাহের শিবিরে পশ্চাদপসরণ করেন।[৯১] কিন্তু যখন বাদশাহ হুমায়ুন নিজে তেলিয়াগড়ি ও শকরিগলির দিকে অগ্রসর হন, তখন জালাল খান ও

খাওয়াস খান তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হবেন না বিবেচনা ক'রে পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন এবং সেখান থেকে গৌড়ে শের খানের নিকট চলে যান। বাদশাহী সৈন্যবাহিনী সহজে সংকীর্ণ গিরিপথ অতিক্রম ক'রে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকে। যখন বাদশাহী বাহিনীর শিবির কোহালগাঁয়ে (কোলগং) স্থাপিত হয়; সেই সময় মাহমূদ শাহ জানতে পারেন যে, জালাল খান তাঁর পুত্রদ্বয়কে বন্দী ও হত্যা করেছে। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর শোকে ও দুঃখে মর্মাহত হয়ে অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৯২] বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর আগমন-সংবাদ শুনে শের খান উদ্বিগ্ন হয়ে গৌড় ও বাংলারাজ্যের সমস্ত সম্পদসহ রাঢ়[৯৩] অভিমুখে ও সেখান থেকে ঝাড়-খণ্ডে[৯৪] চলে যান। বাদশাহ হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌড়[৯৫] দখল করেন। কিছুদিন বাদশাহ আয়েশ-আরামে অতিবাহিত করেন এবং শত্রুকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'রে শের খানের পশ্চাদ্ধাবন করেন নাই। এই শহরে তিন মাস অতীত হতে না হতেই মন্দ আবহাওয়ার জন্য বহু ঘোড়া ও উট মরে যায় এবং বহু সৈনিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। হঠাৎ সংবাদ পাওয়া গেল যে, আফগানেরা ঝাড়খণ্ডের পথে অগ্রসর হয়ে রোটাস[৯৬] অধিকার করেছে। উক্ত দুর্গ রক্ষার জন্য একদল সৈন্য রেখে শের খান নিজে মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হন এবং বাদশাহের সেখানকার আমীরদের হত্যা করেন। এই সময় আবার দিল্লীতে[৯৭] মির্জা হিন্দালের সাফল্যজনক বিদ্রোহের সংবাদও পাওয়া গিয়েছিল। দিল্লীর সংবাদ পেয়ে বাদশাহ উদ্বিগ্ন হয়ে জাহাঙ্গীর কুলী বেগকে বাংলার শাসনকর্তা ও অন্যতম প্রধান আমীর ইবরাহীম বেগকে পাঁচ হাজার বাছাই সৈন্যসহ রেখে নিজে দ্রুত আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন। এই ঘটনা হয়েছিল ৯৪৬ হিজরীতে।

শের শাহ[৯৮] কর্তৃক গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ

৯৪৬ হিজরীতে বাদশাহ হুমায়ুন যখন দিল্লী অভিমুখে পশ্চাদ্গমন করেন, তখন শের খান বাদশাহী বাহিনীর অপ্রস্তুত থাকার ও মির্জা হিন্দালের

বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ রোটাস দুর্গ থেকে যাত্রা করেন। বাদশাহী বাহিনী যখন চৌসা পৌঁছায়[৯৯] তখন শের খান যাওয়ার পথে শিবির স্থাপন ক'রে তিন মাসকাল তাদের বাধা দেন।[১০০] এবং যথা-সম্ভব তাদের বিপর্যস্ত করতে থাকেন। অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা ও কূট-কৌশল অবলম্বন ক'রে শের খান তাঁর মুর্শিদ সুপরিচিত দরবেশ শেখ খলিলকে সন্ধি স্থাপনের জন্য বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। তৎকালীন জরুরী প্রয়োজনবশতঃ বাদশাহ সন্ধি স্থাপনে সম্মত হন এবং সাব্যস্ত হয় যে, বাংলা ও রোটাস দুর্গ শের খানের অধিকারে থাকবে। এর বেশী কিছু তিনি দাবী করতে পারবেন না। কিন্তু বাদশাহের নামে খোত্‌বা পাঠ ও মুদ্রা (বাংলায়) চালু থাকবে। শের খান পবিত্র কুরআনের নামে এই সকল শর্তে সম্মত হন[১০১] এবং বাদশাহী সৈন্যবাহিনীও এই প্রতিজ্ঞায় আস্থা স্থাপন করে। কিন্তু, পরদিন শের খান এক সুসজ্জিত ও সুদক্ষ আফগান-বাহিনী নিয়ে অকস্মাৎ বাদশাহী বাহিনীকে আক্রমণ করেন; তাদের প্রস্তুত হওয়ার সুযোগও দেন নাই। এই যুদ্ধে শের খান জয়ী হন ও যেখানে পারাপারের জন্য নৌকাগুলি রাখা ছিল সেই ঘাট বন্ধ ক'রে দেন। এই কারণে রাজা ও ফকির, উচ্চ ও নীচ সকলেই সাহস হারিয়ে দুরবস্থায় পতিত হয় এবং এলোমেলো ভাবে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। এর ফলে হিন্দুস্তানীদের ছাড়া প্রায় কুড়ি হাজার মুঘল নদীতে ডুবে মারা যায়। বাদশাহও নদীতে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে এক ভিস্তির সাহায্যে অতি কষ্টে নদী পার হয়ে অল্পসংখ্যক জীবিত সঙ্গীসহ আগ্রা অভিমুখে রওয়ানা হন। এই আশ্চর্যজনক বিজয় লাভের পর শের খান বাংলায় ফিরে এসে পুনঃ পুনঃ জাহাঙ্গীর কুলী বেগের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। কিন্তু কোনো বারেই পেরে ওঠেন না। অবশেষে, জাহাঙ্গীর কুলী বেগ ও তাঁর সঙ্গীদের আমন্ত্রণ ক'রে এনে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে তাদের হত্যা করেন। অন্যান্য স্থানে যেসকল বাদশাহী সৈন্য ছিল তাদেরও হত্যা করেন এবং নিজ নামে খোতবা ও মুদ্রা প্রচলিত করেন। তিনি বাংলা ও বিহার প্রদেশদ্বয়কে সম্পূর্ণরূপে নিজের দখলে আনেন। এই সময় থেকে তিনি শের শাহ[১০২] উপাধি গ্রহণ

করেন ; এবং সেই বৎসর রাজ্যের ব্যবস্থাপনায় আত্মনিয়োগ ক'রে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। এক বৎসর পরে তিনি খিজির খানকে বাংলা শাসনের জন্য নিযুক্ত ক'রে নিজে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। অপরপক্ষ থেকে ভ্রাতৃবিরোধ সত্ত্বেও হুমায়ূন এক লক্ষ সৈন্যসহ তাঁকে (শের শাহকে) বাধা দিতে অগ্রসর হন। ৯৪৭[১০৩] হিজরীর মুহররম মাসের ১০ তারিখে কনৌজের নিকটে গঙ্গা নদীর তীরে দু'পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হয়। মুঘল সৈন্যরা যখন শিবির সংস্থাপনের আয়োজন করছিলো সেই সময় প্রায় পঞ্চাশ হাজার আফগান-অশ্বারোহী সৈন্য সবেগে তাদের আক্রমণ করে। বিনাযুদ্ধে বাদশাহী সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং শের শাহ নদী পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন কবেন এবং পরে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হন।

গৌড়ে খিজির খানের রাজত্ব

যখন শের শাহের পক্ষে খিজির খান বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তখন তিনি বাংলার এক সুলতানের[১০৪] কন্যাকে বিবাহ করেন এবং আরাম-আয়েশ, বিলাসিতা ও সাজসজ্জায় রাজার মতো আচরণ করছিলেন। শের শাহ আগ্রায় এই খবর পেয়ে দূরদর্শিতার সাথে ব্যাধি বৃদ্ধি হওয়ার পূর্বেই এর প্রতিকারের জন্য দ্রুত বাংলায় আসেন। খিজির খান তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যান। শের শাহ সেই সময় তাঁকে বন্দী ক'রে বাংলা প্রদেশকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করেন ও এক-একটি বিভাগ এক-একজন উপজাতীয় প্রধানের তত্ত্বাবধানে দেন। তাঁদের সকলের উপর তত্ত্বাবধায়করূপে সততা, সদগুণ ও বিশ্বস্ততার জন্য খ্যাত বিদ্বান কাজী ফজিলতকে নিযুক্ত করেন এবং সন্ধি ও যুদ্ধ করার ক্ষমতা তাঁকে অপন ক'রে শের শাহ আগ্রা ফিরে যান।[১০৫]

বাংলার অধিরাজ পদে নিয়োজিত মুহম্মদ খান সুরের শাসন বিবরণী

৯৫২ হিজরীতে কালিঞ্জর[১০৬] দুর্গ অধিকার করার সময় বিধাতার ইচ্ছায় বারুদ বিস্ফোরণের ফলে যখন শের শাহের আকস্মিক মৃত্যু হয়, তখন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খান (সাধারণতঃ সলিম শাহ নামে পরিচিত) ইসলাম শাহ[১০৭] উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অন্যতম প্রধান আমীর ও সলিম শাহের আত্মীয় মুহম্মদ খান সুরকে তিনি বাংলায় শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মুহম্মদ খান সুর সুবিচার, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি ও সৌজন্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। সলিম শাহের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত তিনি উক্ত (বাংলার শাসনকর্তার) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে তিনি বিদ্রোহী হয়ে চুনার, জৌনপুর[১০৮] ও কাল্পী[১০৯] অধিকার করার চেষ্টা করেন। মুহম্মদ শাহ আদলি[১১০] অন্যতম প্রধান আমীর হিমু (ইনি পূর্বে মুদি ছিলেন)[১১১] এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ মুহম্মদ খানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন। কাল্পী থেকে পনের ক্রোশ দূরবর্তী চপরঘাটা নামক স্থানে উভয় বাহিনীর মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়।[১১২] এতে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য নিহত হয়। মুহম্মদ খানও নিহত হন। (মুহম্মদ খানের দলের) যে সকল আমীর পলায়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁরা ঝোসিতে[১১৩] একত্রিত হয়ে মুহম্মদ খানের পুত্র খিজির খানকে শাসনকর্তা পদে মনোনীত করেন। বাহাদুর শাহ (অর্থাৎ খিজির খান) পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন ও দক্ষিণাঞ্চলের অনেক অংশ বশীভূত ক'রে বাংলা আক্রমণ করেন।

বাহাদুর শাহ উপাধিধারী খিজির খানের রাজত্ব[১১৪]

বাহাদুর শাহ যখন এক সুদক্ষ বাহিনীসহ বাংলা আক্রমণ করেন তখন মুহম্মদ শাহ আদলির পক্ষে শাহবাজ খান গৌড়ের শাসনকর্তা

ছিলেন। তিনি যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন। বাহাদুর শাহের বিরাট বাহিনী দেখে শাহবাজ খানের আমীরগণ তাকে ত্যাগ ক'রে চলে যান। অবশিষ্ট অনুগত সৈন্যদের নিয়ে শাহবাজ খান যুদ্ধ করার সংকল্প করেন এবং এই যুদ্ধে তিনি নিহত হন।

ভাগ্য যার প্রতি সুপ্রসন্ন
কে তাকে পরাস্ত করতে পারে?

বিজয়ী বাহাদুর শাহ গৌড় অধিকার করেন এবং নিজের নামে খোতবা ও মুদ্রা প্রচলন করেন। অতঃপর তিনি মুহম্মদ শাহ আদলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। সুরজগড় ও জাহাঙ্গীরার[১১৫] মধ্যবর্তী স্থানে ভীষণ যুদ্ধ হয়। মুহম্মদ শাহ যুদ্ধক্ষেত্রে[১১৬] মারাত্মকরূপে আহত হওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। এই মুহম্মদ শাহ ওরফে মুবারিজ খান ছিলেন শের শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র; তাঁর পিতার নাম ছিল নিজাম খান সুর (যিনি আবার সলিম শাহের চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি ছিলেন)। সলিম শাহের মৃত্যুর তিনদিন পরে মুহম্মদ শাহ উক্ত সলিম শাহের পুত্র ও নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ শাহকে হত্যা ক'রে মুহম্মদ শাহ আদলি[১১৭] উপাধি নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাসন করার যোগ্যতা না থাকায় আফগানরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'আদ্‌লি'; এই শব্দটির উচ্চারণ সামান্য পরিবর্তন ক'রে তারা তাঁকে 'আঁদলি' বলতো। হিন্দুস্তানী ভাষায় 'আঁদলি' শব্দের অর্থ অন্ধ। বাহাদুর শাহ ছ'বছর বাংলায় রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হয়।

মুহম্মদ খানের পুত্র জালালউদ্দীনের রাজত্ব

বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা জালালউদ্দীন[১১৮] গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পাঁচ বৎসর রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হয়।

জালালউদ্দীনের পুত্রের রাজত্ব

জালালউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র (নাম জানা নাই) সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মাত্র সাত মাস ন'দিন রাজত্ব করার পর গিয়াস-উদ্দীন তাঁকে হত্যা করেন ও বাংলার শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করেন।

গিয়াসউদ্দীনের রাজত্ব

বাংলার শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করার পর গিয়াসউদ্দীন মাত্র এক বৎসর এগারো দিন শান্তিতে ছিলেন। অতঃপর তাজ খান কররাণী[১১৯] শক্তি সংগ্রহ ক'রে তাঁকে হত্যা করেন ও বাংলারাজ্য অধিকার করেন।

তাজ খান কারারানীর রাজত্ব

তাজ খান কারারানী ছিলেন সলিম শাহের একজন আমীর ও সম্বলের শাসনকর্তা।[১২০] মুহম্মদ শাহ আদলির রাজত্ব যখন পতনশীল তখন তাজ খান গোয়ালিয়র থেকে পলায়ন করেন ও বাংলা অভিমুখে যাত্রা করেন। মুহম্মদ শাহ আদলি তার পিছনে এক বৃহৎ সৈন্যদল প্রেরণ করেন। আকবরাবাদ থেকে চল্লিশ ক্রোশ ও কনৌজ থেকে বত্রিশ ক্রোশ দূরবর্তী চাপরামপুর নামক স্থানের সন্নিকটে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তাজ খান পরাজিত হয়ে চুনার অভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে মুহম্মদ শাহ আদলির খাস জমির কয়েকজন রাজস্ব আদায়কারী যথাসম্ভব নগদ অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্যাদি আদায় করেন। ঐ সকল পরগণা থেকে একশ' হাতীর এক 'হল্‌কা' সংগ্রহ করেন এবং গঙ্গা-তীরবর্তী কয়েকটি জেলার ও খাওয়াশপুর টাণ্ডার শাসনকর্তাদ্বয় তাঁর ভ্রাতা আহমদ খান ও ইলিয়াস খানের সঙ্গে

মিলিত হয়ে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেন। মুহম্মদ শাহ আদলি গোয়ালিয়র থেকে সসৈন্যে কারারানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। গঙ্গা নদীর তীরে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। মুহম্মদ শাহ আদলির প্রধান সেনাপতি হিমু মুদি[১২১] এক হল্‌কা হাতী নিয়ে গঙ্গা পার হয়ে যুদ্ধ করেন ও জয়ী হন। এবং আদলীর ভগ্নিপতি ইবরাহীম খান সুর[১২২] এই সময় পলায়ন করতঃ দিল্লী দখল ক'রে গোলমাল সৃষ্টি করেন। সুতরাং, কারারানীদের বিরুদ্ধে অভিযান স্থগিত রেখে আদলিকে দিল্লী অভিমুখে বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হয়। ফলে, কারারানীরা স্বাধীন হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাজ খান কারারানী গৌড় নগর দখল ক'রে নয় বৎসরকাল রাজত্ব করেন ও বাংলারাজ্য জয় করেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যু হয়।

সুলেমান কারারানীর রাজত্ব[১২৩]

কর্মজীবনের প্রথম দিকে সুলেমান কারারানী শের শাহের অধীনে একজন আমীর ছিলেন। শের শাহ তাঁকে সুবে-বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং সলিম শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল ছিলেন। সলিম শাহ যখন অনন্তে মিশে যান, তখন হিন্দুস্তানের গোষ্ঠীপতিদের মনে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। ভ্রাতা তাজ খানের মৃত্যুর পর সুলেমান খান নিজেকে বাংলা ও বিহারের সম্পূর্ণ স্বাধীন সুলতানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। খারাপ আবহাওয়ার জন্য তিনি গৌড় নগরী ত্যাগ ক'রে টাণ্ডা[১২৪] শহরে রাজধানী স্থাপন করেন। ৯৭৫ হিজরীতে তিনি উড়িষ্যা জয় করেন এবং তথায় একজন গভর্নরের অধীনে স্থায়ীভাবে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী রেখে তিনি কুচবিহার জয়ের জন্য যাত্রা করেন। কুচবিহারের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ অধিকার করার পর তিনি সংবাদ পান যে, উড়িষ্যায় বিদ্রোহীরা আবার মাথা

চাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রয়োজনবশতঃ তিনি কুচবিহার[১২৫] শহরের অবরোধ তুলে রাজধানী টাণ্ডায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেইসময় এইভাবে কিছুকাল সমগ্র হিন্দুস্তানে গোলমাল আরম্ভ হয়েছিল। বাদশাহ হুমায়ুন যখন পারস্য থেকে হিন্দুস্তানে ফিরে আসেন, তখন সুলেমান খান দূরদর্শিতা-বশতঃ উপহারসহ আনুগত্য স্বীকার ক'রে হুমায়ুনের নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। অপর পক্ষ তখন শের শাহের বংশধর ও সমর্থকদের ধ্বংসকার্যে ব্যস্ত থাকায় উক্ত উপহারসমূহ গৃহীত হয়; এবং উত্তরে সুলেমানের নিকট আশ্বাসসূচক ও সদিচ্ছামূলক পত্রসহ তাঁকে তাঁর পদে বহাল রেখে এক বাদশাহী ফরমান প্রেরিত হয়। এরপর, যদিও বাংলারাজ্যে[১২৬] সুলেমান নিজের নামে খোত্‌বা ও মুদ্রা চালু রেখেছিলেন, তথাপি তিনি নিজেকে 'হযরতে-আলা' (সর্ব প্রধান) রূপে অভিহিত করতেন ও বাহ্যত জালাল-উদ্দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহের আনুগত্যের চিহ্নস্বরূপ মাঝে মাঝে উপহার প্রেরণ করতেন। প্রায় ষোলো বৎসর[১২৭] স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার পর ৯৮১ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি অত্যন্ত উদ্দমশীল, পরিশ্রমী ও কঠোর নিয়মানুবর্তী ছিলেন। ফেরিশ্‌তার ইতিহাসে তাজ খানের রাজত্বের উল্লেখ নাই এবং বলা হয়েছে যে, সুলেমান খান পঁচিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন। প্রথমাবধি উভয় ভ্রাতা যুগ্মভাবে দেশ শাসন করতেন এবং তাজ খান পরে (একা) রাজত্ব করেছিলেন; সেই কারণে উভয়ের রাজত্বকাল একজনের নামে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা জানেন।

সুলেমান খানের পুত্র বায়াজিদ খানের রাজত্ব[১২৮]

সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বায়াজিদ খান বাংলার সিংহা-সনে আরোহণ করেন। এক মাস অতীত হওয়ার পূর্বেই (অল্প

বিবরণীতে এক বৎসর ছ'মাস রাজত্ব করার পর) হাঁসো নামক জনৈক আফগান (এই ব্যক্তি বায়াজিদের চাচাতো ভাই ও ভগ্নিপতি ছিল) কূটকৌশল অবলম্বন করে ও দরবারকক্ষে বায়াজিদকে হত্যা করে এবং বাংলার শাসক হওয়ার চেষ্টা করে।[১২৯] এতে সুলেমান খানের প্রধান ও বিশ্বাসী কর্মচারী লোদি খান ক্ষুব্ধ হ'য়ে তাকে (হাঁসোকে) হত্যা করার চেষ্টা করেন। এক বিবরণীতে দেখা যায়, আড়াই দিন পরে সুলেমানের ছোট ভাই দাউদ খান তাকে (হাঁসোকে) হত্যা ক'রে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। যাইহোক, বায়াজিদের পর তাঁর ভ্রাতা দাউদ খান সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলেমান খানের পুত্র দাউদ খানের রাজত্ব

দাউদ খান[১৩০] সিংহাসনে আরোহণের পর বাংলার সমস্ত অঞ্চল বশীভূত ক'রে নিজের নামে খোত্‌বা ও মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি সর্বদা মদ্যপান করতেন এবং নীচ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশতেন; তাঁর সৈন্যসংখ্যা ও লোক-লস্কর ছিল অসংখ্য; সাজসজ্জা ছিল বেশুমার; অর্থ ও সম্পদ ছিল প্রচুর; মর্যাদা ও সম্মান ছিল উচ্চ। (তাঁর ৪০,০০০ সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য; ৩৩০০ হস্তী; ১,৪০,০০০ পদাতিক সৈন্য; এদের মধ্যে বন্দুকধারী, গোলন্দাজ, তীরন্দাজ প্রভৃতি সকল শ্রেণীর সৈন্যই ছিল; ২০,০০০ আগ্নেয়াস্ত্র—এর অধিকাংশ প্রাচীর ধ্বংসকারী কামান; বহু সশস্ত্র নৌযান ও যুদ্ধের অন্যান্য সরঞ্জাম মওজুদ ছিল)। এই সকল কারণে তিনি উদ্ধত হয়ে বাদশাহ আকবরের সাম্রাজ্যের সীমান্তে গোলযোগ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করেন। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে এই নীতি ত্যাগ করতে পরামর্শ দেয়া সত্ত্বেও তিনি সেদিকে কর্ণপাত করেন

নাই। তখন খান-ই-খানান উপাধিধারী মুনিম খান[১৩১] আকবরের অধীনে জৌনপুরের শাসনকর্তা ছিলেন ও তিনি পাঁচ-হাজারি মনসবদার ছিলেন। বাদশাহের আদেশানুযায়ী তিনি দাউদ খানকে ধ্বংস ও নির্মূল করার জন্য মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রথমে একটি ক্ষুদ্র অগ্রগামী সৈন্যদল প্রেরণ করেন। এই সংবাদ পেয়ে দাউদ খান তাঁর প্রধান আমীর লোদী খান আফগানকে অগ্রগামী মুঘল সৈন্যদলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। পাটনায় উভয় দল পরস্পরের সম্মুখীন হয় এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হয়। অবশেষে উভয় দল চুক্তি সম্পাদনের পর স্ব স্ব এলাকায় ফিরে যায়। কিন্তু বাদশাহ আকবর এই চুক্তি অনুমোদন করতে অসম্মত হন এবং রাজা টোডর মলকে[১৩২] (এক হাজারী পদে উন্নীত ক'রে) বাংলার প্রশাসক পদে নিযুক্ত করেন। খান-ই-খানানের বাহিনী থেকে সৈনাধ্যক্ষ ও সৈন্যদের আলাদা করতঃ টোডর মলের অধীনে যোগ ক'রে দাউদ খানকে শাস্তি দেয়ার জন্য তাঁকে (টোডর মলকে) অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেয়া হয়। সেইসঙ্গে খান-ই-খানানকে বিহার জয় করার আদেশ দেয়া হয়। সেইসময় দাউদ খান ও লোদি খানের মধ্যে কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতা হওয়ায় দাউদ খানের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে লোদি খান সমঝোতার জন্য খান-ই-খানানের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন এবং বাদশাহ আকবরের বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করার মনোভাব ব্যক্ত করেন। কতলু খান নামক অন্য একজন আফগান-কর্মচারীর সঙ্গে লোদি খানের শত্রুতা ছিল; তিনি দাউদ খানের নিকট লোদি খানের বিরুদ্ধে আকবরের আমীরদের সাথে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করেন। দাউদ খান এই অবস্থা অবগত হওয়ার পর লোদি খানকে এক নরম পত্র লিখে ডেকে পাঠান; এবং তিনি উপস্থিত হওয়ার পর তাঁকে (লোদি খানকে) নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। অথচ, লোদি খান বিজ্ঞতা, সাহসিকতা ও বিরত্বের জন্য খ্যাত ছিলেন। অতঃপর, দাউদ খান নিজে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ আকবরের সৈন্যবাহিনীর সাথে মোকাবিলা করার জন্য সোন নদীর তীর অভিমুখে অগ্রসর হন। সোন, প্রো ও গঙ্গা এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে এক বিরাট নৌ-যুদ্ধ হয়।

যুবক বৃদ্ধ সকলে এই যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল,
অবিরাম বর্শা ও তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য।
নিক্ষিপ্ত ছোরা আকাশে পৌঁছাচ্ছিলো,
বক্ষ বিদীর্ণ হওয়ায় নদীতে রক্ত-বন্যা
প্রবাহিত হচ্ছিলো।
যুদ্ধ-কুঠার বীরদের লৌহ-শিরস্ত্রাণের উপর
বসে যাচ্ছিলো,
যুদ্ধরত মোরগের মাথার উপর চিরুণীর মতো।

পরিশেষে, আকবরের ভাগ্য জয়ী হয়; আফগানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে থাকে ও পাটনায় আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের কতকগুলো যুদ্ধ-জাহাজ মুঘলদের হস্তগত হয়। খান-ই-খানান তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন ও দ্রুত অগ্রসর হয়ে পাটনা উপস্থিত হন এবং দাউদ খান তথাকার যে দুর্গে ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন সেই দুর্গ অবরোধ ক'রে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন।

যখন দুর্গ আক্রমণেব সংকেত দেয়া হয়,
তখন উভয় পক্ষের শত শত কামান ও বন্দুক গর্জে ওঠে।
কামানের গর্জন ও ধোঁয়ায় (চারিদিক) এমন
কালো মেঘে আবৃত হয়ে গেল যেন সেখানে
গর্জনকারী দেবদূতের বাসস্থান হয়ে গেলো,
শিলাবৃষ্টির মতো অবিরাম গোলার আঘাতে,
(উভয় পক্ষের) সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ধ্বংসলীলা
শুরু হলো।

এই সংবাদ যখন বাদশাহ আকবরের নিকট পৌঁছায় তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর নিজের চেষ্টা ব্যতীত পাটনার দুর্গ জয় করা সম্ভব হবে না। সেই কারণে, বাদশাহ সাহসিকতার সাথে রাজবংশীয় সকলকে ও আমীরদের সঙ্গে নিয়ে এক হাজার নৌকাযোগে যাত্রা করেন এবং বর্ষার মওসুমের জন্য নানা রংএর আচ্ছাদন তৈরী করা হয়। পাটনার

নিকটবর্তী হওয়ার পর তিনি (বাদশাহ্) সংবাদ পান যে, দাউদ খানের অন্যতম বিশ্বস্ত সৈনাধ্যক্ষ আয়েশ খান নিয়াজি দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুঘল সৈন্য আক্রমণ করেছেন ও খান-ই-খানানের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন এবং দুর্গস্থ সৈন্যগণ পলায়নের চিন্তা করছে। বাদশাহ্ তখন খান আলিমের[১৩৩] অধীনে তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে হাজীপুর দুর্গ আক্রমণের আদেশ দেন। খান আলিম সেখানে পৌঁছে ফতেহ্ খানের নিকট থেকে দুর্গ কেড়ে নিয়ে নিজ অধিকারভুক্ত করেন। হাজীপুর দুর্গের পতনের সংবাদ প্রাপ্তির পর দাউদ খান নিজ অসদাচণেব জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'বে সম্রাট আকবরের নিকট বিজ্ঞ দূত প্রেরণ করেন। উত্তরে সম্রাট জানান যে, দাউদ খান নিজে উপস্থিত হলে তাঁকে ক্ষমা করা হবে। আর, যদি নিজে উপস্থিত না হতে চান তাহলে নিম্নোক্ত তিনটির যে-কোনো একটা পন্থা তাঁকে বেছে নিতে হবে: "(১) হয় তিনি নিজে আমার সঙ্গে (একক) যুদ্ধ করতে পারেন; (২) অথবা, তিনি তাঁর কোনো আমীরকে আমার কোনো আমীরেব সঙ্গে (একক) যুদ্ধের জন্য পাঠাতে পারেন; (৩) অথবা, তিনি তাঁর একটি যুদ্ধ-হস্তীকে আমার একটি যুদ্ধ-হস্তীর সঙ্গে (একক) যুদ্ধ করতে পাঠাতে পারেন; এর মধ্যে যে-কোনোটিতে যে জয়ী হবে, দেশ তার হবে।" এই সংবাদ প্রাপ্তির পর দাউদ খান ভীত হয়ে পড়েন এবং পাটনায় থাকা সুবিধাজনক নয় মনে ক'বে রাত্রিকালে লৌহ-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে সব-কিছু ফেলে রেখে নৌকা-যোগে বাংলা অভিমুখে পলায়ন করেন। বাদশাহী বাহিনী পাটনা ও হাজীপুর দুর্গদ্বয় অধিকার করেন। সম্রাট আকবর পরাজিত আফগান-বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। দাউদ খানের চারিশত হাতী ও অন্যান্য মালমাত্তা মুঘল বীরদের হস্তগত হয়। পরাজিতদের মধ্যে যারা পালিয়ে যেতে পেরেছিল তারা প্রাণে বেঁচে গেলো; যারা ধরা পড়লো তারা নিহত হল। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি অধিকার করার ও দাউদ খানকে নির্মূল করার জন্য মুনিম খানকে ভার দিয়ে বাদশাহ দরিয়া-পুর[১৩৪] থেকে ফিরে যান। খান-ই-খানান যখন শকরিগলি পৌঁছান, তখন দাউদ খান অসহায় হ'য়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। রাজা টোডর

মল ও আকবরের অন্য কয়েকজন আমীর উড়িষ্যার পথে[১৩৫] দাউদ খানের পশ্চাদ্ধাবনকালে দাউদ খানের পুত্র জুনায়েদ খানের সঙ্গে যুদ্ধে দু'বার পরাজিত হন। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর মুনিম খান নিজেই[১৩৬] উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন। দাউদ খান তাঁর সঙ্গে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হন; এবং উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার পর যুদ্ধার্থে সজ্জিত হয়।[১৩৭]

বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে সজ্জিত হ'য়ে দাঁড়ালো,
ছোরা, তীর ও বর্শা নিয়ে সশস্ত্র হয়ে।
দু'পক্ষের সৈন্যবাহিনী পর্বতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো,
একটি ভীতভাবে, অন্যটি নির্ভীকভাবে।
সকলেই একে-অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হল,
এবং আক্রমণ করলো, নিজেরাও আক্রান্ত হল
বন্দুক, তীর ও বর্শা দ্বারা।
উভয় বাহিনীর বীরদের রক্তে
যুদ্ধক্ষেত্রে বন্যা ব'য়ে যেতে লাগলো।
যুদ্ধক্ষেত্রে বহুজন নিহত হয়ে পড়ে রইলো,
উভয় পক্ষের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে উঠলো।

গুজরা[১৩৮] নামক জনৈক আফগান বীরত্বে তৎকালে রুস্তমের মতো ছিল। সে দাউদ খানের অগ্রগামী সৈন্যদলের নেতা ছিল। খান-ই-খানানের অগ্রগামী সৈন্যদলের সেনাপতি খান-ই-আলিমকে দুর্ধর্ষভাবে আক্রমণ করে এবং বাদশাহী পুরোভাগের বাহিনীকে পর্যুদস্ত ক'রে খান-ই-আলিমকে নিহত করে। দাউদ খানের আক্রমণে বাদশাহী সৈন্য-দলের পুরোভাগ ও মধ্যভাগের মধ্যস্থ কিছুসংখ্যক সৈন্য পর্যুদস্ত হয়ে মধ্যভাগের দিকে পশ্চাদ্গমন করায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অবশিষ্ট অল্প-সংখ্যক সৈন্য, যারা আক্রমণ প্রতিহত ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, খান-ই-খানান তাদের নিয়ে গুজরার সামনে অগ্রসর হন এবং দৈবক্রমে গুজরা ও খান-ই-খানানের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

দুই বীরের যুদ্ধ যখন আরম্ভ হ'ল
তাঁরা উভয়ে চক্‌চকে তলোয়ার খাপ থেকে
বে'র করলেন।
একবার একজন ও তারপর অন্যজন (প্রতিদ্বন্দ্বীকে)
তলোয়ারের আঘাত করতে লাগলেন,
বীরের উপযুক্ত রূপে।
একজন অপরের বর্ম ভেদ করতে পারলেন না,
অন্যজন ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করলেন।
অবশেষে, গুজরার তরবারির আঘাতে
খান-ই-খানান আহত হলেন।
অন্য সমর্থকরা এসে
দুই যোদ্ধার মাঝে এসে বাধা দিলো।

খান-ই-খানান এই অবস্থাতে যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং ছত্রভঙ্গ মুঘল সৈন্যরা যখন আবার তাঁর পাশে এসে সমবেত হ'ল, তখন তিনি পুনরায় গুজরার সঙ্গে লড়াই করতে অগ্রসর হলেন।

গুজরা যখন দ্বিতীয়বার যুদ্ধ করতে এলো,
(তখন) নিয়তির নির্দেশে ধনুক থেকে
তীর এসে সোজা তার কপালে আঘাত করলো
তীর তার মস্তক ভেদ ক'রে বেরিয়ে গেলো।
গুজরা যুদ্ধক্ষেত্রে পড়লো পাহাড়ের মতো,
তার পতনে তার সৈন্যদল সাহস হারালো।
যখন ভাগ্য দাউদ খানের দিক থেকে মুখ ফেরালো,
চারিদিক থেকে দুর্ভাগ্য এসে তাকে চেপে ধরলো।
দাউদ খান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন,
তিনি বিজয়ের স্বপ্ন আর দেখেননি।

দাউদ খান নিরাশ হয়ে যুদ্ধ-হস্তী ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ফেলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। রাজা টোডর মল ও অন্যান্য আমীরগণ

দাউদ খানের পশ্চাদ্ধাবন করেন।[১৩৯] চিন[১৪০] নদীর নিকটবর্তী হয়ে দাউদ খান কটকের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পলায়নের সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি পরিবারবর্গ ও সন্তানদের দুর্গের মধ্যে রেখে নিজে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হলেন এবং কাঁধে কাফন নিয়ে মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে অগ্রসর হলেন। রাজা টোডর মল পরিস্থিতি সম্বন্ধে খান-ই-খানানকে সংবাদ দিলেন। আহত থাকা সত্ত্বেও খান-ই-খানান বাতাসের মতো দ্রুত সেইদিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু দাউদ খান জনৈক আমীরের মাধ্যমে সন্ধি প্রার্থনা করলেন এবং সন্ধির[১৪১] শর্ত সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি (দাউদ খান) মুনিম খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। খান ই-খানান বীরত্ব ও ঔদার্য প্রকাশ করতঃ তাঁকে (দাউদকে) একটি কোমর-বন্দ, একটি ছোরা ও মুক্তা-বসানো একটি তরবারি উপহার দেন এবং উড়িষ্যা ও কটক বেনারস অঞ্চল ছেড়ে দেন এবং (সম্রাটের পক্ষে) তাঁর রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল অধিকার ক'রে বিজয়ী হয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে টাণ্ডা নগরে প্রবেশ করেন ও শাসনের সুব্যবস্থা করতে প্রবৃত্ত হন। মুহম্মদ বখতিয়ার খালজীর আমল থেকে শের শাহের আমল পর্যন্ত গৌড় ছিল বাংলার রাজধানী (যদিও গৌড়ের আবহাওয়া বিদেশীদের অনুকূল না হওয়ায় আফগানরা শাসকবর্গের অবস্থিতির জন্য খাওয়াশ-পুর টাণ্ডা শহর তৈরী করেছিলো)। গৌড় নগরী পুনরায় নির্মাণের উদ্দেশ্যে খান-ই-খানান সেখানে গিয়ে নতুন ক'রে নগর তৈরী করেন এবং সেখানেই তাঁর সদর দফতর স্থাপন করেন। অল্পদিন পরে মন্দ আবহাওয়ার জন্য তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৯৮৩ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়।[১৪২]

খান-ই-খানানের মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্তির পর দাউদ খান আফ-গানদের সাহায্যে বাংলা ও বিহার পুনরায় দখল করেন ও খাওয়াশপুর টাণ্ডা শহর অধিকার করার জন্য অবিলম্বে অগ্রসর হন। বাদশাহী সৈন্যরা থাকতে না পেরে শহর ত্যাগ করে। দাউদ খান পুনরায় তাঁর পূর্ব-স্বাধীনতা পূর্ণরূপে অর্জন করেন।

নওয়াব খানজাহান খানের শাসনকাল ও দাউদ খানের মৃত্যুর বিবরণ

মুনিম খান—খান-ই-খানানের মৃত্যু-সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছানোর পর বাদশাহ আকবর বাংলার শাসনকর্তারূপে হোসেন কুলী খান তুর্কমানকে খানজাহান[১৪৩] উপাধি দিয়ে প্রেরণ করেন। যখন খানজাহান বাংলার সীমান্তে পৌঁছান, তখন খাজা মুজাফ্‌ফর আলী তুরবতী[১৪৪]—যিনি বাহরাম খানের[১৪৫] কর্মচারী ছিলেন ও যাকে মুজাফ্‌ফর খান উপাধি দিয়ে বিহারের শাসনকর্তা নিয়োগ কবা হয়েছিল এবং যিনি রোটাস দুর্গ জয় করার জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন—তিনি বিহার, তিরহুত, হাজীপুর প্রভৃতি স্থানের সৈন্যবাহিনীসহ খানজাহানের সঙ্গে যোগদান করেন। বাদশাহী সৈন্যদলসমূহ একত্রিত হয়ে তেলিয়াগড়ি ও শকরিগলি দুর্গ অধিকারের জন্য প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়। দাউদ খানও এক প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্যবাহিনীসহ গড়ি ও টাণ্ডার মধ্যপথে আক-মহলে[১৪৬] খানজাহানের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু খান-জাহান আগেই প্রচণ্ড আক্রমণ দ্বারা গড়ি দখল করেন ও ১৫০০ আফ-গানকে হত্যা ক'রে দাউদ খানের ঘাঁটি অভিমুখে অগ্রসর হন। ৯৮৩ হিজরীর ১৫ই মুহর্‌রম বৃহস্পতিবার দিন উভয়পক্ষ পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়ার পর সৈন্যবাহিনীদ্বয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হ'ল ;
যোদ্ধারা লড়াইয়ের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলো।
যখন যুদ্ধের বাজার গরম হয়ে উঠলো,
তখন যোদ্ধারা তীক্ষ্ণ তরবারি নিয়ে পরস্পরকে
আক্রমণ করলো।

কামান-গর্জনে ও হাওইয়ের শব্দে
আকাশ পর্যন্ত কেঁপে উঠলো।

দাউদ খানের অন্যতম প্রখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড় খানজাহা-নের[১৪৭] দক্ষিণ অংশ আক্রমণ ও বিপর্যস্ত ক'রে তুললো এবং মুজাফ্‌ফর

খান দাউদ খানের বাম অংশ আক্রমণ ক'রে একে হঠিয়ে দিলেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে খানজাহান দাউদ খানের বাহিনীর মধ্যভাগ আক্রমণ করলেন। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হল।

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে[১৪৮] দ্বৈরথ যুদ্ধ হতে লাগলো;
উভয় বাহিনীর বহু লোক ক্ষয় হ'ল।
মৃতদেহের বহু স্তূপ হতে লাগলো,
এবং মহাপ্রলয়ের দিনের চিহ্ন প্রকাশ হ'ল।
বিখ্যাত বীর খানজাহান যুদ্ধে
দাউদের সৈন্যবাহিনীকে ধূলিসাৎ ক'রে দিলেন:
যেদিকে তরবারি তোলেন সেদিকেই শত্রুর
দেহ দ্বিখণ্ডিত হচ্ছিলো।
ওদিকে দাউদ তাঁর তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা,
খানজাহানের সৈন্যদের বিপর্যস্ত ক'রে তুললেন:
যেদিকে তরবারি ফেরান, সেইদিকেই শত্রুর
শিরস্ত্রাণ তার পায়ে পড়ছিলো।
যদি তীক্ষ্ণ তরবারি দিয়ে তিনি ঘোড়াকে আঘাত করেন,
তা'হলে অশ্ব হয়ে যাচ্ছিলো দ্বিখণ্ডিত।
এবং যদি কোনো ব্যক্তির বুকে বর্শার আঘাত করছিলেন,
সেটা তার পিঠ ফুঁড়ে বেড়িয়ে যাচ্ছিলো।
সেই উগ্র সিংহ বাহুবলে
অনেককে হত্যা করলেন ও আহত করলেন অনেককে।
কিন্তু ভাগ্য তাঁর অনুকূল না হওয়ায়,
তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণ প্রতিহত ক'রে দাঁড়াতে
পারলেন না।
তিনি পরাজিত হলেন; এবং সমস্ত ধনসম্পদ হারালেন,
দুর্ভাগ্য তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে চললো।

যখন বিজয় ও জয়োল্লাসের ইগল পাখী বাদশাহ আকবরের সৈন্যবাহিনীর উপর ছায়াপাত করলো এবং দাউদ খান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

পলায়ন করলেন, তখন খানজাহানের বীর সৈন্যরা পশ্চাদ্ধাবন ক'রে দাউদ খানকে বন্দী করতঃ খানজাহানের নিকট হাজির করলো। দাউদ খানকে গোলমাল ও বিদ্রোহের উৎস গণ্য ক'রে খানজাহান তাঁকে হত্যা করলেন।[১৪৯]

তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তাঁর মস্তক কেটে ফেলা হ'ল,
দাউদের রক্তে মাটি লাল হয়ে উঠলো।
(বাংলার) রাজসিংহাসন রাজা-শূন্য হয়ে গেলো,
বাংলা থেকে রাজগী অন্তর্হিত হল।

দাউদ খানের পুত্র জুনায়েদ খান যুদ্ধে মারাত্মকরূপে আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করলেন। দুই-তিন দিন পর তাঁরও মৃত্যু হয়। খান-ই-খানানের অধীনে যতটা অঞ্চল ছিল খানজাহান তার সবটাই বশীভূত করেন এবং আফগানদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হস্তী ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বাদশাহ আকবরের নিকট প্রেরণ করেন। মুজাফ্ফর খান দামামা-ধ্বনি সহকারে পাটনায় ফিরে যান এবং ৯৮৪ হিজরীতে রোটাস[১৫০] অধিকারে মনোনিবেশ করেন।

দাউদ খানের কয়েকজন আমীরের ধ্বংসের বিবরণ

মুজাফ্ফর খান পাটনা প্রত্যাবর্তনের পথে মুহম্মদ মাসুম খানকে[১৫১] এক সৈন্যদলসহ হুসেন খান আফগানের[১৫২] বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। হুসেন খান আফগান ঐ সময় উক্ত অঞ্চলে ছিলেন। মাসুম খান তখন হুসেন খানকে পলায়ন করতে বাধ্য করেন ও তাঁর নিজ জায়গীর উক্ত পরগণার দুর্গে প্রবেশ করেন। কালাপাহাড় ৮০৩

অশ্বারোহী সৈন্যসহ মাসুম খানকে দুর্গে অবরোধ করেন। (সম্মুখ দিকে) দুর্গ প্রাচীর-আক্রান্ত ও ভগ্নপ্রায় দেখে মাসুম খান পশ্চাদ্দিকের প্রাচীর ভেঙ্গে বেরিয়ে এসে কালাপাহাড়ের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ যুদ্ধের উগ্র উত্তেজনার মধ্যে কালাপাহাড়ের যুদ্ধ-হস্তী শুঁড় দিয়ে মাসুম খানের ঘোড়াকে ভূতলশায়ী করে; মাসুম খানকেও মাটিতে ফেলে দেয়। ইতিমধ্যে মুঘল তীরন্দাজগণ কালাপাহাড়ের হাতীর মাহুতকে তীরের আঘাতে হত্যা করে। তখন চালকহীন হাতী ফিরে নিজের পক্ষের সৈন্যদের আক্রমণ করে ও বহুসংখ্যক আফগানকে পদতলে দলিত করে। এই কারণে আফগানরা পরাজিত হয় এবং কালাপাহাড়ও নিহত হন। খানজাহানের চেষ্টায় উড়িষ্যা, কটক-বেনারস প্রদেশ এবং সমগ্র বাংলা ও বিহার রাজ্য আকবরের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলার রাজা (বা সুলতানদের) ভাগ্য এখানেই শেষ হয়ে যায় এবং এরপর আর কেউ নিজ নামে খোতবা পাঠ অথবা মুদ্রা প্রচলন করতে পারেন নাই। হুসেন খান ও কালাপাহাড়ের মতো নেতৃস্থানীয় আফগান-আমীরগণ পূর্বোক্তরূপে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যান এবং কিছু-সংখ্যক (আফগান আমীর) বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের জঙ্গলে পালিয়ে যান।[১০৩] ৯৮৭ হিজরীতে খানজাহানের মৃত্যু হয়।[১০৪] তখন যে সকল আফগানরা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল তারা বিভিন্ন স্থান থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় দেশ অধিকার করার চেষ্টা করে। তাদের মধ্যে ওসমান খান নামক একজন প্রধান আফগান-সেনাপতি আফগানদের ঐক্যবদ্ধ ক'রে বিদ্রোহ করেন। বাদশাহ আকবর তখন খান-আজিম মির্জা-কোকাকে[১০৫] অন্য কয়েকজন প্রধান আমীরসহ বাংলা ও বিহার শাসনের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি আফগানদের ধ্বংস ও নির্মূল করার জন্য প্রশংসনীয় চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তাতে ব্যর্থ হন তখন শাহবাজ খানকে[১০৬] বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। এরপর ওসমান খানের সঙ্গে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। উগ্র বাদশাহী সৈন্যগণ ক্রমাগত আফগান-বিদ্রোহীদের বন্দী ও হত্যা করতে লাগলো। ১০১৪ হিজরীতে বাদশাহ আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত আফগানদের সম্পূর্ণ

ধ্বংস করা সম্ভব হয় নাই। ওসমান খান আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন এবং কুড়ি হাজার আফগানকে একত্রিত ক'রে তিনি নিজ অঞ্চলে নিজের নামে খোতবা পাঠ চালু করেন। বহুসংখ্যক অনুগামী থাকায় তিনি আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেন ; এবং এই দেশে অবস্থানরত বাদশাহী কর্মচারীদের তোয়াক্কা না ক'রে তিনি বাদশাহী অঞ্চল জয় করতে অগ্রসর হন।

এবারে আমি আমার পুরা-কাহিনীর লেখনী বাংলার নাজিমগণ—যাদের চুঘতাই[১৫৭] সম্রাটগণ বাংলার নিজামতের উচ্চ খেলাত লাভ ক'রে সম্মানিত হয়েছিলেন এবং যারা কর্তৃত্বের পতাকা উত্তোলন ক'রে এই দেশকে বিদ্রোহের পরগাছা থেকে মুক্ত করেছিলেন, তাদের বিবরণী অংকিত করবো।

চতুর্থ পর্ব

দিল্লীর তৈমুর-বংশীয় বাদশাহদের দ্বারা নিয়োজিত
বাংলা-নিজামতের নাজিমদের শাসনের বিবরণী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (ক)

রাজা মানসিংহের নিজামত

১০১৪ হিজরীর ১১শে জমাদি-উস-সানি তারিখে নূরুদ্দীন মুহম্মদ জাঁহাগীর বাদশাহ আগ্রা দুর্গে বাদশাহী সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিমাধ্যে সরকারী দফতরের পত্রাদিতে, সংবাদে ও কর্মচারীদের পত্রাদিতে ওসমান খানের বিদ্রোহের সংবাদ অনবরত পাওয়া যাচ্ছিলো। জাঁহাগীর যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করেন সেইদিনই রাজা মানসিংহকে মূল্যবান খেলাত ও 'চারকল', মণিমুক্তা বসানো একটি তরবারি ও একটি উত্তম অশ্ব উপহার দিয়ে সুবে-বাংলার নিজাম নিয়োগ করেন। সেইসঙ্গে ওয়াজির খানকে প্রদেশের দেওয়ান ও হিসাব-পরীক্ষক পদে নিয়োগ করেন।[১] তাঁরা বাংলায় পৌঁছানোর পর ওসমান খান তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হন এবং যুদ্ধ হতে থাকে। ওসমান অত্যন্ত কৌশলে সন্ধি-আলোচনার প্রস্তাব প্রেরণ করেন। যুদ্ধ বিলম্বিত ও আফগানেরা নির্মূল না হওয়ায় সিংহাসনে আরোহণের সেই বৎসরেই রাজা মানসিংকে[২] ফেরত ডেকে পাঠানো হয় এবং তাঁর স্থলে একই রকম খেলাত, মুক্তা-খচিত কোমরবন্দ ও স্বর্ণ-খচিত জিন সহ একটি ঘোড়া উপহার দিয়ে কুতবউদ্দীন খান কোকলতাশকে সুবে-বংলায় প্রেরণ করা হয়। রাজা মানসিংহ আট মাস ও কয়েকদিন সুবাদারি করেছিলেন।

কুতবউদ্দীন খানের নিজামত

১০১৫ হিজরীর ৯ই সফর তারিখে কুতবউদ্দীন কোকলতাশকে[৩] বাংলার নিজামতের পদে নিয়োগ ক'রে সম্মানিত করার সময় তাঁকে পাঁচ-

হাজারি মনসবদারি পদে উন্নীত করা হয় ; পাঁচ হাজার সৈন্য ও অশ্বারোহী রাখার অনুমতি দেয়া হয় ; ভাতা বাবদ দেয়া হয় দু'লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য তিন লক্ষ টাকা। বাদশাহের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে তিনি বাংলায় পোঁছান। কয়েক মাস অতীত হওয়ার পূর্বেই কুলী বেগ আস্তাল্‌জ ওরফে শের-আফগান খান[৪] কর্তৃক তিনি নিহত হন। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ এই : আলী কুলী আস্তাল্‌জ ছিলেন শাহ তাহ্‌মাস্প সাফাভীর[৫] পুত্র শাহ ইসমাঈলের[৫] খানসামা। শাহ ইস-মাঈলের মৃত্যুর পর তিনি কান্দাহার হয়ে ভারতে আসেন। মুলতানে আবদুর রহীম খান খান-ই-খানানের[৬] অধীনে চাকুরী নেন। খান-ই-খানান তখন থাটাহ্ ও সিন্ধু বিজয়ে ব্যস্ত ছিলেন। খান-ই-খানান প্রথমে তাঁকে বেসরকারীভাবে বাদশাহী কর্মচারীভুক্ত করেন। উক্ত অভিযানে আলী কুলী বীরত্ব প্রদর্শন ও মূল্যবান কাজ করেন। খান-ই-খানান উক্ত অভিযান থেকে বিজয়ী হয়ে বাদশাহের সামনে উপস্থিত হওয়ার পর তারই অনুরোধে আলী কুলীকে উপযুক্ত মসনব দেয়া হয় এবং সেইসময়ই মির্জা গিয়াস বেগ তেহরানির[৭] কন্যা মেহেরুন্নিসার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেয়া হয়। যখন বাদশাহ আকবর দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ের জন্য আকবরাবাদ (আগ্রা) থেকে যাত্রা করেন এবং যুবরাজকে (শাহজাদা সেলিম, পরে বাদশাহ জাঁহাগীর) উদয়পুরের রানার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করা হয়, তখন আলী কুলী বেগকে যুবরাজের সঙ্গে পাঠানো হয়।[৮] যুবরাজ সন্তুষ্ট হয়ে তাকে শের-আফগান উপাধি দেন এবং সিংহাসনে আরোহণের পর সুবে-বাংলার বর্ধমানে একটি জায়গীর দিয়ে তাঁকে সেখানে পাঠান। পরে যখন তাঁর অসাধু আচরণ, অনতভা ও বদ-মেজাজের সংবাদ বাদশাহ অবগত হন, তখন কুতব খানকে বাংলায় প্রেরণের জন্য বাদশাহ্ তাকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, যদি শের-আফগানকে উত্তম ব্যবহার করতে ও অনুগত দেখা যায় তা'হলে ভাল ; যদি তা না হয়, তাকে যেন বাদশাহের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয় ; আর এতে তিনি অস্বীকৃত হলে তাকে যেন শাস্তি দেয়া হয়। কুতবউদ্দীন খান বাংলায় পোঁছে শের-আফগানের আচরণে ও ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হন। তাকে তাঁর সামনে

হাজির হতে আদেশ দিলেও শের-আফগান টালবাহানা ক'রে উপস্থিত হন নাই। কুতবউদ্দীন খান এই সংবাদ বাদশাহকে দিলে তিনি পূর্ব-ইঙ্গিত মতো তাকে শাস্তি দেয়ার আদেশ দেন। উক্ত খান বাদশাহের আদেশ পাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ দ্রুত বর্ধমানের দিকে অগ্রসর হন। খানের পৌঁছানোর সংবাদ পেয়ে শের-আফগান দু'জন সহিস সঙ্গে নিয়ে তাঁকে অভ্যার্থনা করতে যান। সাক্ষাতের সময় কুতবউদ্দীন খানের সৈন্যরা একটু তফাতে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। শের-আফগান বলেন, "এ কি রকম ব্যবহার এবং এর উদ্দেশ্য কি?" খান তাঁর সৈন্যদের সরে যেতে বলেন এবং একা অগ্রসর হয়ে শের-আফগানের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেন। শের আফগান এর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষণ দেখে রোগের আক্রমণের পূর্বেই এর প্রতিকার করা উচিৎ গণ্য করেন ও অতি দ্রুত কুতবউদ্দীনের পেটে তরবারির এমন আঘাত করেন যে, তাতে তাঁর নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসে। খান[৯] দু'হাতে পেট চেপে ধ'রে চীৎকার ক'রে বলেন, "একে ছেড়ে দিও না—বদমাশকে পালিয়ে যেতে দিও না।" আয়না খান[১০] নামক জনৈক কাশ্মীরী (কুতবের প্রধান কর্মচারীদের অন্যতম) দ্রুত ঘোড়া চালিয়ে এসে তরবারি দ্বারা শের-আফগানের মস্তকে আঘাত করেন। সেই অবস্থাতেও শের-আফগান আর একবার আঘাত ক'রে তাকেও শেষ করে দেন। সেই মুহূর্তে কুতবউদ্দীন খানের সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে অগ্রসর হয়ে শের-আফগানকে আঘাতের পর আঘাত করে ও হত্যা করে। শের-আফগান হচ্ছেন সেই ব্যক্তি—যার বিধবা নূরজাহান[১১] বাদশাহ জাঁহাগীরের বেগমরূপে অতি বিখ্যাত। জনৈক কবি বলেছেন:

> নূরজাহান চেহারায় নারী হলেও
> তিনি বীরদের একজন, তিনি একজন
> বাঘ-শিকারী নারী।[১২]

কুতবউদ্দীন খান নিহত হওয়ার পর বাংলার সুবাদারী বিহারের সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলি খানকে দেয়া হয় এবং তাঁর স্থানে ইসলাম খানকে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়।

জাহাঙ্গীর কুলি খানের সুবাদারী[১২]

বাদশাহ জাঁহাগীরের সিংহাসনে আরোহণের দ্বিতীয় বৎসরের শেষ দিকে ১০১৫ হিজরীতে সুবে-বিহারের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলি খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। তাঁর পূর্ব-নাম ছিল লালা বেগ। তিনি বাল্যকালে মির্জা হাকিমের গোলাম ছিলেন। মির্জার মৃত্যুর পর তিনি বাদশাহ আকবরের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত হন এবং বাদশাহ তাঁকে যুবরাজ নূরুদ্দীন মুহম্মদ জাঁহাগীরকে দান করেন। তাঁর দেহ ছিল বলিষ্ঠ ও তিনি উত্তমরূপে কাজ করতেন। ধর্মীয় ও বিচারের ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। বাংলায় পৌঁছে প্রশাসনিক কার্য সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি মাত্র এক মাস কয়েক দিন শাসন করেছিলেন। বাদশাহ তাঁর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে শেখ বদরুদ্দীন ফতেহপুরীর পুত্র বিহারের শাসনকর্তা ইসলাম খানকে[১৩] বাংলার শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেন এবং বিহার ও পাটনার শাসনকর্তার পদে শেখ আবুল ফজল আল্লামির[১৪] পুত্র আফজল খানকে[১৫] নিয়োগ করেন।

নওয়াব ইসলাম খানের শাসন ও ওসমান খানের পতন

বাদশাহ জাঁহাগীরের সিংহাসনে আরোহণের তৃতীয় বৎসরে সুবে-বাংলার নিজামতের দায়িত্ব ইসলাম খানকে অর্পণ করার সময় তাঁকে ওসমান খান কর্তৃক প্রজ্জলিত বিদ্রোহের অগ্নি নির্বাপিত করার কঠোর আদেশ দেয়া হয়েছিল। ইসলাম খান জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকা) পৌঁছে[১৬] দেশের শাসনকার্যে মনোনিবেশ করেন। বাদশাহ সিংহাসনে আরো-

হণের চতুর্থ বৎসরে সুশাসন ও নিজামতের কার্যকলাপে তার দক্ষতার কথা অবগত হয়ে তাঁকে পাঁচ হাজারি মনসবদার পদে উন্নীত করেন এবং পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অনুমতি দেন। ইসলাম খান এক বৃহৎ সৈন্যদল শেখ কবির শুজাইত খানের[১৭] নেতৃত্বে আফগানী বিদ্রোহীদের নেতা ওসমান খানকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সাহায্যার্থে কিশোয়ার খান[১৮] (কুতবউদ্দীন খান কোকার পুত্র[১৯]), ইফতিখার খান,[২০] সৈয়দ আদম বারহা,[২১] শেখ আচ্চা,[২২] মু'তাকাদ খান (এঁরা মোয়াজ্জম খানের পুত্র[২৩]) প্রমুখ আমীর ও অন্যান্য বাদশাহী কর্মচারীদের প্রেরণ করেন। ওসমানের অধীনস্থ অঞ্চলের[২৪] সীমান্তে পোঁছে এঁরা প্রথমে বিদ্রোহীদের নেতাকে সমঝাবার জন্য একজন বিজ্ঞ দূত প্রেরণ করেন। এঁরা সদুপদেশের মূল্যবান মুক্তা তাঁর (ওসমান খানের) হৃদয়ের কানের কোণে গাঁথবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যেহেতু হতভাগ্য ওসমান খানের প্রকৃতি মূলতঃ মন্দ ছিল ও সদুপদেশ উপলব্ধি করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না, সেইহেতু তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ না শুনে তিনি (ওসমান খান) দুর্ভাগ্যজনক বৃথা উচ্চাকাঙ্ক্ষার জাহাজে ইষ্টকরাশি স্তূপীকৃত করলেন এবং দূতকে ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর ত্বত্যাপণ ক'রে আক্রমণাত্মক অশ্ব দ্রুত চালালেন যুদ্ধের জন্য এবং একটি কর্দমাক্ত নদী-তীরে[২৫] সৈন্য সমাবেশ করলেন। জাঁহাগীরের সিংহাসনে আরোহণের সপ্তম বর্ষে ১০২০ হিজরীর জিলহজ মাসের শেষ দিকে তাঁর কর্মচারীরা এই দুঃসাহসিক ঔদ্ধত্যের সংবাদ পাওয়ার পর তাঁরাও সৈন্যসামন্তসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন। অন্যদিকে, ভাগ্যবান বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর সম্মুখে ওসমান খানও দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়ে নিজ দুষ্ক্রিয়াকারী সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করলেন। উভয় পক্ষের বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন।

যখন উভয় পক্ষের যোদ্ধৃগণ পরস্পরের সম্মুখীন হলেন
তখন তারা সব দিক থেকে একে-অন্যের সঙ্গে
যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

বন্দুক, কামান, বর্শা ও তীরের আঘাতে
যুদ্ধের ভোজসভা গরম হয়ে উঠলো।
ধোঁয়া ও ধূলায় আকাশ পর্যন্ত ছেয়ে গেলো,
এতই বেশী যে, দুনিয়ার কিছু দেখা যাচ্ছিলো না।
উভয় সৈন্যবাহিনীর চীৎকার ও হৈ চৈতে
যুদ্ধক্ষেত্র মহাপ্রলয়ের ক্ষেত্রের মতো হয়ে উঠলো।
চারিদিক থেকে কামানের গোলা, তীর ও যুদ্ধের
হাওইএর আঘাতে
পৃথিবী বীরশূন্য ক'রে দিচ্ছিলো।
বীরগণের লাশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল,
জবেহ করা মোরগের মতো।

প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে এবং তীর ও গোলার মধ্যে ওসমান অত্যন্ত বীরত্ব দেখিয়েছিলেন এবং নিজের সামনে পাগলা হাতীগুলোকে নিয়ে বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর পুরোবাহিনীকে আক্রমণ করেন।

সাহসী বাদশাহী সৈন্যগণও তরবারি ও বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে রুস্তম ও সামের মতো বীরত্ব দেখিয়েছিল। বাদশাহী বাহিনীর পুরোভাগের সেনাপতি সৈয়দ আদম বারাহা,[২৬] শেখ আক্‌ছা[২৬] বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নিহত হন। এই সময় উভয় পক্ষের পার্শ্বদেশের বাহিনীদ্বয় পরস্পরকে আক্রমণ করে। বাম দিকের সেনাপতি ইফতিখার খান[২৬] এবং দক্ষিণ পার্শ্বের সেনাপতি কিশোয়ার খান[২৬] ও তাদের বহু সৈন্য নিহত হয়। শত্রুপক্ষেরও অনেকে মারা যায়।[২৭] বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন নেতা ও প্রবীন যোদ্ধাদের নিহত হতে দেখে ওসমান দ্বিতীয়বার সামনে বাচ্চা[২৮] নামক এক পাগলা হাতীকে এগিয়ে দিয়ে নিজে একটি সজ্জিত হাতীতে চড়ে বাদশাহী বাহিনীর পুরোভাগ আক্রমণ করলো ও বারবার আঘাত করতে লাগলো। বাদশাহী বাহিনীর পক্ষ থেকে শুজাইত খান[২৯] তাঁর আত্মীয় ও ভ্রাতাদের নিয়ে তাকে (ওসমানকে) বাধা দিতে অগ্রসর হন এবং অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করেন। তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে নিহত হন ও

অনেকে মারাত্মকরূপে আহত হয়ে পশ্চাদগমন করেন। (পাগলা) হাতীটি যখন শুজাইত খানের সামনে আসে তখন তিনি সবেগে ঘোড়া চালিয়ে গিয়ে হাতীর শুঁড়ে বর্শা দ্বারা আঘাত করেন এবং দ্রুত তরবারি বে'র ক'রে হাতীর মাথায় দু'বার আঘাত করেন; এবং হাতীর সঙ্গে ধাক্কা লাগা মাত্র তিনি ছোরা বে'র ক'রে আরো দু'বার আঘাত করেন। এই সকল আঘাতে দৃক্‌পাত না ক'রে ক্রোধান্বিত হাতীটি প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হয়ে অশ্বারোহী ও অশ্ব দুই-ই ছুড়ে ফেলে দেয়। শুজাইত অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ঘোড়া থেকে নেমে সোজা হয়ে মাটির উপর দাঁড়ালেন। এই সন্ধিক্ষণে শুজাইতের সহিস একটি দো-ধার তলোয়ার দিয়ে হাতীর শুঁড়ে আঘাত করে ও গুরুতর জখম হয়ে হাতী বসে পড়ে। শুজাইত খান তাঁর সহিসের সাহায্যে হাতীর আরোহীকে ফেলে দিয়ে ছোরা দ্বারা হাতীর শুঁড়ে আবার আঘাত করেন। এই আঘাতের পর হাতী প্রচণ্ড গর্জন ক'রে পালিয়ে গেলো। কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হয়েই পড়ে গেলো। শুজাইত খানের ঘোড়া অক্ষত অবস্থায় উঠে দাঁড়ালো এবং তিনি আবার ঘোড়ায় চড়লেন। ইতিমধ্যে আর একটি হাতী বাদশাহী পতাকাধারীকে আক্রমণ করে ও পতাকা (মাটিতে) ফেলে দেয়। শুজাইত খান চীৎকার ক'রে বললেন, "সাবধান, পুরুষের মত কাজ কর; আমি বেঁচে আছি এবং শীঘ্রই তোমাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হচ্ছি।" পতাকা-বাহকের আশেপাশের কিছু সংখ্যক সৈন্য সাহসের সাথে হাতীকে কয়েকটি মারাত্মক জখম করায় হাতী পালিয়ে গেলো এবং তারা পতাকাধারীকে আবার ঘোড়ার উপর বসালো। যুদ্ধ যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে, অনেকে যখন নিহত হয়েছে এবং অনেকে যখন আহত হওয়ায় অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারছিল না, সেই সময় বাদশাহী ভাগ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং কপালে কামানের গোলার আঘাত লাগায় ওসমান খান ঘোড়ার উপর পড়ে যান। যদিও তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর জীবনের আশা নাই, তথাপি সেই অবস্থাতেও বীরত্বের সঙ্গে সৈন্যদের যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এরপর যখন তিনি পরাজয় সুনিশ্চিত বুঝলেন, তখন শেষ নিশ্বাস ফেললেন

বাংলায় পোঁছে। বিজয়ী বাদশাহী বাহিনী পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তাঁর শিবিরে পোঁছে ক্ষান্ত হন। ওসমান[৩০] মধ্যরাত্রে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ভ্রাতা ওয়ালী খান ও পুত্র মোমরেজ খান শিবির ও অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ ক'রে তার লাশ নিয়ে নিজেদের এলাকায় চলে যান। এই সংবাদ শুনে শুজাইত খান তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তার পরামর্শদাতারা এর বিরোধিতা করেন এই কারণে যে, সৈন্যগণ ক্লান্ত, মৃত্যদের দাফন ও আহতদের শুশ্রূষা করতে হবে। ইতিমধ্যে মু'তাকাদ খান (পরে তাঁকে লস্কর খান উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়েছিল), আবুল মোয়াজ্জম খানের[৩১] পুত্র আবদুস সালাম খান ৩০০ অশ্বারোহী ও ৪০০ বন্দুকধারী নতুন সৈন্যসহ পোঁছান। শুজাইত খান এই সৈন্যদের নিয়ে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করেন। ওয়ালী খান নিরাশ হয়ে সংবাদ প্রেরণ করেন, "ওসমান ছিলেন বিদ্রোহের মূল। তিনি তাঁর প্রাপ্য শাস্তি পেয়েছেন। আমরা সকলে অনুগত। যদি আমাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়, তা'হলে আমরা বশ্যতা স্বীকার করবো এবং ওসমানের হাতীগুলো কর স্বরূপ উপস্থিত করবো।" শুজাইত খান ও মু'তাকাদ খান বীর-ধর্ম অনুযায়ী সন্ধির শর্ত সাব্যস্ত করেন। পরদিন ওয়ালী খান ও মোমরেজ খান তাদের ভ্রাতাদের ও আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে শুজাইত খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং কর-স্বরূপ ৪৯টি হাতী হাজির করেন। শুজাইত ও মু'তাকাদ খান এগুলি নিয়ে বিজয়ী হয়ে ইসলাম খানের নিকট জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) উপস্থিত হন। ইসলাম খান এই বিজয় সংবাদ আকবরাবাদে (আগ্রায়) বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। ১০২১ হিজরীর মুহর্‌রম মাসের ১৬ তারিখে এই পত্র বাদশাহের নিকট পৌঁছায় ও তিনি তা পড়েন। এই উত্তম কার্যের জন্য ইসলাম খানকে ছয়-হাজারী মসনব দিয়ে উন্নীত করা হয়, এবং শুজাইত খানের মসনবও উন্নত ক'রে তাঁকে 'রুস্তমে-জমান' উপাধি দেয়া হয়। সেইসঙ্গে অন্য বাদশাহী কর্মচারী—যারা ওসমান খানকে ধ্বংস করার কাজে আনুগত্য ও বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তাদেরও উপযুক্ত মসনব দেয়া হয়। ওসমান খানের বিদ্রোহ আট বৎসরকাল

চলেছিল এবং বাদশাহের সিংহাসনে আরোহণের সপ্তম বর্ষে, অর্থাৎ ১০২২ হিজরীতে তাঁকে দমন করার কার্য শেষ হয়েছিল। বাদশাহের সিংহাসনে আরোহণের অষ্টম বর্ষে ইসলাম খান মনুষ্য-রূপী পশু—মগদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। ইসলাম খান তাঁর পুত্র হোলঙ খানের তত্ত্বাবধানে বন্দী মগদের বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। সেই বৎসরেই (১০২২ হিজরীতে) বাংলায় ইসলাম খানের মৃত্যু হয়। এর পর দেশের (বাংলার) শাসনকর্তার পদে তাঁর ভ্রাতা কাসিম খানকে নিয়োগ করা হয়।

কাসিম খানের নিজামত

ইসলাম খানের ভ্রাতা কাসিম খান পাঁচ বৎসর কয়েক মাস বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময় অসমীয়ারা বাদশাহী এলাকা আক্রমণ করে এবং সৈয়দ আবু বকরকে[৩২] বন্দী ক'রে নিয়ে যায়। কাসিম খান এই ঘটনার বিশদ তদন্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর পরিবর্তে ইব্‌রাহীম খান ফতেহ জংকে নাজিম পদে নিযুক্ত করা হয়।

ইব্‌রাহীম খানের নিজামত এবং শাহজাদা শাহজাহানের বাংলায় আগমন

বাদশাহের (জাঁহাগীরের) সিংহাসনে আরোহণের পর ত্রয়োদশ বৎসরে ১০২৭ হিজরীতে ইব্‌রাহীম খান ফতেহ জং[৩৩] বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদারী পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বেগ খানকে[৩৪]

উড়িষ্যার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন এবং নিজে জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) থেকে প্রশাসনিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর কার্য-কালে কয়েকটি গুরুতর ঘটনা ঘটেছিল। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হবে। সিংহাসনে আরোহণের সপ্তদশ বৎসরে ১০৩১ হিজরীতে বাদশাহ জাঁহাগীর সংবাদ পান যে, পারস্যের রাজা কান্দাহার[৩৫] দুর্গ অধিকার করার মতলব করছেন। তজ্জন্য আহাদী[৩৬] সৈন্যদের পে-মাস্টার জেনারেল জয়নুল আবেদীন বুরহানপুরে অবস্থিত শাহজাদা শাহজাহানের নিকট এক আদেশ-নামা পাঠান, যাতে তাঁকে সৈন্যবাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী ও হস্তী-বাহিনী-সমেত সত্বর বাদশাহ সকাশে উপস্থিত হতে বলা হয়। শাহজাদা বুরহানপুর[৩৭] থেকে রওয়ানা হয়ে মাণ্ডো[৩৮] পৌঁছে বাদশাহের নিকট এই মর্মে এক সংবাদ প্রেরণ করেন যে, বর্ষার মওসুম আরম্ভ হওয়ায় তিনি এই মওসুমে মাণ্ডোতে অবস্থান করবেন ও পরে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হবেন। এই সঙ্গে ঢোলপুর[৩৯] পরগণা তাঁর জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন করেন এবং দরিয়া খান[৪০] আফগানকে উক্ত পরগণা দখল নেয়ার জন্য পাঠান। কিন্তু শাহজাদার পত্র বাদশাহের নিকট পৌঁছাবার পূর্বেই তিনি শাহজাদা শহরিয়ারের সঙ্গে নূরমহলের[৪১] কন্যার (শের-আফগানের ঔরসজাত[৪২]) বিবাহ স্থির করেছিলেন এবং নূরমহলের অনুরোধে উক্ত পরগনা (ঢোলপুর) শহরিয়ারকে দিয়েছিলেন। শাহজাদা শহরিয়ারের কর্মচারী শরিফ-উল্ মুল্ক ঢোলপুর দুর্গ শহরিয়ারের পক্ষে দখল নিয়েছিলেন। অত্যল্পকাল পরে দরিয়া খান ঢোলপুব পৌঁছে বলপূর্বক দুর্গ দখল করতে চান, এবং তজ্জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। নিয়তির খেলা— একটি তীর শরিফ উল্-মুল্কের একটি চোখে লাগায় তিনি অন্ধ হয়ে যান। তাতে বেগম[৪৩] ক্রুদ্ধ হন এবং বিরোধের আগুন তীব্র হয়ে জ্বলে ওঠে। বেগমের অনুরোধে কান্দাহার অভিযানের দায়িত্ব শাহজাদা শহরিয়ারকে অর্পণ করা হয়; এবং মীর্জা রুস্তম[৪৪] সাফাভীকে শাহ-জাদার 'আতালিক ও সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ

করা হয়। বিরোধের আগুন জ্বলে ওঠার সংবাদ শুনে শাহজাহান মিষ্টবাক্য ও সৌজন্যের দ্বারা বিরোধের অবসান ক'রে বাদশাহ ও শাহজাদার মধ্যে সম্প্রীতি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার জন্য আবুল ফজল আল্লামির পুত্র আফজাল খানকে এক পত্রসহ বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। বিহারের শাসনকর্তার পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পর আফজাল খান শাহজাদার দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাদশাহের উপর বেগমের পূর্ণ আধিপত্য থাকার দরুন আফজাল খানকে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া হয় নাই এবং তাঁকে ফিরে যেতে হুকুম দেয়া হয়। সেইসঙ্গে বাদশাহী রাজস্ব আদায়কারীদের উপর হুকুম জারি হয় যে, শাহজাহানের হাত থেকে হিসার[৪৫] ও দোআব[৪৬] সরকার শাহজাদা শহরিয়ারের নিকট হস্তান্তরিত করা হল। শাহজাদা শাহজাহানকে এই মর্মে হুকুম দেয়া হয় যে, দক্ষিণের সুবাসমূহ এবং গুজরাট[৪৭] ও মালোয়া (মালব[৪৮]) তাঁকে দেয়া হল; তিনি এর যে-কোনো স্থানে সদর দফতর স্থাপন ক'রে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন এবং কান্দাহার অভিযানের জন্য কিছু সৈন্য সত্বর পাঠানোর জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। সিংহাসনে আরোহণের অষ্টাদশ বৎসরে ১০৩২ হিজরীর 'খুরদাদ' মাসে আসফ খানকে[৪৯] বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার রূপে নিযুক্ত করা হয়। আসফ খানের এক কন্যার সঙ্গে শাহজাহানের বিবাহ হয়েছিল। সেই অজুহাত দেখিয়ে কিছুসংখ্যক হিংসুক ব্যক্তি শাহজাহানের প্রতি আসফ খানের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে এবং আসফ খানের পুরাতন শত্রু ও শাহজাহানের প্রতি বিদ্বিষ্ট, মহবত খানকে কাবুল থেকে ফিরিয়ে আনতে বেগমকে প্ররোচিত করে। মহবত খানকে তলব করার বাদশাহী-ফরমান ও তৎসহ বেগমের পত্র প্রেরিত হয়। কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্মান দেয়া হয়। শাহজাদা পারভেজের উকীল শরিফ খানকেও[৫০] শাহজাদা ও বিহারের সৈন্যবাহিনীসহ দরবারে উপস্থিত হওয়ার আদেশ প্রেরিত হয়। ভ্রাতার সহিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার জন্য বেগম উদ্বিগ্ন

হয়েছিলেন এবং সেই কারণে এই বৎসরের 'আদর' মাসের ২রা তারিখে আসফ খানকেও দরবারে ফিরে আসতে হুকুম দেয়া হয়। মোটের উপর, উপরোক্ত ঘটনাবলীর দ্বারা বাদশাহের বিমুখতা ও নূরজাহান বেগমের মন্দ অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত হয়ে বাদশাহকে তাঁর ইচ্ছা জ্ঞাপন করার জন্য শাহজাহান কাজী আবদুল আজিজকে দরবারে প্রেরণ করেন এবং শাহজাদা পারভেজ ও সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সৈন্যবাহিনী পৌঁছাবার পূর্বেই বিরোধ দূরীকরণের জন্য তিনি নিজে তাঁর (কাজী আবদুল আজিজের) অনুসরণ করবেন ব'লে স্থির করেন। লুধিয়ানার[৩১] নদী-তীরে বাদশাহী বাহিনীর সঙ্গে কাজীর সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু, যেহেতু বাদশাহের মন বেগমের কুহকে আচ্ছন্ন হয়েছিল, সেইহেতু কাজীকে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি দেয়া হয় নাই এবং তাকে কারারুদ্ধ করার জন্য মহবত খানকে হুকুম দেয়া হয়। অব্যবহিত পরে, শাহজাহানও এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ আকবরাবাদের (আগ্রার) সন্নিকটে শিবির সন্নিবেশ করেন। বাদশাহ সিরহিন্দ[৩২] থেকে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং পথিমধ্যে বিভিন্ন জায়গীরের আমীর ও কর্মচারীগণ যোগদান করায় রাজধানীতে পৌঁছাবার পূর্বেই বিপুল সৈন্য সংগৃহীত হয়। বাদশাহী বাহিনীর পুরোভাগ আবদুল্লাহ খানের[৩৩] বাদশাহী ফৌজের এক ক্রোশে অগ্রগামী হয়ে অগ্রসর হতে হুকুম দেয়া হয়। কিন্তু বিপুল বাদশাহী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের ফল মারাত্মক হতে পারে ব'লে শাহজাহান মনে করেন। সেই কারণে, খান-ই-খানান[৩৪] ও অন্যান্য সেনাপতিদের সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়ে পশ্চাদ্গমন ক'রে তিনি উত্তর দিকে কুড়ি ক্রোশ দূরে চলে যান। কিন্তু, যদি বেগম তাঁর (শাহজাহানের) পশ্চাদ্ধাবন করা সাব্যস্ত করেন, তা'হলে বিরোধ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাদশাহী সৈন্যদের বাধা দেয়ার জন্য তিনি রাজা বিক্রমজিত[৩৫] ও খান-ই-খানানের পুত্র দরাব খান ও অন্য সৈন্যাধ্যক্ষদের রেখে যান। ১০৩২ হিজরীর ২০শে জমাদি-উল-আউয়াল তারিখে শাহজাহানের পশ্চাদ্গমনের সংবাদ বাদ-শাহের নিকট পৌঁছায়। মহবত খানের পরামর্শ অনুযায়ী বেগম ২৫

হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ আসফ খান, খাজা আবুল হাসান,[৫৬] আবদুল্লাহ খান, লশকর খান,[৫৭] ফেদাই খান,[৫৮] নওয়াজেস খান[৫৯] ও অন্যান্যদের যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন। শাহজাহানের পক্ষ থেকে রাজা বিক্রমজিত ও দরাব খান সৈন্যবাহিনী সজ্জিত ক'রে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন এবং তীর ও বন্দুক দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। আবদুল্লাহ খানের[৬০] সঙ্গে শাহজাহানের গোপন ষড়যন্ত্র ছিল যে, যুদ্ধ আরম্ভ হলেই আবদুল্লাহ খান সুযোগ বুঝে শাহজাদার পক্ষ অবলম্বন করবেন। এবার সুযোগ লাভ করায় তিনি (আবদুল্লাহ খান) অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে শাহজাহানের বাহিনীর সাথে যোগদান করেন। রাজা বিক্রমজিত আগে থেকেই আবদুল্লাহ খানের মতলব জানতেন; এই সময় (খান যোগদান করায়) রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে দরাব খানকে এই সংবাদ দিতে যান। দৈবক্রমে রাজা কামানের গোলায় কপালে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে যান। এই দুর্ঘটনার ফলে শাহজাহানের বাহিনীর ব্যবস্থা ভেঙ্গে যায়। যদিও আবদুল্লাহ খানের মতো একজন সেনাপতি বাদশাহী বাহিনীর পুরোভাগের ভিত্তি ধ্বংস ক'রে শাহজাদার বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন, তথাপি শাহজাহানের পক্ষের দরাব খান ও অন্যান্য সেনাপতিগণ দাঁড়াতে সাহসী হলেন না। আবদুল্লাহ খানের দলত্যাগে বাদশাহী সৈন্যগণ এবং রাজা বিক্রমজিত নিহত হওয়ায় শাহজাদার সৈন্যগণ—উভয় দল নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে ও তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দিনের শেষদিকে উভয় বাহিনী স্ব স্ব শিবিরে ফিরে যায়। অবশেষে, বাদশাহ আকবরাবাদ থেকে আজমীরের দিকে হটে যান এবং শাহজাহান মাণ্ডোর দিকে চলে যান। জমাদি-উল-আউয়ালের ২৫ তারিখে বাদশাহ যুবরাজ পারভেজকে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ শাহজাহানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করেন এবং এই বাহিনীর সৈনাপত্যের দায়িত্ব মহবত খানকে দেয়া হয়। শাহজাদা পারভেজ সসৈন্যে যখন চান্দা[৬১] গিরিপথ অতিক্রম ক'রে মাণ্ডো ভেলায়েতে[৬২] পৌঁছান, তখন শাহজাহান সৈন্যবাহিনীসহ মাণ্ডো দুর্গ থেকে বেরিয়ে রুস্তম খানকে[৬৩] একদল সৈন্যসহ শাহজাদা পারভেজের বিরুদ্ধে প্রেরণ

করেন। বাহাউদ্দীন বরকন্দাজ নামক শাহজাহানের কর্মচারী, রুস্তম খানের বিশ্বাসভাজন এক ব্যক্তি মহবত খানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং কেবল সুযোগের অপেক্ষা করছিল। উভয় বাহিনী যখন যুদ্ধের জন্য সারবন্দী হয়ে দাঁড়ায় তখন রুস্তম খান অগ্রসর হয়ে বাদশাহী বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে। শাহজাহানই এই জঘন্য রুস্তম খানকে সেহ্‌বস্তি[১৪] মসনব থেকে পাঁচ-হাজারি মর্যাদায় উন্নীত ক'রে গুজরাটের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করেছিলেন এবং সে শাহজাদার সম্পূর্ণ বিশ্বাস-ভাজন ছিল। এই সময় যখন শাহজাদা তাকে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ ক'রে শাহজাদা পারভেজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠান, তখন এত বৎসরের কৃতজ্ঞতা ও দয়া ভুলে গিয়ে সে মহবত খানের সঙ্গে যোগ দিল। এই দুর্দৈবের জন্য শাহজাহানের সৈন্যগণের মনোবল ভেঙ্গে যায় এবং পারস্পরিক বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে কৃতঘ্ন হয়ে পালিয়ে যায়। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর শাহজাহান অবশিষ্ট সৈন্যদের একত্রিত ক'রে নর্মদা নদী অতিক্রম করেন ও তাঁর পাড়ের দিকে সমস্ত নৌকা সরিয়ে নিয়ে যান। সৈন্যবাহিনীর প্রধান বেতন-দাতা কর্মচারী বৈরাম বেগকে একদল সৈন্যসহ নদী-তীরে রেখে শাহজাহান নিজে খান-ই-খানান, আবদুল্লাহ্ খান ও অন্যদের সঙ্গে নিয়ে আসিব ও বুরহানপুর দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। খান-ই-খানান একটি পত্র গোপনে মহবত খানের নিকট পাঠিয়েছিলেন। মুহম্মদ তকি বখশি চিঠিখানা ধ'রে ফেলেন ও শাহজাহানকে দেন। এই পত্রের উপরে লেখা ছিলঃ

> শত শত ব্যক্তির চক্ষু আমাকে পাহারা দিচ্ছে,
> নতুবা এই অস্বস্তি (অস্বস্তিকর অবস্থা) থেকে
> পালিয়ে যেতাম।

খান-ই-খানান ও দরাব খানকে তাদের বাড়ী থেকে ডেকে শাহজাহান গোপনে পত্রটি তাদের দেখান। তাঁরা এর কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে পারেন নাই। সেইজন্য, খান-ই-খানান ও তাঁর পুত্রকে শাহজাদার বাসস্থানের নিকটে প্রহরাধীন রাখা হয়। এরপরই উপরোক্ত

পত্রের অশুভ উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে। মহবত খান পত্র ও বিশ্বাস-ঘাতকদের মাধ্যমে খান-ই-খানানকে আনুগত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করেছিলেন। খান-ই-খানান পরামর্শচ্ছলে শাহজাহানকে বলেন, সময় যখন এখন মন্দা, তখন প্রবাদ বাক্য—'যদি সময় তোমার অনুকূল না হয়, তবে তুমি নিজেকে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিও'—অনুযায়ী এখন যুদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থা করা তার (শাহজাদার) উচিত এবং সেটা মানবতার স্বার্থে প্রয়োজন। বিরোধের অগ্নি নির্বাপিত করা একটি বৃহৎ সাফল্য হবে মনে ক'রে শাহজাহান খান-ই-খানানকে তাঁর খাস-কামরায় ডেকে নিয়ে যান এবং প্রথমে তাঁকে কুরআন স্পর্শ ক'রে শপথ করিয়ে নিজের মনকে আশ্বস্ত করেন। খান-ই-খানান কুরআন স্পর্শ ক'রে জোরের সঙ্গে শপথ করেন যে, তিনি কখনো শাহজাদার প্রতি বিশ্বাসঘাতক অথবা আনুগত্যহীন হবেন না, এবং তিনি উভয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করবেন। এই প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিন্ত হয়ে শাহজাহান খান-ই-খানানকে পাঠান এবং দরাব খান ও তাঁর পুত্রদের নিজের কাছে রাখেন। আরও সাব্যস্ত হয়েছিল যে, খান-ই-খানান নর্মদা নদীর এপাড়ে থেকে পত্রের মাধ্যমে চুক্তির শর্ত স্থির করবেন। যুদ্ধ-বিরতি ও খান-ই-খানানের যাওয়ার সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর নদী-তীরের পাহারাদার সৈন্যরা অসতর্ক হয়ে পারাপারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে অবহেলা করে। এক রাত্রে এরা যখন ঘুমন্ত, তখন বাদশাহী সৈন্যদের একটি দল সাহসের সাথে অশ্বসহ ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নদী পার হয়। মহা হৈ চৈ আরম্ভ হল ও আতংকে লোকদের হাত-পা অচল বা অসাড় হয়ে গেলো। বৈরাম বেগ নিজে লজ্জিত হয়ে শাহ-জাহানের নিকট যান। খান-ই খানানের বিশ্বাসঘাতকতা ও বাদশাহী সৈন্যদের নদী পার হওয়ার সংবাদ পেয়ে এবং বুরহানপুরে থাকা অসুবিধা-জনক মনে ক'রে শাহজাহান ঘোরতর ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তাপ্তী নদী পার হয়ে উড়িষ্যা[৬৫] অভিমুখে যাত্রা করেন ও কুত্‌ব্‌-উল-মুল্‌কের (শাসনাধীন) প্রদেশ ছারখার করতে থাকেন।[৬৬]

শাহজাদা শাহজাহানের বাংলায় উপস্থিতি ও ইবরাহীম খান ফতেহ জং-এর পতনের বিবরণ

যে সময় শাহজাদা শাহজাহানের সৈন্যবাহিনী উড়িষ্যায় পৌঁছায় তখন বাংলার নাজিম ইব্‌রাহীম খানের ভ্রাতুষ্পুত্র উড়িষ্যার সহকারী শাসনকর্তা আহমদ বেগ খান প্রদেশের অভ্যন্তরে কয়েকজন জমিদারকে শাস্তি দেয়ার জন্য গিয়েছিলেন। ইব্‌রাহীম খান বাংলার নাজিম হওয়ার আগে থেকেই আহমদ বেগ উড়িষ্যার উক্ত পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। হঠাৎ শাহজাদার পৌঁছানোর সংবাদ প্রাপ্তিতে তিনি সাহস হারিয়ে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্তার সদর পিপলীতে[৬৭] চলে যান এবং সেখান থেকে সমস্ত সম্পদ ও জিনিসপত্র নিয়ে পিপলী থেকে বারো ক্রোশ দূরে বাংলার দিকে কটকে পশ্চাদ্‌গমন করেন। কটকে শিবির স্থাপনের উপযোগী শক্তিশালী মনে না হওয়ায় তিনি বর্ধমান পলায়ন করেন ও জাফর বেগের ভ্রাতুষ্পুত্র সালেহ বেগকে[৬৮] সমস্ত বৃত্তান্ত বলেন। শাহজাহানের উড়িষ্যা উপস্থিতির সংবাদ সালেহ বেগ বিশ্বাস করতে পারেন নাই। এই সময় আবদুল্লাহ্‌ খানের নিকট থেকে একটি আপোসমূলক পত্র সালেহ বেগের নিকট আসে। সালেহ বেগকে দলভুক্ত করা সম্ভব হল না। সালেহ বেগ বর্ধমান দুর্গে সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। শাহ-জাহানের সৈন্যবাহিনী বর্ধমানে উপনীত হওয়ার পর আবদুল্লাহ্‌ খান দুর্গ অবরোধ করেন এবং সালেহ বেগকে কোণঠাসা করেন। উদ্ধারের সকল আশা বিনষ্ট হওয়ার পর সালেহ বেগ বাধ্য হয়ে আবদুল্লাহ্‌ খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। বেগের গলায় এক টুকরা কাপড় জড়িয়ে আবদুল্লাহ্‌ খান তাঁকে শাহজাদার সামনে হাজির করেন। এই কণ্টক দূর করার পর রাজমহলের দিকে বিজয়-পতাকা উড্ডীন করার জন্য তাঁরা অগ্রসর হন। বাংলা সুবার প্রতিনিধি ইব্‌রাহীম খান ফতেহ জং-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছানোর পর তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।[৬৯] যদিও তাঁর সাহায্যকারী সৈন্যদল 'মঘা' অঞ্চলে[৭০] বিক্ষিপ্ত

ছিল, তথাপি তিনি সাহসের সাথে আকবর নগরের (অন্য নাম রাজমহল) ঘাঁটি দৃঢ় করা ও সৈন্যসমাবেশ এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এই সময় তিনি শাহজাদার নিকট থেকে নিম্নোক্ত পত্র পান: "নিয়তির বিধানে যা নির্ধারিত ছিল, তা সম্ভাবনার গণ্ডি অতিক্রম ক'রে বাস্তব কার্যকরণে পরিণত হয়েছে; এবং বিজয়ী সৈন্যবাহিনী এদিকে এসেছে। যদিও আমার আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে এই প্রদেশ অতি সামান্য, তথাপি যখন আমার চলার পথে পড়েছে তখন আমি এটাকে নির্দ্বিধায় ছেড়ে যেতে পারি না। যদি আপনি বাদশাহের নিকট উপস্থিত হতে চান, এবং আমি যাতে আপনার জীবন, সম্পত্তি ও পরিবারবর্গের উপর হস্তক্ষেপ না করি এই ইচ্ছা করেন, তা'হলে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদে দিল্লী চলে যেতে পারেন ও আমি তাতে বাধা দেব না। অথবা, যদি আপনি এই প্রদেশেই অবস্থান করতে চান, তা'হলে আপনার ইচ্ছামত যে-কোনো স্থান বেছে নিতে পারেন এবং সেখানে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে বাধা দেয়া হবে না।" উত্তরে ইব্‌রাহীম খান লিখেছিলেন: "বাদশাহ তাঁদের এই পুরাতন বান্দাকে এই প্রদেশের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মাথা থাকবে, ততক্ষণ আমি এই প্রদেশ আঁকড়ে থাকবো; যতক্ষণ আমার জীবন থাকবে ততক্ষণ আমি প্রতিরোধ করবো। আমার অতীত জীবনের সব সুকর্ম আপনার জানা আছে। এই পৃথিবীতে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কতটুকুই বা আর অবশিষ্ট আছে? এখন আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই যে, অতীতের বাদশাহী অনুগ্রহের জন্য কর্তব্য সম্পাদনে ও আনুগত্যের কারণে আমি যেন জীবন বিসর্জন দিয়ে শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারি।"[৭১] প্রকৃতপক্ষে ইব্‌রাহীম খান প্রথমে আকবর নগর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের ইচ্ছা করেছিলেন; কিন্তু এই দুর্গ বৃহৎ হওয়ায় ও সকল দিক থেকে রক্ষা করার মত পর্যাপ্ত সৈন্য না থাকায় তিনি তাঁর পুত্রের সমাধি-ভবনে আশ্রয় নেন। এই মাজারের চতুষ্পার্শ্বে আত্মরক্ষার মত প্রাচীর (বা মাটির প্রশস্ত দেয়াল) ছিল। এই সময় শাহজাহানের যে সৈন্যদলটি দুর্গে ঘাঁটি স্থাপনের জন্য প্রেরিত হয়েছিল, তারা উক্ত সমাধি-স্তম্ভের চারিদিক থেকে আক্রমণ করে এবং ভিতর ও বাহির উভয় দিক

থেকে তীর ও গাদাবন্দুকের দ্বারা যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে। এই সময় আহমদ বেগ খানও পৌঁছে এই কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁর উপস্থিতিতে অবরুদ্ধ সৈন্যগণ কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হয়। যেহেতু, ইব্‌রাহীম খানের দলের অনেকের পরিবারবর্গ ও সন্তানেরা অপর পাড়ে ছিল, সেইহেতু আবদুল্লাহ্ খান ও দরিয়া খান আফগান নদী পার হয়ে অপর তীরে সৈন্য সমাবেশের মতলব করেন। এই সংবাদ শুনে ইব্‌রাহীম খান[৭২] উদ্বিগ্ন হন। কেল্লা ও সমাধি-ভবন রক্ষার জন্য অন্যদের রেখে ইব্‌রাহীম খান বিমূঢ় অবস্থায় আহমদ খানকে সঙ্গে নিয়ে (নদীর) অপর পাড়ে যান এবং শাহজাদার সৈন্যদের নদী অতিক্রমে বাধা দেয়ার জন্য যুদ্ধ-জাহাজগুলিকে অগ্রসর হতে পাঠান।

কিন্তু যুদ্ধ-জাহাজগুলি পৌঁছাবার পূর্বেই দরিয়া খান নদী পার হয়েছিলেন। ইব্‌রাহীম খান এই সংবাদ পেয়ে দরিয়া খানকে[৭৩] বাধা দেয়ার জন্য আহমদ বেগকে নদী পার হতে আদেশ দেন। উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার পর নদী-তীরে এক ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং তাতে আহমদ বেগের বহু সহযোগী নিহত হয়। প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে আহমদ বেগ পশ্চাদগমন করেন। ইব্‌রাহীম খান এক দল উত্তম অশ্বরোহী সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। দরিয়া খান এই সংবাদ পেয়ে কয়েক ক্রোশ পিছিয়ে যান এবং আবদুল্লাহ্ খানবাহাদুর ফিরোজ জং[৭৪] কয়েক ক্রোশ অগ্রসর হয়ে জমিদারদের সাহায্যে নদী পার হয়ে দরিয়া খানের সঙ্গে যোগ দেন। একটি স্থানের একদিকে ছিল নদী ও অন্যদিকে গভীর জঙ্গল; দৈবক্রমে তাঁরা সেখানে সৈন্যসমাবেশ করেন। ইব্‌রাহীম খান গঙ্গা পার হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি নূরুল্লাহ[৭৫] নামক একজন সেনাপতির অধীনে ৮০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে তাঁকে পুরোভাগে স্থাপন করেন; আহমদ বেগ খানকে ৭০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে মধ্যভাগে স্থাপন করেন; এবং নিজে সহস্র সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ পশ্চাদভাগে অবস্থান করেন। নূরুল্লাহ্ আক্রমণ প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পশ্চাদগমন করেন এবং তখন আহমদ বেগ

খানের (মধ্যবর্তী) সৈন্যদল পর্যন্ত যুদ্ধ বিস্তৃত হয়। আহমদ খান বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে গুরুতর জখম হন। ইব্‌রাহীম খান এই দৃশ্যের নিষ্ক্রিয় দর্শকরূপে না থাকতে পেরে দ্রুত অগ্রসর হন। এইরূপে অগ্রসর হওয়ার জন্য তার সৈন্যদের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যায়। অনেকে নির্লজ্জভাবে পলায়ন করে। কেবল অল্প সৈন্যসহ ইব্‌রাহীম খান যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন। তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাঁকে এই নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন, তথাপি তিনি পিছিয়ে যেতে সম্মত হন নাই এবং বলেন, "আমার জীবনের এই সময়ে তা হতে পারে না। জীবন বিসর্জন দিয়েও আমি যে বাদ-শাহের একজন অনুগত বান্দা একথা প্রমাণ করার চাইতে আর কি শ্রেয় হতে পারে?" ঠিক এই সময়ে শত্রুরা চারিদিক থেকে আক্র-মণ করে ও মারাত্মক আঘাতে তাঁকে নিহত করে এবং ভাগ্যবান শাহজাদার অনুসারীরা জয়ী হয়। সমাধি-স্তম্ভের চারিদিকের প্রাকারের মধ্যে যারা ছিল তারা এই সংবাদ শুনে হতাশ হয়ে পড়েছিল। এমনি সময় শাহজাদার সৈন্যরা বারুদ বিস্ফোরণ দ্বারা প্রাকারের একাংশ ভেঙ্গে ফেলে এবং চারিদিক থেকে সাহসী ও নির্ভীক সৈন্যরা বেগে প্রবেশ করে। এই আক্রমণের সময় আবিদ খান দেওয়ান, মীর তকী বখশি ও অন্য কয়েকজন তীর ও বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। ঘাঁটির সৈন্যদের অনেকে খালি মাথায় খালি পায়ে পালিয়ে গেলো এবং যারা পরিবারবর্গ ও সন্তানদের নিয়ে দুর্গে ছিল তারা শাহজাদার নিকট আত্মসমর্পণ করে।[৭৬] ইব্‌রাহীম খানের পরিবারবর্গ ও সব সম্পদ জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা)[৭৭] থাকায় শাহজাহান নদীপথে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হন।[৭৮] ইব্‌রাহীম খানের ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বেগ খান[৭৯] আত্মসমর্পণের পূর্বেই (ঢাকা) চলে গিয়েছিলেন এবং শাহজাহানের আস্থাভাজন ব্যক্তিদের অনুরোধে শাহজাদা তাঁকে সাক্ষাৎ দান করেন। ইব্‌রাহীম খানের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াফ্‌ত করার আদেশ দেন শাহজাদা। বিভিন্ন দ্রব্য ও রেশমের কাপড় ছাড়াও হাতী, মুসব্বর ও অন্যান্য দুর্লভ বস্তু ও চল্লিশ লক্ষ টাকা বাজেয়াফ্‌ত করা

হয়। খান-ই-খানানের পুত্র দরাব খান এতদিন বন্দী ছিলেন। শাহজাদা তাঁকে মুক্তি দেন ও তাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ক'রে বাংলা শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং জামিনস্বরূপ তাঁর স্ত্রী ও শাহ নওয়াজ খান[৮০] নামক এক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যান। রাজা করনের পুত্র রাজা ভীমকে[৮১] নিজের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত ক'রে শাহজাদা তাকে পাটনায় প্রেরণ করেন। এবং তিনি আবদুল্লাহ খান ও অন্যান্য সেনাপতিদের নিয়ে রাজা ভীমের অনুসরণ করেন। পাটনা সুবা যুবরাজ পারভেজের জায়গীর ছিল; তিনি তাঁর দেওয়ান মুখালিস খানকে[৮২] তথাকার শাসনকর্তা এবং ইফতিখার খানের পুত্র আলাহ্-ইয়ার খান ও শের খান আফগানকে ফৌজদার নিযুক্ত করেন। রাজা ভীমের আগমনে তাঁরা সাহস হারিয়ে ফেলেন। এমন কি, সহায়ক সৈন্যদের আসা পর্যন্ত পাটনার দুর্গে ঘাঁটি করতেও তাদের সাহস হয় নাই। তাঁরা পাটনা থেকে এলাহাবাদ পালিয়ে যান। রাজা ভীম তরবারি অথবা বর্শার ব্যবহার না করেই নগরে প্রবেশ করেন ও বিহার সুবা দখল করেন। এরপর শাহজাহান এসে পৌঁছান এবং জমিদারবর্গ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রোটাস দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ সৈয়দ মুবারক এক জমিদারের উপর দুর্গের ভার দিয়ে শাহজাদাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দ্রুত তাঁর নিকট চলে যান। শাহজাদা একদল সৈন্যসহ আবদুল্লাহ্ খানকে এলাহাবাদ সুবা এবং আর একদল সৈন্যসহ দরিয়া খানকে অযোধ্যা সুবার দিকে প্রেরণ করেন। বৈরাম বেগকে বিহারের শাসন-কার্য পরিচালনার জন্য রেখে শাহজাদা নিজেও উক্ত অঞ্চলসমূহের দিকে অগ্রসর হন। আবদুল্লাহ্ খান চৌসা নদী পার হওয়ার পূর্বেই খান-আজিম কোকার পুত্র জৌনপুরের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর কুলী খান[৮৩] আতংকগ্রস্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করেন এবং এলাহাবাদে মীর্জা রুস্তমের[৮৪] নিকট পালিয়ে যান ও সেখানে শিবির সন্নিবেশ করেন। আবদুল্লাহ্ দ্রুত গঙ্গা-তীরবর্তী এলাহাবাদের বিপরীত দিকে অবস্থিত ঝোশি শহরে অগ্রসর হন। তিনি (আবদুল্লাহ্) বাংলা থেকে একটি বৃহৎ নৌ-বহর নিয়ে গিয়েছিলেন। কামানের সাহায্যে আক্রমণ

চালিয়ে এই নৌ বহরে নদী পার হয়ে মনোরম এলাহাবাদ নগরে তিনি শিবির স্থাপন করেন এবং শাহজাহান সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশসহ জৌনপুরের দিকে ধাবিত হন।

বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে শাহজাদা শাহজাহানের যুদ্ধ এবং দক্ষিণে তাঁর পশ্চাদপসরণ

বাংলা ও উড়িষ্যা অভিমুখে শাহজাহানের অগ্রগমনের সংবাদ পাওয়ার পর বাদশাহ তৎক্ষণাৎ যুবরাজ পারভেজ ও মহবত খানকে দক্ষিণ (দাক্ষিণাত্য) থেকে এলাহাবাদ ও বিহার সুবার দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে এবং বাংলার নাজিম তাঁকে (শাহজাহানকে) প্রতিরোধ করতে অক্ষম হলে শাহজাহানের সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধ করতে হুকুম দেন। ইতিমধ্যে বাংলার নাজিম নওয়াব ইব্‌রাহীম খান ফতেহ জং-এর মৃত্যু-সংবাদ বাদশাহের নিকট পৌঁছায় ও তিনি শাহজাদা পারভেজ[৮৩] ও মহবত খানকে পুনরায় উক্ত আদেশ প্রেরণ করেন। শাহজাদা পারভেজ, মহবত খান ও অন্য সৈন্যাধ্যক্ষগণ বাংলা ও বিহার অভিমুখে অগ্রসর হন। শাহজাহানের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি নৌকা-গুলিকে গঙ্গায় নিজের দিকে রেখে পারাপার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং এই কারণে বাদশাহী সৈন্যদের পৌঁছতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল। বাদশাহী বাহিনী বিশেষ কষ্টে জমিদারদের সাহায্যে ত্রিশটি নৌ বহর জোগাড় করে ও জমিদারদের নির্দেশমত একস্থানে নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। কয়েকদিন যাবত উভয় বাহিনী মুখোমুখি সৈন্যসমাবেশ করতে থাকে। বাদশাহী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার; শাহজাহানের সৈন্যসংখ্যা দশ হাজারের বেশী ছিল

না। সেইজন্য তাঁর পরামর্শদাতাগণ তাঁকে যুদ্ধ করতে পরামর্শ দেন। রাজা করনের পুত্র রাজা ভীম তাঁদের সঙ্গে একমত না হয়ে রাজপুত-সুলভ হঠকারিতা প্রদর্শন করেন এবং বলেন যে, যুদ্ধ করতে সম্মত না হলে তিনি দলত্যাগ করবেন। সৈন্য-সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও শাহজাদা শাহজাহান ভীমের খেয়ালমত কাজ করা আপাত সুবিধাজনক গণ্য কবেন ও যুদ্ধ করার আদেশ দেন। উভয়পক্ষ তখন সৈন্যদের একত্রিত ক'রে যুদ্ধ আরম্ভ করে।[৮৬]

উভয়পক্ষেব সৈন্যগণ কাতারবন্দী হয়,
হাতে তাদের ছোরা, তীর ও বর্শা।
তারা যুদ্ধের ময়দানে অগ্রসর হল,
সত্যই এবার যুদ্ধের আগুন জলে উঠলো।
উভয়পক্ষের গোলন্দাজদের কামান থেকে
সৈন্যবাহিনীদ্বয়ের উপর আগুন ছড়াতে শুরু করলো।
উভয়পক্ষের কামানের গাড়ী থেকে ধোঁয়া ওঠে—
বলতে পার যে, কালো মেঘ সৃষ্টি হচ্ছিলো।
কামানের গোলা শিলা-বৃষ্টির মতো পড়ছিলো,
ঠিক যেন ধ্বংসের ঝড় ব'য়ে যাচ্ছিলো ঃ
সৈন্যাধ্যক্ষদের মাথা ও হাত, বুক ও পা
চারিদিকে বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছিলো।
চারিদিকে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিলো,
বীরদের দেহ মাছের মতো ধুক্‌পুক্‌ করছিল।
পাথর বিঁধ্‌তে পারে এমনি তীর চারিদিক থেকে
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ছিলো;
যার উপর পড়ছিলো, তারই দেহ এফোঁড় ওফোঁড়
ক'রে বিদীর্ণ করছিলো।
তলোয়ার ও বর্শার আঘাতে বুক ছিন্নবিচ্ছিন্ন
হয়ে যাচ্ছিলো;
যোদ্ধাদের মৃতদেহ মাটিতে পড়ছিলো।

কিন্তু (অসংখ্য) তারকারাজির মতো বাদশাহী সৈন্যরা
শাহজাদার সৈন্যদের ঘিরে চাপ দিচ্ছিলো।
এই যুদ্ধে তারা (বাদশাহী সৈন্যরা) এদের
ঘিরে ফেলেছিলো
ঠিক যেমন আংটি আঙ্গুলকে ঘিরে থাকে।
শাহজাহানের সৈন্যদলের সাহসী রাজা ভীম,
এই হত্যাকাণ্ড দেখেও ভীত হননি।
তার গোষ্ঠীর সহযোগীরা
শত্রু-সৈন্যের উপর সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লো।
তাদের ঘোড়া বেগে ছুটিয়ে সিংহের মতো লড়তে লাগলো,
তারা তলোয়ার চালাতে লাগলো জল-দানবের মতো।
একটি প্রচণ্ড আক্রমণ দ্বারা শত্রু-ব্যূহ ভেঙ্গে দিলো,
এবং দ্রুত শত্রুর মধ্যভাগ আক্রমণ করলো।
এদের সামনে যারা দাঁড়ালো
তাদেরি মাথা মাটিতে লুটাতে লাগলো।
কিন্তু অভিজ্ঞ বাদশাহী সৈন্যরা যখন দেখলো
যে, একটা বিপর্যয় হঠাৎ উপস্থিত হয়েছে,
তারা তখন চারিদিক থেকে ঘোড়া ছোটালো বেগে,
এবং হস্তীর মতো বীর ভীমকে আক্রমণ করলো।
তরবারি দ্বারা তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করে দিলো,
এবং তাঁকে অশ্ব-পৃষ্ঠ থেকে মাটিতে ফেলে দিলো।
শাহজাহানের অন্য সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ
ভীমকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হতে পারলো না।

(শাহজাহানের) গোলন্দাজরা এই সংকট দেখে কামান ফেলে পালিয়ে গেলো এবং বাদশাহী সৈন্যরা গোলাবারুদসহ সেগুলো দখল করলো। দরিয়া খান এবং অন্য আফগানরা ও সেনাপতিরা যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে পালিয়ে গেলো। মধ্যস্থলে ছিলেন শাহজাহান ; তারা (বাদশাহী সৈন্যরা) তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। পতাকাবাহী

হস্তী ও বাছাই বন্দুকধারী তাঁর পিছনে ছিল এবং অদূরে তাঁর দক্ষিণ দিকে আবদুল্লাহ্ খান ছিলেন। এ-ছাড়া আর কেউ ছিল না। এই মুহূর্তে একটি তীর এসে শাহ্জাদার ঘোড়াকে আঘাত করে। আবদুল্লাহ্ খান যখন দেখলেন যে, যুবরাজ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাৎপদ হবেন না, তখন তিনি অগ্রসর হয়ে বহু অনুরোধ উপরোধ ক'রে শাহজাদাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনেন এবং নিজের ঘোড়ায় আরোহণ করতে তাঁকে সম্মত করান। প্রকৃতপক্ষে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রোটাস পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। সেইসময় শাহ্জাদা মুরাদ বখসের[৮৭] জন্ম হওয়ায় দীর্ঘপথ চলা সম্ভব হচ্ছিলো না। সেইজন্য তাকে আল্লার হাতে সমর্পণ ক'রে এবং খিদমত পরস্ত খান ও অন্য কয়েকজন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে তাঁর তত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়ে অন্যান্য রাজপুত্রদের ও সমর্থকদের নিয়ে ধীরে ধীরে পাটনা ও বিহারের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। একই সময় দক্ষিণের লোকজনের, বিশেষতঃ হাবসী মালিক অম্বরের[৮৮] নিকট থেকে শাহ্জাদাকে দক্ষিণে ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ-পত্র আসে। শাহ্জাহান[৮৯] পশ্চাদ্গমন করার পর বাংলার শাসনকর্তা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দরাব খানকে তাঁর সঙ্গে যোগদান করতে আদেশ প্রেরণ করেন। কৃতঘ্ন দরাব খান বদমাশী ক'রে শাহ্জাদার হুকুমের ভুল ব্যাখ্যা করেন ও জানান যে, জমিদারগণ চারিদিক থেকে ঘিরে তাঁর বেরোবার পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছে এবং সেইজন্য (যেতে না পাবায়) তাকে ক্ষমা করতে বলেন। দরাবের উপস্থিতির সকল আশা ত্যাগ ক'রে ও যুদ্ধের উপযোগী সৈন্যবাহিনী না থাকায় শাহ্জাহান বাধ্য হয়ে বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্নচিত্তে আকবরনগর (রাজমহল) অভিমুখে অগ্রসর হন এবং যাওয়ার সময় দরাব খানের পুত্রকে আবদুল্লা খানের হেফাজতে রেখে যান। সেখানে রক্ষিত সমস্ত পারিবারিক জিনিসপত্র নিয়ে শাহ্জাহান যে পথে এসেছিলেন সেই পথে দক্ষিণে ফিরে যান। দরাব খানের আনুগত্যহীনতা ও বদমাশী জানতে পেরে আবদুল্লাহ্ খান তার বয়স্ক পুত্রকে হত্যা ক'রে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন। শাহ্জাহান তাকে হত্যা না করার আদেশ প্রেরণ করা সত্ত্বেও কোনো ফল হয় নাই। যখন শাহ্জাহানের বাংলা

থেকে দক্ষিণে পশ্চাদ্‌গমনের সংবাদ বাদশাহের নিকট পৌঁছায়, তখন তিনি মুখলেস খানকে রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধায়কের পদে নিয়োগ করেন এবং দ্রুত শাহজাদা পারভেজের নিকট গিয়ে তাঁকে অন্যান্য নেতৃস্থানীয় আমীরদের সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হতে আদেশ করেন। তজ্জন্য শাহজাদা পারভেজ দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করেন এবং যাত্রার পূর্বে মহবত খান ও তাঁর পুত্র খানাহ্জাদ খানকে জায়গীরদারস্বরূপ তত্ত্বাবধানের জন্য জায়গীর দিয়ে যান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (খ)

মহবত খান ও তাঁর পুত্রকে জায়গীরস্বরূপ বাংলা বরাদ্দকরণ[১]

যখন সুবে-বাংলা নওয়াব মহবত খান ও তাঁর পুত্র খানাহ্-জাদ খানকে জায়গীরস্বরূপ বরাদ্দ করা হয় তখন তাঁরা শাহজাদা পারভেজের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন। দরাব খানকে অবাধে আসতে দেয়ার জন্য উক্ত দেশের জমিদারদের আদেশ দেয়া হয়। দরাব খান বিনা বাধায় মহবত খানের নিকট পৌঁছান। কিন্তু যখন মহবত খানের নিকট দরাব খানের উপস্থিতির সংবাদ বাদশাহ্ পান, তখন তিনি মহবত খানকে নিম্নরূপ আদেশ পাঠান: "এই দুর্বৃত্তকে রেহাই দেয়াতে আপনি কি সুবিধা দেখছেন? এই পত্র পাঠ মাত্র আপনার উচিত এই দুষ্ট-প্রকৃতির বিদ্রোহীর শিরশ্ছেদ ক'রে তার মাথা বাদশাহের নিকট প্রেরণ করা।" মহবত খান বাদশাহের হুকুম মত দরাব খানের শিরশ্ছেদ ক'রে তার মাথা বাদশাহের নিকট পাঠিয়ে দেন। বাংলায় যে-সকল হাতী দখল করা হয়েছিল সেগুলো বাদশাহের নিকট প্রেরণ না করায় এবং বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রেরণের কিস্তি-খেলাফ করায় বাদশাহ আরব দস্ত ঘয়েবকে[২] মহবত খানের নিকট গিয়ে হাতীগুলো বাজেয়াফ্‌ত ক'রে বাদশাহের নিকট পাঠাতে হুকুম দেন; এবং বাদশাহের নিকট নিজে উপস্থিত হয়ে সঠিক হিসাব পেশ করতে ও বকেয়া রাজস্ব পরিশোধ করতে হুকুম দেন। মহবত খান প্রথমে হাতীগুলো বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন; এবং পরে পুত্র খানাহ্‌জাদ খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ ক'রে চার বা পাঁচ হাজার রক্তলিপ্সু

রাজপুত অশ্বারোহীসহ বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য যাত্রা করেন। সেইসঙ্গে মনে মনে দৃঢ়সংকল্প করেন যে, যদি তাঁর সম্মান, সম্পত্তি ও জীবনের কোনো প্রকার ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়, সেরূপ ক্ষেত্রে তিনি সপরিবারে ও সন্তানসহ মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত হবেন। তাঁর পৌঁছানোর সংবাদ অবগত হয়ে বাদশাহ হুকুম দেন যে, যতদিন পর্যন্ত তিনি বাদশাহী রাজস্ব জমা না দেবেন এবং সুবিচার ক'রে জনসাধারণের অভিযোগসমূহের প্রতিকার না করবেন, ততদিন বাদশাহ তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেবেন না। ইতিমধ্যে খাজা নখশাবন্দীর[৩] পুত্র বারখুরদারের সঙ্গে বাদশাহের অনুমতি না নিয়েই[৪] মহবত খান নিজ কন্যার বাগদান করেছিলেন। বাদশাহ বারখুরদারকে তলব করেন এবং তাঁকে অপমান-জনকভাবে বেত্রাঘাত ও কারারুদ্ধ করেন। সকালে মহবত খান তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যগণসহ বাদশাহের শিবিরে যান এবং কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন না ক'রে উদ্ধত ও দুঃসাহসিকভাবে দরজা ভেঙ্গে বাদশাহের 'খাসখানায়'[৫] প্রবেশ করেন। তাঁর (মহবত খানের) সঙ্গে ছিল চার-পাঁচ শ' রাজপুত ও তাঁর পরণে ছিল শিকারীর পোষাক। খাসখানায় প্রবেশ ক'রে বাদশাহকে অভিবাদন ক'রে নিজ আবাসস্থলে ফিরে আসেন।'[৬] সংক্ষেপে, এই সময় বাদশাহী বাহিনী থাটার দিকে চলে গিয়েছিল। এই বাহিনীর সঙ্গে যোগদানের জন্য মহবত খানকে হুকুম দেয়া হয়। ইতিমধ্যে শাহজাদা পারভেজের মৃত্যু হয়। শরিফ খান[৭] থাটার দুর্গে সুরক্ষিতভাবে অবস্থান করছিলেন এবং সেই কারণে শাহজাদা সসৈন্যে দক্ষিণে চলে যান। মহবত খান থাটায় পৌঁছে আনুগত্য স্বীকার ক'রে শাহজাহানকে পত্র লেখেন। শাহজাহান বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করায় মহবত খান তাঁর অধীনে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। এর ফলে সুবে-বাংলায় মহবত খানের পুত্র খানাহ্জাদ খানের পরিবর্তে মোয়াজ্জম খানের পুত্র মুকররম খানকে[৮] এবং পাটনা প্রদেশে মীর্জা রুস্তম সাফাভীকে[৯] নিযুক্ত করা হয়। কথিত হয়, খানাহ্জাদ খানের স্থলে নওয়াব মুকররম খানকে বাংলার সুবাদারী দেয়ার জন্য যেদিন দিল্লীতে সনদ তৈরি হচ্ছিল,

সেইদিনই শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ ফিরোজপুরী[১০] খানাহ্জাদ খানের উদ্দেশ্যে এক প্রশংসাজনক কবিতা (কসিদাহ) রচনা ক'রে পাঠিয়েছিলেন। এই কবিতায় নিম্নোক্ত ছত্র দু'টি ছিল যদ্বারা খানাহ্জাদকে পরিবর্তনের ইঙ্গিত ছিল ঃ

ওগো প্রস্ফুটিত গোলাপ, পাপিয়ার মতো আমি তোমার
প্রেমে পড়েছি

কিন্তু, একটা নতুন বসন্তে হবে তোমার স্থিতি এবং
তা দৃষ্টিগোচর হবে অন্যদের।

উপরোক্ত ছত্র দু'টি পড়ার পর খানাহ্জাদ খান তাঁর পদচ্যুতির কথা অনুমান ক'রে যাত্রার ব্যবস্থা করতে থাকেন। এক মাস পরে তিনি বাদশাহের তলব নামা পান।

নওয়াব মুকররম খানের নিজামত

বাদশাহের সিংহাসনে আরোহণের একবিংশতিতম বৎসরে, মোতাবেক ১০৩০ হিজরীতে মুকররম খানকে সুবে-বাংলার নিজামতে নিয়োগ করা হয়। কয়েক মাস অতীত হতে না হতে দৈবক্রমে তাঁর ঠিকানায় এক বাদশাহী ফরমান আসে। খান উক্ত ফরমান গ্রহণ করার জন্য অগ্রসর হন।[১১] আসরের নামাজের সময় হওয়ায় তিনি নামাজ সমাপনান্তে আবার কার্যারম্ভ করার উদ্দেশ্যে ভৃত্যদের নৌকা পাড়ে নোঙর করার নির্দেশ দেন। মাঝিরা নৌকা (ভাউলিয়া) তীরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সেই সময় প্রচণ্ড বাতাসে নৌকা ভেসে যায়। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ও ঢেউয়ের তোড়ে নৌকা ডুবে যায়। সঙ্গী ও সহচরবৃন্দসহ মুকররম খান নদীতে ডুবে যান এবং একটি প্রাণীও রক্ষা পায় নাই।[১২]

নওয়াব ফেদাই খানের নিজামত[১৩]

বাদশাহের সিংহাসনে আরোহণের দ্বাবিংশতিতম বৎসরে, মোতাবেক ১০৩৬ হিজরীতে যখন মুকররম খানের নদীতে ডুবে মৃত্যু হওয়ার সংবাদ তাঁর নিকট পৌঁছায় তখন নওয়াব ফেদাই খানকে সুবে-বাংলার রাজ-প্রতিনিধিরূপে নিয়োগ করা হয়। তৎকালে এ দেশ থেকে রেশমের দ্রব্যাদি, হস্তী, মুসব্বর কাঠ, চন্দন কাঠ ও অন্যান্য উপহার ব্যতীত নগদ অর্থ বাদশাহের নিকট প্রেরিত হত না। এই সময় পূর্ব প্রথা বাতিল ক'রে সাব্যস্ত করা হয় যে, বাদশাহের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ও নূরজাহান বেগমের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা—মোট দশ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর বাদশাহী খাজাঞ্চিখানায় পাঠাতে হবে।[১৪] ১০৩৭ হিজরীর সফর মাসের ২৭ তারিখে[১৫] কাশ্মীর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রাজৌরে বাদশাহ নূরুদ্দীন মুহম্মদ জাঁহাগীরের মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র আবুল মোজাফ্‌ফর শাহাবুদ্দীন শাহজাহান (তখন তিনি দক্ষিণে ছিলেন) ও আসফজাহ্ আসফ খানের[১৬] চেষ্টায় (ভ্রাতাদের নির্মূল ক'রে) দিল্লীর বাদশাহী মসনদে আরোহণ করেন। এর পর সুবে-বাংলা ফেদাই খানের পরিবর্তে কাসিম খানের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

নওয়াব কাসিম খানের নিজামত[১৭]

কাসিম খান বাংলার নিজামতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি তাঁর পূর্ববর্তী নাজিমদের মত প্রশাসনিক কার্যে ও বিশৃঙ্খলা (বিদ্রোহাদি) দমনে আত্মনিয়োগ করেন। শাহজাহানের রাজত্বের ষষ্ঠ বৎসরে হুগলী বন্দরের খ্রীস্টান ও পর্তুগীজরা উদ্ধত হওয়ায় কাসিম খান তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন ও যুদ্ধে পরাজিত ক'রে তাদের বহিষ্কার-

করেন। এই কার্যের জন্য তিনি বাদশাহ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু অল্পদিন পরে তার মৃত্যু হয়।

নওয়াব আজম খানের নিজামত

অতঃপর নওয়াব আজম খানকে[১৮] বাংলার নিজামতে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনি সুচারুরূপে শাসনকার্য পরিচালনায় অক্ষম হওয়ায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অসমীয়ারা এই সময় বাদশাহী এলাকা আক্রমণ ক'রে অনেকগুলি পরগণা ধ্বংস করে এবং প্রচুর সম্পদ ও দ্রব্যাদি লুঠ ক'রে নিয়ে যায়। আবদুস সালাম[১৯] এক সহস্র অশ্বারোহী ও বহু পদাতিক সৈন্যসহ গৌহাটি অভিযানে গিয়েছিলেন। তাঁকেও তারা ধরে নিয়ে যায়। বাদশাহ এই সংবাদ পাওয়ার পর আজম খানের স্থলে ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। প্রশাসনিক কার্যে ইসলাম খানের প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি জাঁহাগীরের অন্যতম প্রধান আমীর ছিলেন।

নওয়াব ইসলাম খানের শাসনকাল

বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত হওয়ার পর অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা নওয়াব ইসলাম খান এই সুবায় এসে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে প্রশাসনিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। বিদ্রোহী অসমীয়াদেব শাস্তি দেয়ার জন্য তিনি অভিযান প্রেরণ করেন এবং কুচবিহার ও

আসাম জয়ের পরিকল্পনা করেন। এই সকল অঞ্চলে অভিযান পরিচালনা ক'রে ও বহু যুদ্ধের পর তিনি দুর্বৃত্ত উপজাতিদের শাস্তি দেন এবং তারা যে-সকল বাদশাহী মহল দখল করেছিল সেগুলি পুনরুদ্ধার করেন। অতঃপর তিনি কুচবিহারের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। বহু যুদ্ধ ও দুর্গ দখল ক'রে তিনি বিদ্রোহী অসমীয়াদের ধ্বংস করেন। এই সময় উজীর পদে নিয়োগের জন্ম শাহজাহান তাঁকে[২০] ডেকে পাঠান এবং নওয়াব সয়েফ খানকে[২১] জানানো হয় যে, শাহজাদা মুহম্মদ শুজাকে বাংলার নিজামত বরাদ্দ করা হয়েছে ও শাহজাদা না পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি (সয়েফ খান) প্রতিনিধি হিসেবে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। যুদ্ধের মধ্যেই ইসলাম খানকে ফেরত যাওয়ার আদেশ দেয়ায় আসাম বিজয় অসম্পূর্ণ থাকে এবং তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর অসমীয়ারা পুনরায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। শাহজাহানের রাজত্বের একাদশ বৎসরে এই ঘটনা ঘটেছিল।

শাহজাদা মুহম্মদ শুজার শাসনকাল

শাহজাহানের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে শাহজাদা মুহম্মদ শুজা[২২] বাংলায় পৌঁছে আকবর নগরে (রাজমহলে) সদর দফতর স্থাপন করেন ও সেখানে কতকগুলি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। জাহাঙ্গীর নগর অর্থাৎ ঢাকায় তিনি তাঁর শ্বশুর নওয়াব আজম খানকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন।[২৩] ইসলাম খানের প্রত্যাবর্তনের পর প্রশাসনিক কার্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, সে-সব নতুনভাবে বিন্যাস করা হয়। শাহজাদা আট বৎসরকাল প্রশাসনিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। শাহজাহানের রাজত্বের বিংশতিতম বৎসরে[২৪] শাহজাদাকে বাদশাহের নিকট উপস্থিত

হওয়ার জন্ত আদেশ দেয়া হয় এবং নওয়াব ইতিকাদ খানকে এই সুবার নিজামতে নিয়োগ করা হয়।

নওয়াব ইতিকাদ খানের নিজামত

বাংলার নিজামতে নিয়োগের পর নওয়াব ইতিকাদ খান[২৫] এদেশে এসে দুই বৎসরকাল শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। শাহ-জাহানের রাজত্বের দ্বাবিংশতিতম বৎসরে তাঁর (ইতিকাদ খানের) স্থলে শাহজাদা মুহম্মদ শুজাকে দ্বিতীয়বার বাংলার নিজামত দেয়া হয়।

শাহ শুজার দ্বিতীয় শাসনকালের ও তাঁর কর্ম-জীবনের সমাপ্তির বিবরণ

শাহজাদা শাহ শুজা দ্বিতীয়বার বাংলায় এসে আট বৎসরকাল সুদক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং অন্যান্য অঞ্চল জয় ক'রে গৌরব অর্জন করেন। বাদশাহ শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের ৩০ বৎসরের সময় অর্থাৎ ১০৬৭ হিজরীতে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থতার কাল দীর্ঘ হওয়ায়[২৬] ও সরকারী কর্মচারীগণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে না পারায় সাম্রাজ্য পরিচালনকার্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শাহজাদাদের মধ্যে কেবল দারা শেকোহ ব্যতীত অন্য কেউ বাদশাহের নিকট না থাকায় বাদশাহী কার্য পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর উপরই ন্যস্ত করা হয়। দারা শেকোহ নিজেকে যুবরাজ গণ্য ক'রে সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কার্য সম্পূর্ণরূপে নিজ আয়ত্তাধীন করেন। এই

কারণে শাহজাদা মুরাদ গুজরাটে নিজ নামে খোতবা পড়াতে আরম্ভ করেন। বাংলায় মুহম্মদ শুজা নিজেকেই বাদশাহ ঘোষণা করেন এবং সৈন্যসামন্তসহ পাটনা ও বিহারের দিকে অগ্রসর হয়ে বেনারসের নিকটবর্তী হন। এই সংবাদ শুনে দারা শেকোহ বাদশাহের গুরুতর অসুস্থ অবস্থাতেও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শাহজাহানাবাদ (দিল্লী) থেকে আকবরাবাদ (আগ্রায়) রওয়ানা হন ১০৬৮ হিজরীর ২০শে মুহররম তারিখে, অর্থাৎ শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের একত্রিংশত্তম বৎসরে, এবং সেখানে পৌঁছান ১৯শে সফর তারিখে। এখানে এসে দারা নেতৃস্থানীয় রাজপুত রাজা ও সাম্রাজ্যের প্রধান অমাত্য—রাজা জয়সিং কাচোয়া এবং দিলীর খান, সলোবত খান, হজাদ সিং ও অন্যান্য পাঁচ-হাজারি ও চার-হাজারি মনসবদারগণকে তাঁর নিজের (দারার) ও বিরাট এক বাদশাহী ফৌজ কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রসহ শাহ শুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সমগ্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতিরূপে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলায়মান শেকোহকে নিযুক্ত করেছিলেন। উক্ত বৎসরের রবি-উল-আউয়ালের ৪ঠা তারিখে এই বাহিনীর অভিযান আরম্ভ হয়। কয়েকদিন অগ্রসর হওয়ার পর এই বাহিনী বেনারস অতিক্রম ক'রে বাহাদুরপুর গ্রামে শিবির সন্নিবেশ করে। এই স্থানটি বেনারস থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে। বাহাদুরপুর থেকে দেড় ক্রোশ দূরে শুজার সৈন্যবাহিনীর শিবির অবস্থিত ছিল। উভয় বাহিনী সামরিক কল-কৌশল অবলম্বন ক'রে বিপক্ষকে হঠাৎ আক্রমণ করার সুযোগ সন্ধান করছিল। ফলে, কোনো পক্ষ সোজাসুজি আক্রমণ করে নাই। ২১শে জমাদি-উল-আউয়াল তারিখে বাদশাহী বাহিনী শিবির স্থানান্তরিত করার ভান ক'রে পশ্চাদপসরণ করে। কিন্তু হঠাৎ ঘুরে সবেগে শুজার সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করে। শুজার বাহিনী সম্পূর্ণ হতভম্ব হয়ে যায়। আগের দিন বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদপ-সরণের সংবাদ শুনে শুজা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে অবহেলা করেছিলেন এবং এই সময় গভীর নিদ্রাভিভূত ছিলেন। এই প্রকার আকস্মিক আক্রমণে নিদ্রাভঙ্গের পর শুজা এক মাদী-হস্তীতে আরোহণ ক'রে

চঞ্চলভাবে এদিক ওদিক ঘুরছিলেন। ইতিমধ্যে রাজা জয়সিং পার্শ্বদিক থেকে সবেগে আক্রমণ দ্বারা শুজার নিকটবর্তী হচ্ছিলেন। গত্যন্তরবিহীন হয়ে শাহ শুজা বাংলা থেকে আনীত নৌ-বহরে উঠে সমস্ত সম্পদ, কামান, ঘোড়া, শিবির ইত্যাদি ত্যাগ ক'রে দ্রুত পলায়ন করেন এবং দ্রুতবেগে পাটনা অতিক্রম ক'রে মুঙ্গের পৌঁছান। সেখানে সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্যে কয়েকদিন অবস্থান করেন। সুলায়মান শেকোহর সৈন্যবাহিনী শুজার সৈন্যদের কতককে হত্যা করে, কতককে বন্দী করে ও শিবিরের সব লুণ্ঠন ক'রে শুজার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে মুঙ্গের পৌঁছায়। মুহম্মদ শুজা মুঙ্গেরে প্রতিরোধ অসম্ভব বিবেচনা ক'বে বিদ্যুৎবেগে আকবর নগর (রাজমহলে) চলে যান। বাদশাহী বাহিনী পাটনা ও বিহার সুবা বশীভূত ও দখল করে।[২৭] কিন্তু, ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব দক্ষিণ[২৮] থেকে সম্রাট সমক্ষে উপস্থিত হওয়ার জন্য অগ্রসর হন এবং নর্মদা নদী-তীরে বিপুল বাদশাহী সৈন্যবাহিনীকে ভীষণ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং শাহজাহানাবাদে পৌঁছে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। আওরঙ্গজেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মুহম্মদকে বাদশাহ শাহজাহানের নিকট পাঠান ও বাদশাহকে প্রহরাধীন রাখেন। আরো কতকগুলি যুদ্ধের পর দারা শেকোহকে[২৯] হত্যা ক'রে আওরঙ্গজেব ১০৬৯ হিজরীর পবিত্র রমজান মাসে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলায়মান শেকোহ পিতার পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে শাহ শুজার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ ক'রে দিল্লী অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করেন। দারা শেকোহ ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে অনুমান করেন এবং এতে তাঁর (শুজার) সুযোগ উপস্থিত হয়েছে মনে ক'রে আলীবর্দী খান, মীর্জা জান বেগ ও অন্যান্য কর্মচারীদের কুপরামর্শে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলার উপর প্রভুত্ব দাবী করেন এবং এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ হিন্দুস্তানের রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন। শুজার উপস্থিতির পূর্বেই হিন্দুস্তানে আওরঙ্গজেব ও দারা শেকোহর মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং আওরঙ্গজেব ইতিমধ্যে বাদশাহী সিংহাসনে আরোহণ করায় শুজার অভিযানের সংবাদ পেয়ে আওরঙ্গজেব তাঁর সমগ্র সৈন্য-

বাহিনীসহ দ্রুত অগ্রসর হন। কাচোয়ায় উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়।

উভয়পক্ষের সৈন্যবাহিনী সারিবদ্ধ ক'রে প্রস্তুত করা হ'ল,
তারা দাঁড়িয়েছিল সমতল ভূমির উপর পর্বতের মতো।
যখন দুই বাহিনী পরস্পরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো,
তখন ধূলায় অন্ধকার হয়ে গেলো, বিশ্ব
কালো হয়ে গেলো।
উভয়পক্ষের যুদ্ধের দামামা যখন বেজে উঠলো,
সিংহের মতো বীরেরা আঘাত করার জন্য নখর
বিস্তার করলো।

দামামা ধ্বনির কোলাহলে
পৃথিবীর কর্ণ বধির হয়ে গেল।
কামান, বন্দুক, হাওই ও শরাঘাতে
পৃথিবীর নিরাপত্তা কোণঠাসা হয়ে গেল।
কামানের গাড়ীর ধোঁয়া বাতাসের সঙ্গে মিশে
পৃথিবী থেকে আকাশ অদৃশ্য হয়ে গেল।
হত্যা করতে করতে বর্শা গরম হয়ে উঠলো
জীবনের কর্ণে মৃত্যুর বাণী ফিস ফিস ক'রে বললে।
তরবারির আঘাতে এত আগুন জ্বলে উঠলো যে,
তাতে অস্তিত্বের ফসল পুড়িয়ে দিলো।
যুদ্ধের আগুন এত তীব্রভাবে জ্বলে উঠলো,
যে উর্ধ্বাকাশে মঙ্গল গ্রহের অন্তর উত্তপ্ত ক'রে দিলো।

বহু চেষ্টা ও যুদ্ধ করেও আওরঙ্গজেবের বাহিনী পরাজিত হয়। কিন্তু আওরঙ্গজেব কিছুসংখ্যক আমীর ও গোলন্দাজদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অটল হয়ে রইলেন। শাহ শুজার বাহিনীর প্রধান সেনাপতি আলীবর্দী খান আওরঙ্গজেবকে বন্দী করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আল্লাহ বাদশাহদের সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞান দিয়েছেন এবং

পরিস্থিতি সঠিকভাবে উপলব্ধির ক্ষমতা দিয়েছেন। জ্ঞানী বাদশাহ (আওরঙ্গজেব) যুদ্ধ 'মাত্রই প্রতারণা' এই প্রবাদ বাক্য লক্ষ্য ক'রে উপরোক্ত (আলীবর্দী) খানকে প্রধান উজীর পদের লোভ দেখান এবং তাকে বলেন যে, যদি তিনি (আলীবর্দী) শুজাকে হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নামিয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাতে পারেন, তা'হলেই এই যুদ্ধে তিনি (আওরঙ্গজেব) জয়ী হতে পারবেন। খানও আওরঙ্গজেবের এই ফাঁদে পা দিলেন এবং তাঁর পুরাতন উপকারকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন ও তাঁকে বললেন, "আমাদের সৈন্যবাহিনী জয়ী হয়েছে···, শত্রু-সৈন্য পরাজিত হয়েছে। চারিদিক থেকে কামানের গোলা, হাওই ও তীর বর্ষিত হচ্ছে। কোনোটি দৈবক্রমে রাজকীয় হস্তীকে আঘাত করতে পারে। এই অবস্থায় আপনার হাতী থেকে নেমে ঘোড়ায় চড়া উচিত। আপনার সৌভাগ্যের জোরে আমি অবিলম্বে আলমগীরকে বন্দী ক'রে আপনার সামনে হাজীর করবো।" শাহ শুজা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করা মাত্রই উক্ত খান এই সংবাদ আলমগীরের নিকট প্রেরণ করেন। আলমগীর তৎক্ষণাৎ কৌশলে বিজয়-বাদ্য বাজানোর আদেশ দিলেন। শাহ শুজার সৈন্যবাহিনী তাঁকে হস্তীপৃষ্ঠে দেখতে না পাওয়ায় চারিদিকে আলমগীরের জয় ও শুজার পরাজয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পরলো। শুজা নিহত হয়েছেন মনে ক'রে তাঁর সৈন্যরা আতংকগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে থাকে। শুজা তাদের আতংক দূর ক'রে ফেরাবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এ থেকে বাক্য তৈরী হয়েছে, "খেলায় জিতেও শুজা হেরে গেলেন।" আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা একত্রিত হয়ে আক্রমণ করে। পরাজয় নিশ্চিত দেখে শাহ শুজা বাধ্য হয়ে বাংলা অভিমুখে পলায়ন করেন। তেলিয়াগড়ি ও শকরিগলির গিরিপথ সুরক্ষিত ক'রে তিনি আকবরনগরে (রাজমহলে) ঘাঁটি স্থাপন করেন। আলমগীর তাঁর প্রধান সেনাপতি নওয়াব মোয়াজ্জম খান খান-ই-খানানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং নওয়াব ইসলাম খান, দিলীর খান, দাউদ খান, ফতেহ জং খান, ইহ্‌তিশাম খান প্রমুখ বাইশজন খ্যাতনামা আমীরকে সুলতান মুহম্মদের অধীনে শাহ শুজার পশ্চাদ্ধাবনে নিযুক্ত

করেন। আওরঙ্গজেব নিজে বিজয়ী হয়ে রাজধানী (দিল্লী) অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন।

নওয়াব মোয়াজ্জম খান খান-ই-খানানের সুবাদারি

বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পর নওয়াব মোয়াজ্জম খান এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন। শাহ শুজা তেলিয়াগড়ি ও শকরিগলি গিরিপথদ্বয় সুরক্ষিত করায় নওয়াব মোয়াজ্জম খান মাত্র বারো হাজার সৈন্য নিয়ে উক্ত গিরিপথ অধিকার করা কঠিন হবে বিবেচনা ক'রে ঝাড়খণ্ড[৩০] ও পার্বত্য এলাকা দিয়ে দ্রুত বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন। বিরোধী বাহিনীদ্বয় পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার পর শুজা আকবর নগরে (রাজমহলে) অবস্থান অসম্ভব বিবেচনা করেন এবং এই সমস্ত দুষ্কার্যের মূল আলীবর্দী খানকে হত্যা ক'রে নিজে টাণ্ডা চলে যান। সেখানে দুর্গের বাইরে দৃঢ়প্রাকার তৈরী করেন ও ঘাঁটি সুরক্ষিত করেন। যখন উভয় বাহিনী গঙ্গার দুই তীরে সমবেত হয়, তখন একদিন দুষ্কার্যের গোড়া শরিফ খান ও ফতেহ জং খান নৌকাযোগে নদীর উত্তর পাড়ে উপস্থিত হন। অন্যরাও তাদের অনুসরণ করে। শরিফ খান উত্তর পাড়ে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহ শুজার সৈন্যগণ তাদের আক্রমণ করে। প্রায় সত্তর জন অপর তীরে পোঁছেছিল; তারা সকলেই নিহত হয়। অবশিষ্ট নৌকাগুলি নদীর মধ্যস্থল থেকে ফিরে যায়। সুলতান শুজা আহত ব্যক্তিদের হত্যা করার আদেশ দেন। কিন্তু শাহ নিয়ামতুল্লাহ ফিরোজপুরি তাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। এই দরবেশের উপর শাহ শুজার পরম বিশ্বাস থাকায় তাঁর অনুরোধ মোতাবেক শরিফ খান ও আহত ব্যক্তিদের তাঁর হাতে

সমর্পণ করেন। দরবেশ তাদের শুশ্রূষা করেন ও ক্ষত নিরাময় হওয়ার পর তাদের নিজ সৈন্যবাহিনীতে প্রেরণ করেন। কিন্তু, সুলতান মুহম্মদ চাচার পক্ষে যোগদান করার উদ্দেশ্যে একা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং চাচার (শুজার) নিকট অত্যন্ত সদয় ব্যবহার পাওয়ায় তাঁর কাছেই থেকে যান। সুলতান শুজা তাঁর সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। সুলতান শুজার পক্ষে সুলতান মুহম্মদ খান-ই-খানান,[৩১] দিলির খান প্রমুখ আমীরদের নেতৃত্বাধীন বাদশাহী সৈন্যদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধ করেন।

পরিশেষে, শাহ শুজার ঔদাসীন্য ও অবহেলা দেখে সুলতান মুহম্মদ আবার বাদশাহী বাহিনীর পক্ষে ফিরে যান ও সেখান থেকে শাহজাহানাবাদে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সম্মুখে উপস্থিত হন। বাদশাহ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন।[৩২] শাহ শুজার পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য পুনরায় খান-ই-খানানকে আদেশ দেয়া হয়। এই সময় একদিন দিলির খান ও অন্যান্যরা পাগলাঘাট নদী অতিক্রম করার সময় তাঁর (দিলির খানের) পুত্র কিছুসংখ্যক সুদক্ষ সঙ্গীসহ নদীতে ডুবে মারা যান। শাহ শুজা পরিবারবর্গ ও সমর্থকগণসহ জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) থেকে আনীত নৌবহরযোগে উক্ত স্থান অভিমুখে রওয়ানা হন। খান-ই-খানানও[৩৩] স্থলপথে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। জাহাঙ্গীর নগরেও বাদশাহী বাহিনীকে প্রতিরোধ করা অসম্ভব বিবেচনা ক'রে শাহ শুজা উক্ত স্থান ত্যাগ করেন এবং কিছুসংখ্যক অনুসারীসহ আসামের দিকে চলে যান এবং সেখান থেকে আরাকান গিয়ে তথাকার শাসনকর্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। আরাকানের তৎকালীন শাসনকর্তা একজন সৈয়দ[৩৪] ছিলেন। তথাকার শাসনকর্তার বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই হউক, অথবা স্বাভাবিক রোগে হউক সেখানে (আরাকানে) তাঁর (শুজার) মৃত্যু হয়। সুলতান শুজার আমলের বিশৃঙ্খলার সুযোগে কুচবিহারের রাজা ভীমনারায়ণ[৩৫] ঘোড়াঘাট আক্রমণ করেন এবং তথাকার বহুসংখ্যক নারী-পুরুষ মুসলমানদের বন্দী করেন। এরপর ভীমনারায়ণ কামরূপ দখল করার জন্য অগ্রসর হন। হাজো ও গৌহাটি অঞ্চল কামরূপ প্রদেশের ও বাদশাহী

এলাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভীমনারায়ণ তাঁর মন্ত্রী শাহুনাথকে[৩৬] বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ কামরূপ জয়ের জন্য প্রেরণ করেন। এই আক্রমণের সংবাদ পেয়ে অদূরদর্শী আসামের রাজা[৩৭] স্থল ও জলপথে এক বৃহৎ বাহিনী কামরূপ অভিমুখে পাঠান। দু'দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা এবং বাদশাহী বাহিনীর সাহায্যের কোনই আশা নাই দেখে কামরূপের[৩৮] ফৌজদার মীর লুত্‌ফুল্লাহ্‌ শিরাজী দ্রুত নৌকাযোগে জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকায় পৌঁছে নিজেকে আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা করেন। শাহুনাথ অসমীয়াদের মোকাবিলা করতে অক্ষম হ'য়ে 'প্রত্যাবর্তনই শ্রেয়' এই প্রবাদ অনুযায়ী নিজের দেশে ফিরে যান। অসমীয়ারা বিনাবাধায় কামরূপ প্রদেশ জয় করে এবং অধিবাসীদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পদ ও লোকজনকে নিজেদের দেশে নিয়ে যায় এবং সারাদেশ বিরান করে দেয়। সুলতান শুজা তখন নিজের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় বিধর্মীরা সেই সুযোগে জাহাঙ্গীর নগর থেকে পাঁচ মন্‌জিল দূরবর্তী কাজী বাড়ী মৌজার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ অধিকার করে এবং কাজী বাড়ীর নিকটবর্তী তবসিলা গ্রামে সৈন্যদের ঘাঁটি স্থাপন ক'রে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করে। এমতাবস্থায় খান ই-খানান জাহাঙ্গীর নগর পৌঁছে প্রশাসনিক সুব্যবস্থাকরণে কিছু সময় ব্যয় করার পর তিনি নৌ-বহর, গোলন্দাজ বাহিনী ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেন। এবং জাহাঙ্গীর নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা রক্ষার জন্য ইহ্‌তিশাম খানকে এবং রাজস্ব ও আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির দায়িত্ব রায় ভোগতি দাশ শুজাইকে দিয়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সিংহাসনারোহণের চতুর্থ বৎসরে, মোতাবেক ১০৭২ হিজরীতে[৩৯] কুচবিহার ও আসাম জয়ের জন্য অগ্রসর হন। তিনি গোলন্দাজ বাহিনী ইত্যাদিকে নদীপথে প্রেরণ করেন এবং নিজে কুড়ি হাজার সুদক্ষ অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্যসহ স্থলপথে বাদশাহী এলাকার সীমান্তবর্তী এক পাহাড় অতিক্রম ক'রে অগ্রসর হন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি গৌহাটি পর্যন্ত কুচবিহার রাজ্য জয় করেন। অতঃপর আসাম জয় করার জন্য সৈন্যবাহিনীসহ অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে আরাকানীদের দ্বারা বন্দী ও নিগৃহীত শাহ শুজার সন্তান-সন্ততি ও পরি-

বারবর্গকে উদ্ধার ক'রে দিল্লী প্রেরণের জন্য বাদশাহের এক হুকুমনামা খান-ই-খানানের নিকট পেঁৗছায়। বাদশাহের হুকুমের উত্তরে খান আবেদন জানান যে, বাদশাহী সৈন্যগণ এই সময় কুচবিহার ও আসাম জয়ে ব্যস্ত আছে এবং উপরোক্ত প্রদেশদ্বয়ের বিজয় অসম্পূর্ণ রেখে আরাকান অভিযানে যাওয়া সুবিবেচনার কাজ হবে না; এবং এই বৎসর কুচবিহার ও আসাম বিজয় সম্পূর্ণ ক'রে পরবর্তী বৎসর আরাকান অভিযানে যাত্রা করবেন। অতঃপর উক্ত বৎসরের ২৭শে জমাদি-উস-সানি তিনি গৌহাটি থেকে আসামে প্রবেশ করেন। জল ও স্থলপথে যুদ্ধ করতে করতে তিনি জঙ্গল, পর্বত ও নদী অতিক্রম করতে থাকেন। যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই তিনি একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। অনেক যুদ্ধের পর তিনি উক্ত দেশের রাজার দুর্গ ও প্রাসাদ অধিকার করেন ও বহু জিনিসপত্র লাভ করেন। পরপর যুদ্ধে[৪১] হতভাগ্য অসমীয়ারা পরাজিত হ'য়ে ভুটানের পাহাড়ে পলায়ন করে এবং সমগ্র আসাম বিজিত হয়। অবশেষে আসামের রাজা গলায় বশ্যতার শিকল প'রে ও কানে বাধ্যতার মাক্‌ড়ি প'রে উপহারসহ জনৈক বিশ্বাসী দূতকে খান-ই-খানানের নিকট প্রেরণ করেন এবং বাদশাহকে কর দিতে সম্মত হন। সেইসঙ্গে বাদলি ফুকনের তত্ত্বাবধানে জিনিসপত্র, দুর্লভ রেশমী দ্রব্যাদি, হস্তী ও অন্যান্য দুর্লভ দ্রব্যসহ নিজ কন্যাকে প্রেরণ করেন। উক্ত ফুকন সমস্ত উপহারসহ ঢাকার উপকণ্ঠে পেঁৗছে শিবির সন্নিবেশ করে ও বাদশাহী রাজধানী গমনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। অসমীয়ারা যাদুবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত এবং খান-ই-খানান তাদের যাদুর দ্বারা আক্রান্ত হন। যকৃৎ ও হৃদপিণ্ডের ব্যথায় তিনি কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন। দিনের পর দিন এই ব্যথা বৃদ্ধি হতে থাকে ও মারাত্মক পরিণতির ইঙ্গিত দেয়। চিকিৎসা সত্ত্বেও কোনো সুফল হয় না। সুতরাং মীর মর্তুজা ও অন্য সেনাপতিদের রেখে বাধ্য হয়ে তাঁকে ফিরতে হয়। প্রত্যেক কৌশলপূর্ণ স্থানে সৈন্যদের ঘাঁটি স্থাপন ক'রে তিনি এক পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হন এবং ব্যাধি বৃদ্ধি হওয়ায় সেখান থেকে নৌকাযোগে জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) রওয়ানা হন।[৪২] বাদশাহ আওরঙ্গজেবের

সিংহাসনে আরোহণের পঞ্চম বৎসরে, মোতাবেক ১০৭৩ হিজরীর রমজান মাসের ২রা তারিখে খিজিরপুর থেকে দুই ক্রোশ দূরে নৌকাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৪২] পরে প্রান্তিক ঘাঁটিসমূহের সৈন্তরা সেগুলো ত্যাগ ক'রে আসে; কিন্তু কন্যাকে পুনরায় গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় রাজকন্যা সমস্ত উপহারসহ থেকে যান।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (গ)

নওয়াব আমীর-উল-ওমরাহ শায়েস্তা খানের সুবাদারি

খান-ই খানানের মৃত্যুর পর বাংলার সুবাদারিতে আমীর-উল-ওমরাহ শায়েস্তা খান নিযুক্ত হওয়ায় তিনি বাংলায় পৌঁছান। কয়েক বৎসর তিনি প্রশাসনিক কার্যে মনোনিবেশ করেন এবং সুবিচার ও জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের, দুঃস্থ বিধবাদের ও অন্যদের গ্রাম ও জমি দান ক'রে তিনি তাদের অবস্থা ভাল করেন। গোয়েন্দারা বাদশাহকে এই সংবাদ দেওয়ায় শায়েস্তা খান[১] নিজে বাদশাহের সমক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রকৃত অবস্থা পেশ করেন। বাদশাহী রাজস্বের অপব্যয়ের অভিযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে পুনরায় খেলাত দিয়ে বাংলায় প্রেরণ করা হয়।[১] কিন্তু তিনি এই প্রদেশে থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন না। সেইজন্য তাঁকে বাদ শাহের পদ-চুম্বনের সুযোগ দান ও অন্য কাউকে এই প্রদেশের সুবাদার পদে নিয়োগ করার জন্য তিনি অনবরত বাদশাহকে পত্র লিখতেন। প্রথমে তাঁর পদত্যাগপত্র মঞ্জুর করা হয় নাই। কিন্তু অবশেষে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় আলী মর্দান খান ইয়ার ওফাদারের পুত্র নওয়াব ইব্রাহীম খানকে নিজামের পদ দেয়া হয়। নওয়াব আমীর-উল-ওমরার কল্যাণকর শাসনের বিষয় কেবল বাংলায় নয়, সারা হিন্দুস্তানে সুবিদিত। তার একটা হচ্ছে এই যে, তাঁর নিজামত আমলে খাদ্যশস্য এতই সস্তা ছিল যে, বাজারে এক দামড়ি[১] দিয়ে এক সের চাউল পাওয়া যেতো। রাজধানী শাহজাহানাবাদে (দিল্লীতে) প্রত্যাবর্তনের

সময় তিনি জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) পশ্চিম দরওয়াজায় নিম্নোক্ত বাক্যটি খোদাই ক'রে গিয়েছিলেন ঃ "যিনি এই প্রকার সস্তায় চাউল বিক্রি দেখাতে পারবে, কেবল তিনিই এই দরওয়াজা খুলতে পারবেন।" এই সময় থেকে নওয়াব শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খানের আমল পর্যন্ত এই দরওয়াজা বন্ধ ছিল। নওয়াব সরফরাজ খানের সুবাদারি আমলে এই দরওয়াজা খোলা হয়। পরে এ-বিষয় বিবৃত হবে। আমীর-উল-ওমরার[৪] তৈরী কাট্‌রা ও অন্যান্য অট্টালিকার অস্তিত্ব আজও জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) আছে।[৫]

নওয়াব ইবরাহীম খানের সুবাদারী[৬]

সুবে-বাংলার নিজামতের খেলাত দ্বারা ভূষিত হওয়ার পর নওয়াব ইব্‌রাহীম খান জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকায়) পৌঁছে প্রশাসনিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। নিপীড়িতদের সামনে তিনি সুবিচার ও দাক্ষিণ্যের দরওয়াজা মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন এবং একটি পিপীলিকার উপরও অত্যাচার হতে দেন নাই। বাদশাহ আওরঙ্গজেব দক্ষিণের প্রদেশের শাসন-কর্তা আবুল হাসান[৭] ওরফে তানা শাহ এবং সাতারার বিদ্রোহী জমিদার শিব ও শম্ভা[৮-৯] প্রমুখের সঙ্গে বারো বৎসর যাবৎ সম্পূর্ণ ব্যস্ত থাকায় দীর্ঘকাল রাজধানী থেকে অনুপস্থিত ছিলেন। সেই কারণে সাম্রাজ্যের কয়েকটি স্থানে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সুবে-বাংলার বর্ধমান জেলার চিতওয়া[১০] ও বারদাহের জমিদার শোভা সিং বিদ্রোহী হন এবং আফগানদের নেতা নাক-কাটা রহীম খান একদল আফগান-সৈন্য-সহ তাঁর সঙ্গে যোগদান করেন। উক্ত বিদ্রোহীদের অত্যাচারে নিগৃহীত বর্ধমানের[১১] জমিদার কিশন রাম বাধ্য হয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও নিহত হন। কিশন রামের স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পরিবারবর্গ ও সম্পদ

তাদের হস্তগত হয়। কিশন রামের পুত্র জগৎ রায় বাংলার সুবাদারের রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকায়) পলায়ন করেন। এই সংবাদ পেয়ে চাকলা যসর (যশোর), হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ফৌজদার নূরুল্লাহ্ খান[১২-১৩] বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য যসর[১৪] থেকে অগ্রসর হন। নূরুল্লাহ্ খান অত্যন্ত ধনী ও ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সেহ্-হাজারী মনসবদারের মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহিনীর কোলাহল শুনে তিনি তাদের প্রতিরোধ করা দুঃসাধ্য মনে ক'রে হুগলী দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং চুচ্ড়ার (চিন্সুড়ার) খ্রীস্টান ডাচদের সাহায্য চান। শত্রুরা নূরুল্লার ভীরুতার সংবাদ পেয়ে (হুগলী) দুর্গ অবরোধ করে এবং কতকগুলো খণ্ড-যুদ্ধের পর অবরুদ্ধ সৈন্যদের বিপর্যস্ত ক'রে তোলে। শেখ সাদীর একটি কবিতায় আছেঃ

> "যখন শক্তি দ্বারা শত্রুদের পরাস্ত করতে পারবে না।
> তখন উপহার দিয়ে বিশৃঙ্খলার দ্বার বন্ধ করা তোমার উচিত।"

এই বাণী অনুযায়ী নূরুল্লাহ্ সমস্ত সম্পদ ত্যাগ ক'রে নিজের প্রাণ রক্ষা করাই সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন। নাক ও দুই কান কাপড়ে বেঁধে (অর্থাৎ অত্যন্ত হীনভাবে) তিনি দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং সমস্ত সম্পত্তি ও মালসহ হুগলী দুর্গ শত্রুর হস্তগত হয়। এই বিপর্যয়ের পর চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। শহর ও শহরতলীর নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য অধিবাসীরা নিজেদের মালমাত্তা নিয়ে নিরাপদ স্থান চুচ্ড়া (চিন্সুড়ায়) আশ্রয় গ্রহণ করে। ডাচ-নেতৃবৃন্দ দুই জাহাজ ভর্তি সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রসহ দুর্গের পাদদেশে উপস্থিত হয়ে কামানের গোলায় দুর্গের অট্টালিকাসমূহ ধ্বংস ও বহু লোক হতাহত করে। সন্ধি-চুক্তির ব্যবস্থা না করেই শোভা সিং হুগলীর অদূরবর্তী সাতগাঁয়ে পলায়ন করে এবং সেখানেও অবস্থান করা অসম্ভব মনে ক'রে বর্ধমানে পশ্চাদ্গমন করে। সেখান থেকে রহীম খানের নেতৃত্বে তার উশৃঙ্খল সৈন্যদের নিয়ে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হয়। তৎকালে মুর্শিদাবাদের নাম ছিল মক্সুদাবাদ। অত্যাচারী শোভা সিং-এর কবলস্থ কিশন রামের পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁর (শোভা

সিং-এর) একটি পরমা সুন্দরী, সুশীলা ও সতী কন্যা ছিল। চরম বদমাশ শোভা সিং এই কুমারীর সতীত্ব নষ্ট করার মতলব করেছিল। নিয়তির বিধান—তাই এক রাত্রে সে উক্ত কুমারীর[১০] সতীত্ব নষ্ট করার জন্য হাত বাড়ায়। সেই সিংহী চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে পলকের মধ্যে এই প্রকার দুর্ঘটনার সম্ভাবনায় লুক্কায়িত ছোরা বে'র ক'রে বদমাশের নাভি থেকে তলপেট কেটে ফেলে এবং সেই ছোরা দিয়ে নিজের গলা কেটে জীবন বিসর্জন দেয়। পৃথিবী গ্রাসকারী এই অত্যাচারী ধ্বংস হওয়ার পর তার ভ্রাতা হিম্মত সিং তার স্থান গ্রহণ করে। এই ব্যক্তিও পৃথিবীতে আগুন জ্বালাতে সংকল্পবদ্ধ হয়ে বাদশাহী এলাকায় লুঠতরাজ আরম্ভ করে। রহীম খান নিজ গোষ্ঠীর ও উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদের জোরে রহীম শাহ নাম গ্রহণ করে। দাম্ভিকতা ও অহংকারবশতঃ কুমতলবে সে বহু সংখ্যক নীচ ও অজ্ঞ বদমাশদের সংগ্রহ ক'রে বিদ্রোহের আগুন দ্বিগুণ-ভাবে জ্বালিয়ে তোলে।[১১] গঙ্গার পশ্চিম দিক বর্ধমান থেকে আকবর নগর (রাজমহল) পর্যন্ত বাংলা প্রদেশের অধিকাংশ বিপর্যস্ত ক'রে তোলে। বাদশাহী সমর্থকদের মধ্যে যে তার বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী না হয়েছে, তাকেই শাস্তি দিয়েছে ও পীড়ন করেছে। এদের মধ্যে (বাদশাহী সমর্থকদের মধ্যে) মুর্শিদাবাদের নিকটে নিয়ামত খান নামক জনৈক বাদশাহী কর্মচারী পরিবারবর্গ ও অনুচরদের নিয়ে বাস করতেন। তিনি রহীম শাহের সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। রহীম শাহ তাঁকে হত্যা ক'রে মাথা কেটে আনতে হুকুম দেয়। জীবনের পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছে দেখে নিয়ামত খান শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তওহর খানের যেমন নাম তেমনি সাহসী ছিলেন। তিনি দ্রুত অশ্ব চালনা ক'রে সাহসের সাথে আক্রমণ করেন। অবশেষে শত্রু-সৈন্যরা তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং তিনি শহীদ হন। তাঁর আশে-পাশের সহযোগীরাও নিহত হয়। এই অবস্থা দেখে নিয়ামত খান বর্ম ইত্যাদি পরিধান ক'রে কেবল একটি তলোয়ার নিয়ে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করেন এবং ডাইনে বাঁয়ে শত্রুসৈন্য হত্যা করতে করতে মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়ে

রহীম শাহের মাথায় তলোয়ারের আঘাত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে নিয়ামতের তরবারি রহীম শাহের লৌহ-শিরস্ত্রাণে লেগে ভেঙ্গে যায়। নৈরাশ্যের ক্রোধে নিয়ামত খান এক হাত দিয়ে রহীম শাহের মুখ চেপে ধরেন ও অন্য হাত দিয়ে তার কোমর ধরে বলপূর্বক তাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে মাটিতে ফেলে দেন। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে নিজে ঘোড়া থেকে নেমে রহীমের বুকের উপর ব'সে ছোরা দিয়ে তার গলায় আঘাত করেন। দৈবক্রমে ছোরাটি রহীম শাহের শিরস্ত্রাণের ঝুরিতে বেঁধে যায় এবং তার গলায় আঘাত লাগে নাই। ইতিমধ্যে রহীম শাহের অনুচরেরা এগিয়ে এসে তরবারি ও বর্শা দিয়ে নিয়ামত খানকে আহত ক'রে মাটিতে ফেলে দেয়। রহীম শাহের জীবন দ্বিতীয়বার রক্ষা পায় ও সে অনাহত রইলো। মুমূর্ষু নিয়ামত খানকে অজ্ঞান অবস্থায় তারা একটি শিবিরে নিয়ে যায়। অত্যধিক তৃষ্ণায় নিয়ামত খান চোখ খুলে পানি দেয়ার জন্য ইঙ্গিত করেন। রহীম শাহের লোকেরা যখন এক পেয়ালা পানি আনলো, তখন তাদের হাতে পানি পান করতে তাঁর বিতৃষ্ণা বোধ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শুষ্ক ওষ্ঠে শাহাদতের পেয়ালার পানি পান করেন। আশে-পাশের জমিদারেরা ও সংবাদ-বাহকেরা পরপর এই দুঃখজনক সংবাদ জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) নওয়াব ইবরাহীম খানকে দেয়। কিন্তু নওয়াব ছিলেন এমন ব্যক্তি যার সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথাগুলো প্রযোজ্য:

"সিংহের মতো শক্তি থাকা সত্ত্বেও
প্রতিশোধ নেয়ার সময় তিনি ছিলেন নরম
তলোয়ারের মতো কোমল।"

দুর্বল-চিত্ত নওয়াব বলেন, "যুদ্ধের ফলে আল্লাহর বান্দাদের রক্তপাত হয়; উভয়পক্ষের লোকদের রক্তপাত করার প্রয়োজন কি?" বাদশাহ তখন দক্ষিণে ছিলেন। সরকারী পত্র ও সংবাদদাতাদের পত্রে এই বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে বাদশাহ এক ফরমান দ্বারা ইবরাহীম খানের পুত্র জবরদস্ত খানকে চাকলা বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতির ফৌজদার[১৭] নিযুক্ত করেন এবং দুষ্ক্রিয়াকারী শত্রুকে শাস্তি দেয়ার তাগিদ দেন। সেইসঙ্গে অযোধ্যা, এলাহাবাদ ও বিহারের নাজিম ও ফৌজদারদের

যেখানেই তারা শত্রুকে পাবেন সেখানেই তাকে ও তার পরিবারবর্গ ও সন্তানদের বন্দী করতে আদেশ দেন। আরো ঘোষণা করা হয় যে, যে-কেউ শত্রুপক্ষ ত্যাগ করবে তাকে জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং যে শত্রুপক্ষে যোগ দেবে তাকে ও তার পরিবারবর্গকে নির্মূল করা হবে। শেষ পর্যন্ত তাই ঘটেছিল। অত্যল্পকাল পরে বাংলা ও বিহারের সুবাদারি শাহজাদা আজিম-উশ-শানকে দেয়া হয় এবং কিছু সংখ্যক বাদশাহী কর্মচারিসহ তাঁকে বাংলায় যেতে আদেশ দেয়া হয়।[১৮] মহান খান—যার নাম জবরদস্ত খান—বাদশাহী হুকুম পাওয়ার পর কামান-সজ্জিত নৌ-বহর ও বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) থেকে যুদ্ধ অভিযানে রওয়ানা হন। প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর আগমন-বার্তা শুনে রহীম শাহ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের এক বৃহৎ বাহিনীসহ দ্রুত গঙ্গার তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। জবরদস্ত খান নদী-তীরে নৌ-বহর নোঙর করেন ও শত্রু-বাহিনীর সম্মুখে নিজ সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করেন এবং ইয়াজুজের তুল্য শত্রুদের সামনে মালবাহী গাড়ীগুলোর অগ্রভাগ আলেকজাণ্ডারের প্রাচীরের মতো সাজিয়ে দেন। পরদিন সুরক্ষিত ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে তিনি সৈন্য-বাহিনীর ব্যূহ স্থাপন করেন—দক্ষিণে, বামে, মধ্যভাগে, পুরোভাগে ও পশ্চাদ্‌ভাগে সশস্ত্র বীর-যোদ্ধাদের ব্যূহ স্থাপন করেন। সম্মুখভাগে কামান নিয়ে তিনি সাগর তরঙ্গের মতো অগ্রসর হয়ে যুদ্ধের দামামা-ধ্বনি করেন। যুদ্ধ আহ্বানের দামামা-ধ্বনি শুনে রহীম শাহ উদ্বিগ্ন হন; তবু তিনি তৎপর আফগান-সৈন্যদের নিয়ে বাদশাহী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধার্থে অগ্রসর হন। বাদশাহী বাহিনীর তরফ থেকে জবরদস্ত খান কামান, বন্দুক ও হাওই ছুড়বার আদেশ দেন। গোলন্দাজ ও বন্দুক-ধারীরা অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণ করতে লাগলো এবং সৈন্যরা তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ ক'রে শত্রুদের বিপর্যস্ত ক'রে তুললো।

> তারা তাদের বর্শা ও তরবারি নিয়ে আক্রমণ করলো,
> এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর রক্তপাত করলো।[১৯]

কামানের ধোঁয়ায় ও পদাতিকদের পায়ের ধূলায়
পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত গাঢ় অন্ধকার হয়ে গেলো।
সেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর রক্তপাতের জন্য
লাল তরঙ্গায়িত সাগরের মতো হয়ে গেলো।
তার মধ্যে যোদ্ধাদের মাথাগুলো আলোড়ন তুলেছিল,
তাদের মৃতদেহগুলো তার মধ্যে মাছের
মতো দেখাচ্ছিলো।

প্রচণ্ড নরহত্যার পর ভীরু আফগানরা পালিয়ে যায় এবং রহীম শাহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করেন। শক্তিশালী ও কর্মতৎপর জবরদস্ত খান বিজয়ী হন এবং আঘাতের পর আঘাত হেনে আফগানদের তাদের শিবিরে পশুপালের মতো তাড়িয়ে নিয়ে যান। পুরো তিন ঘণ্টা যুদ্ধের আগুন জ্বলতে থাকে। সূর্যাস্তের দিকে অত্যধিক গুমোট-গরম এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম ও ক্লান্তির জন্য অশ্বারোহীদের পশ্চাদ্ধাবন কার্য ত্যাগ করতে হয়। অতঃপর বিজয়ী সৈন্যগণ যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে শিবির সংস্থাপন করে এবং মৃতদের গোসল দাফন ও আহতদের শুশ্রূষা করে। চারিদিকে প্রহরী রেখে তারা সতর্কভাবে রাত্রি যাপন করে। পরদিন প্রভাতে যখন পূর্বদিকের রাজা[২০] সবুজ অশ্বে[২১] আরোহণ ক'রে গগনমণ্ডলে আবির্ভূত হন তখন রাত্রির অন্ধকার ও সৈন্যরূপী তারকারাজি অন্তর্হিত হয়ে যায়। এই সময় বিজয়ীগণ পুনরায় যুদ্ধসাজে সৈন্যদের রণক্ষেত্রে সজ্জিত করে। উভয় বাহিনী অগ্রসর হয়ে বর্শা, তরবারি ও ছোরা নিয়ে আক্রমণ করে। বাদশাহী সৈন্যগণ মরণপণ যুদ্ধ ক'রে বিদ্রোহীদের হত্যা ক'রে স্তূপীকৃত করে। দু'ঘণ্টা যুদ্ধের পর আফগান-বাহিনী বিধ্বস্ত হয়। রহীম শাহ পলায়ন করেন ও অসহায়ভাবে মুর্শিদাবাদের পথ ধরেন। জবরদস্ত খান এক 'ফরসাখ' অগ্রসর হয়ে শত্রুদের নিধন করতে থাকেন এবং পশ্চাদ্ধাবন ক'রে বহুসংখ্যক বিদ্রোহীকে হত্যা করেন। শত্রুর সমস্ত জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র ও অশ্ব হস্তগত ক'রে বিজয়ী হয়ে নিজ শিবিরে ফিরে আসেন। অতঃপর তিনি লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সৈন্যদের মধ্যে তাদের পদানুযায়ী

ভাগ ক'রে তাদের অন্তর জয় করেন। সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন এবং আহতদের শুশ্রূষা তদারক করেন। শত্রুর পথ কার্যকরীভাবে বন্ধ করার ও তাদের নিকট রসদ সরবরাহ না করার জন্য তিনি জমিদার ও পাহারাদারদের কঠোর আদেশ দেন। আরো মূল্যবান দ্রব্যাদি ও লুণ্ঠিত জিনিসপত্রসহ আহত সৈন্যদের জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকায়) প্রেরণ করেন এবং পলায়িতদের অবস্থিতির সন্ধানে চারিদিকে চর প্রেরণ করেন। রহীম শাহ অসহায় ও উদ্বিগ্নভাবে মুর্শিদাবাদ পৌঁছান এবং সেখানে সৈন্য সংগ্রহের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন। পরাজিত বিশৃঙ্খল সৈন্যদের ও অস্ত্রশস্ত্রহীন দুঃস্থ ব্যক্তিদের তিনি একত্রিত করেন এবং খাজাঞ্চিখানার অর্থ দ্বারা অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় ক'রে দ্রুত এক সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। চতুর্থ দিনে জবরদস্ত খান[২] যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে আশেপাশের জমিদারগণ বাদশাহী বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেন। কয়েক মনজিল অগ্রসর হওয়ার পর জবরদস্ত খান সমতলভূমির পূর্বদিকে শিবির স্থাপন করেন। রহীম শাহ বাদশাহী সৈন্য-সংখ্যার আধিক্য দেখে এদের মোকাবিলা করা অসম্ভব মনে ক'রে ভীরুভাবে বর্ধমান পলায়ন করেন। জবরদস্ত খানও সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাকে বিশ্রামের সুযোগ দেন নাই।

শাহজাদা ওয়ালাগওহর মুহম্মদ আজিম-উশ-শানের সুবাদারি এবং রহীম খানের[২৩] পতন

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহম্মদ মোয়াজ্জম, বাহাদুর শাহের পুত্র শাহজাদা ওয়ালাগওহর মুহম্মদ আজিম-উশ-শানকে[২৪] বাদশাহ বাংলা ও বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ঐ সময় তিনি বাদশাহের

নিকট একটি বিশেষ খেলাত, একটি মণিমাণিক্যখচিত তরবারি, উচ্চ পর্যায়ের মনসব ও শাহী[২০] পর্যায়ের তক্‌মা প্রাপ্ত হন। বিদ্রোহীদের শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর দুই পুত্র সুলতান করিমুদ্দীন ও মুহম্মদ ফররুখশিয়রসহ সুবে-বিহার অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সুবে-অযোধ্যা ও এলাহাবাদের মধ্য দিয়ে দ্রুত বিহার পৌঁছান। শাহজাদা বিধাতার অনুশাসনের তুল্য কার্যকরী বাদশাহী ফরমান দ্বারা জমিদার, আমিল ও জায়গীরদারদের তলব করেন। তাঁরা নজরানা ও উপহার নিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হন এবং মর্যাদা অনুযায়ী খেলাত লাভ করেন। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কার্যের ক্ষেত্রে মনোনিবেশ ক'রে তাঁরা বাদশাহী খাজাঞ্চিখানার প্রাপ্য রাজস্ব ও কর পরিশোধ করেন। রাজস্ব ও প্রশাসনিক কার্যের জন্য সং লোকদের দেওয়ান ও মিতব্যয়ী ব্যক্তিদের কারকুন পদসমূহে নিয়োগ করা হয়। বিভাগ (Circles) ও মহলসমূহে তহশিলদার নিয়োগ করা হয়। হঠাৎ জবরদস্ত খানের বিজয় ও রহীম শাহের পরাজয়ের সংবাদ সরকারী পত্র-যোগে পৌঁছায়। তিনি (আজিম-উশ-শান) অনুমান করেন যে, যে বিজয় ও গৌরবের মৎস্য তিনিই পাওয়ার যোগ্য তা অন্য লোকে ধরে নিচ্ছে ও তজ্জন্য সে পুরস্কার লাভ করবে। উপরন্তু, নওয়াব আলী মর্দান[২৬] খানের পৌত্র জবরদস্ত খান এই প্রকার মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য সমাধা করায় হয়ত তার বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা হতে পারে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাহজাদা এক বৃহৎ বাহিনীসহ সুবে-বিহার থেকে দ্রুত রাজমহল অতিক্রম ক'রে বর্ধমান পৌঁছান। শাহজাদা জবরদস্ত খানের কার্য উপেক্ষা করেন; এমন কি, প্রশংসা অথবা উৎসাহ দেয়ার জন্য একটি কথাও বলেন নাই। শাহজাদার ঔদাসীন্যের দরুন উক্ত খান তাঁর এত পরিশ্রম বৃথা গিয়েছে মনে ক'রে বাদশাহের নিকট যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শাহজাদার ক্ষমতা উপেক্ষা ক'রে তিনি দামামা-ধ্বনিসহ দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করেন। রহীম শাহ যুদ্ধক্ষেত্রে এই সিংহের উগ্রতার ভয়ে শিয়ালের মত গর্তে লুকিয়েছিলেন। এখন তিনি সুযোগ বুঝে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার নদীতে পানির স্রোত প্রবাহিত করেন এবং বর্ধমান,

হুগলী ও নদীয়ার সীমান্ত অঞ্চলে আক্রমণ করতে থাকেন। লুঠপাট চালিয়ে তিনি ঐ সকল অঞ্চল বিরান এবং বন্যপশু, পেঁচা ও কাকের বাসস্থানে পরিণত করেন। জবরদস্ত খানের প্রস্থানের পর শাহজাদা আত্ম-নির্ভরশীলতার সাথে জমিদার ও ফৌজদারদের বশীভূত ও আশ্বস্ত করবার জন্য জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) হুকুম-নামা প্রেরণ করেন। শাহজাদা আকবর নগর (রাজমহল) থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকেন ও সৈন্যদের সুবিধা পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। আমিল, ফৌজদার ও জমিদারগণ নিজ নিজ মহল থেকে সৈন্যদল নিয়ে এবং উপহার ও করসহ শাহজাদার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগদান করে। দুর্ভাগা রহীম শাহ কিন্তু শাহজাদার উপস্থিতি অলীক মনে ক'রে অমনো-যোগিতার নিদ্রা-ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। যখন বাদশাহী বাহিনীর আগমন-সংবাদ হতভাগা জানতে পারেন, তখন তিনি দ্রুত ও উদ্বিগ্নভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আফগান-সৈন্যদলসমূহকে একত্রিত ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। শক্তিশালী বাদশাহী ঈগল এই সকল চড়ুই পাখীর দলকে অগ্রাহ্য ক'রে ধীরে সুস্থে অগ্রসর হয় এবং লটবহর পিছনে রেখে বর্ধ-মানের উপকণ্ঠে শিবির সন্নিবেশ করে। সেখান থেকে শাহজাদা এই ঘৃণ্য প্রতারককে মূল্যবান উপদেশবাণী প্রেরণ করেন এবং তা গ্রহণ করলে পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি ও অসম্মত হলে প্রতিশোধ নেয়ার ভীতি প্রদর্শন করেন। প্রতারক বাহ্যত শাহজাদার সুপরামর্শে সম্মত হওয়ার ভান করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার অন্তর বিদ্রোহী-কণ্টকে পূর্ণ ছিল। সে শাহজাদার প্রিয় সঙ্গী, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রধান উজীর খাজা 'আসামের'[৭] ছোট ভাই খাজা আনোয়ারের সাহায্য প্রার্থনা করে এবং জানায় যে, খাজা স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ও প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়ে যদি তার (রহীমের) নিরাপত্তা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেন, তবে সে তাঁর সঙ্গে শাহজাদার নিকট উপস্থিত হয়ে ও তার দুষ্ক্রিয়ার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। বিশ্বাসঘাতকের ছলনা সম্বন্ধে অজ্ঞ শাহজাদা উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন এবং উক্ত খাজাকে পরদিন সকালে রহীম শাহের শিবিরে নিয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে প্রকাশ্যে আনুগত্য স্বীকারের জন্য তাকে

রাজদরবারে আনতে হুকুম দেন। পরদিন সকালে খাজা প্রভুর আদেশ অনুযায়ী কোনো প্রকার সতর্কতা অবলম্বন না করেই কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুসহ অশ্বারোহণে রহীম শাহের শিবিরে যান। রহীম শাহের শিবিরের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তাকে সংবাদ দেন ও চারিদিক পর্যবেক্ষণ করেন। শিবিরের মধ্যে আফগান-সৈন্যদের লুকিয়ে রেখে রহীম শাহ বিশ্বাসঘাতকতা করার ফন্দী করেছিল। সাপের আগুন থেকে ধোঁয়া উঠার আশংকা করে তিনি শিবিরের অভ্যন্তরে যেতে ইতস্ততঃ করছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দেয়ার জন্য রহীম শাহকে বাইরে আসতে বলেন। যখন উভয়পক্ষের মধ্যে এই প্রকার দাবী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা চলছিল ও মূল উদ্দেশ্য তখনো অকার্যকরী ছিল, এমনি সময় হঠাৎ রহীম শাহ সশস্ত্র সৈন্যদলসহ শিবিরের বাইরে এসে চীৎকার করতে করতে খাজার সামনে অগ্রসর হয়। মুখের কথার আঘাত শেষ পর্যন্ত বর্শাঘাত পর্যন্ত পৌঁছায়। খড়ের নিচে পানির অস্তিত্ব অনুভব ক'রে খাজা আনোয়ার এইভাবে আসার জন্য দুঃখিত হন এবং কার্য অসম্পূর্ণ রেখেই ফিরে যেতে চান। রহীম শাহ অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে। আনোয়ার বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন; কিন্তু মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কয়েকজন সঙ্গীসহ নিহত হন। ময়দান শূন্য দেখে আফগানরা উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে সবেগে অগ্রসর হয়ে শাহজাদার শিবির আক্রমণ করে।

বাদশাহী বংশের তরুণ বংশধর
প্রতারকের এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখলেন,
এবং খাজা আনোয়ারের অবস্থা অবগত হলেন
সংবাদ পেলেন যে তাঁর মস্তক দেহ থেকে
বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে;
তখন তাঁর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো,
তিনি তাঁর অস্ত্র-রক্ষককে অস্ত্র আনতে বললেন।
কাঁধে বর্ম ও মাথার উপর শিরস্ত্রাণ দিয়ে
মাথা থেকে পা পর্যন্ত তাঁর আকৃতি
হ'ল যেন লোহার তৈরী।

তিনি একটি কঠিন তলোয়ার ঝুলিয়ে নিলেন,
কোমরে শক্ত করে বাঁধলেন একটি ছোরা।
একটি চক্‌চকে ঢাল বাঁধলেন কাঁধে,
এবং চক্‌চকে বর্শা নিলেন হাতে।
একটি তুণ ঝুলিয়ে নিলেন কোমরে
এবং কাঁধে নিলেন একটি কায়েনীয় ধনুক।[২৮]
হাওদার মাথায় বাঁধলেন একটি ধ্বাশ
এবং হাতে নিলেন লোহার গদা।
সৈন্যবাহিনীর সেনাপতিদের আদেশ দিলেন
রাজ শিবিরের সম্মুখে সত্বর সমবেত হতে।
তাঁর আদেশে যুদ্ধ-লিপ্সু সৈন্যগণ
শাহজাদার চতুর্দিকে জমায়েত হ'ল।
শাহজাদা যখন হাতীতে চড়লেন,
তখন তাঁকে পর্বতের উপর সূর্যের তুল্য দেখাচ্ছিল।
যুদ্ধ-দামামা বেজে উঠলো, সৈন্যরা অগ্রসর হ'ল
তরঙ্গায়িত নদীর মতো।
যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে তিনি তাঁর পতাকা উন্নত করলেন,
এবং সাহসের সাথে সৈন্যদের ব্যূহ সজ্জিত করলেন।
তিনি মধ্যস্থ ও পার্শ্বস্থসমূহ ঃ
দক্ষিণ ও বামপার্শ্ব, পশ্চাদভাগ ও পুরোভাগ সাজালেন।
তাঁর অত্যধিক সৈন্যসংখ্যা ও বাদশাহী মর্যাদার দরুন—
পৃথিবী ত্রাসে কাঁপতে লাগলো,
তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন,
কিন্তু আক্রমণ করতে বিলম্ব করলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশ করা হ'ল ; দাবার ছকের মতো অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের সাজানো হ'ল। সেই সময় রহীম শাহ পার্শ্বদেশ আক্রমণ ক'রে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলো। বর্ম-পরিহিত একদল আফগান-সৈন্য ছোরা হাতে বাদশাহী সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ ক'রে

মধ্যস্থলে উপস্থিত হ'য়ে 'আজিম-উশ-শান' ব'লে চিৎকার ক'রে শাহজাদার সন্ধান করতে লাগলো। অশ্বারোহণে শাহজাদার হস্তী আক্রমণ ক'রে তারা শেষ আঘাত করার জন্য প্রস্তুত হ'ল। বাদশাহী অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যগণ এই দুর্বৃত্তদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে শাহজাদাকে শত্রুর সামনে এক কোণে ফেলে পলায়ন করলো। ফলে বাদশাহী সৈন্যদের শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গেলো। রহীম শাহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে শাহজাদার হস্তীকে আক্রমণ করলো। এই সংকটকালে ও এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ দুঃসাহসিকতা দেখে অদূরে দণ্ডায়মান হামিদ খান কোরায়শী[২৯] তীরের মতো বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে রহীম শাহকে আক্রমণ ক'রে বললেন, "দুর্বৃত্ত, আমি আজিম-উশ-শান।" সঙ্গে সঙ্গে পর্বত বিদারী তীব ছুড়ে রহীম শাহের বক্ষভেদ করলেন।

তিনি ধনুক খুলে নিলেন হাতে
খাদাং[৩০] তীর বে'র করলেন তুণ থেকে।
গাধার চামড়ার খাঁজে বসালেন তীর
এবং লক্ষ্য করলেন সেই দৈত্যের দিকে।
লক্ষ্য স্থির ক'রে যখন তীর ছুড়লেন খাঁজ থেকে,
তখন তা সেই যুদ্ধলিপ্ত দৈত্যের বক্ষভেদ করলো,
সোজাসুজি তার বক্ষভেদ করে গেলো।

হামিদ খান দ্রুত রহীম শাহের ঘোড়ার কাঁধ লক্ষ্য ক'রে আরো তীর ছুড়ে ঘোড়ার কাঁধে ও মাথায় আঘাত করলেন। বুকে দু'টো মারাত্মক আঘাত পেয়ে রহীম শাহ মাটিতে পড়ে গেলেন। হামিদ খান ক্ষিপ্রগতিতে ঘোড়া থেকে রহীম শাহের বুকের উপর বসে তার মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বর্শার আগায় গেঁথে ঘোরাতে লাগলেন। এই দৃশ্য দেখে ভীরু আফগানরা ভয়ে পশ্চাদপদ হয়ে পলায়ন করলো ও স্পর্ধিত দুর্বৃত্তদের পতাকা উল্টে গেলো। বিজয়ের উল্লাসে বাদশাহী পতাকা আবার বাতাস স্পর্শ করলো এবং বাদশাহী বাদ্য আবার সজোরে বেজে উঠলো ও 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' ধ্বনি পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর অশ্বারোহী-

সৈন্যগণ বিজিতদের তাদের শিবির পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেলো এবং যুবক বৃদ্ধ যে-কেউ তাদের নাগালে পড়লো, সে তাদের কুম্ভীর-রূপী রক্তলিপ্সু তরবারির খাদ্যে পরিণত হল। আর যারা তলোয়ারের কবল থেকে বাঁচলো তারা আহত হয়ে উদ্বিগ্নভাবে কোনো প্রকারে পালিয়ে গেলো। বাদশাহী দল বহু দ্রব্য পায় ও বহু সংখ্যককে বন্দী করে। ভাগ্যবান শাহজাদা বিজয়ী হ'যে বর্ধমানে প্রবেশ করেন এবং আউলিয়া শাহ ইবরাহীম সাক্কার[৩১] মাজার জিয়ারত করেন। জিয়ারতের পর তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন এবং বাদশাহের নিকট বিজয় সংবাদ পাঠান। তিনি দুর্বৃত্ত আফগান সমর্থকদের শাস্তি দেয়ার জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করেন। যেখানেই তাদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, সেখানেই তাদের গ্রেফতার ও হত্যা করা হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই বর্ধমান, হুগলী ও যসর (যশোর) প্রভৃতি জেলা আফগান হামলাকারীদের কবল থেকে মুক্ত হয়। এরা যে সকল অঞ্চল বিরান করেছিল, সেগুলো আবার উর্বর হয়ে উঠলো। বর্ধমানের নিহত জমিদার কিশন রায়ের পুত্র জগৎ রায়কে খেলাত দিয়ে পৈতৃক জমিদারীতে পুনর্বহাল করা হয়। অনুরূপ-ভাবে, আফগানরা অন্য যে সকল জমিদারকে উৎপীড়ন ও বহিষ্কার করেছিল, তাদেরও রাজকীয় ফরমান দ্বারা শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং পৈতৃক মর্যাদায় পুনর্বহাল করা হয়। খালসা (সরকারের খাস জমি) জমি-সমূহ ও জায়গীরসমূহ পুনরায় বন্দোবস্ত দ্বারা রাজস্ব আদায় আরম্ভ হয়। আর, তিউল,[৩২] আয়মা ও আলতমগাহগণ স্ব স্ব মহলে পুনরায় প্রবেশ ও দখল করে। বাদশাহ বীরত্বের জন্য হামিদ খান কোরায়শীর মনসব উন্নীত করেন এবং শামশের খান বাহাদুর উপাধি দিয়ে সিলহট (সিলেট) ও বান্দাসিলের (?) ফৌজদার পদে নিযুক্ত করেন। শাহজাদার অন্যান্য কর্মচারিগণ যারা উত্তম কাজ করেছিল তাদেরও কাজ ও মর্যাদার অনুপাতে মনসব ও অধিকতর মর্যাদা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। বর্ধমানে জেলার ফৌজদারের বাসস্থান ছিল। শাহজাদা সেখানে অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন অট্টালিকার ভিত্তি স্থাপন করেন ও একটি জুমা মসজিদ তৈরী করান। হুগলীতে তিনি শাহগঞ্জ[৩৩] শহর প্রতিষ্ঠা করেন ও নিজ নামানুসারে শহরের

নাম রাখেন আজিমগঞ্জ। পণ্যদ্রব্যসমূহ ও রেশমী দ্রব্যাদির উপর 'সায়ের'-করের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন এবং মুসলমানদের দ্রব্যের উপর শতকরা আড়াই টাকা[৩৪] এবং হিন্দু ও খ্রীস্টানদের ক্ষেত্রে শতকরা পাঁচ টাকা শুল্ক ধার্য ও আদায় করেন।[৩৪] বিদ্বান, সৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের তিনি সম্মান করতেন এবং সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র ব্যক্তিদের সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, পুরাকাহিনী, মওলানা রুমির[৩৫] কাব্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। দরবেশদের পরামর্শ লাভের জন্য তিনি সর্বদা আগ্রহশীল ছিলেন এবং রাজ্যের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন। বর্ধমানের সর্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত দরবেশ সুফী বায়াজিদকে[৩৬] নিমন্ত্রণ করার জন্য সুলতান করিমুদ্দীন ও মুহম্মদ ফররুখ শিয়রকে প্রেরণ করেন। তাঁরা দরবেশের সামনে পৌঁছালে তিনি তাঁদের 'সালাম আলায়কুম' ব'লে সম্ভাষণ জানান। সুলতান করিমুদ্দীন শাহজাদার মর্যাদা ধারণ ক'রে সম্ভাষণের উত্তর দিলেন না। কিন্তু ফররুখ শিয়র নগ্নপদে তাঁর সামনে গিয়ে সম্ভ্রমের সাথে দাঁড়িয়ে সালাম করলেন ও পিতার বাণী ব্যক্ত করলেন। দরবেশ তাঁর সৌজন্যসূচক ব্যবহারে খুশী হ'য়ে তাঁর হাত ধরে বললেন, "বস, তুমি হিন্দুস্তানের বাদশাহ" এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। দরবেশের দোয়া আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গৃহীত হ'ল। ফররুখ শিয়রের সৌজন্যসূচক আচণের ফলে পিতা যা চেয়েছিলেন পুত্রকে তা প্রদত্ত হ'ল। সাক্ষাতের জন্য পৌঁছানোর পর আজীম-উশ-শান অগ্রসর হয়ে দরবেশের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হওয়ার জন্য দোয়া চাইলেন। দরবেশ বললেন, "আপনি যা চান তা আমি পূর্বেই ফররুখ শিয়রকে দিয়েছি। যে তীর একবার ছাড়া হয়েছে, তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।" শাহজাদাকে দোয়া ক'রে দরবেশ নিজ হুজরায় ফিরে যান। অতঃপর, চাকলা বর্ধমান, হুগলী, হিজলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের প্রবর্তিত প্রশাসনিক সুব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে শাহজাদা শাহ শুজার আমলে তৈরী বাদশাহী নৌ-বহরে জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) রওয়ানা হন। ঢাকায় পৌঁছে তিনি উক্ত অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংগঠিত করার দিকে মনোনিবেশ করেন। শাহজাদা কর্তৃক সওদায়ে খাস, সওদায়ে আম,

প্রথা প্রবর্তন এবং হিন্দুদের নববর্ষ হোলির দিন জাফরানি রংএর লাল বস্ত্র পরিধানের সংবাদ সংবাদদাতা ও ঐতিহাসিকদের মারফত বাদশাহের নিকট পৌঁছার পর তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন।[৩৭] শাহজাদাকে বাদশাহ নিম্নোক্ত পত্র লেখেন: "তোমার মস্তকে জাফরানি রং-এর শিরস্ত্রাণ, কাঁধে লাল কাপড়—(অথচ) তুমি ছেচল্লিশ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ—তোমার দাড়ি ও গোঁফের জয় হোক।" সওদায়ে খাস সম্বন্ধে সরকারী সংবাদদাতার পত্রে নিজ হাতে লিখে স্বাক্ষর করেছিলেন—"জনসাধারণের উপর অত্যাচারকে সওদায়ে খাস বলার যথাযথতা কি; এবং সওদায়ে খাসের সঙ্গে সওদায়ে আমের সম্পর্ক কি?[৩৮]

যারা ক্রয় করে—(তারা) বিক্রি করে;
আমরা ক্রয় করি না, বিক্রিও করি না।"
(অর্থাৎ, আমরা কেনা-বেচা করি না)

এবং তিরস্কার স্বরূপ ও ভবিষ্যতে যাতে এরূপ আর না হয়, তজ্জন্য বাদশাহ শাহজাদার মনসব (মনসবের নির্ধারিত সৈন্যসংখ্যা) ৫০০ কমিয়ে দেন। সওদায়ে খাস ও সওদায়ে আম—এ দুটোর অর্থ হচ্ছে এই: চাটগাঁও ও অন্যান্য বন্দরের বণিকদের জাহাজে যত পণ্যদ্রব্য আসে সেগুলো শাহজাদার[৩৯] তরফ থেকে খরিদ করে নেওয়া হত—এর নাম সওদায়ে খাস। পরে সেইসকল পণ্যদ্রব্য দেশের ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রি করা হত—তখন একে বলা হত সওদায়ে আম। বাদশাহের স্বাক্ষরযুক্ত পত্র দেখে শাহজাদা উপরোক্ত ব্যবসা ত্যাগ করেন। মীর্জা হাদিকে করতলব খান উপাধি দিয়ে বাদশাহ তাঁকে বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। মীর্জা অত্যন্ত বিচক্ষণ, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। এই সময় তিনি সুবে উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন। উড়িষ্যার কয়েকটি মহলে ব্যয়-সংকোচ করায় বাদশাহী কর্মচারীদের মধ্যে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। সততা ও ন্যায়পরায়ণতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। যুদ্ধবিগ্রহের সময় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করায় তিনি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সুনজরে ছিলেন। তৎকালে অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত সকল কার্য, রাজস্ব ধার্য ও সংগ্রহ করার ক্ষমতা,

বাদশাহী খাজাঞ্চিখানায় অর্থ প্রেরণ ও তার ব্যয় সুবার দেওয়ানের এখতিয়ারভুক্ত ছিল। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কার্য—যথা, দুর্দান্ত ও অবাধ্যদের দমন ও শাস্তিদান, বিদ্রোহী ও অত্যাচারীদের নির্মূল করার দায়িত্ব ছিল নাজিমের। নিজামত সংশ্লিষ্ট জায়গীর, ব্যক্তিগত মনসব ও উপহার দ্রব্যাদি ব্যতীত বাদশাহী রাজস্বের বা আয়ের উপর হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার নাজিমের ছিল না। প্রতি বৎসর বাদশাহ যে বিধান ও পদ্ধতি সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রকাশ করতেন, নাজিম ও দেওয়ান উভয়কেই তা মেনে চলতে হত[৭০] এবং এর এক চুল এদিক ওদিক করার অধিকার কারো ছিল না। বাদশাহ কর্তৃক বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পর করতলব খান জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকায়) পৌঁছান। শাহজাদার সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ের সুব্যবস্থা করায় মনোযোগ দেন। খাজাঞ্চিখানার আয় ও ব্যয় উপরোক্ত খানের এখতিয়ারে থাকায় আয়-ব্যয়ের উপর শাহজাদার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হ্রাস হয়ে যায়। দেশের অবস্থা সুশৃঙ্খল, উর্বর ও সম্পদপূর্ণ দেখে উক্ত খান রাজস্বের হার পুনরায় ধার্য করার ব্যবস্থা করেন এবং বিচক্ষণ ও মিতব্যয়ী আদায়কারীদের প্রত্যেক পরগণা, চাক্‌লা ও সরকারে প্রেরণ করেন। বাদশাহী রাজস্ব ও 'সায়ের'-করসমূহ সঠিকভাবে নির্ণয় ও আদায় ক'রে বাদশাহের নিকট এক কোটি টাকা পাঠান এবং খালসা-মহল ও জায়গীরসমূহের রাজস্বের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করান। বাংলার আবহাওয়া মন্দ হওয়ার পূর্বে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এই সুবায় চাকুরী গ্রহণ করতে চাইতেন না। কারণ, তারা মনে করতেন এদেশের আবহাওয়াই যে শুধু মারাত্মক তাই নয়, পরন্তু এটা ভূতের দেশ। সেই-জন্য প্রধান বাদশাহী দেওয়ান বহুসংখ্যক জায়গীর দিয়ে তাদের এদেশে এসে বাস করতে প্রলুব্ধ করতেন। ফলে, বাংলায় খালসা (সরকারের খাস) মহলের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই কারণে এই সুবার রাজস্ব থেকে শাহজাদার সৈন্যদের অথবা নগদী সৈন্যদের বেতন দেয়া সম্ভব হত না; অন্যান্য সুবা থেকে অর্থ এনে ঘাটতি পূরণ করা হত। উক্ত খান বাদশাহের নিকট এক পরিকল্পনা পেশ করেন যদ্বারা বাংলার

মনসবদারদের[৪১] জায়গীর বাতিল ক'রে উড়িষ্যার জায়গীর দেয়ার প্রস্তাব করেন এবং বাদশাহ্ তাঁর প্রস্তাব অনুমোদন করেন। উক্ত খান[৪২] অতঃপর 'সায়ের' রাজস্বসহ বাংলার সকল জায়গীর পুনরাধিকার করেন—কেবল নিজামত ও দেওয়ানী সংশ্লিষ্ট জায়গীর বাদ দেন[৪৩] এবং বাংলার মনসবদারদের উড়িষ্যার জায়গীর বরাদ্দ ক'রে দেন। বাংলার তুলনায় উড়িষ্যার জমি অপকৃষ্ট ও অনুর্বর ছিল। এই একটি কৌশলে উক্ত খান বাংলার আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করেন এবং বাংলার জমিদার ও জায়গীরদারদের সমস্ত মুনাফা নিঙড়ে নেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা ক'রে তিনি কতকগুলো বিভাগের সরকারী ব্যয় সংকোচ করেন। প্রত্যেক বৎসর তিনি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেন এবং বাদশাহের অনুগ্রহ লাভ করেন। বাংলার রাজস্ব বিভাগে ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায় শাহজাদা আজীম উশ-শানের মেজাজ সর্বদা খারাপ হয়ে থাকতো। এতদ্ব্যতীত, উত্তম কার্যের জন্য বাদশাহের নিকট থেকে উক্ত খানের বহু পুরস্কার লাভ শাহজাদার ঈর্ষার কারণ হয়েছিল। খানকে হত্যা করার জন্য শাহজাদা মতলব করেছিলেন; কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। নগদী সৈন্যদের সৈন্যাধ্যক্ষ আবদুল ওয়াহেদ ও তার অধীন সৈন্যদের পুরস্কার ও বেতন বৃদ্ধির লোভ দেখিয়ে শাহজাদা তাদের হাত করেন। এই নগদী সৈন্যরা পুরাতন সরকারী চাকর। শক্তি ও সংখ্যার জন্য তাদের আত্মবিশ্বাস এত অধিক ছিল যে, তারা অন্যদের কথা দূরে থাক, ঢাকার নাজিম অথবা দেওয়ানকেও পরোয়া করতো না। তরবারি চালনায় অত্যন্ত কুশলী বিধায় তারা অন্যদের হেয় জ্ঞান করতো। বেপরোয়া ভাব ও দাম্ভিকতার জন্য তারা সুবিদিত ছিল।[৪৪] বেতন দাবীর অজুহাতে সুযোগ মতো খানকে পথে আক্রমণ ও হত্যা করার জন্য এই নগদী সৈন্যদের প্রলুব্ধ করা হয়। এই দুর্বৃত্তদল শাহজাদার প্ররোচনায় খানকে হত্যা করার সুযোগের সন্ধানে ছিল। খান দরবারে যাওয়ার ও ফেরবার সময় সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন ক'রে চলতেন এবং একদল সশস্ত্র সৈন্য তাঁর সঙ্গে যাতায়াত করতো। কিন্তু, একদিন খুব

সকালে সঙ্গীদের না নিয়েই তিনি শাহজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য রওয়ানা হয়েছিলেন। পথে একদল 'নগদী' বেতন দাবীর অজুহাতে হৈ চৈ শুরু করে ও খানকে ঘেরাও করে। খান অত্যন্ত স্থিরভাবে তাদের সম্মুখীন হন ও তাদের তাড়িয়ে দেন। শাহজাদাই এই গোলমালের মূল জানতে পেরে তিনি ক্রোধান্ধ হয়ে শাহজাদার নিকট যান। সৌজন্যের সর্ব-প্রকার সরকারী রীতি ত্যাগ ক'রে প্রতিশোধ গ্রহণের মেজাজে তিনি তাঁর ছোরায় হাত দিয়ে শাহজাদার হাঁটুব সঙ্গে হাঁটু লাগিয়ে বসে বলেন, "এই হাঙ্গামা আপনার প্ররোচণায় হয়েছে; এই পন্থা ত্যাগ করুন; নতুবা এই মুহূর্তে আমি আপনার জীবন নিয়ে নিজের জীবনও দেব।" শাহজাদা গত্যন্তর না দেখে ও সম্রাটের ক্রোধের ভয়ে বৃক্ষ-পত্রের মতো কাঁপতে লাগলেন। আবদুল ওয়াহেদ ও তাব সৈন্যদের ডেকে কোনো প্রকার গোলমাল অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে কঠোরভাবে নিষেধ ক'রে দেন এবং নবম মেজাজে সৌজন্য সহকারে খানকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেন। শত্রুদের বিবোধিতা থেকে উদ্বেগমুক্ত হয়ে খান দেওয়ানে আসে, যান ও নগদী সৈন্যদের বেতনেব হিসাব তলব করেন। জমিদাবদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ ক'রে তিনি তাদের প্রাপ্য বেতন পরিশোধ করেন ও চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন। সরকারী পত্র ও (গোয়েন্দা বিভাগীয়) খবর-নামায় তিনি এই ঘটনা সম্বন্ধে বাদশাহকে জানান।[৫] বিদ্রোহীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত বিবরণী ও নিজের বিবরণী তিনি বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। শাহজাদার বদমেজাজির আশংকায় খান তাঁর নিকট নিরাপদ দূরত্বে থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। অনেক চিন্তা ও পরামর্শের পর তিনি মকসুদাবাদের মতো উৎকৃষ্ট স্থান নির্বাচন করেন। মকসুদাবাদ সুবার মধ্যস্থলে অবস্থিত থাকায় সকল দিক থেকে সংবাদ প্রাপ্তি সহজ ছিল। উত্তর-পশ্চিমে ছিল চাকলা আকবর নগর (রাজমহল) এবং বাংলার চাবিকাঠি শকরিগলি ও তেলিয়াগড়ি গিরিপথ; দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল বীরভূম, পাচিত ও বিশনপুর, ঝাড়খণ্ড যাওয়ার পথ, এবং দক্ষিণ ও হিন্দুস্তান থেকে ডাকাতদল ও সৈন্যবাহিনী আগমন-নির্গমনের পথ; দক্ষিণ-পূর্বে ছিল উড়িষ্যা যাওয়ার পথ; চাকলা বর্ধমান

এবং হুগলী ও হিজলী (খ্রীস্টান ও অন্য বণিকদের উপস্থিতির বন্দর) ; এবং যসর (যশোর) ও ভুসনা চাক্‌লাদ্বয় ; পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল সুবার রাজধানী জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) এবং এর সংশ্লিষ্ট ছিল ইলামাবাদ বা চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাঙ্গামাটির সীমান্তবর্তী ঘাঁটিসমূহ ; উত্তরে ছিল ঘোড়াঘাট, রংপুর ও কুচবিহার চাক্‌লাগুলো। শাহজাদার কোনো অনুমতি ছাড়াই খান জমিদার, কানুনগো ও খাস জমির কর্ম-চারীদের নিয়ে মকসুদাবাদে দফতর স্থাপন করেন। কিন্তু যখন খবরনামা ও সরকারী পত্রের মাধ্যমে ঘটনা সম্পর্কে এবং শাহজাদার বিরুদ্ধে করতলব খানের অভিযোগ বাদশাহের নিকট পৌঁছায়, তখন তিনি কঠোর ভাষায় শাহজাদার নিকট এক বাদশাহী ফরমান প্রেরণ করেন ঃ "করতলব খান বাদশাহের কর্মচারী ; যদি তার ব্যক্তিগত অথবা সম্পত্তির (জান ও মালের) এক চুল পরিমাণও ক্ষতি হয়, তা'হলে বৎস, আমি তোমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।" সেইসঙ্গে বাদশাহ শাহজাদাকে বাংলা ত্যাগ ক'রে বিহার যাওয়ার জরুরী হুকুম দেন। বাংলায় তাঁর প্রতিনিধি-স্বরূপ সুলতান ফররুখ শিয়রের সঙ্গে সরবুলন্দ খানকে[৪৬] রেখে শাহ-জাদা করিমুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে আজীম-উশ-শান অনুচরবর্গ ও দেহরক্ষী-গণসহ জাহাঙ্গীর নগর থেকে রওয়ানা হয়ে মুংগির (মুংগের) পৌঁছান। শাহ শুজা কর্তৃক নির্মিত সুন্দর শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরের প্রাসাদগুলোর ভগ্নাবস্থা ও সেগুলো মেরামতের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন দেখে তিনি সেখানে বাস করলেন না।[৪৭] গঙ্গা তীরবর্তী পাটনার আবহাওয়া পছন্দ হওয়ায় শাহজাদা সেখানে বাস করা সাব্যস্ত করলেন। বাদশাহের অনুমোদন গ্রহণ ক'রে তিনি নগরীর উন্নতিসাধন করেন ও নিজ নামানুসারে নগরীর নাম রাখেন আজিমাবাদ। তিনি সেখানে প্রশস্ত প্রাচীরবেষ্টিত একটি দুর্গ তৈরী করেন। এক বৎসর পরে মকসুদা-বাদে করতলব খান বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব তৈরী ক'রে বাদশাহের শিবির অভিমুখে যাত্রা করেন।[৪৮] রাজস্ব নির্ধারণের কাগজ-পত্র, রাজস্বের তালিকা ও সুবার আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈরী ক'রে তিনি বাংলা সুবার কানুনগো দরাব নারায়ণকে সেগুলো স্বাক্ষর করতে

বলেন। তৎকালীন প্রথানুযায়ী দেশের আর্থিক ও আভ্যন্তরীণ শাসনের হিসাব-নিকাশ কানুনগোর স্বাক্ষর ব্যতীত কেন্দ্রীয় বাদশাহী দেওয়ানে গৃহীত হত না। এই প্রথার সুযোগ গ্রহণ ক'রে সেই কুটিল ও অদূরদর্শী নির্বোধ, কানুনগো হিসেবে তার পারিশ্রমিক তিন লক্ষ টাকা না পেলে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করে। খান তখনকার প্রয়োজনের তাগিদে বাদশাহের নিকট থেকে ফিরে এসে এক লক্ষ টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু, দরাব নারায়ণ এই বন্দোবস্তে সম্মত হয় নাই ও স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু জি-নারায়ণ কানুনগো নামক দরাব নারায়ণের সহযোগী কানুনগো[৪৯] দূরদর্শিতার সাথে হিসাব নিকাশে স্বাক্ষর দেয়। শাহজাদার বিরোধিতা ও হিসাব নিকাশে স্বাক্ষর দানে দরাব নারায়ণের অস্বীকৃতি উপেক্ষা ক'রে খান বাদশাহের শিবিরে যান এবং বাংলার রাজস্ব ও উপহার বাদশাহকে দেন; (প্রধান) উজীর ও বাদশাহের অন্যান্য উজীরদেরও উপহার দেন। রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্ত টাকা ও জায়গীরসমূহের মুনাফা বাদশাহকে প্রদান করেন। সুবার হিসাব-নিকাশের কাগজপত্র মস্তৌফি[৫০] ও দেওয়ানে কুলে[৫১] পেশ করেন। উত্তম ও বিশ্বস্ত কার্য প্রমাণ করায় খান বাদশাহের নিকট অধিকতর অনুগ্রহ লাভ করেন এবং বাদশাহ তাঁকে দেওয়ানী পদের অতিরিক্ত বাংলা ও উড়িষ্যা সুবাদ্বয়ের নিজামতে শাহজাদার সহকারী পদে নিয়োগ করেন। তাঁকে মুরশিদ কুলী খান উপাধি, মূল্যবান খেলাত, পতাকা ও নাকাড়া (ধ্বনির) অধিকার দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।

শাহজাদা আজীম-উশ-শানের প্রতিনিধিরূপে নওয়াব জাফর খানকে বাংলার নিজামত প্রদান

বাংলার ডেপুটি নাজিম এবং বাংলা ও ওডিষার (উড়িষ্যার) দেওয়ান পদের খেলাত পূর্ব-প্রথামত প্রাপ্ত হয়ে মুরশিদ কুলী খান[১] সুবায় পৌঁছে সয়দ আকরাম খানকে বাংলার ডেপুটি দেওয়ান ও তাঁর জামাতা শুজা-উদ্দীন মুহম্মদ খানকে ওডিষার (উড়িষ্যার) ডেপুটি দেওয়ান নিযুক্ত করেন। মকসুদাবাদে তিনি শহরের উন্নতি করেন ও নিজ নামানুসারে শহরের নাম রাখেন মুর্শিদাবাদ এবং সেখানে একটি টাক্‌শাল প্রতিষ্ঠা করেন।[২] ওডিষা (উড়িষ্যা) সুবা থেকে মেদিনীপুর চাক্‌লা বিচ্ছিন্ন ক'রে তিনি উক্ত অঞ্চল বাংলার শামিল করেন।[৩] কিস্তি-খেলাফী জমিদারদের কারারুদ্ধ ক'রে এবং অভিজ্ঞ ও সৎ রাজস্ব-আদায়কারীদের মহালে পাঠিয়ে তিনি খাজনা ক্রোক করেন ও বাদশাহী রাজস্ব আদায় করেন। বাদশাহী (বা সরকারী) রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করার জমিদারদের সমস্ত ক্ষমতা বিলোপ ক'রে তিনি কেবল নান্‌কা[৪] জমার মুনাফায় তাদের আয় সীমাবদ্ধ করেন। তাঁর আদেশে আমিলগণ (রাজস্ব আদায়কারী-গণ) পরগণার প্রত্যেক গ্রামে শিকদার ও আমিল পাঠিয়ে আবাদী ও অনাবাদী জমি মাপ করার পর সেইসব জমি প্রজাদের বন্দোবস্ত দেয়া হয়। গরীব প্রজাদের কৃষিঋণ (তকাভি) দিয়ে জমির উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এইরূপে সকল মহলে মুরশিদ কুলী রাজস্ব বৃদ্ধি ছাড়াও আবাদী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করেন।

মুরশিদ কুলী পূর্ণ রাজস্ব-তালিকা তৈরী করেছিলেন এবং মওসুমে মওসুমে আবাদী জমির খাজনা, ভূমি-রাজস্ব, সায়ের-ট্যাক্স ইত্যাদি ফসল দ্বারা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। সরকারী ব্যয়-সংকোচ ক'রে তিনি বাদশাহী খাজাঞ্চিখানায়[৩] পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করেন। গভীর জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতবেষ্টিত অঞ্চলে অবস্থান করায় বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের জমিদারগণ নওয়াবের সামনে নিজেরা উপস্থিত হতেন না; প্রতিনিধিদের মারফত কার্য পরিচালনা করতেন এবং প্রচলিত কর, উপহার ইত্যাদি পাঠাতেন। বীরভূমের জমিদার আসাদুল্লাহ্ ধার্মিক ও দরবেশতুল্য ব্যক্তি ছিলেন; তিনি তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক বিদ্বান, ধার্মিক ও দরবেশদের জন্য মদদ ই-মাশরূপে দান করেছিলেন এবং গরীব ও দুঃস্থদের জন্য দৈনিক-দান বরাদ্দ করেছিলেন। সেইজন্য মুরশিদ কুলী খান তাঁর উপর কোনো প্রকার উৎপীড়ন করতেন না। কিন্তু বিষ্ণুপুরের জমিদারের মহলসমূহের আদায়ের পরিমাণ কম ও ব্যয় অতিরিক্ত থাকায় তিনি (মুরশিদ কুলী খান) তাকে শাস্তি দিতে থাকেন। টিপ্‌রা, কুচবিহার ও আসামের রাজারা নিজেদের 'ছতর ধারী' (ছত্রধারী) শাসকরূপে গণ্য করতেন এবং হিন্দুস্তানের বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করতেন না ও নিজেদের নামে টাকশাল থেকে মুদ্রা তৈরী করতেন। কিন্তু, আসামের রাজা মুরশিদ কুলী খানের বলিষ্ঠ শাসনের কথা শুনে খানকে হাতীর দাঁতের চেয়ার ও পাল্কি, মৃগনাভি, বাদ্যযন্ত্র; নানা প্রকার পালক, ময়ূরের পাখার পাংখা ইত্যাদি উপহার প্রেরণ করেন ও বশ্যতা স্বীকার করেন। কর ও উপহার দিয়ে কুচবিহারের রাজাও খানের বশ্যতা স্বীকার করেন। খান তাঁদের খেলাত উপহার প্রেরণ করেন। প্রত্যেক বৎসর এই ব্যবস্থানুযায়ী কাজ হত। বাংলার মহলসমূহের আর্থিক ব্যবস্থা সুশৃংখল করার পর খান অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও আভ্যন্তরীণ বিষয়াদির উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করেন। তাঁর শাসন ব্যবস্থা এতই বলিষ্ঠ ও সার্থক ছিল যে, তখন কোনো বহিরাক্রমণ অথবা আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা ঘটে নাই। সেই কারণে সামরিক ব্যয় প্রায় বিলোপ করা হয়েছিল। দু'হাজার অশ্বারোহী ও চার হাজার পদাতিক সৈন্যের সাহায্যে তিনি এই প্রদেশ শাসন করতেন। নাজির আহমদ নামক জনৈক পিওনের মারফতে তিনি

রাজস্ব আদায় করতেন। খানের ব্যক্তিত্ব এতই শক্তিশালী ও তাঁর আদেশ এতই ভীতিপ্রদ ছিল যে, তাঁর পিওনরাই দেশে শান্তি রক্ষা ও দুর্দান্তদের দমন করার জন্য যথেষ্ঠ ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব বড় ছোট সকলের মনে এতই ভীতি সঞ্চার করতো যে, সিংহহৃদয় ব্যক্তিরাও তাঁর সামনে কাঁপতো। খান ক্ষুদ্র জমিদারদের সামনে উপস্থিত হতে দিতেন না। মুৎসুদ্দি, আমিল ও নেতৃস্থানীয় জমিদারগণও তাঁর সামনে আসন গ্রহণে সাহস করতেন না। পরন্তু, তারা শ্বাসরোধ ক'রে প্রস্তরমূর্তির মতো খাড়া হয়ে থাকতেন। হিন্দু জমিদারদের পাল্কী চড়া নিষিদ্ধ ছিল; তবে, তাঁরা জাওয়ালা ব্যবহার করতে পারতেন। মুৎসুদ্দিরা তাঁর সামনে ঘোড়ায় চড়তেন না[৬]; সরকারী অনুষ্ঠানে মনসবদারদের সামরিক পোষাক প'রে উপস্থিত হতে হত। তার সামনে কেউ কাউকে অভিবাদন করতে পারতেন না; এর বিরোধী কিছু করলেই তৎক্ষণাৎ তিরস্কার করা হত। বিচারকার্যের জন্য সপ্তাহে দু'দিন তিনি দরবারে বসতেন। তাঁর সুবিচারের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, অন্যের প্রতি অপরাধ করার দরুন ইসলামী আইন অনুসারে তিনি নিজ পুত্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছিলেন।[৭] সুবিচারে, দেশের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় এবং বাদশাহের প্রাপ্য সম্মান রক্ষার ব্যাপারে তিনি কাউকে খাতির করতেন না। মুৎসুদ্দিদের তিনি মোটেই বিশ্বাস করতেন না; তিনি নিজে প্রত্যহ আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও জমাওয়াসিলের খাতা পরিদর্শন ক'রে স্বাক্ষর করতেন। প্রতি মাসান্তে তিনি খালসা (খাস জমির) ও জায়গীর-সমূহের একরারনামা বাজেয়াফত করতেন এবং এই সকল একরারনামা মোতাবেক সমস্ত রাজস্ব বাদশাহী খাজাঞ্চিখানায় পরিশোধ না করা পর্যন্ত মুৎসুদ্দি, আমিল, জমিদার, কানুনগো ও অন্যান্য কর্মচারীদের চেহেল সতুন প্রাসাদের দেওয়ানখানায় আটক ক'রে রাখতেন। বকেয়া আদায়ের জন্য আদায়কারী পিউন নিযুক্ত ক'রে কিস্তি-খেলাফীদের পানাহার অথবা পেশাব-পায়খানা করতে অনুমতি দিতেন না এবং পিউনরা যাতে ঘুষ নিয়ে তৃষ্ণার্ত কিস্তি-খেলাফীদের কাউকে পানি না দেয়, সেজন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত

করতেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই প্রকারে পানীয় ও খাদ্য ব্যতীত তাদের অতিবাহিত করতে হত। সেইসঙ্গে পা উপর দিক ক'রে ঝুলিয়ে বেঁধে রাখা হত ; পা পাথরে ঘর্ষিত হত ; চাবুক মারা হত। বেত্রাঘাত করাতে তিনি কাউকে খাতির করতেন না। বেত্রাঘাত সত্ত্বেও জমিদারদের যে সকল আমলা রাজস্ব পরিশোধ করতেন না ও তহবিল তছরূপ করতো, তিনি তাদের সপরিবারে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করতেন।[৮] এদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজশাহী চাকলার জমিদার আদি নারায়ণ ; তিনি একজন হিন্দুস্তানীয় বংশধর ছিলেন এবং যোগ্য ও কর্মদক্ষ ছিলেন। খালসা (সরকারী খাস জমির) রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। তাঁর সঙ্গে গোলাম মোহাম্মদ ও কালিয়া জমাদার ও দুইশত সৈন্যের যোগসাজস ছিল। আদি নারায়ণ রাজস্ব পরিশোধে গড়িমসি করছিলেন ও শেষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মুরশিদ কুলী তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য মোহাম্মদ জান নামক একজন কর্মচারীকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। রাজবাড়ীর সন্নিকটে[৯] উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে গোলাম মোহাম্মদ জমাদার নিহত হয় কিন্তু আদি নারায়ণ মুরশিদ কুলীর ক্রোধের ভয়ে আত্মহত্যা করেন। রামজীবন[১০] ও কুলী কুন্‌ওয়ার নামক দু'জন জমিদারের মধ্যে আদি নারায়ণের জমিদারী ভাগ করে দেয়া হয়। এরা দু'জনে রাজস্ব নিয়মিত পরিশোধ করতেন। এক বৎসর শেষ হয়ে নতুন বৎসর আরম্ভ হওয়ার পর ফারওয়ার্দি (অর্থাৎ আষাঢ়) মাসে সমস্ত সম্পদ[১১] ওজন ক'রে মুরশিদ কুলী খান রাজস্ব বাবদ দু'শ' গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে এক কোটি তিন লক্ষ টাকা ছয় শত অশ্বারোহী ও পাঁচ শ' পদাতিক সৈন্যের তত্ত্বাবধানে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জায়গীর সমূহ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ও অন্য আদায়কৃত অর্থ বাদশাহী খাজাঞ্চি-খানায় প্রেরণ করতেন। প্রত্যেক বৎসরের প্রথম দিকে তিনি বাদশাহকে হাতী, তঙ্গন ঘোড়া, মহিষ, পোষা হরিণ, জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) সংরক্ষিত পাখী, ব্যাঘ্রচর্মের ঢাল, স্বর্ণখচিত শীতল পাটি, মশারি,[১২] সিলেটের গঙ্গাজলি কাপড়[১৩]—যার ভেতর দিয়ে সাপ প্রবেশ করতে পারতো না, এবং হাতীর দাঁত, মৃগনাভি, বাদ্যযন্ত্র ও খ্রীস্টান বণিকদের

নিকট প্রাপ্ত ইউরোপে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ও অন্যান্য দুর্লভ বস্তু বাদশাহের নিকট পাঠাতেন। উক্ত অর্থ ও দ্রব্যাদি প্রেরণের সময় তিনি অশ্বারোহণে নগরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত সঙ্গে যেতেন এবং এই বিষয় দরবারের কাগজপত্রে ও সরকারী ইশতেহারে লিপিবদ্ধ করাতেন। ঐ সকল দ্রব্য ও অর্থ প্রেরণের পদ্ধতি ছিল এইরূপ: ধনদৌলত বোঝাই গাড়ীগুলো অন্য সুবার সুবাদারের এলাকায় পৌঁছালে উক্ত সুবাদার তার নিজের লোকজন দ্বারা গাড়ীগুলো নিজ দুর্গে আনতেন এবং পূর্বের গাড়ীগুলো থেকে মাল নামিয়ে নতুন গাড়ী বোঝাই করতেন এবং পূর্বের গাড়ী ও পাহারাদারদের ছেড়ে দিয়ে নিজ পাহারাদারদের তত্ত্বাবধানে সেগুলো পাঠাতেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের নিকট উপহার দ্রব্যাদি না পৌঁছানো পর্যন্ত পরপর সুবায় এই পদ্ধতিতে কাজ হত। খানের সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থা বাদশাহের অনুমোদন লাভ করার ফলে তিনি খানকে নতুন অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ও মুতামান উল-মুল্‌ক আলা উদ-দৌলা জাফর খান নাসিরি নাসির জং উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। খানের ব্যক্তিগত মসনব সাত হাজারীতে উন্নীত হয় এবং 'মাহি' শ্রেণীয় মর্যাদা দেয়া হয় ও তাঁকে উচ্চতর আমীর শ্রেণীভুক্ত করা হয়। খানের পরামর্শ ব্যতীত বাংলায় কাউকে নিযুক্ত করা হত না। বাংলা একটি উর্বর দেশে পরিণত হয়েছে শুনে বাদশাহী মনসবদারগণ এখানে চাকুরীর আবেদন করতেন। নওয়াব জাফর খান এই সকল প্রার্থীদের তাঁর অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত করতেন। নওয়াব সইফ খান[১৪] নামক একজনের দরখাস্ত বাদশাহের মারফতে প্রাপ্ত হয়ে নওয়াব জাফর খান তাঁকে একটি পদ দেন। নওয়াব সইফ খানের সংক্ষিপ্ত কর্মজীবনী এই ইতিহাসে উল্লেখ করা হল। নওয়াব মহবত জং-এর নিজামত আমল পর্যন্ত নওয়াব সইফ খান জীবিত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন; তাই কখনো মহবত জং-এর[১৫] সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন না। যদিও মহবত জং তাঁর সাক্ষাৎ চাইতেন কিন্তু তবু নওয়াব সইফ খান আসতেন না। যখন নওয়াব মহবত জং শিকারের উদ্দেশ্যে পুর্নিয়া অভি-

মুখে যেতেন, তখন নওয়াব মহবত সইফ খান সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে তাঁর পথরোধ করতেন। কিন্তু যখনই নওয়াব মহবত জং-এর সৈন্যসাহায্য প্রয়োজন হত, তখনই নওয়াব সইফ খান সুদক্ষ সৈন্যদল দিয়ে তাঁকে সাহায্য করতেন। সইফ খানের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র খান বাহাদুর পুর্নিয়া ও সংলগ্ন এলাকার ফৌজদার পদ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। নওয়াব মহবত জং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াব সইদ আহমদ খানবাহাদুর সওলাত জং-এর কন্যার সঙ্গে খানবাহাদুরের[১৬] বিবাহ দেন; কিন্তু বিবাহের চার দিন পরেই এই মহিলার মৃত্যু হয়। এই কারণে নওয়াব মহবত জং সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তি বাজেয়াফত ক'রে খানবাহাদুরকে প্রহরাধীন রাখেন। বাধ্য হয়ে প্রয়োজনবশতঃ খানবাহাদুর অশ্বারোহণে শাহজাহানাবাদ (দিল্লী) পালিয়ে যান। নওয়াব মহবত জং পুর্নিয়া অঞ্চল সওলাত জং-কে বন্দোবস্ত ক'রে দেন। সওলাত জং এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ উক্ত অঞ্চলে পৌঁছে শাসনব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করেন ও আধিপত্য বিস্তার করতে থাকেন। সওলাত জং-এর মৃত্যুর পর শওকত জং তাঁর উত্তরাধিকারী হন। শওকত জং-এর খালাতো ভাই নওয়াব সিরাজুদ্দৌলা তাঁর নিজামত আমলে যুদ্ধে শওকত জং কে নিহত করেন এবং দেওয়ান মোহন লালকে পাঠিয়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ও মালমাত্তা বাজেয়াফত করেন।

হ্যাঁ, কি বলছিলাম? আর কোথায় কি কথা বলছি?
কোথায় ছিল ঘোড়া? কোথায় আমি ঘোড়া চালিয়েছি?

এবার আমি আমার কাহিনী আবার শুরু করি। দরাব নারায়ণ কানুনগো নওয়াব জাফর খানের দেওয়ানী আমলে হিসাব নিকাশের কাগজপত্র সই করতে অস্বীকার করেছিলেন। সেইজন্য নওয়াব জাফর খান এর প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন। কানুনগোর পদ বিজিত অঞ্চলসমূহের রেজিস্ট্রারের তুল্য এবং দেওয়ানের হিসাব নিকাশ কানুনগোর স্বাক্ষর ব্যতীত কেন্দ্রীয় বাদশাহী দেওয়ান কর্তৃক গৃহীত হত না। নওয়াব তাই দরাব নারায়ণের ক্ষমতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি ক'রে

তার খ্যাতি নষ্ট করার মতলব করেন। এই মতলবে তিনি দরাব নারায়ণকে খালসার (বাদশাহী খাস জমি) কার্যকলাপের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করেন। যখন দেওয়ান ভূপত রায়ের, যিনি নওয়াবের সঙ্গে ও বাদশাহী শিবির থেকে এসেছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গুলাব রায় দেওয়ানের কার্য সন্তোষজনকভাবে নির্বাহ করতে পারছিলেন না, তখন খালসার পেশকারের দায়িত্বও দরাব নারায়ণের উপব অর্পিত হয়। রাজস্ব নির্ধারণের এবং অন্যান্য আর্থিক ও আভ্যন্তরীণ কার্যের দায়িত্ব দরাব নারায়ণকে দিয়ে নওয়াব তাঁকে শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী করেন। যদিও উপরোক্ত কানুনগো খালসার রাজস্ব সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মনোযোগ দিয়ে আদায়ের পরিমাণ এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় বৃদ্ধি করেন এবং হিসাবের প্রতিটি দফায় বর্ধিত আয় দেখান ও বাদশাহী রাজস্বের খাতে অতিরিক্ত আয় দেখান, তথাপি নওয়াব ক্রমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে থাকেন এবং সমস্ত হিসাব নিকাশের বিবরণীসহ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন ও নানা প্রকারে পীড়ন ক'রে তাঁকে হত্যা করেন। কানুনগো-গিরির দশ আনা অংশ তিনি দরাব নরায়ণের পুত্র শিউ নারায়ণকে দেন ও ছয় আনা দেন জয়নারায়ণকে। এই জয়নারায়ণ নওয়াবের দেওয়ানী আমলে হিসাব নিকাশে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। বাদশাহের অনুমতি নিয়ে নওয়াব হুগলীর ফৌজদারের পদ থেকে জিয়াউদ্দীন খানকে অপসারিত ক'রে উক্ত বন্দরের ফৌজদারি নিজামতের অন্তর্ভুক্ত করেন ও নিজ ক্ষমতায় ওয়ালি বেগকে উক্ত স্থানের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। ওয়ালী বেগের উপস্থিতির পর উক্ত খান দুর্গ ত্যাগ ক'রে শহরের বাইরে এসে বাদশাহী রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। ওয়ালী বেগ পদচ্যুত ফৌজদারের পেশকার কংকর সেন বাঙালীকে রাজস্ব আদায়ের রশিদ ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ এবং ফৌজদারের কেরানী ও অধীনস্থ কর্মচারীগণসহ হাজির হওয়ার জন্য তলব করেন। জিয়াউদ্দীন খান তখন কংকর সেনকে সাহায্য করেন। তজ্জন্য ওয়ালী বেগ তাঁর (জিয়াউদ্দীনের) যাত্রায় বাধা দেন। ফলে জিয়াউদ্দীন ও ওয়ালী বেগের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। চিনসুড়া ও ফরাসী চন্দন নগরের মধ্যবর্তী চন্দন

নগরের প্রান্তরে উক্ত খান খ্রীস্টান ডাচ ও ফরাসীদের সাহায্যে নিজ সৈন্য সমাবেশ ক'রে প্রতিরোধের জন্য প্রাকার ইত্যাদি তৈরী করেন। দেবীদাসের পুকুর থেকে দেড় ক্রোশ দূরে ইদগাহ[১৮] ময়দানে ওয়ালী বেগ সৈন্য সমাবেশ করেন এবং পরিখা তৈরী করেন ও নওয়াব জাফর খানকে পরিস্থিতির বিবরণ প্রেরণ করেন। প্রাক্তন ও নতুন ফৌজদার উভয়েই নিজ নিজ পরিখার আড়াল থেকে যুদ্ধ চালাতে থাকেন ও সৈন্যদের অবস্থিতি দেখতে থাকেন। জিয়াউদ্দীন খানের প্রতিনিধি মোল্লা জয়সম জুরানী ও কংকর সেন গোপনে ডাচ ও ফরাসীদের নিকট গোলাবারুদ, কামান ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করেন। ওয়ালী বেগ সৈন্য সাহায্যের অপেক্ষায় আত্মরক্ষার পন্থা গ্রহণ করেন। এই সংকটকালে নওয়াব জাফর খান প্রেরিত একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ দলীপ সিং হাজারি ওয়ালি বেগের সাহায্যার্থে পৌঁছান এবং সেই সঙ্গে খ্রীস্টানদের প্রতি ভীতি-প্রদর্শনমূলক এক হুকুমনামা নিয়ে আসেন। খ্রীস্টানদের পরামর্শ অনুযায়ী জিয়া-উদ্দীন শান্তি স্থাপনের জন্য দলীপ সিং-এর সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করায় দলীপ সিং অসতর্ক হয়ে যান। একদিন খুব ভোরে দলীপ সিং-কে ধাপ্পা দেয়ার উদ্দেশ্যে জিয়াউদ্দীন একজন পত্রবাহককে তাঁর নিকট পাঠান ও পত্রটি দিয়ে দলীপের উত্তর আনতে বলেন, এবং পত্রবাহককে চিহ্নিত করার জন্য একটি লাল শাল তার মাথায় বেঁধে দেন। একজন ইংরেজ গোলন্দাজের লক্ষ্য নির্ভুল ছিল ও তার একটি তামা ও টিন মিশ্রিত ধাতুর (ব্রোঞ্জের) কামান ছিল[১৯]; কামানটির পাল্লা ছিল দেড় ক্রোশ। কামানটি দলীপ সিং-এর শিবিরের দিকে মুখ ক'রে গোলন্দাজ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূতের শালের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিল। দলীপ সিং তখন খালি গায়ে খালি মাথায় গোসলের পূর্বে তৈল মর্দন করছিলেন। দূত এই সময় পাত্রটি তাঁর নিকট দেয়। দূতের শালের প্রতি নিশানা ক'রে গোলন্দাজ গোলা ছুড়েছিল এবং সেটি দলীপ সিং-এর বুকে আঘাত করে ও তাঁর দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়। যাদুকর গোলন্দাজের লক্ষ্যভেদ প্রশংসনীয়; কারণ দূতের কোনো ক্ষতি

হয় নাই। জিয়াউদ্দীন খান গোলন্দাজকে পুরস্কৃত ক'রে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি আক্রমণ করেন।

> দলীপ সিং নিহত হওয়ার পর অনতিবিলম্বে,
> জিয়াউদ্দীন আক্রমণ করতে সবেগে অগ্রসর হন।
> নদীর প্রবল স্রোতের মতো তাঁর সৈন্যরা অগ্রসর হলো,
> এবং বিপক্ষদলের সৈন্যেরা পলায়ন করতে লাগলো।
> কেবল সৈন্যরাই যে নিহত হয়েছিল তাই নয়,
> অবরোধ প্রাকারও তারা প্রবল বেগে অতিক্রম করলো।
> ওয়ালী বেগ সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন
> এবং উদ্বিগ্নভাবে দুর্গে আশ্রয় নিলেন।

জিয়াউদ্দীন খান উদ্বেগমুক্ত হয়ে বাদশাহী রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সেখানে পৌঁছানোর পর তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সকল গোলমালের মূল কংকর বাঙালী—যার বাড়ী ছিল হুগলীতে—বাদশাহী রাজধানী থেকে মুর্শিদাবাদ ফিরে আসেন এবং নির্ভীকভাবে নওয়াব জাফর খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও বাম হস্ত দ্বারা তাঁকে অভিবাদন জানান। তদ্বারা তিনি নওয়াবকে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, যে-হাতে বাদশাহকে অভিবাদন করা হয়েছে সেই হাত দিয়ে জাফর খানকে অভিবাদন করলে উক্ত হস্তকে অপবিত্র করা হবে। নওয়াব জাফর খান বক্রকণ্ঠে উত্তর দেন, "কংকর জুতোর তলায় থাকে।" কংকরের ˉ⁰ আরবী বানানে উভয় ک এর উপরে 'ফাতাহ' এবং ں ও ر এর উপর 'সকুন' দিলে হিন্দুস্তানীতে শব্দের অর্থ হয় 'কাঁকড়'। নওয়াব জাফর খান তাঁর (কংকরের) অতীত ও বর্তমান দুষ্কার্য ভুলে গিয়েছেন এমনি ভাব ও বাহ্যতঃ আপোসমূলক মনোভাব দেখিয়ে কংকরকে হুগলীর চাকলাদার পদে নিযুক্ত করেন। বৎসর শেষ হওয়ার পর তার জমা-খরচের হিসাব পরীক্ষা ক'রে নওয়াব বর্তমান ও বকেয়া রাজস্ব ও 'সায়ের' রাজস্বের বাবদে তহবিল তসরুপের অভিযোগে তাকে কারারুদ্ধ করেন। এই বিড়ালকে (কংকরকে) একটি আঁটো পায়জামা পরিয়ে জোর ক'রে বিরেচক ঔষধ খাইয়ে দেয়া হয় এবং একজন নিষ্ঠুর রাজস্ব আদায়কারীর তত্ত্বা-

বধানে তাকে রাখা হয়। পায়জামার মধ্যে অনবরত পায়খানা করতে করতে কংকরের মৃত্যু হয়। সেই সময় বাংলার দেওয়ান পদাধিকারী সৈয়দ আকরাম খানের মৃত্যু হয়। শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খানের (উড়িষ্যা সুবার নওয়াব নাজিম ও নওয়াব জাফর খানের জামাতা) কন্যা নফিসা বেগমের স্বামী সৈয়দ রাজী খানকে বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়। সৈয়দ রাজী খান আরবের এক নেতৃস্থানীয় সৈয়দ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি[১] অত্যন্ত গোঁড়া ও বদমেজাজী ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন ও কঠোর পন্থা অবলম্বন ক'রে তিনি রাজস্ব আদায় করতেন। কথিত হয়, বিষ্ঠাপূর্ণ এক হাউজ তৈরী করে হিন্দুদের স্বর্গের নামানুসারে তিনি অবজ্ঞাভরে তার নাম দিয়েছিলেন—'বৈকুণ্ঠ'। খেলাফী জমিদারদের ও রাজস্ব আদায়কারীদের তিনি এই হাউজে ঠেলে দিতেন। নানা প্রকারে তাদের উৎপীড়ন ক'রে ও কষ্ট দিয়ে তিনি সম্পূর্ণ বকেয়া রাজস্ব আদায় করতেন। সেই বৎসর জমিদার সীতারামের বিদ্রোহের ও সরকার মাহমুদাবাদের ভূসনা চাকলার ফৌজদার মীর আবু তোরাবের হত্যার সংবাদ পৌঁছায়। এর বিশদ বিবরণ হচ্ছে এই ঃ পরগনা মাহমুদাবাদের জমিদার সীতারাম[২] জঙ্গল ও নদীবেষ্টিত অঞ্চলে থাকায় দাম্ভিকতার সঙ্গে বিদ্রোহ করেন। সুবাদারের বশ্যতা অস্বীকার করেন ও বাদশাহী কর্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অস্বীকার করেন এবং ঐ অঞ্চলে তাদের যাওয়ার সকল পথ বন্ধ ক'রে দেন। সীতারাম তাঁর জমিদারীর অঞ্চলসমূহ লুঠতরাজ করতে থাকেন এবং বাদশাহী ঘাঁটির সৈন্য ও ফৌজদারদের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হন। ভূসনা চাকলার[৩] ফৌজদার ছিলেন মীর আবু তোরাব। তিনি নেতৃস্থানীয় সৈয়দ বংশোদ্ভূত ছিলেন; শাহজাদা আজীম-উশ-শান ও তৈমুর বংশের সাথে তাঁর নিকট-আত্মীয়তা ছিল; সমকালীন আমীরদের মধ্যে তিনি তাঁর বিদ্যা ও যোগ্যতার জন্য খ্যাত ছিলেন। তিনি নওয়াব জাফর খানকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন। মীর আবু তোরাব সীতারামকে বন্দী করার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন। পরিশেষে, সীতারামকে শাস্তি দেয়ার জন্য তিনি তাঁর সেনাপতি পীর খানকে ২০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ প্রেরণ

করেন। এই সংবাদ পেয়ে সীতারাম উক্ত সেনাপতিকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে একস্থানে ওত পেতে থাকেন। একদিন মীর আবু তোরাব জনকতক বন্ধু ও অনুচরসহ শিকারে বেরিয়ে শিকারের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে সীতারামের এলাকায় পৌঁছান। পীর খান তখন আবু তোরাবের সঙ্গে ছিলেন না। আবু তোরাবকে পীর খান মনে ক'রে সীতারাম অকস্মাৎ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পশ্চাদদিক থেকে তাঁকে আক্রমণ করেন। উচ্চ-স্বরে নিজ নাম ঘোষণা করা সত্ত্বেও সীতারাম তৎপ্রতি লক্ষ্য না ক'রে বাঁশের লাঠি দিয়ে আবু তোরাবকে জখম করে ও তাঁকে ঘোড়া থেকে মাটিতে ফেলে দেন। এই সংবাদ পেয়ে নওয়াব জাফর খান বাদশাহের ক্রোধের ভয়ে কাঁপতে থাকেন। জাফর খানের স্ত্রীর ভগ্নীর স্বামী ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত হাসান আলী খানকে ভুসনার ফৌজদার নিযুক্ত ক'রে নওয়াব এক সুদক্ষ সৈন্যদল তাঁর অধীনে দেন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বদমাশকে (সীতারামকে) বন্দী করার আদেশ দেন। নওয়াব চারিদিকের জমিদারদের উপর কড়া হুকুম জারি করেন যেন তাদের সীমানা দিয়ে সীতারাম পালিয়ে যেতে না পারেন এবং জানিয়ে দেন যে, যদি কোনো জমিদারের এলাকা দিয়ে সীতারাম পলায়ন করেন, তা'হলে সেই জমিদারকে তার জমিদারী থেকে বিচ্যুত ক'রে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। জমিদারগণ চারিদিক থেকে সীতারামকে কোণঠাসা করেন। এই সময় হাসান আলী খান উপস্থিত হয়ে পরিবার ও অনুচর-বর্গসহ সীতারামকে বন্দী করেন ও তাদের হাতে-গলায় শৃঙ্খলবেষ্টিত ক'রে নওয়াব জাফর খানের নিকট প্রেরণ করেন। গরুর চামড়া দিয়ে সিতারামের মুখ বেষ্টন ক'রে নওয়াব তাকে মুর্শিবাদের পুব দিকের উপকণ্ঠে জাহাঙ্গীর নগর ও মাহমুদাবাদে যাতায়তের বড় রাস্তায় ফাঁসির আদেশ দেন এবং সীতারামের স্ত্রী-পুত্রাদি ও অনুচরবর্গকে আজীবন কারারুদ্ধ ক'রে রাখার হুকুম দেন। সীতারামের সমস্ত মালমাত্তা বাজেয়াফত করেন ও তার পরিবারবর্গকে একেবারে নির্মূল করেন এবং তার জমিদারী রামজীবনকে দান করেন। ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণী তিনি বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন। ১১১৯ হিজরীর ২৮ জিলকদ শুক্রবার দিন দক্ষিণে বাদশাহ

আওরঙ্গজেব আলমগীরের[২৪] মৃত্যু হওয়ায় মুহম্মদ মোয়াজ্জম শাহ 'আলিম বাহাদুর শাহ'[২৫] দিল্লীর বাদশাহী মসনদে আরোহণ করেন। নওয়াব জাফর খান তাঁর নিকট বাংলা থেকে উপহার ও কর প্রেরণ করেন এবং তৎপরিবর্তে তিনি বাংলার সুবাদার পদে পুনরায় নিয়োগের সনদ প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত বাদশাহ তাঁকে একটি ঝালরদার পাল্কীসহ খেলাত প্রেরণ করেন। শাহজাদা আজীম-উশ-শান আজীমাবাদে তাঁর প্রতিনিধিরূপে সরবুলন্দ খানকে রেখে বাদশাহী রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হন। সেই বৎসরই বাহাদুর শাহের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে নওয়াব জাফর খানের আমন্ত্রণে সুলতান ফরকখ শিয়র জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন এবং নওয়াব তাঁকে লালবাগ প্রাসাদে স্থান দেন। উক্ত নওয়াব শাহাজাদার প্রতি তাঁর যোগ্য মর্যাদা দেখান এবং তাঁর সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করেন। সেইসঙ্গে প্রচলিত প্রথানুযায়ী তিনি কর ও রাজস্ব বাদশাহ বাহাদুর শাহের নিকট প্রেরণ করেন। পাঁচ বৎসর এক মাসকাল রাজত্বের পর ১১২৪ হিজরীতে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান মা'জ-উদ-দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন ও জাঁহাদর শাহ[২৬] উপাধি গ্রহণ করেন এবং দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার যোগসাজশে শাহাজাদা আজীম-উশ-শানকে হত্যা করেন।[২৭] এই উদ্বেগের কারণ দূর করার পর প্রধান উজীর আসাদ খান ও আমীরুল ওমারা জুলফিকর খানের চেষ্টায় ও সাহায্যে নতুন বাদশাহ তাঁর অন্য দুই ভ্রাতাকে হত্যা করেন।[২৮] প্রকৃতপক্ষে বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর আট দিনের মধ্যে তিনি বাদশাহী পরিবারের ত্রিশ জনেরও অধিক সংখ্যক বংশধরদের হত্যা করেন এবং অবশিষ্টদের পীড়ন ও বন্দী ক'রে রাখেন। এইভাবে জাঁহাদর শাহ সিংহাসন দখল করেন। আমীরুল ওমারা ছিলেন সামরিক বিভাগের প্রধান বখ্‌শি। জাঁহাদর শাহ তাঁকে প্রধান উজীর পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর পিতা আসফুদ্দৌলা আসফ খানকে উকীলে-কুল, অর্থাৎ সাম্রাজ্যে বাদশাহের প্রধান প্রতিনিধিরূপে নিয়োগ করেন। প্রথা মোতাবেক বাদশাহ নওয়াব জাফর খানকে তাঁর পদে পুনরায় নিযুক্তি অনুমোদন ক'রে বাণী প্রেরণ করেন। জাফর

খানও বশ্যতা স্বীকার ক'রে কর ও উপহার প্রেরণ করেন। শাহজাদা আজীম-উশ-শানের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান ফররুখ শিয়র তখন সুবার সহকারী নাজিমরূপে বাংলায় ছিলেন। সুলতান মা'জ-উদ-দীনের সঙ্গে যুদ্ধ করার সংকল্প ক'রে তিনি শাহজানাবাদে (দিল্লী) যাত্রার আয়োজন করেন এবং নওয়াব জাফর খানের নিকট অর্থ ও সৈন্য দাবী করেন। নওয়াব জাফর খান সোজাসুজি উত্তর দেন, "আমি বাদশাহী কর্মচারী এবং বাদশাহী রাজধানীতে যিনি সিংহাসনের অধিকারী তাঁরই অধীন। তৈমুর বংশীয় যিনি দিল্লীর (সাম্রাজ্যের) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনি ভিন্ন অন্য কারো বশ্যতা স্বীকার করলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। যেহেতু আপনার চাচা মা'জ-উদ-দীন বর্তমানে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেইহেতু বাদশাহী রাজস্ব আপনাকে দেয়া যেতে পারে না।" বাংলা থেকে সাহায্য ও সৈন্য পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে, অথচ কুরআনের নির্দেশ— "আমি আমার প্রভু আল্লাহ তাআ'লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি"— স্মরণ ক'রে ফররুখ শিয়র সাহসের সাথে স্বল্পসংখ্যক পুরাতন ও নতুন সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে সুলতান মা'জ-উদ-দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন।[২৯] জাহাঙ্গীর নগরে অবস্থিত তাঁর নিজের সৈন্যদের ও গোলন্দাজ-দের তলব ক'রে ফরকখ শিয়র শাহজাহানাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং আজিমাবাদে (পাটনায়) পৌঁছা পর্যন্ত এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী সংগৃহীত হয়। উক্ত শহরের মহাজনদের নিকট থেকে করস্বরূপ অর্থ আদায় করেন ও সুবে বিহারের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে রাজকীয় জাঁকজমকের সাথে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ও মাথার উপর বাদশাহী ছত্র ধারণ করেন। রাজকীয় জাঁকজমকের সাথে পাটনা থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি বেনারস পৌঁছে সেখানকার অধিবাসীদের স্বস্তি ও শান্তির প্রতিশ্রুতি দেন। বেনারসের নগর-শেঠ ও অন্যান্য মহাজনদের নিকট সাম্রাজ্য বন্ধক দিয়ে তিনি এক কোটি টাকা সংগ্রহ করেন ও তদ্বারা এক সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। রাঢ়ের সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সৈয়দ আবদুল্লাহ খান ও সৈয়দ হোসেন আলী

খান[৩০] অতুলনীয় সাহসী ও বীর ছিলেন। তাঁরা অযোধ্যা ও এলাহাবাদ সুবাদ্বয়ের নাজিম ছিলেন। কিন্তু সুলতান মা'জ-উদ-দীন তাঁদের পদচ্যুত করায় তাঁরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সেইজন্য তাঁরা সুলতান ফররুখ শিয়রের পক্ষাবলম্বন ক'রে তাঁর জন্য ত্যাগ স্বীকারে বদ্ধপরিকর হন। ইতিমধ্যে নওয়াব জাফর খান কর্তৃক প্রেরিত বাদশাহী রাজস্ব এলাহাবাদ পৌঁছাবার পর তথাকার দারোগা সুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান গাড়ীগুলো আটক করেন ও পাহারার জন্য ৩০০ সৈন্য মোতায়েন করেন। ফররুখ শিয়র সেগুলো পাহারা দেয়ার জন্য এক বৃহৎ সৈন্যদল মোতায়েন করেন। উক্ত মালমাত্তা সুরক্ষিত হওয়ার ব্যবস্থায় ও পাহারাদারদের দক্ষতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হয়ে ফরকখ শিয়র সৈয়দ হোসেন আলী খানকে উজীর পদে নিযুক্ত কবেন এবং নিজ নামে খোতবা পাঠ চালু করেন। "আল্লাহ যখন কিছু ইচ্ছা করেন, তখন এব সাফল্যের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থাও তৈরী হয়।" ফররুখ শিয়র যেহেতু জাফর খানের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, সেইহেতু তিনি বাংলার এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান আফ্রাসিয়াব খান মীর্জাই আজমিরীর বড় ভাই রশিদ খানকে[৩১] জাফর খানের পরিবর্তে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। মীর্জাই আজমিরী বাদশাহী পরিবারে পালিত হয়েছিলেন এবং দৈহিক শক্তিতে রুস্তম অথবা ইস্‌ফন্দিয়ারের তুল্য ছিলেন; এমন কি তিনি পাগলা হাতীকে ভূমিসাৎ করতে পারতেন। কথিত হয় যে, যখন সুলতান ফরকখ শিয়র আকবর নগর (রাজমহল) থেকে আজিমাবাদ (পাটনা) অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন শকরিগলির নিকটে মালিক ময়দানের[৩২] কামান একটি গর্তের কাদায় আটকে যায়। এই কামানটি এতই বৃহৎ ছিল যে, এর গোলার ওজন ছিল এক মণ ও টেনে নেয়ার জন্য দু'টি হাতী ও ১৫০টি মহিষের প্রয়োজন হত। হাতী ও মহিষের দ্বারা টেনে কামানটি কাদা থেকে সরানো গেলো না। ফররুখ শিয়র নিজে কামানের নিকট গিয়ে খ্রীস্টান গোলন্দাজদের উদ্ভাবনী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু তাদের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। মীর্জাই আজমিরী অভিবাদন ক'রে বলেন, "হুকুম হলে বান্দা শক্তির পরীক্ষা করতে পারে।" সুলতান তাঁকে

হুকুম দেন। মীর্জাই আজমিরী তখন নিজের জোব্বার নিম্নাংশ কোমরে জড়িয়ে কামানের কাঠামোর নিচে দু'হাত দিয়ে সেটাকে তুলে বুকের উপর রেখে বললেন, "যেখানে হুকুম হবে সেখানে এটা রাখতে পারি।" উঁচু জায়গায় রাখার হুকুম দিলেন সুলতান। মীর্জা গর্ত থেকে কামান তুলে উঁচু জায়গায় রাখলেন। এই শক্তি প্রয়োগের ফলে মীর্জার চোখ থেকে রক্তক্ষরণের উপক্রম হয়েছিল। সুলতান তাঁকে বাহবা দেন এবং উপস্থিত সকলে তাঁর প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন। মীর্জাকে তখনই ছয়-হাজারি মনসব ও আফ্রাসিয়াব খান উপাধি দেয়া হয়। রশিদ খান এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং তেলিয়া-গড়ি ও শকরিগলি গিরিপথ অতিক্রম ক'রে বাংলায় প্রবেশ করেন। তাঁর প্রবেশের সংবাদ প্রাপ্তির পরও জাফর খান কোনো প্রকার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না। সুবার নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ব্যতীত তিনি নতুন সৈন্য সংগ্রহ করলেন না। মুর্শিদাবাদ থেকে তিন ক্রোশ দূরে পৌঁছে রশিদ খান যুদ্ধার্থে সৈন্য সজ্জিত করেন। পরদিন সকালে নওয়াব জাফর খান দু'হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ মীর বাঙালী ও সৈয়দ আনোয়ার জৌনপুরীকে রশিদ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করেন এবং নিজে দৈনিক প্রথানুযায়ী কুরআন নকল করতে প্রবৃত্ত হন। উভয় সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হওয়ার পর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঘোরতর যুদ্ধে সৈয়দ আনোয়ার নিহত হন; কিন্তু মীর বাঙালী এক ক্ষুদ্র সৈন্য-দলসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অটল হয়ে রইলেন। বিপক্ষরা তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো। এই সমস্ত সংবাদ পৌঁছানো সত্ত্বেও নওয়াব জাফর খান কোনোরূপ উদ্বেগ প্রকাশ না ক'রে ধীরভাবে কুরআন নকল করতে থাকেন। অবশেষে মীর বাঙালীর পশ্চাদপসরণের সংবাদ পৌঁছায়। তখন নওয়াব তাঁর বিশেষ শিষ্য মুর্শিদাবাদের ফৌজদার ও সামরিক বিভাগের অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ মুহম্মদ খানকে মীর বাঙালীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। মুহম্মদ খান সৈন্যদলসহ বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হয়ে মীর বাঙালীর সঙ্গে যোগদান করেন। এরপর নওয়াব জাফর খান কুরআন নকল করা শেষ ক'রে 'ফাতেহায়ে খয়ের' আবৃত্তি করেন ও যুদ্ধের জন্য সজ্জিত

হন। অশ্বারোহী সৈন্যদল, জ্ঞাতিগণ, তুর্কী, জর্জীয় ও হাবসী লোক লস্করসহ নওয়াব জাফর খান এক হস্তীতে আরোহণ করেন এবং নগরের বাইরে করিমাবাদের প্রান্তরে রশিদ খানের সঙ্গে লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হন এবং "দোয়ায়ে সইফি"[৩৩] আবৃত্তি করতে থাকেন। কথিত হয়, তিনি এতই ঐকান্তিকতার সঙ্গে 'দোয়ায়ে সইফি' আমল করতেন যে, তাঁর তলোয়ার আপনা থেকেই খাপ থেকে বেরিয়ে আসতো এবং অদৃশ্য সাহায্যের মাধ্যমে তিনি শত্রুদের পরাজিত করতেন। জাফর খানের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে মীর বাঙালী ও তাঁর সৈন্যদের সাহস শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সৈন্যগণ উচ্চ কলরব করতে লাগলো; মীর বাঙালী তাদের নিয়ে বিপক্ষের মধ্যভাগ আক্রমণ করেন। রশিদ খান তরবারি চালনায় দক্ষতা ও নিজের যোগ্যতার জন্য জাফর খানকে তোয়াক্কা করতেন না। তিনি এক পাগলা হাতীতে চড়ে মীর বাঙালীকে আক্রমণ করেন। মীর বাঙালী ছিলেন অভ্রান্ত লক্ষ্যভেদী; তিনি

ধনুকের ছিলায় কাঠের তৈরী তীর বসালেন
এবং নিজের বগল পর্যন্ত ধনুকে টান দিলেন।
যখন তীরের শেষ প্রান্ত তাঁর কানের কাছ পর্যন্ত পৌঁছালো,
তখন তিনি যুদ্ধরত শত্রুর প্রতি সোজা ছুড়লেন।
সৌভাগ্যবশত তীর গিয়ে লাগলো শত্রুর কপালে,
এবং সোজা মস্তক ভেদ ক'রে বেরুলো।
বীরগণের সেই নেতা তীরবিদ্ধ হলেন ঃ
সাহসী সিংহ হাতীর উপর গড়িয়ে পড়লেন।
সেই সময় সৈন্যগণ সমবেতভাবে
শত্রুকে সবেগে আক্রমণ করলো।
ঘোড়ার খুরের দাপটে মাটি কর্ষিত ভূমির মতো হয়ে গেলো,
কামান ও বর্শার আঘাতে আকাশ বিদীর্ণ হল।
তলোয়ার, ছোরা, লোহার গদা ও বর্শা নিয়ে
তারা শত্রুকে আক্রমণ করলো।

যুদ্ধক্ষেত্রে প্রচুর রক্তপাতের ফলে
সমস্ত মাটি লাল হয়ে গেলো।
যেন একটা সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করা হল,
যারা বাঁচলো তারা বন্দী হল।
শক্রর মালমাত্তা লুণ্ঠিত হল
জাফর খান গৌরবময় বিজয় লাভ করলেন।

নওয়াব জাফর খান বিজয়ী হয়ে ফিরে এসে বিজয়-বাদ্য বাজাতে হুকুম দিলেন এবং দুর্গে প্রবেশ করলেন। রশিদ খানের নিহত সৈন্যদের মস্তক একত্রিত ক'রে অন্যদের সাবধান করার জন্য হিন্দুস্তানের বড় রাস্তায় একটা উচ্চ চূলা তৈরী করার হুকুম দিলেন। রশিদ খানের বন্দী সৈন্যরা বলেছিল যে, জাফর খান অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেঘের মধ্য থেকে সবুজ পোশাক পরিহিত সৈন্যরা খোলা তলোয়ার হাতে তাদের আক্রমণ করেছিল ও পরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সুলতান ফররুখ শিয়র তখনো সুলতান মা'জ-উদ-দীনের সঙ্গে সংঘর্ষের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে পারেন নাই; তদুপরি জাফর খানের জয় ও রশিদ খানের পরাজয়ের সংবাদ শুনে হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। আকবরাবাদের (আগ্রার) সন্নিকটে যখন সুলতান মা'জ-উদ্দীন জাঁহাদর শাহের সঙ্গে যুদ্ধ হয়,[৩৪] তখন রাঢ়ের সৈয়দগণ ফররুখ শিয়রের পক্ষে প্রচণ্ড বীরত্ব প্রদর্শন করেন।[৩৫] মা'জ-উদ-দীনের পক্ষে প্রধান বখ্শী খানজাহান বাহাদুর কোকলতাশ খান আমীরুল ওমারা জুলফিকর খানের অবহেলার জন্য নিহত হন।[৩৬] মা'জ-উদ-দীনের পক্ষের অন্যান্য আমীরগণ—বিশেষতঃ মুঘল আমীরগণ—ফররুখ শিয়রের আমীরদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ফলে, মা'জ-উদ-দীন জাঁহাদর শাহের সৈন্যদের মধ্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। খানজাহান বাহাদুরের অবস্থা দেখে হতোদ্যম হ'য়ে জাঁহাদর শাহ সোজা শাহজাহানাবাদে সাম্রাজ্যের প্রধান উজীর আসাদ খান আসিফ-উদ-দৌলার বাড়ীতে চলে যান।[৩৭] অব্যবহিত পরে আসিফ-উদ-দৌলার পুত্র আমীরুল ওমারা পিতার নিকট

উপস্থিত হয়ে বাদশাহকে আশ্রয় দেয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু পিতা জাঁহাদর শাহের পক্ষ সমর্থন করা অসুবিধাজনক হবে বিবেচনা ক'রে তাঁকে প্রহরাধীন রাখেন। এরপর, আর বাধাপ্রাপ্ত না হ'য়ে সুলতান মুহম্মদ ফররুখ শিয়র ১১২৪ হিজরীর শেষ দিকে আকবরাবাদে (আগ্রায়) বাদশাহী মসনদে আরোহণ করেন। আকবরাবাদ (আগ্রা) থেকে ফররুখ শিয়র দ্রুত শাহজাহানাবাদে (দিল্লী) যান এবং সেখানে জাঁহাদর শাহ ও আমীরুল ওমারাকে হত্যা করেন।[৩৮]

সুলতান ফররুখ শিয়রের দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ

বাদশাহ ফররুখ শিয়রের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ পেয়ে নওয়াব জাফর খান তাঁর নিকট উপহারাদি ও বকেয়া বাদশাহী রাজস্ব সম্পূর্ণ প্রেরণ করেন। তৎপরিবর্তে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা সুবাত্রয়ের নিজামতি ও দেওয়ানীর যুক্তসনদ প্রাপ্ত হন।[৩৯] নওয়াব একটি মূল্যবান খেলাতও পেয়েছিলেন। পূর্বের আমলের মতো এই আমলেও নওয়াবের প্রস্তাবাদি বাদশাহ মনোযোগের সাথে অনুমোদন করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঃ নগর-শেঠের চাচা ও প্রতিনিধি ফতেহচাঁদ শাহ নওয়াবের সুনজরে ছিলেন এবং নওয়াবের প্রস্তাবানুসারে তাঁকে জগৎশেঠ উপাধি দেয়া হয় ও বাংলার প্রধান খাজাঞ্চির পদে নিয়োগ করা হয়। উজীর কুতব-উল-মুল্‌ক আবদুল্লাহ খানের ভ্রাতা প্রধান বখশি সৈয়দ হোসেন আলী খানের 'নাসির জং' উপাধি লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল। জাফর খানের এই উপাধি ছিল। বাদশাহী বিধি অনুযায়ী একাধিক ব্যক্তির একই সময়ে একই উপাধি ধারণের রীতি না থাকায় উপাধি (নাসির জং) বদল করার জন্য জাফর খানের নিকট এক বাদশাহী হুকুম প্রেরিত

হয়। যদিও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় তখন বিপুল প্রভাব ও ক্ষমতাশালী ছিলেন, তথাপি জাফর খান তাদের এই ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হয়ে উপাধি বদল করতে অসম্মত হন এবং বাদশাহকে উত্তরে জানানঃ "এই পুরাতন বান্দার খ্যাতি অথবা নামের লোভ নেই; কিন্তু বাদশাহ আলমগীর (আওরঙ্গজেব) অনুগ্রহ ক'রে যে উপাধি দিয়েছেন, সেটা আমি বিনিময় করতে প্রস্তুত নই।" সৈয়দ রাজী খানের মৃত্যুর পর জাফর খানের ইচ্ছানুযায়ী বাদশাহ ফররুখ শিয়র সুবে-বাংলার দেওয়ানীতে মীর্জা আসাদুল্লাকে নিয়োগ করেন। আসাদুল্লা ছিলেন জাফর খানের জামাতা উড়িষ্যার নাজিম শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খানের পুত্র। এই সঙ্গে মীর্জাকে সরফরাজ খান উপাধি দেয়া হয়। জাফর খান অপুত্রক ছিলেন এবং সরফরাজ খান ছিলেন তাঁর দৌহিত্র; সেই কারণে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নওয়াব নিজ ব্যক্তিগত জায়গীরের আয় থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার খোলহার-বাগ পরগণার কিস্‌মত চুনাখালির জমিদারী উপরোক্ত কিস্‌মতের তালুক-দার মুহম্মদ আমানের নিকট থেকে সরফরাজ খানের নামে ক্রয় ক'রে উক্ত জমিদারীর নাম রাখেন আসাদ নগর এবং বাদশাহী ও সুবার কানুনগোর দফতরে তা রেকর্ড করিয়ে রাখেন। এই জমিদারী খাস তালুকরূপে উল্লিখিত হয়, যাতে তাঁর (সরফরাজ খানের) মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা বাদশাহী রাজস্ব আদায় করার পর উদ্‌বৃত্ত অর্থ ভোগ করতে পারে। সেই বৎসরই জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) সহকারী গবর্নরের পদ শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খানের এক জামাতা মীর্জা লুত্‌ফুল্লাকে দেয়া হয়। এই সঙ্গে মীর্জা মুরশিদ কুলী খান উপাধি লাভ করেন। ১১৩১ হিজরীর ৯ই রবি-উস্‌-সানি তারিখে উজীর আবদুল্লাহ খান ও বখশী হোসেন আলী খানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাদশাহ ফররুখ শিয়র নিহত হন।[৪০] তখন রাঢ়ের সৈয়দগণ বাহাদুর শাহের পুত্র ও শাহজাদা রফি-উশ-শানের পুত্র সুলতান রফি-উদ-দরাজাতকে[৪১] সিংহাসনে বসান। চার/পাঁচ মাস নামেমাত্র রাজত্ব করার পর ক্ষয়রোগে এই বাদশাহের মৃত্যু হয়। এরপর রফি-উদ-দরাজাতের দ্বিতীয় ভ্রাতা সুলতান রফি-উদ-দৌলাকে[৪২] বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত ক'রে দ্বিতীয় শাহজাহান নাম দিয়ে

তাঁকে সিংহাসনে বসান। তিনিও তাঁর ভ্রাতার মতো পাঁচ/ছয় মাসকাল নামেমাত্র সিংহাসনে আসীন ছিলেন। এই সময় বাদশাহ আলমগীরের পৌত্র ও সুলতান আকবরের পুত্র সুলতান নেকোশিয়ার যখন আকবরাবাদ (আগ্রা) আক্রমণ করেন, তখন দ্বিতীয় শাহজাহানের মৃত্যু হয়। রাঢ়ের সৈয়দগণ ও অন্যান্য বাদশাহী আমীরগণ ১১৩১ হিজরীর শেষ দিকে জাহান শাহের পুত্র সুলতান রওশন আখতারকে শাহজাহানাবাদের (দিল্লীর) দুর্গ থেকে সঙ্গে নিয়ে অবিরাম মার্চ করে আকবরাবাদ (আগ্রা) পৌঁছান এবং ১১৩২ হিজরীর প্রথম দিকে তাঁকে আবুল ফাতাহ নাসিরউদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী উপাধি দিয়ে সিংহাসনে বসান।[৪৩] এক কবি বলেছেন ঃ

তিনি ছিলেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র—এবার অবস্থান্তরে
তিনি হয়ে গেলেন চাঁদ—
ইউসুফ বন্দী-দশা থেকে ফিরে রাজা হলেন।

মুহম্মদ শাহের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ প্রাপ্তির পর নওয়াব জাফর খান যথারীতি উপহারাদি প্রেরণ করেন এবং তৎপরিবর্তে তাঁর পূর্বপদ অনুমোদিত হয় ও তাঁর উপর উড়িষ্যার সুবাদারির দায়িত্ব দেয়া হয়। মোটের উপর সুলতান ফররুখ শিয়রের আমল থেকে এ পর্যন্ত সৈয়দ হোসেন আলী খান ও সৈয়দ আবদুল্লা খানের অসঙ্গত প্রভাবের ফলে সাম্রাজ্যের কার্যের মর্যাদা হ্রাস হয়েছিল এবং অনবরত বাদশাহ পরিবর্তনের ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু বাদশাহী বিপ্লবে বাংলার জনসাধারণের কোনো প্রকার দুর্দশা হয় নাই; কারণ, জাফর খান অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এই সুবার শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। তাঁর আমলে মারাঠারা বাংলার কোনো ক্ষতি করতে পারে নাই। খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী দিনেমারদের বাংলায় কুঠি ছিল না; ফরাসীদের মাধ্যমে তারা ব্যবসা করতো। ফরাসীদের পরামর্শে তারা নজর দিয়ে বঙ্গী বাজারে[৪৪] কুঠি স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। নওয়াব জাফর খানের নিকট থেকে সনদ প্রাপ্তির পর তারা মাটির দেয়াল দেয়া কতকগুলো বাড়ী করে এবং মজবুত চূড়াসহ কুঠির ভিত্তি স্থাপন করে, কুঠির চারিদিকে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করে; নদীর পানি এই পরিখায় প্রবাহিত হওয়ায় ছোট ছোট

জাহাজের এখানে আসবার সুবিধা হত। দিবারাত্র কাজ ক'রে ও বহু অর্থব্যয় ক'রে তারা এসব তৈরী করছিল। দম্ভ ও গর্বভরে তারা অন্য খ্রীস্টান জাতিসমূহের উপর মেজাজ দেখাতো ও বলতো যে, পশম, মখমল ও রেশমের দ্রব্যাদি[৪৫] চটের দরে বিক্রি করবে।[৪৬] ইংরেজ ও ডাচ খ্রীস্টানেরা নিজেদের সমূহ ক্ষতির আশংকা ক'রে দিনেমারদের কুঠি বন্ধ করে দেয়ার জন্য মুঘল বণিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ও নিজেরা তাদের (মুঘলদের) নজর পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। হুগলী বন্দরের ফৌজদার আহসান উল্লাহ্ খানের নিকট তারা ইউরোপে ডেইনদের রক্তপাত ও অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত করে এবং বঙ্গী বাজারে দুর্গ, চুড়া ও পরিখা তৈরীর অতিরঞ্জিত বর্ণনা পেশ করে; তাছাড়া, বাদশাহের সাম্রাজ্যে তাদের পূর্বের দুষ্ক্রিয়ার কথা বর্ণনা করে। এই সকল বিবরণী দ্বারা তারা দিনেমারদের কুঠি বন্ধ করার কথা নওয়াবের নিকট প্রস্তাব করতে আহসান উল্লাহকে প্ররোচিত করে। সেইসঙ্গে নিজেরাও নওয়াবের নিকট দরখাস্ত পেশ করে। কুঠি বন্ধ করার জন্য আহসান উল্লাহ্ খান ডেইনদের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন; কিন্তু এরা কুঠি বন্ধ করে নাই। অবশেষে, ফৌজদার নিজের সহকারী মীর জাফরকে ডেইনদের নিকট প্রেরণ করেন। দিনেমারদের প্রধান,—যিনি নিজেকে একজন জেনারেল ব'লে পরিচয় দিতেন—প্রাকারের উপর কামান স্থাপন ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। উক্ত মীর প্রাকারের বিপরীত দিকে সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন ক'রে কামান, হাওই, তীর ও বন্দুক দিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিন্তু অবিরাম কামান ও হাওই বর্ষণের জন্য মীরের সৈন্যগণ কুঠির নিকটস্থ হতে পারছিল না। নদীপথে বণিকদের নৌ-যান যাতায়াত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফরাসী খ্রীস্টানেরা গোপনে ডেইনদের গোলা, বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতো। খাজা মোহাম্মদ ফজলের জ্যেষ্ঠ পুত্র খাজা মোহাম্মদ কামিল নদীপথে যাতায়াত করতেন; এক সময়ে ডেইনরা তাঁকে গ্রেফতার করে। এই কারণে মুঘল, আর্মেনীয় ও অন্য বণিকেরা তাঁকে মুক্ত করার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করে এবং তাঁকে হত্যা করা হবে এই আশংকায় দুই/তিন দিনের জন্য যুদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত খাজা বিপুল

পরিমাণ মুক্তিপণ দেয়ায় ও শান্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেয়ায় ডেইনরা তাকে মুক্তি দেয়। অতঃপর খ্রীস্টান ফরাসীরা ফৌজদারের ক্রোধের ভয়ে ডেইনদের পক্ষ ত্যাগ করে। কামান বন্দুকের গোলাগুলি, তীর ও হাওই ছুড়্‌তে ছুড়্‌তে মীর জাফর নিজের ঘাঁটি অগ্রসর ক'রে নিলেন এবং স্থল ও জলপথে সর্বপ্রকার সরবরাহ বন্ধ ক'রে দেয়ায় দুর্গস্থ সৈন্যদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। খাদ্য সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় দুর্গস্থ দেশীয় সৈন্যরা পলায়ন করে; জেনারেল একা তেরোজন ডেইনসহ কুঠিতে থাকেন। এই প্রকার সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও এরা নিজ হাতে অবিরাম কামানের গোলা ও হাওই ছুড়তে থাকে। ফলে, মীর জাফরের সৈন্যরা অগ্রসর হওয়া দূরে থাক, মাথা তোলার সুযোগ পাচ্ছিলো না। কিছুক্ষণ এইভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। এই সময় মীর জাফরের ঘাঁটির কামানের একটি গোলার আঘাতে ডেনিশ সেনাপতির[৪৭] একটি হাত ভেঙ্গে অকর্মণ্য হয়ে যায়। ফলে, গভীর রাত্রে একটি জাহাজে উঠে সেনাপতিকে বাধ্য হয়ে কুঠি ত্যাগ ক'রে পলায়ন করতে হয়। তিনি স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। পরদিন সকালে কুঠি দখল করা হয়; কিন্তু কামানের কয়েকটি গোলা ব্যতীত মূল্যবান কিছু পাওয়া যায় নাই। কুঠির প্রবেশ-দ্বার ও চূড়া ভূমিসাৎ ক'রে মীর জাফর বিজয়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় সংবাদ পাওয়া যায় যে, সরকার মাহমুদাবাদের টংকু স্বরূব-পুরের[৪৮] অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য কুখ্যাত আফগান-জমিদার সুজাত খাঁ ও নিজাত খাঁ মাহমুদাবাদ থেকে প্রেরিত ষাট হাজার টাকা পরিমাণ রাজস্ব পথিমধ্যে লুঠ ক'রে নিয়েছে। চোর ডাকাতদের রক্তপিপাসু জাফর খান এই সংবাদ পেয়ে ডাকাতি তত্ত্বাবধানের জন্য একজন তত্ত্বা-বধায়ক ও তার সঙ্গে গোয়েন্দার দল নিযুক্ত করেন। উক্ত ঘটনার প্রকৃত বিবরণ অবগত হওয়ার পর তিনি উক্ত ডাকাতদের গ্রেফতার করার জন্য চাকলা হুগলীর ফৌজদার আহসান উল্লাহ খানকে আদেশ দেন। উক্ত খান বাহ্যত শিকারে যাওয়ার অজুহাতে বেরিয়ে হঠাৎ দিক পরিবর্তন ক'রে ডাকাতদের আড্ডায় হানা দিয়ে তাদের সকলকে গ্রেফতার করেন এবং তাদের হস্তপদ ছেদ ক'রে চামড়া দিয়ে বেঁধে

নওয়াব জাফর খানের নিকট প্রেরণ করেন।[৪৭] নওয়াব তাদের যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করার আদেশ দেন ও তাদের সমস্ত মালমাত্তা বাজেয়াফ্‌ত করেন। নওয়াবের শাসনকালে চোর, ডাকাত, লুঠেরা ও নরহন্তাদের নাম বাংলা থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শহর ও গ্রামের বাশিন্দাগণ পূর্ণ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বাস করতো। তাঁর নিজামতের প্রথম দিকে (তখনো তিনি মুরশিদ কুলি খান নামে পরিচিত ছিলেন) বর্ধমানের দিকের সদর রাস্তায় কাটোয়া ও মুর্শিদগঞ্জে তিনি থানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উক্ত রাস্তা পাহারা দেয়ার জন্য তিনি এই থানাগুলো প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং এগুলোর শাসন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর বিশেষ শিষ্য মুহম্মদজানের উপর ন্যস্ত ছিল। যেহেতু সেই সময় নদীয়া থেকে হুগলী যাওয়ার পথে ফানাচোরে কলা বাগানগুলোতে দিনের বেলায় চুরি হত, সেইহেতু মুহম্মদজান কাটোয়া থানার অধীনে পুপথলে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেছিলেন। অন্যদের সতর্ক ক'রে দেয়ার উদ্দেশ্যে মুহম্মদজান চোর-ডাকাতদের গ্রেফতার ক'রে তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কেটে সদর রাস্তার উপর লটকিয়ে দিতেন। তার দলের কুড়ানধারীরা আগে আগে যেতো ; সেইজন্য তার নাম হয়েছিল মুহম্মদজান কোলহারা। তার নাম শুনে চোর-ডাকাত থরহরি কাঁপতো।

ইসলাম ধর্ম প্রচার, ধর্মীয় নির্দেশাদি কঠোরভাবে পালন, সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানদের সাহায্যকারী, দুঃস্থের দুর্দশা দূর করা, অত্যাচারীদের নির্মূল করা—এই সকল ক্ষেত্রে নওয়াব জাফর খান ছিলেন দ্বিতীয় আমীরুল-উল-উমারা শায়েস্তা খান। তাঁর আদেশ যাতে পালিত হয় সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন কঠোর এবং কর্তব্য সাধনে বা প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তিনি ছিলেন অটল। দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে তিনি কখনো অবহেলা করতেন না ; বৎসরে তিন মাস রোজা রাখতেন ও সম্পূর্ণ কুরআন আবৃত্তি করতেন। চান্দ্র মাসের ১২/১৩ তারিখে তিনি রোজা রাখতেন ; প্রতি বৃহস্পতিবার রাত জেগে নামাজ পড়তেন। বহু রাত্রি তিনি কুরআনের বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠে অতিবাহিত করতেন ও খুব কম নিদ্রা যেতেন। প্রত্যহ সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কুরআন

নকল করতেন। প্রত্যেক বৎসর মক্কা, মদিনা, নজফ, কারবালা, বাগদাদ, খোরাসান, জেদ্দা, বসরা, আজমীর ও পাণ্ডুয়া প্রভৃতি তীর্থযাত্রীদের প্রধানদের মাধ্যমে তিনি স্বহস্ত লিখিত কুরআন, নিয়াজ ও উপহার পাঠাতেন। এই সকল স্থানের প্রত্যেকটির জন্য নিয়াজ, দান ও কুরআন পাঠক (বা ক্বারী) বরাদ্দ করেছিলেন। এই ইতিহাসের নগণ্য লেখক এইরূপে লিখিত কুরআনের একটি ছেঁড়া কপি সাদুল্লাপুরে[৩০] হযরত মখদুম আখি সিরাজউদ্দীনের মাজারে দেখেছিল; এটি নওয়াব জাফর খানের হাতে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। নওয়াবের অধীনে দু'হাজার ক্বারী নিয়োজিত ছিলেন; তারা প্রত্যহ সমগ্র কুরআন পাঠ করতেন ও নওয়াবের স্বহস্ত লিখিত কপি সংশোধন ক'রে দিতেন। নওয়াবের নিজের বাবুর্চিখানা থেকে হরিণ, পাখী ও অন্যান্য পশু-মাংসসহ নানা উপাদেয় খাদ্য তাদের দু'বেলা সরবরাহ করা হত। শেখ, সৈয়দ, আলেম ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গ তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং তাদের পরিচর্যা করা পুণ্যের কাজ মনে করতেন। হযরত মুহম্মদের (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রবি-উল-আউয়ালের ১লা থেকে ১২ই তারিখ পর্যন্ত তিনি ধার্মিক শেখ, উলামা ও দরবেশদের ভোজন করাতেন। মুর্শিদাবাদ এলাকার আশ-পাশ থেকে তিনি তাঁদের দাওয়াত ক'রে আনতেন এবং অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করতেন এবং আহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্ভ্রমের সাথে তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন ও নিজে খাওয়াতেন। এই সময় মাহি নগর থেকে লালবাগ পর্যন্ত সমগ্র নদী-তীর তিনি এমনভাবে চেরাগের আলোয় সজ্জিত করতেন যে, নদীর অপর তীরের দর্শকগণও বিস্ময়ের সঙ্গে সমস্ত মসজিদে উৎকীর্ণ কুরআনের আয়াত পড়তে পারতো। কথিত হয় যে, এই সকল চেরাগ জ্বালাবার জন্য নাজির আহমদের তত্ত্বাবধানে এক লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত করতেন। সূর্যাস্তের পর বন্দুকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চেরাগ একসঙ্গে জ্বালিয়ে দেয়া হত। মনে হত যেন একটা আলোক-ধারা মুক্ত ক'রে দেয়া হয়েছে, অথবা পৃথিবী যেন তারকারাজিখচিত আকাশের মতো হয়ে গিয়েছে।

স্রষ্টার সন্তুষ্টিলাভের ও প্রজাদের কল্যাণের জন্য, এবং অত্যাচারিতের অভিযোগের প্রতিকারের জন্য তিনি সর্বদা আত্মনিয়োগ করতেন। শংগার্ফি কলম দ্বারা তিনি নিজের নাম স্বাক্ষর করতেন। খাদ্য-দ্রব্যাদির মূল্য সস্তা করার জন্য তিনি সদা সচেষ্ট ছিলেন; কাউকে খাদ্যশস্য মজুত ক'রে রাখতে দিতেন না। প্রতি সপ্তাহে তিনি খাদ্যশস্যের মূল্য-তালিকা প্রস্তুত করাতেন এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা প্রকৃত যে মূল্যে খরিদ করতো তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। দরিদ্রদের নিকট থেকে তালিকা-নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অধিক দাম আদায় করলে তিনি ব্যবসায়ী, মহলদার ও ওজনদারদের নানা প্রকার শাস্তি দিতেন এবং গাধার পিঠে চড়িয়ে শহর ঘোরাবার আদেশ দিতেন। তাঁর শাসনকালে চাউলের বাজার-দর টাকায় ৫/৬ মণ ছিল; অন্যান্য জিনিসও অনুরূপ সস্তা থাকায় লোকে মাসিক এক টাকায় পোলাও কালিয়া খেতো।[৫১] এই প্রকার সস্তার দরুন গরীবেরা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতো। জাহাজের কাপ্তেনরা কোনো প্রকার খাদ্যশস্য রফতানি করতে পারতো না; জাহাজের লোকসংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের অধিক তারা জাহাজে নিতে পারতো না। জাহাজ ঘাটে ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গে হুগলী বন্দরের ফৌজদার জাহাজ পরিদর্শনের জন্য একজন কর্মচারী পাঠাতেন ও সমস্ত খাদ্যশস্য আটক করতেন, যাতে জাহাজের লোকদের প্রয়োজনের অধিক খাদ্যশস্য রফতানী না হয়।

বাদশাহী ক্ষমতার (বা কর্তৃত্বের) প্রতি নওয়াবের এতই শ্রদ্ধা ছিল যে, তিনি কখনো বাদশাহী নৌবহরে ভ্রমণ করতেন না। বর্ষাকালে যখন বাদশাহী যুদ্ধ-নৌবহর জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) পরিদর্শনের জন্য (মুর্শিদাবাদ) আসতো, তখন তিনি নিজে অগ্রসর হয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করতেন এবং বাদশাহী রাজধানীর দিকে মুখ ফিরিয়ে অভিবাদন করতেন ও উপহার দিতেন। পবিত্র (ধর্মীয়) বিধান অনুযায়ী তিনি কখনো মদ্যপান করতেন না; হারাম বর্জন করতেন; কখনো নাচ দেখতেন না বা গান শুনতেন না। আজীবন তিনি একমাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ব্যতীত কোনো রক্ষিতা রাখেন নাই, অথবা অন্য নারীর প্রতি আসক্ত

হন নাই। অত্যন্ত সাধুতা-বোধের দরুন তিনি কোনো খোজা অথবা (ধর্মীয়) আইনানুসারে যে-স্ত্রীলোকদের দেখা নিষিদ্ধ তাদেরে হারেমে প্রবেশ করতে দিতেন না। কোনো দাসী একবার হারেমের বাইরে গেলে, তার পুনঃপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। বিদ্যা, কলা ও বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে তিনি পারদর্শী ছিলেন। সুস্বাদু অথবা বিলাসী খাদ্য তিনি গ্রহণ করতেন না। একমাত্র বরফ-পানি ও সংরক্ষিত বরফ ব্যতীত অন্য কোনো বিলাসিতাপূর্ণ কিছু গ্রহণ করতেন না। নাজির মুহম্মদের সহকারী খিজর খানকে শীতকালের চারি মাসকাল আকবর নগরের পাহাড়ে বরফ সংরক্ষণের জন্য পাঠানো হত। নওয়াবের ব্যবহারার্থে বারো মাসের মতো প্রয়োজনীয় বরফ মওজুদ করা থাকতো ও আকবর নগর থেকে তা সরবরাহ করা হত।

বাংলার শ্রেষ্ঠ ফল[৩২] আমের মওসুমে আম সংবরাহের জন্য আকবর নগর চাকলায় একজন তত্ত্বাবধায়ক পাঠানো হত। এই কর্মচারী খাস গাছের আম গুণ্‌তি ক'রে হিসাবের খাতায় লিখে রাখতেন এবং হিসাবে জমা ও খরচ দেখানো হত। পাহারাদার ও বাহকেরা জমিদারদের নিকট থেকে পাঠানোর খরচ আদায় ক'রে মালদহ, কাটোয়া, হোসেনপুর, আকবর নগর ও অন্যান্য স্থান থেকে আম পাঠাতো। খাস আম গাছ কাটার অধিকার জমিদাবদের ছিল না। পরন্তু, উক্ত চাকলার সমস্ত আম গাছ আটক করা হত। পূর্বের নাজিমদের আমলে এই প্রথা কঠোরতরভাবে প্রয়োগ করা হত। বর্তমানে[৩৩] যদিও বাংলার শাসনভার খ্রীস্টান ইংরেজদের অধীনস্থ, এবং যদিও নওয়াব জাফর আলী খানের[৩৪] পুত্র নওয়াব মোবারক-উদ্‌-দৌলা নামে মাত্র নাজিম, তথাপি আমের মওসুমে খাস আমগাছ-তত্ত্বাবধায়ক উক্ত নওয়াব মোবারক-উদ্‌-দৌলার পক্ষে মালদহ গিয়ে খাস গাছগুলো আটক করেন ও নওয়াবের নিকট আম পাঠান। তবে বর্তমানে পাঠাবার খরচা জমিদারদের থেকে আদায় করা যায় না এবং তত্ত্বাবধায়কেরও পূর্ব-মর্যাদা ও সম্মান আর নাই।

নওয়াব জাফর খানের আমলে অত্যাচার এমনই নির্মূল করা হয়েছিল যে, জমিদারদের প্রতিনিধিরা অত্যাচারিতদের ও ফরিয়াদিদের

সন্ধানে নকর-খানা থেকে চেহেল সেতুন[৫৫] পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতো। কোনো অত্যাচারিত ব্যক্তি অথবা ফরিয়াদির সন্ধান পাওয়া মাত্রই তারা তার সঙ্গে আপোস মীমাংসা করে নিতো, নওয়াবের কাছ পর্যন্ত যেতে দিত না। আদালতের বিচারকদের কেউ অত্যাচারীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলেও অত্যারিত ব্যক্তি নওয়াবের নিকট নালিশ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার করতেন। বিচারের ক্ষেত্রে তিনি কারো প্রতি অনুগ্রহ অথবা পক্ষপাতিত্ব দেখাতে দিতেন না। উচ্চ-নীচ সকলকে এক পাল্লায় বিচার করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপঃ একথা সুবিদিত যে, জনৈক অত্যাচারিত ব্যক্তির মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি নিজ পুত্রকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন[৫৬] ও তজ্জন্য তাঁকে 'আদালত-গস্তর' (বিচার বিতরণকারী) উপাধি দেয়া হয়েছিল। তিনি কুরআনের বিধান ও বাদশাহ আওরঙ্গজেব কর্তৃক নিয়োজিত কাজী মুহম্মদ শরফ দ্বারা আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বিচার করতেন। কাজী মুহম্মদ শরফ অত্যন্ত সৎবিচারক ও পরম পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার ভণ্ডামি (বা মুনাফেকি) ছিল না। কথিত হয়, চুনাখালির জনৈক ভিক্ষুক তথাকার তালুকদার বৃন্দাবনের নিকট ভিক্ষা চায়। তালুকদার বিরক্ত হয়ে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। ভিক্ষুক তখন বৃন্দাবনের যাতায়াতের পথে একটি প্রাচীরের ভিত্তির মতো ক'রে ইটের উপর ইট সাজিয়ে রাখে ও এটাকে মসজিদ আখ্যা দেয় এবং যখনই বৃন্দাবনের পালকি সেখান দিয়ে যেতো তখনই আজান দিতো। বৃন্দাবন বিরক্ত হয়ে সেখানকার কতকগুলো ইট ফেলে দেয় ও ভিক্ষুককে গালাগালি দিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়। ভিক্ষুক নওয়াব জাফর খানের বিচারালয়ে নালিশ করে। কাজী মুহম্মদ শরফ অন্য আলেমদের সাথে একমত হয়ে পবিত্র আইনের নির্দেশ অনুযায়ী বৃন্দাবনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। জাফর খান প্রাণদণ্ডের আদেশের সঙ্গে একমত হতে না পেরে আসামীকে মুক্তি দেয়া যায় কিনা কাজীকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই হিন্দুকে প্রাণদণ্ডের আদেশ থেকে রেহাই কি কোনো প্রকারে দেয়া যায়?" কাজী উত্তরে বলেন, "তার পক্ষের সুপারিশকারীকে ফাঁসি দিতে (অথবা প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী করতে) যতটুকু সময়ের

প্রয়োজন, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি রেহাই পেতে পারে; এরপর তাকে ফাঁসি দিতে হবে।"[৫৭] শাহজাদা আজিম-উশ-শানও বৃন্দাবনেব পক্ষে অনুরোধ করেন; কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়। কাজী স্বহস্তে তীর দিয়ে বৃন্দাবনকে হত্যা করেন। আজীম-উশ-শান বাদশাহ আওরঙ্গজেবের নিকট পত্রে লিখেছিলেন: "কাজী মুহম্মদ শরফ পাগল হয়ে গিয়েছেন; অকারণে তিনি বৃন্দাবনকে স্বহস্তে হত্যা করেছেন।" বাদশাহ তাঁর বিবরণীর (পত্রের) উপর স্বহস্তে লিখেছিলেন: "এ একটা গুরুতর[৫৮] মিথ্যা অপবাদ; কাজী আল্লার রাস্তায় আছেন।" আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত কাজী শরফ কাজীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নওয়াব জাফর খানের জোর অনুবোধ সত্ত্বেও কাজী শরফ পদত্যাগ করেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ও নওয়াব জাফর খানের নিজামতি আমলে কেবল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের, আলেমদের, বিদ্বানদের ও সৎব্যক্তিদের মধ্যে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারতেন, কেবল তাদেরি কাজীর পদে নিয়োগ করা হত। অশিক্ষিত অথবা নীচ ব্যক্তিদের এই পদ দেয়া হত না। ধার্মিক ও বংশানুক্রমিক কাজীদের বদলী করার অথবা তাদের পরিবর্তন করার রীতি ছিল না। তাদের নিকট কোনো প্রকার কর আদায় করা হত না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কারো অধীনস্থ ছিলেন না; কারো নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হত না।[৫৯] একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায়: প্রথম বাকির খানের (এরই নামানুসারে 'বাকির খানি রুটি' নামকরণ করা হয়েছে) পৌত্র হুগলী বন্দরের ফৌজদার আহসান উল্লাহ খান নওয়াব জাফর খানের আশ্রিত ছিলেন এবং নওয়াবের উপর তাঁর বিপুল প্রভাব ছিল। আহসান উল্লার শাসনকালে হুগলীর কোতোয়াল ইমাম-উদ-দীন জনৈক মুঘলের কন্যাকে তার বাড়ী থেকে ফুসলিয়ে বে'র ক'রে নিয়ে যায়। ইমাম-উদ-দীন উচ্চপদস্থ ও বিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। আহসানউল্লাহ খান ঘটনাটি উপেক্ষা করেন ও কোতোয়ালের প্রতি পক্ষ-পাতিত্ব দেখান এবং তার ভবিষ্যৎ সদ্ব্যবহারের জন্য জামিন হন। মুঘলেরা নওয়াব জাফর খানের নিকট এই বিষয়ে নালিশ করে। নওয়াব তখন আহসানউল্লার অনুরোধ-উপরোধ উপেক্ষা ক'রে পবিত্র পুস্তকের নির্দেশ

অনুযায়ী কোতোয়ালকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করান। নওয়াব তাঁর কার্য-কালের শেষ দিকে মুর্শিদাবাদ নগরীর পূর্ব দিকের প্রান্তরে খাস তালুকের জমিতে একটি খাজাঞ্চিখানা, একটি কাট্‌রা, একটি জুমআ' মসজিদ, একটি স্তম্ভ, একটি হাউজ ও একটি বৃহৎ ইঁদারা তৈরী করিয়েছিলেন। এই মসজিদের সিঁড়ির নিচে তিনি নিজের কবরের স্থান নির্দ্দিষ্ট করেছিলেন—যাতে কবরের কোনো ক্ষতি না হয় ও মসজিদের সংলগ্ন থাকায় তাঁর আত্মার মাগফেরাতের কারণ হয়। জীবন শেষ হওয়ার পূর্বে তাঁর কোনো পুত্র-সন্তান না থাকায় তিনি তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খানকে (যাকে তিনি লালন পালন করেছিলেন) উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করেন এবং সমস্ত সম্পদ, মালমাত্তা, নিজামত ও বাদশাহী পদসমূহের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১১৩৯ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

তিনি তাঁর অশ্ব চালনা করলেন অনন্তের দিকে;
তিনি চলে গেলেন; কিন্তু তাঁর সুনাম বেঁচে রইলো।
হ্যাঁ, এর থেকে উত্তম কিছু কে আকাঙ্ক্ষা করতে পারে?
যে মৃত্যুর পরে তার সদ্‌গুণগুলো যেন বেঁচে থাকে।[৬০]

নওয়াব শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খানের নিজামত[৬১]

[তিনি পূর্ব থেকে ওড়িসা—অর্থাৎ উড়িষ্যা সুবার নাজিম পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন

নওয়াব জাফর খান অনন্তধামে চলে যাওয়ার পর সরফরাজ খান[৬২] মৃত্যুকালীন ইচ্ছানুযায়ী তাঁর মৃতদেহ কাট্‌রার মসজিদের সিঁড়ির পাশে দাফন করেন এবং নিজে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে মসনদে আরোহণ করেন। নিজামত ও বাদশাহী কর্মচারীদের সন্তুষ্ট ক'রে তিনি নওয়াব

জাফর খানের মতোই রাজস্ব ও প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনা করতে থাকেন। সরকারী তহবিল ও বাদশাহী সম্পদ ব্যতীত জাফর খানের ব্যক্তিগত সম্পদ ও মালমাত্তা তিনি (সরফরাজ খান) নিজস্ব বাসভবনে স্থানান্তরিত করেন। বাদশাহ মুহম্মদ শাহ ও কমর-উদ-দীন হোসেন খানবাহাদুরের[৬৩] নিকট জাফর খানের মৃত্যু-সংবাদ প্রেরণ করেন। তাঁর পিতা উড়িষ্যার নাজিম শুজা উদ দীন মুহম্মদ খানের নিকটও তিনি এই সংবাদ প্রেরণ করেন। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর শুজা-উদ-দীন বলেন :

'ভাগ্য এবার আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ করেছে,
এবং আমার নামে রাজ্যের মুদ্রা তৈরির ব্যবস্থা করেছে।'

বাংলাব নিজামতের সম্মান, সম্পদ ও সুযোগাদি লাভের জন্য শুজা-উদ-দীনের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেইজন্য তিনি পিতৃসুলভ ও পুত্রের প্রতি সর্বপ্রকার অনুরক্তি ত্যাগ ক'রে অতুলনীয় বীর ও উদার-হৃদয় অন্য পুত্র মুহম্মদ তকি খানকে উড়িষ্যার নিজামতের ভার দিয়ে কটক নগরে তাঁকে রেখে নিজে বাংলা অভিমুখে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী-সহ অগ্রসর হন।

বাংলার নিজামতের বাদশাহী সনদ প্রাপ্তি ও বাদশাহী উজীর-গণের সমর্থন লাভের জন্য তিনি নওয়াব জাফর খানের প্রতিনিধি রায় বালকিশনের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। জাফর খানের অন্য প্রতিনিধি-গণের তুলনায় রায় বালকিশনের প্রভাব অধিক ছিল। তিনি (শুজা-উদ দীন) নিজের প্রতিনিধিদের নিকটও পত্র লেখেন।

বাদশাহ মুহম্মদ শাহ[৬৪] জাফর খানের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তির পর সৈন্যবাহিনীর প্রধান বখশী আমীর-উল-ওমারা শামস-উদ দৌলা খান ই-দওরানকে[৬৫] বাংলার সুবাদারী পদে নিয়োগ করেছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি ছিলেন বাদশাহের অনুগত বন্ধু; সামাজিক আনন্দোৎসবে ও রাজকার্যে বাদশাহের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল; যুদ্ধে ও আনন্দোৎসবে সর্বত্র তিনি ছিলেন বাদশাহের সঙ্গী। উপরোক্ত প্রতিনিধির পরামর্শে বিভ্রান্ত হয়ে আমীর-উল-ওমারা বাংলার ডেপুটি নিজামতের খেলাত শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খানের নামে প্রেরণ করেন। এই সনদ পৌঁছানোর

সময় শুজা উদ-দীন মেদিনীপুর প্রান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন। উক্ত সনদ প্রাপ্তিকে সৌভাগ্যসূচক গণ্য ক'রে তিনি এই স্থানের নাম দেন 'মুবারক মনজিল' এবং একটি কাট্‌রা ও একটি ইষ্টক-নির্মিত সরাইখানা তৈরির আদেশ দেন। পিতার অগ্রগতির সংবাদ পেয়ে যৌবনসুলভ হঠকারিতা-বশতঃ সরফরাজ খান পিতার বিরোধিতা করার জন্য কাটোয়ায় অগ্রসর হওয়ার ইচ্ছা করেন। নওয়াব জাফর খানের অত্যন্ত বুদ্ধিমতি ও বিচক্ষণ বেগম নিজের জীবন অপেক্ষাও সরফরাজ খানকে স্নেহ করতেন। বেগম তাঁকে (সরফরাজ খানকে) কোমল ও মধুর ভাষা দ্বারা শান্ত করেন। তাঁকে বলেন, "তোমার পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর পর সুবাদারি ও দেশের সমস্ত সম্পদ তোমারই হবে। পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইহকাল ও পরকালের পক্ষে ক্ষতিকর এবং অত্যন্ত নিন্দনীয়। পিতার জীবিত-কাল পর্যন্ত তোমার কেবল দেওয়ানী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।" সরফরাজ খান কখনো তাঁর মাতামহীর পরামর্শের বিরুদ্ধে কাজ করতেন না এবং তিনি তাঁর কথায় সম্মত হন। সরফরাজ খান অগ্রসর হয়ে শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খানকে অভ্যর্থনা ক'রে মুর্শিদাবাদ নিয়ে আসেন। দুর্গ ও নিজামতের দফতর পিতাকে অর্পণ ক'রে সরফরাজ খান নক্তাখালিস্থ নিজস্ব ভবনে বাস করতে থাকেন। সেখান থেকে প্রত্যহ তিনি পিতার নিকট উপস্থিত হতেন ও তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সময় কাটাতেন। পূর্ব প্রথানু-যায়ী নওয়াব জাফর খানের সমস্ত ক্বারী ও আলেমদের প্রার্থনা ও কুরআন আবৃত্তির জন্য সরফরাজ খান নিয়োজিত রাখেন। এতদ্ব্যতীত তিনি লোকের অন্তর জয় করা এবং আউলিয়া ও দরবেশদের দোয়া লাভের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করেন।

শুজা উদ-দীন মুহম্মদ খান[৬৬] তাঁর কালে বীরত্ব ও সাহসিকতায় অতুলনীয় ছিলেন; দানে এবং উদারতায়ও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর জন্ম হয়েছিল বুরহানপুরে।[৬৭] যেহেতু তিনি বৃদ্ধ বয়সে বাংলার নিজামতের মসনদে আরোহণ করেছিলেন, সেইহেতু বাংলার যে-সকল জমিদার নওয়াব জাফর খান কর্তৃক কারারুদ্ধ হয়েছিলেন ও যাদের জীবনে কখনো স্ত্রী-পুত্রের মুখ দর্শনের আশা ছিল না, তাদের মুক্তি দেন

এবং নওয়াব জাফর খান নির্ধারিত রাজস্বের উপর নজর আদায় ক'রে গৃহে ফিরবার অনুমতি দেন। এই কৌশলে তিনি জায়গীরের মুনাফা ও গুদাম প্রভৃতির উপর ধার্য কর ছাড়াও সহজেই এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আদায় করেন এবং জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের মহাজনী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাদশাহী তোষাখানায় প্রেরণ করেন। এতদ্ব্যতীত, নওয়াব জাফর খানের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তর্গত রোগা ঘোড়াসমূহ, পশুপাল, ক্ষয়-প্রাপ্ত গালিচা ও পর্দাসমূহ চড়া দামে বিক্রি ক'রে আরো চল্লিশ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। এই অর্থ ও হস্তীসমূহ বাদশাহ মুহম্মদ শাহের নিকট প্রেরণ করেন। হিসাব-নিকাশ তৈরী হওয়ার পর তিনি নির্ধারিত নিজামতি রাজস্ব প্রথামত বাদশাহী রাজধানীতে প্রেরণ করেন। মওসুম-মাফিক বাদশাহের নিকট হাতী, তংগন ঘোড়া, বিশেষ ধরনের সুতী-কাপড়,[৬৮] কুশখানা[৬৯] ও অন্যান্য প্রস্তুতদ্রব্যাদি প্রেরণ ক'রে বাদশাহের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করায় তাঁকে মৌতামন-উল-মুল্ক, শুজা-উদ-দৌলা—শুজা-উদ-দীন মুহম্মদ খানবাহাদুর আসাদ জং উপাধি দ্বারা ভূষিত করা হয়। তা'ছাড়া, ব্যক্তিগত সাত-হাজারী মসনব, সাত হাজার ব্যক্তিগত সৈন্য রাখার অধিকার, একটি ঝালরদার পালকি, 'মাহী' পর্যায়ের নিদর্শন, ছয়টি পোশাক, মূল্যবান প্রস্তর, মুক্তাখচিত একটি তরবারি, একটি রাজকীয় হস্তী ও অশ্ব প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত তাঁকে বাংলার নাজিম পদে পাকা করা হয়। সমারোহ ও অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরীদের অতিক্রম ক'রে যান। জীবন মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও জীবনের আনন্দ উপভোগকে তিনি উপেক্ষা করতেন না। নওয়াব জাফর খান নির্মিত সরকারী অট্টালিকাসমূহ নিজের দরাজ মতের তুলনায় ক্ষুদ্র গণ্য ক'রে তিনি সেগুলো ভেঙ্গে তৎপরিবর্তে একটি বৃহৎ জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ, একটি অস্ত্রাগার, একটি সুউচ্চ সিংহদ্বার, একটি দিওয়ানখানা,[৭০] একটি আম-দরবার,[৭১] একটি খিলওয়াতখানা,[৭২] মহিলাদের খাস-কামরা, একটি জলুসখানা,[৭৩] একটি খালিসা কাছারি[৭৪] ও একটি ফরমান বাড়ী[৭৫] তৈরী করান। তিনি মহাসমারোহে জীবন যাপন করতেন ও রাজকীয় জাঁকজমকের সাথে বাইরে বেরুতেন। তিনি সর্বদা সামরিক বাহিনীর কল্যাণ ও প্রজাদের

সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। কর্মচারীদের পুরস্কার দেয়ার সময় তিনি এক হাজার থেকে পাঁচশ' টাকার কম কাউকে দিতেন না। সুবিচারের প্রতি সদা-সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে ও আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে তিনি তাঁর রাজ্য থেকে পীড়ন ও অত্যাচার সমূলে উৎখাত করেছিলেন। নওয়াব জাফর খানের অধীনস্থ কর্মচারী নাজির আহমদ ও মুরাদ ফরাস নির্মমতার জন্য কুখ্যাত ছিল। শুজা-উদ-দীন তাদের প্রাণদণ্ড দেন এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফত করেন। নাজির আহমদ ভাগিরথী নদীর তীরে দেহ্পাড়ায় একটি মসজিদ ও উদ্যান নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভিত্তি স্থাপন করেছিল। শুজা-উদ-দীন তাদের (নাজির ও মুরাদের) প্রাণদণ্ড দিয়ে উক্ত মসজিদ ও উদ্যান নির্মাণ সম্পূর্ণ করেন ও নিজের নামে নাম রাখেন। তিনি উদ্যানে হাউজসহ কতকগুলো জাঁকালো প্রাসাদ, খাল ও অসংখ্য ফোয়ারা তৈরী ক'রে অত্যন্ত সুসজ্জিত করেছিলেন। এই জমকালো উদ্যানের তুলনায় কাশ্মীরের বসন্তকালীন কুঞ্জসমূহ ম্লান বোধ হ'ত। বরঞ্চ ইরামের[৭৬] উদ্যানও সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে এখান থেকেই প্রেরণা লাভ করতো। এই স্বর্গতুল্য উদ্যানে শুজা-উদ-দৌলা প্রায়ই প্রমোদ-ভ্রমণ, আনন্দ-ভোজন (চড়ুইভাতি) এবং আনন্দানুষ্ঠান ও ভোগ-বিলাসের জন্য সেখানে যেতেন। এই উদ্যানে প্রত্যেক বৎসর তিনি কর্মচারীদের মধ্যে বিদ্বান ব্যক্তিদের একটি রাজকীয় ভোজ দিতেন।[৭৭] কথিত হয় যে, উদ্যানের চমৎকার সৌন্দর্যের জন্য পরীরা এখানে এসে চড়ুইভাতি করতো ও ভ্রমণ করতো এবং পুকুরে গোসল করতো। প্রহরীরা এই আভাস পেয়ে শুজা-উদ-দৌলাকে সংবাদ দেয়। তখন জীনপরীদের নিকট ক্ষতির আশংকা ক'রে তিনি মাটি দিয়ে পুকুর বন্ধ ক'রে দেন ও সেখানে আনন্দ-ভোজনও বন্ধ ক'রে দেন।

আরাম-আয়েশপ্রিয় হওয়ায় নিজামতের কার্যাদি সম্পাদনের জন্য হাজী আহমদ, রায় আলমচাঁদ দেওয়ান ও জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ এই তিনজনের সমন্বয়ে একটি কাউন্সিল গঠন ক'রে তাদের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং নওয়াব নিজে ভোগবিলাসে রত হন।[৭৮-৭৮ক] যখন শুজা-উদ-দৌলা উড়িষ্যার নাজিম ছিলেন, তখন রায় আলমচাঁদ

মোখতার[৭৯] তাঁর বাড়ীর একজন মুহুরী ছিলেন। এই সময় তাঁকে স্থবে-বাংলার ডেপুটি দেওয়ান পদে নিয়োগ ক।া হয়। নিজামত ও দেওয়ানির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হওয়ার পর রায় আলমচাঁদ সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ঠ হ্রাস করেন এবং তজ্জন্য এক-হাজারীর ব্যক্তিগত মন্‌সব ও রায়-রায়নে উপাধি লাভ করেন। ইতিপূর্বে বাংলার নিজামতি অথবা দেওয়ানিতে অন্য কেউ এই উপাধি ভোগ করেন নাই। হাজী আহমদ[৮০] ও মীর্জা বন্‌দি ছিলেন মীর্জা মুহম্মদের পুত্র। মীর্জা মুহম্মদ ছিলেন বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের আযম শাহ নামক এক পুত্রের মত্তপাত্র বাহক। পিতার মৃত্যুর পর হাজী আহমদ সুলতান আযম শাহের পাত্র বাহক ও জহরতাদির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের বিপ্লবে আযম শাহের[৮১] পতন হওয়ার পর ভ্রাতৃদ্বয় বাদশাহী রাজধানী ত্যাগ করেন ও দক্ষিণে যান; এবং সেখান থেকে ওডিসায় (উড়িষ্যায়) গিয়ে শুজা উদ-দৌলার অধীনে চাকুরীতে প্রবেশ করেন। যখন যেমন প্রয়োজন তখন তেমন রঙ ধারণের কৌশল অবলম্বন ক'রে ভ্রাতৃদ্বয় শুজা-উদ-দৌলার স্থনজর লাভ করেন। যখন শুজা-উদ দৌলা স্থবে-বাংলার নিজামত লাভ করেন, তখন নিজামতের কার্যকলাপে হাজী আহমদ তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও পরামর্শদাতা হন। মীর্জা বন্‌দীকে মন্‌সব ও আলীবর্দী খান উপাধি দিয়ে আকবর নগর[৮২] বা রাজমহল চাক্‌লার ফৌজদার পদে নিযুক্ত করা হয়। অনুরূপভাবে হাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ রেজাকে[৮৩] মুর্শিদাবাদের 'বাজুত্‌রার' দারোগা বা তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করা হয়। হাজীর দ্বিতীয় পুত্র আগা মুহম্মদ সঈদকে রংপুরের ডেপুটি ফৌজদার পদ দেয়া হয়। হাজীর কনিষ্ঠ পুত্র মীর্জা মুহম্মদ হাশিমকে একটি মন্‌সব ও হাশেম আলী খান উপাধি দেয়া হয়। শুজা-উদ-দৌলা বু।হানপুরে থাকাকালে পীর খান বিশ্বস্তভাবে তাঁর কার্য সম্পন্ন করেছিলেন ও বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তাঁর অনুগামী ছিলেন। আহসানউল্লা খানের বদলীর পর একটি মনসব ও শুজা কুলী খান উপাধি দিয়ে হুগলী বন্দরের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়।

পার্থিব উন্নতির পথে গুণই (যোগ্যতা) কেবল
ছাড়পত্র নয়,
সময় যখন প্রসন্ন হয়, তখন ত্রুটিও গুণে পরিণত হয়।

হুগলীর নতুন ফৌজদার অন্যায় অর্থ আদায় ও উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। তাঁর অর্থগৃধ্নুতার জন্য হুগলী বন্দরের দ্রুত পতন হতে থাকে। তিনিই ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করেন। শুল্ক ও বাদশাহী শুল্ককর আদায়ের অজুহাতে তিনি বাদশাহের নিকট থেকে সৈন্যদল আনয়ন করেন এবং ইংরেজ, ডাচ ও ফরাসীদের সঙ্গে বিরোধিতা আরম্ভ ক'রে নজর ও কর আদায় করতে থাকেন। কথিত হয়, একবার ইংরেজদের জাহাজ থেকে রেশমী ও সুতীবস্ত্রের গাঁট নামিয়ে দুর্গের নীচে জমায়েত ক'রে সেগুলো তিনি বাজেয়াফত করেন। ইংরেজ সৈন্যদল কলকাতা থেকে অগ্রসর হয়ে দুর্গের সন্নিকটে উপস্থিত হয়। তখন শুজাকুলী খান তাদের মোকাবিলা করার শক্তি নেই বিবেচনা ক'রে নরম হয়ে যান এবং ইংরেজরা তাদের পণ্যদ্রব্য সেখান থেকে নিয়ে যায়। উক্ত খান তখন ইংরেজদের আক্রমণ করার জন্য নওয়াব শুজা-উদ-দৌলার নিকট সৈন্য প্রেরণের আবেদন করেন এবং কাশিমবাজার ও কলকাতায় জিনিস-পত্র সরবরাহ বন্ধ ক'রে ইংরেজদের বিপর্যস্ত ক'রে তোলেন। কাশিম-বাজারের ইংরেজ কুঠির প্রধান তখন বাধ্য হয়ে সন্ধির আবেদন করেন ও শুজা উদ-দৌলাকে তিন লক্ষ টাকা নজর দিতে স্বীকার করেন। কলকাতা-কুঠির প্রধান তথাকার মহাজনদের নিকট থেকে উক্ত নজরানার অর্থ ঋণ গ্রহণ করেন ও শুজা-উদ-দৌলার নিকট পাঠান।

খানদৌরান খানের মাধ্যমে শুজা-উদ-দৌলার উত্তম কার্যকলাপের সংবাদ বাদশাহের নজরে আসায় তিনি এর পুরস্কারস্বরূপ রওশন-উদ-দৌলা তুরাব্বাজ খানের ভ্রাতা ফখর-উদ দৌলার[৮৪] বদলীর পর বিহার সুবার দায়িত্বও নওয়াব শুজা-উদ-দৌলার উপর অর্পণ করেন। মুহম্মদ আলীবর্দী খানকে দক্ষ ও কুশলী ব্যক্তি গণ্য ক'রে উক্ত নওয়াব তাঁকে বিহারের ডেপুটি গবর্নর পদে নিয়োগ করেন এবং তাঁকে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ আজিমাবাদ (পাটনা) প্রেরণ

করেন। আলীবর্দী খান সুবে-বিহারে উপস্থিত হ'য়ে দারভাঙ্গার আফগানদের প্রধান সেনাপতি আবদুল করিম খানকে[৮৫] শাসনকার্যে সংশ্লিষ্ট করেন ও একদল সুদক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করেন। প্রশাসনিক ও রাজস্বের ক্ষেত্রে আবদুল করিম খানকে কর্তৃত্ব দিয়ে আলীবর্দী তাঁকে বানজারা উপজাতির বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। বানজারা গোষ্ঠীর লোকেরা লুঠতরাজ ও নরহত্যা করতো এবং বণিক ও ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে বাদশাহী এলাকায় প্রবেশ ক'রে লুঠপাট করতো। বানজারা গোষ্ঠীকে দমন ক'রে আবদুল করিম খান বহু মালমাত্তা সংগ্রহ করেন। বানজারা গোষ্ঠীকে[৮৬] দমন করায় আলীবর্দী বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। আফগানদের সহায়তা লাভ ক'রে আলীবর্দী বিঠিয়া ও ভাওয়ারার[৮৭] বিদ্রোহী ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী রাজাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। পূর্বের নাজিমদের সৈন্যগণ কখনো তাদের এলাকায় পদক্ষেপ করে নাই, অথবা কোনো সুবাদারের নিকট তাদের গর্বোন্নত শির নত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে তারা কখনো বাদশাহী রাজস্ব অথবা কর প্রদান করে নাই। তাদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম ক'রে আলীবর্দী বিজয়ী হন। তাদের এলাকা লুণ্ঠন ও ধ্বংস ক'রে আলীবর্দী কয়েক লক্ষ টাকার মালমাত্তা পান। রাজাদের সঙ্গে কর, রাজস্ব ও বাদশাহী রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ ক'রে তিনি বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেন। সৈন্যগণও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির অংশ পেয়ে লাভবান হয়েছিল এবং এতে আলীবর্দীর শাসনব্যবস্থা দৃঢ়তর হয়। ব্যাপক লুঠতরাজের দরুন কুখ্যাত চাকওয়ার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা ক'রে আলীবর্দী তাদেরও নির্মূল করেন। ভোজপুরের[৮৮] জমিদার ও টিকারির রাজা সুন্দর সিং ও নামদার খান মুইন[৮৯] বিদ্রোহী ও দুর্দান্ত ছিলেন। গভীর অরণ্য ও পাহাড়ের মধ্যে এদের অধীনস্থ অঞ্চলগুলো থাকায় তাঁরা আনুগত্য প্রদর্শনে উপেক্ষা করতেন এবং দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন ব্যতীত কখনো বাদশাহী রাজস্ব দিতেন না। আলীবর্দী তাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করেন এবং সমস্ত রাজস্ব আদায় করেন। এইভাবে অন্য উদ্ধত বিদ্রোহীদের শাস্তি দিয়ে তিনি তাদের দমন করেন। অল্পকালের মধ্যে বিপুল সম্পদ ও বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর অধিকারী হওয়ায়

আলীবর্দীর ক্ষমতা ও মর্যাদা প্রভূত পরিমাণে বর্ধিত হয়। রাজ্যের শাসন-কার্য আবদুল করিম খানের নিয়ন্ত্রণে থাকায় সমস্ত ক্ষমতা তার হস্তগত ছিল এবং তিনি আলীবর্দী খানকে উপেক্ষা ক'রে চলতেন। সেই কারণে তার উপর আলীবর্দীর সন্দেহ হয়। মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে কৌশলে তিনি আবদুল করিমকে নিজ বাড়ীতে আনিয়ে হত্যা করেন। বাদশাহী খালি-সার দেওয়ান মুহম্মদ ইসহাক খানের[১০] মাধ্যমে আলীবর্দী বাদশাহের প্রধান উজীর কমর-উদ-দীন খানের[১১] ও বাদশাহের অন্যান্য উজীরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে শুজা-উদ-দৌলার অনুমোদন ছাড়াই বাদশাহের নিকট থেকে সরাসরি মহবত জং[১২] উপাধি লাভ করেন। হাজী আহমদ ও আলীবর্দীর উপর শুজা-উদ-দৌলার পূর্ণ বিশ্বাস থাকায় শুজা-উদ-দৌলা এজন্য কোন সন্দেহ পোষণ করেন নাই। কিন্তু তাঁর পুত্র সরফরাজ খানের মনে আশংকা হয়েছিল। এই মতদ্বৈধের জন্য পিতা ও পুত্রের মধ্যে মনো-মালিন্য দেখা দেয়। মুহম্মদ তকি খান ছিলেন শুজা-উদ-দৌলার অন্য এক স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। তকি খান উড়িষ্যার ডেপুটি নাজিম ছিলেন। তিনি অত্যন্ত বীর, সাহসী ও সৈন্যবাহিনীর প্রিয় ছিলেন। হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খান তখন সরফরাজ ও তকি খানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনো-ভাব সৃষ্টি ক'রে নিজেদের সুবিধা অর্জন করার ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন। ষড়-যন্ত্রের পরিকল্পনা যখন পাকাপাকি হয়, হাজী আহমদ তখন রায় রায়ান আলমচাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেহচাঁদের সহযোগিতা লাভ করেন এবং তৎপর এই ত্রয়ী ষড়যন্ত্রের পরিণতির অপেক্ষা করেন। সরফরাজ খানকে রাজ্যের কোনো কাজের দায়িত্ব না দেয়ার জন্য উক্ত ত্রয়ী শুজা-উদ-দৌলাকে প্রবুদ্ধ করেন। পিতা ও পুত্র এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের মনে অবিশ্বাসের বীজ রোপিত ও অংকুরিত হতে থাকে। তকি খান এই ভুল বুঝাবুঝির উৎস নির্ধারণ করার পর পিতা ও ভ্রাতার সঙ্গে স্বয়ং সাক্ষাতের জন্য উড়িষ্যা থেকে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন। শুজা-উদ-দৌলার পরামর্শদাতাগণ তখন অবস্থা বুঝে ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ঈর্ষার আগুন এমনভাবে বৃদ্ধি করতে থাকেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মুহম্মদ তকি খান সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ দুর্গের বিপরীত দিকে ভাগিরথীর অপর তীরে অগ্রসর হন

এবং এক বালুময় প্রান্তরে সৈন্য সজ্জিত করেন। তারপর, তিনি পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, কিন্তু নগর লুন্ঠন করেন নাই। সরফরাজ খানের সৈন্যদল নক্তাখালী থেকে শাহনগর পর্যন্ত যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়েছিল। মুহম্মদ তকি খানের সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষদের গোপনে ঘুষের লোভ দেখিয়ে সরফরাজ খান তাদের নিজ দলভুক্ত করেন এবং তকি খানকে বন্দী করার জন্য সংবাদ দিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। সরফরাজ আশা করেছিলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হলে তকি খানের সৈন্যাধ্যক্ষরাই তাকে বন্দী ক'রে হাজির করবে। মুহম্মদ তকি খান তৎকালে রুস্তমের[৭৩] তুল্য বীর ছিলেন এবং তিনি শত্রুর পরোয়া করতেন না। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে শান্তি আলোচনা চলতে থাকে। ব্যাপার গুরুতর দেখে নওয়াব শুজা-উদ-দৌলা এতে হস্তক্ষেপ করেন এবং উভয় ভ্রাতার মধ্যে আপোস ক'রে যুদ্ধ বন্ধ করেন। সরফরাজ খান ও বেগমদের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাবশত শুজা-উদ-দৌলা মুহম্মদ তদি খানকে কয়েকবার তিরস্কার করেন ও তাঁকে সামনে এসে অভিবাদন জানাতে নিষেধ করেন। পরিশেষে, সরফরাজ খানের মাতার অনুরোধে তিনি তকি খানকে ক্ষমা করেন ও উড়িষ্যায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর যাদুর ফলে ১১৪৭ হিজরীতে[৭৪] তাঁর মৃত্যু হয়। এর ফলে শুজা-উদ-দৌলার অন্যতম জামাতা মুরশিদ কুলী খান ওরফে মজবুর[৭৫] উড়িষ্যা সুবার ডেপুটি নাজিম পদে নিয়োজিত হন। মুরশিদ কুলী ইতিপূর্বে জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) ডেপুটি নাজিম ছিলেন। তিনি সুরাট বন্দরের এক বণিকের পুত্র ছিলেন। লেখায়, রচনায়, কবিতা রচনায় ও হস্তলিপিতে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

নওয়াব জাফর খানের সুবাদারী আমলে উপরোক্ত মুরশিদ কুলি খান[৭৬] যখন মুর্শিদাবাদে থাকতেন তখন শিরাজের আদি বাশিন্দা মীর হবিব নামক এক ব্যক্তি অনর্গল ফার্সী বলতে পারতো—যদিও সে এই ভাষা পড়ে নাই। দৈবক্রমে মীর হবিব হুগলী এসে মুঘল বণিকদের কাছে জিনিসপত্র খুচরা বিক্রি করতো। একই ধরনের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকায় ও কথোপকথনে পারদর্শী হওয়ায় মীর হবিব অল্পদিনের মধ্যেই

মুরশিদ কুলী খানের সুনজরে পড়ে ও তাঁর অধীনে চাকুরী গ্রহণ করে। নওয়াব জাফর খান যখন মুরশিদ কুলী খানকে জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) গবর্নর পদে নিযুক্ত করেন, তখন মীর হবিবও তাঁর ডেপুটি হিসেবে সঙ্গে যান। হিসাব নিকাশ পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা ক'রে ও ব্যয়সংকোচের নীতি গ্রহণ ক'রে মীর হবিব যুদ্ধ-নৌবহর, গোলন্দাজ বাহিনী ও সৈন্যবাহিনীর ব্যয় হ্রাস করেন এবং তদ্দ্বারা তিনি রাজ্যের উপকার করেন। ফলে, অল্পকালের মধ্যেই তাঁর সরকারী মর্যাদা উন্নীত হয়। জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) অঞ্চল উর্বর, লাভজনক ও ব্যবসায়ের উপযোগী দেখে তিনি শাহজাদা আজিম-উশ-শানের আমলে প্রচলিত সও-দায়ে খাস প্রথা পুনঃপ্রচলন করেন। তাছাড়া, অন্যান্য পন্থায় আদায় ক'রে তিনি নিজে ও তাঁর প্রধান উভয়েই সম্পদ সঞ্চয় করেন। বাদশাহী রাজস্ব আদায়ের অজুহাতে তিনি পরগণা জালালপুরের[১৭] জমিদার নূরউল্লাহ (ইনি উক্ত অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় জমিদার ছিলেন) ও অন্যান্য জমিদারদের তাঁর কাছারিতে উপস্থিত হতে প্রলুব্ধ করেন। কৌশলে অন্য জমিদারদের একে একে বিদায় ক'রে মীর হবিব নূরউল্লাহকে আটকে রাখেন। দ্বিপ্রহর রাত্রে তিনি তাঁকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন; পাহারা দেয়ার জন্য জনকতক আফগানকে সঙ্গে দেন। কিন্তু এরা মীর হবিবের প্ররোচণায় এক অন্ধকার সংকীর্ণ গলিতে নূরউল্লাহকে হত্যা করে। পরদিন সকালে মীর হবিব ঘোষণা করেন যে, নূরউল্লাহ পলায়ন করেছে। অতঃপর এক-দল সৈন্য তার বাড়ীতে পাঠিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের টাকাকড়ি, জহরতাদি, রেশমের বস্ত্রাদি ও নূরউল্লাহর হাবসী নারীপুরুষ দাসদাসীদের বাজেয়াফত করেন। মীর হবিব নিজে এদের দখল ক'রে আমীরানা জাঁকজমকের অধিকারী হয়।

অতঃপর পাট পসারের[১৮] জমিদার আকা সাদেকের যোগসাজশে মীর হবিব তাকে টিপরা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। আকা সাদেক কৌশল ও চাতুর্যে মীর হবিবের তুল্য ছিলেন। দৈবক্রমে টিপরার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে আকা সাদেকের সাক্ষাৎ হয়। এই ব্যক্তি তার খুল্লতাতের কবল থেকে পালিয়ে নিজের দেশ ত্যাগ ক'রে

ঘুরছিলো এবং এই সময় সে বাদশাহী এলাকায় ছিল। তাকে হাতে পেয়ে আকা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন ও তাকে জমিদারীতে পুনরায় অধিষ্ঠিত করার প্রতিশ্রুতি দেন। রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র গিরিপথ ও নদী অতিক্রম ক'রে আকাকে টিপবা রাজ্যের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। টিপরার রাজা অসতর্ক ছিলেন এবং বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর আক্রমণ সম্বন্ধেও অনবহিত ছিলেন। বাদশাহী বাহিনীর এই আকস্মিক আক্রমণে রাজা সম্পূর্ণ হতভম্ব হয়ে পাহাড়ের চূড়ার দিকে পলায়ন করেন। সহজেই টিপরা অঞ্চল মীর হবিবের অধীন হয় এবং যুদ্ধ ক'রে রাজার বাসস্থান চণ্ডিগড়[৯৯] অধিকার করেন। বিপুল মালমাত্তা লুঠ ক'রে মীর হবিব টিপরা অঞ্চল বাদশাহী এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করেন। উক্ত অঞ্চলের সুব্যবস্থা করার পর মীর হবিব[১০০] আকা সাদেককে টিপবার ফৌজদার পদে নিযুক্ত করেন এবং রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রাজপদে[১০১] অধিষ্ঠিত ক'রে মালমাত্তা, মূল্যবান দ্রব্যাদি ও বহু হস্তীসহ জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) ফিরে আসেন। মুরশিদ কুলী খান টিপরা জয়ের বিবরণী নওয়াব শুজা-উদ-দৌলার নিকট প্রেরণ করেন এবং সেইসঙ্গে উক্ত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ দ্রব্যাদি ও রেশমের বস্ত্রাদি প্রেরণ করেন। নওয়াব উক্ত অঞ্চলের (টিপরার) নাম দেন রওশনাবাদ[১০২] এবং মুরশিদ কুলিকে 'বাহাদুর' ও মীর হবিবকে 'খান' উপাধি দেন।

যখন মুরশিদ কুলী খানকে উড়িষ্যা সুবার ডেপুটি নাজিম পদে নিয়োগ করা হয়, তখন নওয়াব শুজা-উদ-দৌলার সুপারিশে বাদশাহ তাঁকে (মুরশিদ কুলীকে) 'রুস্তম জং' উপাধি দেন। পিতার বৃদ্ধ বয়স দেখে ও তাঁর মৃত্যুর পর রুস্তম জং-এর বিরোধিতার আশংকা ক'রে সরফরাজ খান[১০৩] ইয়াহিয়া খান নামে রুস্তম জং এর পুত্র ও তার স্ত্রী দুর্দানা বেগমকে জামিনস্বরূপ মুর্শিদাবাদে আটকে রাখেন। এজন্য মুরশিদ কুলী খান ক্ষুব্ধ হওয়া সত্ত্বেও গত্যন্তরবিহীন হয়ে তাঁকে এই অবস্থা নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। মুরশিদ কুলী খান সৈন্যবাহিনীসহ উড়িষ্যায় উপস্থিত হয়ে জাহাঙ্গীর নগরে যেমন, তেমনি এখানেও মীর হবিবউল্লা খানকে ডেপুটি পদে নিয়োগ করেন।[১০৪] কূটকৌশল, রাজনৈতিক বিজ্ঞতা

উদ্যম সহকারে মীর হবিব উড়িষ্যার সকল বিদ্রোহী জমিদারকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন। উড়িষ্যার শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন ক'রে মীর হবিব উক্ত সুবাকে উদ্বৃত্ত অঞ্চলে পরিণত করেন। মুহম্মদ তকি খানের আমলের গোলমালের সময় পুরুষোত্তমের রাজা[১০৫] হিন্দুদের দেবতা জগন্নাথকে ওড়িসা (উড়িষ্যা) সুবার প্রত্যন্তে চিল্‌কা হ্রদের ওপারে এক পাহাড়ের চূড়ায় অপসারিত করেছিলেন। এই প্রতিমা অপসারণের ফলে বাদশাহী রাজস্বের পরিমাণ ন'লক্ষ টাকা হ্রাস হয়ে গিয়েছিল। এই রাজস্ব তীর্থযাত্রীদের নিকট থেকে আদায় করা হত। মীর হবিব-উল্লার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ক'রে ও তৎকালীন নাজিমকে নজর দিয়ে রাজা দণ্ড দেও হিন্দুদের দেবতা জগন্নাথকে পুরুষোত্তম (পুরী) আনয়ন করেন ও তথায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। জগন্নাথের পূজার বিবরণ এই ইতিহাসে অন্যত্র বিবৃত হয়েছে।

যখন ওড়িসার (উড়িষ্যার) ডেপুটি নিজামত মুরশিদ কুলী খান রুস্তম জং-কে দেয়া হয়, তখন চাক্‌লা জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) ডেপুটি নিজামত সরফরাজ খানকে দেয়া হয়।[১০৬] সরফরাজ খান পারস্য রাজবংশোদ্ভূত গালিব আলী খানকে ডেপুটি গবর্নররূপে ঢাকায় প্রেরণ করেন। নওয়াব জাফর খানের পূর্বতন সেক্রেটারি ও নিজ গৃহশিক্ষক জস্‌মুনত রায়কে সরফরাজ খান দেওয়ান ও মন্ত্রীপদে নিয়োগ ক'রে গালিব আলী খানের সঙ্গে ঢাকায় প্রেরণ করেন। সরফরাজ খান তার ভগ্নী নফিসা বেগমের প্রতি শ্রদ্ধাবশত সৈয়দ রাজি খানের পুত্র মুরাদ আলী খানকে[১০৭] ঢাকাস্থ নৌবহরের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করেন। রাজস্ব ও আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি, খাস জমি-ব্যবস্থা, জায়গীর, নৌবহর ও গোলন্দাজ বাহিনী, হিসাব নিকাশ ও শুল্ক বিভাগীয় সমস্ত কাজের ভার মুন্‌শী জস্‌মুনত রায়ের উপর অর্পণ করা হয়। উক্ত মুন্‌শী নওয়াব জাফর খানের অধীনে শিক্ষালাভ করায় সততা, আন্তরিকতা ও বিজ্ঞতার সাথে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোনিবেশ ক'রে কেবল যে রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিলেন তাই নয়, পরন্তু প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি সওদায়ে খাস সম্পূর্ণ বাতিল ক'রে

দেন এবং মুরশিদ কুলী খানের[১০৮] আমলে মীর হবিব প্রবর্তিত পীড়নমূলক নতুন সমস্ত ব্যবস্থা বিলোপ করেন। খাদ্যশস্যের বিক্রয়মূল্য সস্তা রাখার চেষ্টা ক'রে তিনি জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) দুর্গের পশ্চিম দিকের যে দরওয়াজা নওয়াব আমীর-উল-ওমারা শায়েস্তা খান বন্ধ করেছিলেন[১০৯] তা উন্মুক্ত ক'রে দেন। সেইসময় থেকে একাল পর্যন্ত খাদ্যশস্যের মূল্য এত সস্তা আর কেউ করতে পারেন নাই। উদারতা, সমদর্শিতা ও সুবিচার দ্বারা তিনি জাহাঙ্গীর নগরকে (ঢাকাকে) ইরামের[১১০] উদ্যানের মতো উর্বর করেছিলেন এবং তজ্জন্য সরফরাজ খানের সুনাম সকল শ্রেণীর প্রজাদের মধ্যে ব্যপ্ত হয়েছিল। নফিসা বেগমের[১১১] অনুরোধে সরফরাজ খানের এক কন্যার সঙ্গে মুরাদ আলী খানের বিবাহ দিয়ে তাঁকে গালিব আলী খানের স্থানে জাহাঙ্গীর নগরের ডেপুটি গবর্নর পদে নিযুক্ত করা হয়। মুরাদ আলী খান নৌ-বিভাগের অন্যতম কেরানী রাজবল্লভকে পেশকার পদে উন্নীত করেন ও প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে আরম্ভ করেন।[১১২] মুনশী জস্থনত রায় পূর্বে প্রজাদের নিকট সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং এখন সেই সুনাম নষ্ট হওয়ার আশংকায় দেওয়ানের পদ ত্যাগ করেন। ফলে, নতুন ডেপুটি নাজিমের অত্যাচারে জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকা প্রদেশ বিরান হয়ে যায়।

হাজী আহমদের দ্বিতীয় পুত্র মীর্জা মুহম্মদ সঈদ ছিলেন সরফরাজ খানের পক্ষে চাক্‌লা ঘোড়াঘাট, রংপুর ও কুচবিহারের ফৌজদার। তার অন্যায় রাজস্ব আদায় ও অত্যাচারের ফলে রংপুরের মহলগুলো বিরান হয়ে যায় এবং অত্যাচারীতদের নিকট থেকে আদায়কৃত সম্পদের সাহায্যে তিনি একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। বাদশাহের নিকট থেকে সৈন্য সাহায্য নিয়ে তিনি কুচবিহার ও দিনাজপুরের রাজাদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযানে অগ্রসর হন। এই রাজাদের ধারণা ছিল যে, তাঁরা বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর অধিকারী ও তাদের রাজ্য বহু জঙ্গল ও নদনদী দ্বারা সুরক্ষিত। এজন্য তাঁরা নাজিমের কর্তৃত্বের তোয়াক্কা করতেন না। কূটকৌশল, বলপ্রয়োগ ও যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা মীর্জা মুহম্মদ সঈদ এই সকল অঞ্চল দখল করেন এবং রাজাদের মালমাত্তা, ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদ,

জহরত ও অন্যান্য দ্রব্যাদি দখল করেন। কারুনের ধনরত্নের মতো বিপুল সম্পদ হস্তগত হওয়ায় সঈদ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। কুচবিহার বিজয়ের পর হাজী আহমদকে খোসামোদ ক'রে নওয়াব শুজা-উদ-দৌলা ও সরফরাজ খানের সুপারিশে মীর্জা মুহম্মদ সঈদ 'খান' ও 'বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন।

তিন-সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী নওয়াব শুজা-উদ-দৌলা বর্ধমানের জমিদার বদি-উজ-জমানকে শাসন করার জন্য সরফরাজ খানকে প্রেরণ করেন। এই জমিদারের এলাকা পাহাড় ও অরণ্য-বেষ্টিত এবং তাঁর অধীনে বহু আফগান থাকায় তিনি নাজিমের বশ্যতা স্বীকার করতেন না এবং নির্ধারিত কর ব্যতীত অন্য কিছু পাঠাতেন না। জরীপ করা ও আবাদী যে সকল জমির আয় দরিদ্র ও বিদ্বানদের সাহায্যার্থে সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ করা ছিল, তন্মধ্যে ১৪ লক্ষ টাকা পরিমাণ রাজস্ব উক্ত জমিদার নাচ-গান ও ভোগবিলাসে ব্যয় করেছিলেন। জমিদার নিজে অসৎ আমোদপ্রমোদ ও বিলাসে মগ্ন থাকতেন। খুবরাকান্দি, লাকরাখোন্দা ও অন্যান্য পাহাড়ের শীর্ষে ও সংকীর্ণ গিরিপথগুলোতে শক্তিশালী প্রহরা নিযুক্ত ক'রে তিনি বাদশাহী সৈন্যদের ও গুপ্তচরদের আগমন ও নির্গমনের পথ বন্ধ করেছিলেন এবং পর্বত-বেষ্টিত গভীর অরণ্যের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকেন ও তাঁর অনুমতি ব্যতীত কেউ সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না ব'লে তিনি কল্পনা করেছিলেন। জমিদারি শাসনের ভার দিয়েছিলেন তার ভ্রাতা আযম খানকে; পুত্র আলী কুলী খানকে সেনাপতির পদ আর নওবত খানকে করেছিলেন দেওয়ান ও উজীর। বদি-উজ-জমান নিজে কোনো কাজ করতেন না; কেবল বাঁশি বাজিয়ে ও আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করতেন। সরফরাজ খান তাকে নওয়াব শুজা-উদ-দৌলার বশ্যতা স্বীকার করতে, অন্যথায় শাস্তি দেয়ার ভীতি প্রদর্শণ ক'রে পত্র প্রেরণ করেন। অতঃপর সরফরাজ খান তাঁর বিশেষ বিশ্বস্ত খাজা বসন্ত ও দ্বিতীয় বখশী মীর শরফ-উদ-দীনকে এক বৃহৎ সৈন্য-দলসহ বর্ধমানের পথে প্রেরণ করেন। তখন বদি-উজ-জমান দাম্ভিকতার নিদ্রা ভঙ্গ ক'রে আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করেন। উক্ত মীর ও খাজাকে

তাঁর পক্ষে অনুরোধ করার জন্য প্রলুব্ধ করেন এবং তাঁদের মারফতে বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার ক'রে পত্র প্রেরণ করেন। পরে তাঁদের সঙ্গে তিনি মুর্শিদাবাদ যান। মীর শরফ-উদ-দীনের মাধ্যমে তিনি প্রথমে সরফরাজ খানের সমীপে হাজিব হন এবং নওয়াব শুজা-উদ-দৌলা তাঁকে সাক্ষাতের অনুমতি দেন। নওয়াব তাঁকে ক্ষমা করেন এবং উদাতার সাথে খেলাত উপহার দেন। তিনি বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা বাদশাহী রাজস্ব প্রদান ও রাজস্ব প্রদানের সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ কবতে এবং হুকুম তামিল করতে স্বীকার করেন এবং এ ব্যাপারে বর্ধমানের জমিদার করতচাঁদকে[১১৩] জামিন দেন। অতঃপব তাঁকে বীরভূম ফিরে যেতে দেয়া হয়।

১১৫১ হিজরীর শেষ দিকে যখন নাদির শাহ[১১৪] বাদশাহী রাজধানী আক্রমণ করেন ও সামসাস-উদ-দৌলা খানদওরান যুদ্ধে[১১৫] নিহত হন, তখন নওয়াব শুজা-উদ-দৌলা অসুস্থ ও শয্যাশায়ী হওয়ায় ইয়াহিয়া খান ও দুর্দানা বেগমকে (মুরশিদ কুলী খানের পুত্র ও স্ত্রী) উড়িষ্যা যাওয়ার অনুমতি দেন এবং সরফরাজ খানকে উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করেন। হাজী আহমদ, বায় রায়ান[১১৬] ও জগৎশেঠের উপর বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সরফরাজ খানকে বারবার উপদেশ দিয়ে তিনি সরফরাজ খানকে নিজামতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন। উক্ত বৎসরের ১৩ই জিলহজ্জ তারিখে নওয়াব শুজা-উদ-দৌলা খানের মৃত্যু হয়। শুজা-উদ-দৌলা[১১৭] জীবিতকালেই নিজের দাফনের স্থান মুর্শিদাবাদের দুর্গ ও শহরের বিপরীত দিকে দেহুপাড়ায় নির্দিষ্ট করেছিলেন। সেখানে তাঁর লাশ দাফন করার পর সরফরাজ খান পিতৃত্যক্ত মসনদে আরোহণ করেন।

নওয়াব সরফরাজ খানের নিজামত

নওয়াব সরফরাজ খান বাংলার নিজামতি মসনদে আরোহণ করার পর পিতার মৃত্যুকালীন নির্দেশ অনুযায়ী তিনি রাজস্ব ও প্রশাসনিক ব্যাপারে

হাজী আহমদ, রায়-রায়ান ও জগৎশেঠকে পরামর্শদাতা (কাউন্সিলর) নিযুক্ত করেন। কিন্তু এই ব্যক্তিগণ পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করতে থাকেন এবং সরফরাজ খানের যে সকল পুরাতন কর্মচারী পদোন্নতি ও মন্‌সব প্রাপ্তির আশা করেছিলেন, তাদের উপেক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁরা তাঁর (সরফরাজ খানের) মর্যাদাহানি ও পদচ্যুতির উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। যদিও নওয়াব সরফরাজ খান ও বেগমগণ পুরাতন কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য ব্যগ্র ছিলেন, তথাপি উক্ত ত্রয়ীর বিরোধিতার জন্য ব্যর্থ হন। ত্রয়ী কাউন্সিলের সদস্যগণ গোপনে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ও পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং নাজিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অজুহাতে আলীবর্দী খানকে আজিমাবাদ (পাটনা) থেকে সসৈন্যে আহ্বান করতে ও তৎপর সরফরাজ খানের পরিবর্তে তাঁকে নিজামতের মসনদে বসাবার ষড়যন্ত্র করেন।[১১৮] এই ষড়যন্ত্র কার্যকরী করার জন্য তাঁরা দিবারাত্র আলোচনা করতে থাকেন; কিন্তু পরিকল্পনা স্থির নির্ধারিত করতে পারেন নাই। এই সময় পারস্যের রাজা নাদির শাহ[১১৯] দিল্লীর বাদশাহ মুহম্মদ শাহকে পরাজিত ক'রে মুঘল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ[১২০] নিজাম-উল-মুল্‌ক, বুরহান-উল-মুল্‌ক, কমর-উদ-দীন খান ও মুহম্মদ খান বঙ্গশ প্রমুখকে বন্দী করেন এবং শাহজাহানাবাদে (দিল্লীতে)[১২১] তাঁর পারসিক সৈন্যদলসহ প্রবেশ ক'রে বাদশাহ ও আমীরদের প্রাসাদসমূহ লুণ্ঠন করেন। ফলে সমগ্র সাম্রাজ্যের ভিত্তি কম্পিত হয়ে পড়ে।[১২২] ত্রয়ী কাউন্সিল বাংলায় নাদির শাহের নামে মুদ্রা চালু ও খোতবা[১২৩] পড়তে সরফরাজ খানকে প্ররোচিত করেন। নাদির শাহের আক্রমণের বহু পূর্বে কমর-উদ-দীন খানের[১২৪] পক্ষে মুরিদ খান মুর্শিদাবাদ এসেছিলেন। কাউন্সিলের পরামর্শে শুজা-উদ-দৌলার বাজেয়াফ্‌তি মালমাত্তা ও সুবার কর সরফরাজ খান উক্ত মুরিদ খানের মরফতে দিল্লী প্রেরণ করেন। হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খান উক্ত মুরিদ খানের সঙ্গে যোগসাজশ ক'রে তাকে নিজেদের দলভুক্ত করেন। নাদির শাহের দিল্লী ত্যাগের পর এঁরা নাদির শাহী মুদ্রা ও তাঁর নামে খোতবা প্রচলনের ও অন্যান্য

বহু রকম কাহিনী সরফরাজ খানের বিরুদ্ধে নওয়াব কমর-উদ-দীন খান ও নিজাম-উল-মুলকের কর্ণগোচর করেন। বাদশাহের উজীরদের[১২৫] কৌশলে তাঁরা (হাজী আহমদ ও আলীবর্দী) বাংলার নিজামতের সনদ প্রাপ্ত হন এবং সরফরাজ খানের প্রাণদণ্ড দেয়ার আদেশ পান।[১২৬] তাদের (কাউন্সিল সদস্যদের) এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হওয়ার পর তারা সরফরাজ খানকে বলেন যে, রাজ্যের আয় সীমাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ব্যয় অধিক এবং এই অজুহাতে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করার জন্য নওয়াবকে রাজী করান। সেইসঙ্গে বাংলা আক্রমণের উদ্দেশ্যে সৈন্য ও অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য আলীবর্দীকে গোপনে সংবাদ দেন। সরফরাজ খানের সৈন্য-বাহিনী থেকে যাদের পদচ্যুত করা হয়, হাজী আহমদ তাদের সঙ্গে সঙ্গে আজীমাবাদ (পাটনায়) আলীবর্দীর নিকট প্রেরণ করেন। এইরূপে সরফরাজ খানের সৈন্যবাহিনীর প্রায় অর্ধেক ভেঙ্গে দেয়া হয়। এইভাবে আলীবর্দীর যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয় এবং তিনি আফগান, রোহিলা ও ভালিয়াদের সৈন্যবাহিনীভুক্ত ক'রে বৃহৎ বাহিনী গঠন করেন। হাজী আহমদ নিজের ও তার পুত্রদের কয়েক লক্ষ টাকা পরিমাণ সঞ্চিত অর্থ আলীবর্দীর সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রেরণ করেন। বাদশাহের দরবারস্থ নিজস্ব রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও অন্য দূতদের মারফতে এই ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক কার্যাবলীর সংবাদ পেয়ে সরফরাজ খান চরম অবস্থায় পৌঁছাবার পূর্বেই এর প্রতিকারের জন্য বিশ্বাসঘাতকদের অপসারণের উদ্দেশ্যে আজিমাবাদের (পাটনার) ডেপুটি গবর্নরের পদে[১২৭] আলীবর্দীর স্থলে নিজ জামাতা সৈয়দ মুহম্মদ হোসেন খানকে এবং তেলিয়াগড়ি ও শকরিগলির গিরিপথদ্বয়ের সৈনাপত্যসহ আকবর নগরের (রাজমহলের) ফৌজদারি পদে হাজী আহমদের জামাতা আতা-উল্লাহ খানের স্থলে মীর শরফ-উদ-দীনকে নিয়োগের সাব্যস্ত করেন। দেওয়ানের পদে রায় রায়ানের পরিবর্তে মুনশী জস্মনত রায়কে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার পূর্বেই ত্রয়ী কাউন্সিলের সদস্য কৌশলে নিজেদের দীর্ঘকালের চাকুরী, বাদশাহী রাজস্বের বিপুল বকেয়া অনাদায়ী ও তাদের নিজেদের ক্ষতির কথা ব'লে বাৎসরিক হিসাব-

নিকাশ তৈরী ও পেশ করার জন্য তিন মাস সময় প্রার্থনা করেন।[১২৮] সরল সরফরাজ খানও তাদের এই ফাঁদে পা দিলেন ও তাদের কৌশলে প্রতারিত হলেন। আলীবর্দী খান এই স্বল্প-বিরামের সুযোগ নিয়ে মোস্তফা খান, শমশের খান, সরদার খান, ওমর খান, রহীম খান, করম খান, সিরান্দাজ খান, শেখ মাসুম, শেখ জাহাঙ্গীর খান, মুহম্মদ জুলফিকার খান, চিদন হাজারী (ভালিয়াদের বখশী), বখতাওয়ার সিং এবং সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষদের স্বদলভুক্ত করেন। সরফরাজ খানের সঙ্গে সাক্ষাতের অজুহাতে আলীবর্দী দ্রুত অগ্রসর হন এবং তেলিয়াগড়ি ও শকরিগলি গিরিপথদ্বয় অতিক্রম ক'রে বাংলায় উপস্থিত হন। হাজী আহমদের প্ররোচণায় আকবর নগরের (রাজমহলের) ফৌজদার আতাউল্লা খান আজিমাবাদ (রাজমহল) থেকে উক্ত গিরিপথদ্বয় দিয়ে পত্রবাহক, গোয়েন্দা ও দূতদের যাতায়াত সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ফলে আলীবর্দীর অগ্রগতির সংবাদ সরফরাজ খানের নিকট পৌঁছায় নাই। আলীবর্দী খানের অগ্রগামী সৈন্যদল যখন আকবর নগরে (রাজমহলে) পৌঁছায়, কেবল তখনই এই সংবাদ সরফরাজ খানের নিকট পৌঁছায়। এই সংবাদে মুর্শিদাবাদ শহর ও বাজারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হতবুদ্ধি হয়ে সরফরাজ খান তৎক্ষণাৎ হাজী আহমদকে কারারুদ্ধ করেন। যদিও রায় রায়ান বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, আলীবর্দী কেবল সরফরাজ খানের দরবারে হাজির হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন, তথাপি তাতে কোনোই ফল হয় নাই। পুরাতন কর্মচারী গওস খান ও মীর শরফুদ্দীনকে অগ্রগামী সৈনাপত্যের ভার দিয়ে এবং ইয়াসিন খান ফৌজদারের সহায়তায় দুর্গ ও নগর রক্ষার জন্য পুত্র হাফিজ উল্লাহ ওরফে মীর্জা আমানিকে নগরে রেখে নওয়াব সরফরাজ খান গজনফর হোসেন খান ও মুহম্মদ তকি খানের এক পুত্রকে (উভয়েই তাঁর জামাতা ছিলেন) ও মীর মুহম্মদ বাকির খান, মীর্জা মুহম্মদ ইরাজ খান, মীর কামিল, মীর গদাই, মীর হায়দার শাহ, মীর দিলির শাহ, বাজি সিং, রাজা গন্ধর্ব সিং, শমশের খান কোরায়শী (সিলেটের ফৌজদার), শুজা কুলি খান (হুগলী বন্দরের ফৌজদার), মীর হবিব, মুরশিদ কুলি খান ফৌজদার,

মর্দান আলী খান (মরহুম শুজা খানের বখশী) এবং বাংলার অন্যান্য সেনাপতি ও জমিদারদের সঙ্গে নিয়ে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনীসহ মুর্শিদাবাদ থেকে দু'ক্রোশ দূরে বাহমনিয়ায় শিবির স্থাপন করেন। দ্বিতীয় দিনে সবাই দেওয়ানে পৌঁছান এবং তৃতীয় দিনে খামরায় পৌঁছে সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র পরিদর্শন করেন। শুজা খানের আমলেব কর্মচারীদের সঙ্গে হাজী আহমদের যোগসাজশ থাকায় গোলার পরিবর্তে ইষ্টক ও কামানের মধ্যে আবর্জনা দেখতে পান। এই কারণে গোলন্দাজ বাহিনীব তত্ত্বাবধায়ক হাজীর ভ্রাতা শহরিয়ার খানকে অপসারিত ক'রে তাকে নিজ সৈন্যদের তত্ত্বাবধান ও প্রহরায় দিয়ে নওয়াব সরফরাজ খান পর্তুগীজ এণ্টনির পুত্র পাক্কোকে গোলন্দাজ বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করেন। মহবত জং-এর সৈন্যবাহিনী সুতী নদীর উৎস আওরঙ্গাবাদ (যেখানে শাহ মরতুজা হিন্দীর মাজার বিদ্যমান) থেকে চক্রাকারে বালকাটার প্রান্তর পর্যন্ত ঘিরে ছিল।

চতুর্থ দিনে রৌপ্যমুকুট পরিহিত রাজা (অর্থাৎ সূর্য) যখন তাঁর পূর্বদিকস্থ শিবির থেকে নির্গত হয়ে আকাশে আবির্ভূত হলেন ও ছোরার মতো রশ্মি বিকিরণ করতে আরম্ভ করলেন এবং নিষ্প্রভচন্দ্র তার হাজার হাজার সৈন্য (অর্থাৎ তারকামণ্ডলী) উক্ত বীরের সাথে মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে পর্বতের অন্তরালে লুকিয়ে গেলেন, তখন নওয়াব সরফরাজ খান জ্যোতিষীদের গণনানুযায়ী এক শুভমুহূর্তে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হলেন। এক আঘাতেই মহবত জং-এর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আতংক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং প্রায় ছত্রভঙ্গ হওয়ার উপক্রম হয়। সেইসময় রায় রায়ান[১২৯] হাওয়া উল্টো বইছে দেখে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে নওয়াব সরফরাজ খানের নিকট নিবেদন করেন যে, এই গ্রীষ্মের দুপুরে যদি যুদ্ধ চালানো হয় তা'হলে সৈন্য ও অশ্ব উভয়ই অতিরিক্ত গরম ও পিপাসায় মরতে থাকবে এবং সেই কারণে তখনকার মতো যুদ্ধ বন্ধ ক'রে পরদিন সকালে আবার যুদ্ধ আরম্ভ ক'রে শত্রুকে ধ্বংস করা সুবিধা হবে—

আপনার শত্রু শক্তি পাবে কোথায়
আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য?
আপনার সৌভাগ্যবশত
আপনার পদতলে শত্রুর মস্তক পিষ্ট হবে।

যদিও জ্যোতিষিগণ এই সময়টিকে যুদ্ধের জন্য শুভ বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন ও তাদের যুক্তি দ্বারা বিজয়ের নিশ্চিত সম্ভাবনা প্রকাশ করেন এবং যদিও সেনাপতিগণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাগিদ দিতে থাকেন, তথাপি সরফরাজ খান অটল থেকে ভীতি প্রদর্শনপূর্বক সেদিন আর যুদ্ধ চালাতে নিষেধ করেন। অতঃপর সরফরাজ খান গেরিয়া নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন করেন। ইতিমধ্যে আনুগত্য প্রকাশ ক'রে মহবত জং-এর নিকট থেকে এক পত্র আসে এবং তাতে বলা হয় যে, তিনি কেবল সরফরাজ খানকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য এসেছেন। সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সরফরাজ খান উক্ত পত্র প'ড়ে পুনরায় আশ্বস্ত হন এবং সর্বপ্রকার সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা পরিহার করেন। এতদ্ব্যতীত, সমস্ত গোলমালের মূল হাজী আহমদকে মুক্ত ক'রে দিয়ে মহবত জংকে আশ্বস্ত ক'রে তাঁর নিকট আনবার জন্য পাঠান। যুদ্ধ অথবা শান্তি সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়ের জন্য সরফরাজ খান হাজীর সঙ্গে নিজ বিশ্বস্ত কর্মচারী শুজা কুলি খান ও খাজা বসন্তকে পাঠান। শেষোক্ত ব্যক্তিদের আলীবর্দীর সৈন্যসংখ্যা ও ব্যবস্থা এবং প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে তাঁর নিকট সঠিক রিপোর্ট করতে বলেন। হাজী ও তার অন্য আত্মীয়দের বন্দী করায় মহবত জং অত্যন্ত বিব্রত হয়েছিলেন। এদের হত্যা করা হবে বলে তাঁর আশংকা ছিল এবং এই কারণে আক্রমণ করতে তিনি ইতস্তত করছিলেন। হাজীর মুক্তিকে বিজয়ের শুভচিহ্ন মনে ক'রে আলীবর্দী একটি ক্ষুদ্র বাক্সে একটি ইষ্টক রেখে বলেন যে, এর মধ্যে কুরআন আছে এবং সেটি হাতে নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে, পরদিন সকালে তিনি জোড়হস্তে নওয়াব সরফরাজ খানের সামনে উপস্থিত হয়ে অপকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। এইসঙ্গে তিনি দু'শ' স্বর্ণমুদ্রা খাজা বসন্তকে উপহার দেন। নির্বোধ শুজা কুলি খান ও খাজা বসন্ত ঘাসের নীচে পানির পরিমাণ নির্ণয়

না করেই আনন্দে ডগমগ হ'য়ে ফিরে আসেন এবং আলীবর্দী খানের আনুগত্যপূর্ণ মেজাজের কথা নওয়াব সরফরাজ খানের নিকট বর্ণনা ক'রে তাঁর ক্রোধ নিরসন করেন। অতঃপর নওয়াব সরফরাজ খান ভোজের জন্য সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুতের আদেশ দিয়ে স্বচ্ছন্দচিত্তে বসে থাকেন ও নিদ্রাভিভূত হন (যে নিদ্রা মৃত্যুর তুল্য)। তাঁর সৈন্যরাও মদ্যপান ক'রে অসতর্ক হয়ে যায়।

হ্যাঁ। শত্রুর মিষ্টি কথার উপর নির্ভর করা বোকামি;
প্রতারণার বন্যা প্রাচীরের তলদেশ ক্ষয় করে।

সরফরাজ খানের দূতগণের প্রত্যাগমনের পর আলীবর্দী খান তাঁব সৈন্যাধ্যক্ষদের দু'মাসের অতিরিক্ত বেতন ও লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বিতরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের হস্তগত করেন। এইরূপে তিনি তাদের যুদ্ধ করার জন্য প্ররোচিত কবেন ও তাদের গোলা, বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র দেন। সরফরাজ খানের সেনাপতিগণের সঙ্গে আগে থেকেই আলীবর্দীর যোগসাজশ ছিল এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও রাজহত্যার জন্য প্রস্তুত ছিল। সরফরাজ খানের অগ্রগামী সৈন্যদলের সেনাপতিদ্বয় মুহম্মদ গওস খান ও মীর শরফ-উদ-দীন ব্যতিক্রম ছিলেন; এঁরা গেরিয়া নদীর অগভীর স্থানে অবস্থান করছিলেন। গোয়েন্দাদের মারফত বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে দ্বিপ্রহর রাত্রে উক্ত সেনাপতিদ্বয় সরফরাজ খানকে খড়ের গাদার নিচে আগুনের বিষয় বিব্রত করেন ও তাঁকে নিরাপত্তার জন্য তাদের (সেনাপতিদ্বয়ের) শিবিরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন এবং আরো বলেন যে, তাঁরা পরদিন সকালে তাঁর জন্য প্রাণবিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছেন। ললাটলিপি অখণ্ডনীয়; তা খণ্ডন করার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়; ভাগ্যের জট নখ দিয়ে খোলা যায় না; বিধাতার ইচ্ছায় সরফরাজ খানের কর্ণে সতর্কবাণী পৌঁছালো না। এই অনুগত ব্যক্তিদের আবেদনে তিনি কর্ণপাত করলেন না; পরন্তু তাদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলেন ও ভীতি প্রদর্শন ক'রে বললেন, "তোমরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার শুভাকাঙ্ক্ষী মহবত জং-এর সঙ্গে আমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে চাও।" সেনাপতিদ্বয় লজ্জায় অপমানে বিব্রত হয়ে নিজেদের শিবিরে

ফিরে যান। নিজেরা ও তাঁদের সৈন্যরা সশস্ত্র অবস্থায় সতর্কভাবে রাত্রি অতিবাহিত করেন; অথচ তখন সরফরাজ খান ঘুমঘোরে অচেতন ছিলেন। হাজী আহমদের প্ররোচণায় গভীর রাত্রে আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতের অজুহাতে মহবত জং এর সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যরা হাল্কা জিনিসপত্র নিয়ে একজন দু'জন ক'রে গিয়ে সরফরাজ খানের সৈন্যদের সঙ্গে মিশে তাঁর শিবির ঘেরাও করে ও আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষা করে।

শুজা খানের আমলের কর্মচারীদের উপর সরফরাজ খানের আস্থা ছিল গভীর; অথচ প্রথমাবধি এদের সঙ্গে হাজীর যোগসাজশ ছিল এব. ষড়যন্ত্রের বিষয় গোপন রেখেছিল। আর, সরফরাজের অনুগত ব্যক্তিরা তিরস্কারের ভয়ে চুপ ক'রে ছিল। রাত্রি এক ঘণ্টা থাকতে আলীবর্দী খান ও হাজী আহমদ সৈন্যদের দুই ভাগে বিভক্ত করেন। নন্দলাল জমাদারের অধীনে পতাকা, দামামা ও হাতী দিয়ে তাদের গওস খান ও মীর শরফ-উদ-দীনকে আক্রমণ করার জন্য পাঠানো হয়। অন্য অংশকে রাজশাহীর জমিদার রামকান্তের জমিদারির লোকদের পরিচালনায় তাঁরা (আলীবর্দী ও হাজী আহমদ) আফগান ও ভালিয়া সৈন্যদের নিয়ে রাত্রিকালেই সরফরাজ খানকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হন। রাত্রির অন্ধকার থাকতে থাকতে—যখন শত্রু-মিত্র নির্ণয় করা কঠিন—এমনি সময় তারা হঠাৎ মৃত্যুসম নিদ্রাভিভূত সরফরাজ খানের সৈন্যদের আক্রমণ করে ও বন্দুক ছুড়তে আরম্ভ করে। অনুগত ব্যক্তিরা সরফরাজ খানের ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাঁকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। যেহেতু নিয়তি তাঁর প্রতি বিরূপ হয়েছেন, সেইহেতু তিনি এই সময়ও তাদের কথায় কান না দিয়ে তাদের তিরস্কার করেন ও দ্রুত ভোজের আয়োজন করতে আদেশ দেন। সরফরাজ খান[১৩৩] আরও বলেছিলেন, "আলীবর্দী খান আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছে।" এমনি সময় কামানের একটি গোলা এসে পড়ে। সূর্যোদয়ের সময় দেখা গেল মহবত জং-এর সৈন্যগণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়েছে। কামান, বন্দুক, তীর বিদ্যুৎ চমকের মতো ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করেছে। প্রভাতী

নিদ্রায় আচ্ছন্ন সরফরাজ খানের সৈন্যগণ বিশৃঙ্খলভাবে উঠে কোমর বেঁধে পলায়ন শুরু করলো। আর, যারা পলায়ন করতে অথবা অস্ত্রধারণ করতে পারে নাই, তারা নিহত হল। সরফরাজ খানের সৈন্যরা ব্যাপকভাবে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

বলতে পার, যুদ্ধের ভয়ে
পৃথিবীও পালিয়ে গেলো।

কেবল সরফরাজ খানের পুরাতন কর্মচারীদের অধিকাংশ সম্মান ও আনুগত্যবোধে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতে দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। নওয়াব সরফরাজ খান ফযরের নামাজ সমাপনান্তে সশস্ত্র হয়ে এক হাতে পবিত্র কুরআন নিয়ে এক দ্রুতগামী হস্তীপৃষ্ঠে উঠলেন। অতঃপর যেখানে ঘোরতর যুদ্ধ হচ্ছিলো সেখানে পোঁছে তীর ছুড়তে আরম্ভ করেন। একদল ভালিয়া পদাতিক সৈন্যকে অগ্রগামী ক'রে মহবত জং এর সৈন্যাধ্যক্ষগণ সরফরাজ খানের সৈন্যদের আক্রমণ করলো।

যখন উভয়পক্ষের সৈন্যগণ যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে দাঁড়ালো,
বলতে পার, তখন যেন হাশরের দিন উপস্থিত হয়েছে;
কামান, বন্দুক ও হাওইয়ের গর্জনে
সমগ্র বিশ্ব যেন কাঁপছিলো।
ধনুকের ছিলার ধ্বনি ও তীরের শব্দ
ঊর্ধ্বাকাশে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।
প্রসারিত হস্তের বর্শা মৃত্যুর মতো
বুকে আঘাত ক'রে খণ্ডবিখণ্ড করছিলো।
বীরদের হাতের ইস্পাত-নির্মিত তীক্ষ্ণ তরবারি,
শত্রুর রক্ত নেয়ার জন্য উদ্যত হচ্ছিলো:
জীবন দেয়া ও নেয়ার জন্য বীরগণ উগ্র হয়ে উঠেছিল,
বল্‌তে কি, পৃথিবী বীরশূন্য হয়ে যাচ্ছিলো।

এই তরবারি-যুদ্ধে ঝড়ে বৃক্ষ-পত্রের মতো মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র আচ্ছন্ন হয়ে গেল; চারিদিকে রক্তস্রোত প্রবাহিত হলো। এই সময় শুজা

খানের আমলের বখশী মর্দান আলী খান সরফরাজ খানের প্রধান সেনাপতি হয়ে পুরোভাগের সৈন্যদল পরিচালনা করছিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ যুদ্ধ চালাতে অক্ষম হয়ে তিনি পলায়ন করলেন। তার পলায়নে সরফরাজ খানের সৈন্যগণের মনোবল ভেঙ্গে গেল এবং তা'রা বিশৃঙ্খল ভাবে পলায়ন করতে লাগলো।

প্রত্যেকে নিজেকে বাঁচাতে পারলেই সন্তুষ্ট,
কেউ অপরের জন্য উদ্বিগ্ন নয়।

জর্জীয় ও হাবসী দাসগণ ও কয়েকজন পুরাতন সহযোগী ব্যতীত সেই অসংখ্য নকল বীরদের মধ্যে কেউ সরফরাজ খানের হাতী রক্ষা করার জন্য রইলো না। মাহুত শত্রুপক্ষের জয় হয়েছে দেখে সরফরাজ খানকে বললো, "মহামান্য হুজুরের যদি অনুমতি হয় তবে আমি আপনাকে বীরভূমের জমিদার বদিউজ-জমানের ওখানে নিয়ে যেতে পারি।" সরফরাজ খান মাহুতের ঘাড়ে একটা ঘুঁষি মেরে উত্তরে বললেন, "হাতীর পা শিকল দিয়ে বাধো; এইসব কুকুরের সামনে থেকে আমি পশ্চাদ্গমন করবো না।"[১৩১] মাহুত বাধ্য হয়ে হাতী সম্মুখের দিকে চালালো। শত্রুবাহিনীর বরকন্দাজ ও ভালিয়ারা আগে থেকেই সরফরাজ খানের শিবিরের চতুর্দিক ঘিরে রেখেছিল। তারা চারদিক থেকে তার হাতী লক্ষ্য ক'রে কামানের গোলা ছুড়তে আরম্ভ করলো। তার উপর শত্রুবাহিনী অবিরাম কামানের গোলা, রকেট, তীর ও বন্দুক ছুড়ছিলো। সরফরাজ খানের বিশেষ প্রিয়পাত্র মীর গদাই একটি রকেটের আঘাতে নিহত হন। মীর মুহম্মদ বাকির ওরফে বাকির আলী খানের (শুজা-উদ-দৌলার ভ্রাতুষ্পুত্র) ভ্রাতা মীর কামিল, মীর্জা মুহম্মদ ইরাজ খান বখশির এক অবিবাহিত বালক ও অন্যান্য ব্যক্তিগত পরিচারকগণ নিহত হন। এদের মধ্যে ছিল বাহরাম, সঈদ ও অন্যান্য দাস; তারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে নাই। কামানের গোলা ও বন্দুকের গুলিতে এরা সরফরাজ খানের সামনে নিহত হয়। মীর্জা ইরাজ খানও মারাত্মকরূপে আহত হন। মীর দিলির আলী বীরত্ব সহকারে আলীবর্দী

খানের আফগান-বাহিনীকে আক্রমণ করেন এবং শক্তি ও সাহসিকতা প্রদর্শন ক'রে সঙ্গীগণসহ নিহত হন।

এই সময় সরফরাজ খানও নিজ শিবিরস্থ জনৈক বিশ্বাসঘাতকের বন্দুকের গুলিতে কপালে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হাতীর হাওদার[১৩১] উপর পড়ে যান এবং তাঁর আত্মাপাখী বেহেশ্‌তে উড়ে যায়। এই দুর্ঘটনা দেখেই মীর হবিব, মুরশিদ কুলি খান, সিলেটের ফৌজদার শমশের খান কোরায়শী ও রাজা গন্ধর্ব সিং—যারা এতক্ষণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে নীরব-দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন—তারা সকলেই পলায়ন করলেন। মীর হায়দার শাহ ও খাজা বসন্ত পরস্পরকে আঁকড়ে এক রথের[১৩২] মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন, তাঁরাও তাঁদের প্রভুর মৃতদেহের প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত না করেই পালিয়ে গেলেন।

তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে কেউ রইলো না
এক মুহূর্ত তাঁকে রক্ষা করার জন্য।

নন্দলাল জমাদার, গওস খান ও মীর শরফ-উদ-দীনের অধীনস্থ সৈন্যগণ রাত্রির অন্ধকারে ভ্রমবশত তাদেরকে মহবত জং-এর মনে ক'রে আক্রমণ করেন। রুস্তমের বীরত্বপূর্ণ সাহসিকতার সাথে আক্রমণ ক'রে তারা নন্দলালকে তরবারির আঘাতে নিহত করেন। যারা তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা পেলো তাদের ছত্রভঙ্গ ক'রে তাঁরা দ্রুত সরফরাজ খানের সন্ধানে যান। যদিও সরফরাজ তখন নিহত হয়েছেন, তথাপি এই দু'জন সাহসী সেনাপতিকে দেখে মহবত জং যুদ্ধক্ষেত্রে বেশুমার সৈন্যদের নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই দু'জন সেনাপতি তখনো সরফরাজ খানের নিহত হওয়ার সংবাদ পান নাই। সেইজন্য তাঁরা তাঁদের পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও অন্য বীর-সঙ্গীদের নিয়ে আলীবর্দী খানের সৈন্যদলকে ভীষণভাবে আক্রমণ করেন এবং আলীবর্দীর সৈন্যদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হন। এই বীরকেশরীদের আক্রমণে আলবর্দীর সৈন্যদল প্রায় ছত্রভঙ্গ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল; এমন সময় চিদন হাজারীর বন্দুক-ধারীদের একটি গুলি এসে গওস খানের বুকে লাগে ও তিনি মারাত্মকরূপে আহত হন। গওস খানের দুই পুত্র কুতব ও বাবর সাহসে ব্যাঘ্রের

মতো ছিলেন; তাঁরা শিকারের সময় তরবারির আঘাতে সিংহ হত্যা করতেন। তাঁরা তাঁদের তরবারি নিষ্কোষিত ক'রে বহুসংখ্যক আফগান ও ভালিয়াদের[১৩৪] হত্যা করেন।

যাকে তারা আক্রমণ করেছেন তাকেই শেষ করেছেন
যার মস্তকে আঘাত করেছেন সে-ই লুটিয়ে পড়েছে।
যাকে তাঁরা তাঁদের দীর্ঘ ছোরা দ্বারা আঘাত করেছেন,
তারই মস্তক কাঁধ থেকে লুটিয়ে পড়েছে।

চিদন হাজারীও তাঁদের হাতে তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত হয়। প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে বহু সৈন্য হত্যা ক'রে কুতব ও বাবর বীরের মতো নিহত হন এবং অনন্তের পথে যাওয়ার জন্য পিতার সঙ্গে মিলিত হন। মীর শরফ-উদ-দীন কয়েকজন সাহসী অশ্বারোহীসহ সোজা মহবত জং-এর সামনে গিয়ে ক্ষিপ্রতার সাথে তাঁর বক্ষ লক্ষ্য ক'রে তীর ছোড়েন। কিন্তু তীরটি মহবত জং এর ধনুকে লেগে তীর্যকভাবে তাঁর পাঁজরে বিদ্ধ হয়। শরফ উদ-দীন আর একটি তীর নিক্ষেপের উদ্যোগ করতে তাঁর বন্ধু ও মহবত জং-এর সেনাপতিদ্বয় শেখ জাহান ইয়ার ও মুহম্মদ জুলফিকার তাঁকে বলেন, "নওয়াব সরফরাজ খান নিহত হয়েছেন। এখন যুদ্ধ চালিয়ে জীবন দিয়ে লাভ কি?" মীর বীরত্বজনক উত্তর দিলেন, "এতক্ষণ আমি যুদ্ধ করছিলাম নিমক-হালালির জন্য; আর এখন যুদ্ধ করছি আমার সম্মান রক্ষার জন্য।"[১৩৫] উক্ত সেনাপতিদ্বয় তাঁকে তাঁর সম্মানের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পিছিয়ে নিয়ে যান। তখন মীর সঙ্গীদের নিয়ে বীরভূম যাত্রা করেন। গোলন্দাজরা পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও পাঞ্চো ফিরিঙ্গি[১৩৬] অবিরাম তার কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করছিলো। মীর শরফ-উদ-দীনের পশ্চাদ্গমনের পর বহুসংখ্যক আফগান পাঞ্চোকে আক্রমণ ক'রে হত্যা করে। বাজী সিং নামক জনৈক রাজপুত সেনাপতি এতক্ষণ খাম্‌রা নামক স্থানে পশ্চাদভাগ রক্ষা করছিলেন। প্রভুর পতন সংবাদ পেয়ে তাঁর মর্যাদাবোধ জাগ্রত হল। তিনি একাই সবেগে অশ্বচালনা ক'রে শত্রুসৈন্য ভেদ ক'রে মহবত জং যেখানে ছিলেন সেখানে পৌঁছালেন। বাজী সিং তাঁর তীক্ষ্ণ বর্শার এক আঘাতে মহবত জংকে

হাতী থেকে নিচে ফেলে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু, মহবত জং তাঁর বীরত্ব ও ক্ষিপ্রতা দেখে গোলন্দাজ বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক দস্তুর কুলি খানকে বাজী সিংকে প্রতিরোধ করতে আদেশ দেন। দস্তুর কুলি খানের বন্দুকের গুলিতে বুকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বাজী সিং মারাত্মকরূপে আহত হয়ে পড়ে যান।[১৩৭] বাজী সিং-এর নয় বৎসর বয়স্ক পুত্র জালিম সিং রাজপুত জাতির স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যের সাথে তরবারি নিষ্কোষিত ক'রে তাঁর পিতার দেহ পাহারা দেয়ার জন্য দাঁড়ান। সৈন্যরা তাঁকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। নওয়াব মহবত জং বালকের সাহস দেখে তাঁকে হত্যা করতে নিষেধ করেন ও তাঁর প্রশংসা করেন। তাঁর পিতার মৃতদেহ অপসারণেও বাধা দিতে বারণ করেন। গোলন্দাজরা বাজী সিং-এর মৃতদেহ অপসারণে সাহায্য করে ও জালিম সিংকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যায়। যুদ্ধের মধ্যে গওস খান, মীর শরফ-উদ-দীন, বাজী সিং ও পাঙ্কো ফিরিঙ্গি, সরফরাজ খানেব দুই জামাতা গজনফর হোসেন ও হাসান মুহম্মদ, অন্য মনসবদারগণ ও পরাজিত সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে একদিনের মধ্যে মুর্শিদাবাদ পৌঁছান। রায় রায়ান আলমচাঁদ তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধস্বরূপ কপালে তীরের আঘাত পেয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে অর্ধমৃত অবস্থায় নিজ বাড়ীতে পৌঁছান। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অনুতপ্ত হয়ে তিনি হীরকচূর্ণ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।[১৩৮] সরফরাজ খান যখন নিহত হয়ে হাতীর হাওদার উপর পড়ে যান, তখন মাহুত দ্রুতবেগে হাতী চালিয়ে তাঁর লাশ মুর্শিদাবাদ নিয়ে যায়। মুর্শিদাবাদের ফৌজদার ইয়াসিন খান ও সরফরাজ খানের পুত্র হাফিজুল্লাহ খানকে নগর, দুর্গ ও পরিবারবর্গকে রক্ষার জন্য রেখে যাওয়া হয়েছিল। তাঁরা রাত্রি দ্বিপ্রহরে নওয়াব সরফরাজ খানের লাশ নক্তাখালিতে দাফন করেন। হাফিজুল্লাহ ও গজনফর হোসেন দ্রুত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু তাঁরা পরাজিত সৈন্যদের নিকট উৎসাহ না পেয়ে যুদ্ধের পরিকল্পনা ত্যাগ করেন ও আলীবর্দী খানের বশ্যতা স্বীকার করেন। সরকারের এই বিপ্লবের দরুন নগরে, সৈন্যবাহিনীতে ও বাংলার জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক

আলোড়ন সৃষ্টি হয়। প্রথমে হাজী আহমদ[১৩৯] মুর্শিদাবাদ প্রবেশ করেন এবং আলীবর্দী খানের পক্ষ থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা ঘোষণা করেন। হাজীর আদেশ অনুযায়ী ইয়াসিন খান ফৌজদার সরফরাজ খানের খাজাঞ্চিখানা ও পরিবারবর্গ, কর্মচারী ও চাকরবৃন্দ এবং অন্তঃপুর থেকে যাতে কেউ পালাতে না পারে সেইজন্য পাহারা বসান। ঘেরিয়ার এই যুদ্ধ হয়েছিল ১১৫৩ হিজরীতে।[১৪০]

নওয়াব আলীবর্দী খান মহবত জং-এর নিজামত

যুদ্ধে জয়ী হওয়ার পর আলীবর্দী খান মহবত জং-এর আফগান ও ভালিয়া সৈন্যরা[১] তিন দিন যাবত মুর্শিদাবাদ নগরী ও সরফরাজ খানের সম্পদ লুঠপাট করে। এই লুণ্ঠন যাতে স্বচক্ষে না দেখতে হয় সেইজন্য তিনি নগরে প্রবেশ করেন নাই। নগরের বাইরে গোবরা নদীর তীরে শিবির সন্নিবেশ ক'রে তিনি অবস্থান করছিলেন। চতুর্থ দিনে সম্পূর্ণ নিরাপদ বোধ হওয়ায় তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন ও বাংলার নিজামতের মসনদে বসেন। পূর্বের নাজিমগণ বহু আত্মকৃচ্ছ্রতার দ্বারা যে সম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন, সরফরাজ খানের সেই সম্পদ আলীবর্দী অনায়াসে বাজেয়াফ্‌ত করেন। যেহেতু নওয়াব মহবত জং-এর পর-নারীর প্রতি আসক্তি ছিল না ও এই প্রকার ভোগ-লিপ্সা তাঁর ছিল না এবং আজীবন তিনি একটি বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে অতিবাহিত করেছিলেন ও তজ্জন্য গর্ব করতেন। সেইহেতু হাজী আহমদ ও তার পুত্রগণ এবং আত্মীয়স্বজনেরা সরফরাজ খানের পনের শত সুন্দরী পোষ্য ও দাসীদের নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে নেয়। সরফরাজ খানের বিবাহিতা বেগমদের ও সান্তন-সন্ততিদের[২] জাহাঙ্গীর নগরে(ঢাকায়) নির্বাসিত করেন ও খাস তালুকের আয় থেকে তাদের ভাতা বরাদ্দ ক'রে দেন। সরফরাজ খানের ভগ্নী নফিসা বেগম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আকা বাবা কুটককে পোষ্য-পুত্ররূপে নিয়েছিলেন। নফিসা বেগম নওয়াজেশ আহমদ খানের[৩] অন্তঃপুরে গৃহশিক্ষকরূপে চাকুরী নিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রকে লালন পালন করেন। নওয়াজেশ ছিলেন হাজী আহমদের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

যখন সরফরাজ খানের পতন ও বাংলার মসনদে আলীবর্দী খানের আরোহণের সংবাদ বাদশাহ নাসির-উদ-দীন মুহম্মদ শাহের নিকট পৌঁছায় তখন তিনি অশ্রু বিসর্জন ক'রে বলেছিলেন, "নাদির শাহের জন্য আমার সমস্ত সাম্রাজ্য ওলোটপালট ও ধ্বংস হয়ে গেলো।"[৪] কিন্তু প্রতিকার কঠিন বিধায় বাদশাহ চুপ করে রইলেন। প্রধান মন্ত্রী নওয়াব কমর-উদ-দীন খানের অন্যতম সহযোগী মুরাদ খানের[৫] মাধ্যমে মহবত জং প্রধান মন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। সরফরাজ খানের বাজেয়াফ্‌তকৃত সম্পদ থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা এবং নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়াও কর হিসেবে আরো চৌদ্দ লক্ষ টাকা মহবত জং বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন; এতদ্ব্যতীত, কমর-উদ-দীন খান[৬] উজীরকে পাঠান তিন লক্ষ টাকা এবং আসফ জা নিজাম-উল-মুল্‌ক্‌কে এক লক্ষ টাকা। এইরূপে তিনি অন্যান্য বাদশাহী কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে বশীভূত করেন। সরফরাজ খানের প্রতিনিধি রাজা যুগল কিশোরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে মহবত জং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন সুবার নিজামতের সনদ প্রথা-মোতাবেক নিজ নামে লাভ করেন। অতঃপর তিনি বাংলার জমিদারদের দেয় রাজস্ব, উপহার ও করের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেন।

মুরশিদ কুলি খানকে[৭] পরাভূত ক'রে ওড়িসা (উড়িষ্যা) সুবা জয় করার জন্য মহবত জং কোমর বাঁধলেন এবং তজ্জন্য সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ক'রে স্বীয় ভগ্নীপতি মীর জাফর খান বাহাদুরকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। সরফরাজ খানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মীর জাফর মহবত জং-এর পক্ষে উত্তম কার্য করেছিলেন। মীর জাফরকে মহবত জং একটি দেহরক্ষী দল, একটি মনসব ও একটি উপাধি প্রদান ক'রে আমীরের মর্যাদা দেন। জাফর খানের জায়গীরসমূহের তত্ত্বাবধায়ক কেরানী সৎ ও বিচক্ষণ চিন রায়কে রায় রায়ান উপাধি দিয়ে মহবত জং তাকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। হাজী আহমদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহবত জং-এর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। মহবত জং তাঁকে নাসির-উল-মুল্‌ক নওয়াজেশ মুহম্মদ খান বাহাদুর সাহামত জং উপাধি দিয়ে নামে মাত্র বাংলার দেওয়ান পদে এবং চট্টগ্রাম, রওশনাবাদ (ত্রিপুরা)

ও সিলেটসহ জাহাঙ্গীর নগরের (ঢাকার) ডেপুটি নাজিমরূপে নিয়োগ করেন। হাজী আহমদের কনিষ্ঠ পুত্র হাশেম আলী খান বিবাহ করেছিলেন আমানা বেগম নাম্নী মহবত জং-এর অন্য এক কন্যাকে। মহবত জং তাকে জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান হায়বত জং উপাধি দিয়ে বিহার প্রদেশ ও আজিমাবাদের (পাটনার) ডেপুটি নাজিম পদে নিযুক্ত করেন। মর্যাদা ও আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে তিনি অন্য আত্মীয়স্বজনদেরও উন্নত করেন।[৮] কিন্তু সংখ্যাধিক্য হেতু আফগান ও ভালিয়ারা উদ্ধত ছিল এবং সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতো ও মহবত জংকে তোয়াক্কা করতো না অথবা আনুষ্ঠানিক সৌজন্য দেখাতো না। সুবিচারের নীতি ভুলে গিয়ে তারা লুঠপাট ও নারীপুরুষকে হত্যা করতো। এই প্রকার অকৃতজ্ঞ আচরণ যা বাংলার পূর্বতন স্বাধীন সুলতানদের আমলে দমিত হয়েছিল, তাই আবার মহবত জং-এর আমল থেকে দেখা দিলো।[৯]

আলীবর্দী খান মহবত জং-এর বিদ্রোহের প্রারম্ভে, নওয়াব সরফরাজ খান তাঁর ভগ্নীপতি ওড়িসার (উড়িষ্যার) গবর্নর মুরশিদ কুলি খানের নিকট সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু মুরশিদ কুলি খান পূর্বোল্লেখিত ব্যক্তিগত ঈর্ষার দরুন সাহায্য প্রেরণে বিলম্ব করেছিলেন। পরে যখন মুরশিদ কুলি খান একদল সৈন্য সরফরাজ খানের সাহায্যার্থে প্রেরণের ব্যবস্থা কবেন, সেইসময় সরফরাজ খানের পতন ও আলীবর্দী কর্তৃক সুবে-বাংলা অধিকারের সংবাদ তার নিকট পৌঁছায়। তখন মুরশিদ কুলি খান নিদ্রোত্থিত হয়ে লজ্জা ও দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়েন।

পারস্পরিক ঐক্যে সাধারণ (সকলের) কল্যাণ হয়।
অনৈক্যে সকলকে ধ্বংস করে।[১০]

অতঃপর, আলীবর্দীর ভয়ে মুরশিদ কুলি খান আত্মরক্ষার আয়োজন করতে আরম্ভ করেন এবং সৈন্যবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। সেই-সঙ্গে হাজী আহমদ খানের জামাতা মুখলিস আলী খানকে (যিনি পূর্ব থেকে মুরশিদ কুলির নিকট ছিলেন) সন্ধিচুক্তির ব্যবস্থা করার জন্য প্রেরণ করেন। হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খান তার মারফতে কূটনৈতিক কৌশলপূর্ণ পত্র প্রেরণ ক'রে মুরশিদ কুলিকে নিশ্চিন্ত করার ব্যবস্থা

করেন।[১১] মুরশিদ কুলির সেনাপতিদের মধ্যে গোপনে রাজদ্রোহিতার বীজ বপনের জন্য মুখলিস আলীকে নির্দেশ দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়। মুরশিদ কুলি খানের সামনে উপস্থিত হয়ে মুখলিস খান প্রকাশ্যে তাঁকে নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা করেন এবং গোপনে প্রলোভন দেখিয়ে মুরশিদ কুলির সৈন্যবাহিনীর মধ্যে রাজদ্রোহিতার বীজ বপন করেন। আলীবর্দী খান মহবত জংকে এ-বিষয়ে সাফল্যের বিবরণ প্রেরণ করেন। আলীবর্দী বৃহৎ সৈন্যবাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে অনতিবিলম্বে উড়িষ্যা অভিমুখে অগ্রসর হন। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর মুখলিস খান তাঁর স্ত্রী দুর্দানা বেগম ও পুত্র ইয়াহিয়া খানকে সমস্ত সম্পদসহ বরাভাটির[১২] দুর্গে রেখে এক সুদক্ষ সৈন্যদল ও প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-সরঞ্জামসহ এবং দুই জামাতাকে—মীর্জা মুহম্মদ বাকির খান (ইনি পারস্যের শাহজাদা ছিলেন)[১৩] ও আলাউদ্দীন মুহম্মদ খান—সঙ্গে নিয়ে কটক থেকে যাত্রা ক'রে বালিসর (বলেশ্বর) পর্যন্ত অগ্রসর হন। ফলওয়ারের পারঘাটে তেলিয়াগড়ির[১৪] পাহাড় থেকে জোন[১৫] নদী পর্যন্ত প্রতিরোধ-বাঁধ তৈরী ক'রে সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করেন ও শত্রুর অপেক্ষা করতে থাকেন।[১৬] দুর্ভাগ্যবশত মুরশিদ কুলি খান নিজ শিবিরস্থ বিশ্বাসঘাতক মুখলিস আলী খানের কলকৌশলের বিষয় অবগত ছিলেন না এবং সেইজন্য এই দুমুখো শয়তান সম্পর্কে কোনো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। তদ্বারা তিনি শেখ সাদীর[১৭] বচন উপেক্ষা করেছিলেন:

> "যদি আত্মীয় তোমার শত্রু হয়, বাহ্যতঃ তার সঙ্গে
> বন্ধুর মতো ব্যবহার করবে,
> কিন্তু কখনো তার বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে
> উদাসীন থেকো না।
> কারণ, তার অন্তরের মধ্যে তোমার প্রতি ঈর্ষার
> দূষিত ক্ষত রয়েছে।"

এক লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলীবর্দী খান দ্রুত অগ্রসর হয়ে মেদিনীপুর পৌঁছান। সেখানে খেলাত ও উপহার

দিয়ে জমিদারদের স্বদলভুক্ত করেন এবং বাদশাহী এলাকার সীমান্ত জলিসারে (জালাসোরে) শিবির স্থাপন করেন। সবোরিখা[১৮] নদীর তীরে রাজঘাটের পারঘাটায় মারভঞ্জের (ময়ূরভঞ্জের)[১৯] জমিদার রাজা জগরধারভঞ্জ তাঁর 'চওয়ার' ও 'খন্দাইতদের' নিয়ে একটি সৈন্যঘাঁটি স্থাপন ক'রে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। গভীর অরণ্য ও কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষাদি থাকায় রাজঘাটের পারঘাটা অতিক্রম করা কঠিন গণ্য ক'রে আলীবর্দী রাজার সাহায্য চান। কিন্তু এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী অধীনে থাকায় রাজা উদ্ধতভাবে আলীবর্দীর পক্ষ অবলম্বন করতে অথবা তাঁকে নদী পার হতে দিতে অসম্মত হন। আলীবর্দী তখন কামানের গাড়ীগুলো সম্মুখভাগে স্থাপন ক'রে রাজঘাটের পারঘাটায় কামানের গোলা ছুড়তে আরম্ভ করেন। রাজার সৈন্যরা কামানের গোলাবর্ষণের ফলে টিক্‌তে না পেরে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে যায়। আলীবর্দী খান সৈন্য ও গোলন্দাজ বাহিনীসহ নদী অতিক্রম ক'রে রামচন্দরপুরে শিবির স্থাপন করেন। এই স্থানটি মুরশিদ কুলি খানের শিবির থেকে দেড় ক্রোশ দূরে ছিল। উভয়পক্ষের দূতগণ কয়েকদিন পর্যন্ত শান্তি ও যুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনায় আনাগোনা করতে থাকে। এই অবস্থা একমাস চলে। এই সময় মুরশিদ কুলি খান ফুলওয়ারের পারঘাটা অতিক্রম করেন নাই।[২০] এই প্রকারে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী আটক থাকার দরুন অপব্যয় ও খাদ্যাভাবের সম্ভাবনা এবং বর্ষার আগমন ও মারাঠা দস্যুদের আক্রমণের আশংকায় আলীবর্দী শান্তিচুক্তি সম্পাদন ক'রে প্রত্যাগমনের কথা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু তাঁর আফগান-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মুস্তফা খান শান্তি স্থাপনে অসম্মত হয়ে বর্ষাকালে প্রতিরোধ-প্রাকার তৈরির প্রস্তাব করেন। অতঃপর সাব্যস্ত হয় যে, একজন বিশ্বাসী দূত মারফত মুরশিদ কুলি খানের নিকট একটা আপোসমূলক পত্র পাঠাতে হবে ও দূত এমনভাবে কাজ করবে যার ফলে মুরশিদ কুলি এই জওয়াব দেবেন: "আমি আপনাকে উড়িষ্যা সুবার উপর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব অথবা অধিকার দিতে সম্মত নই।" এই দলীল প্রাপ্তির পর তখনকার মতো আলীবর্দী বাংলায় ফিরে যাবেন এবং বর্ষাকাল

শেষ হওয়ার পর আবার সসৈন্যে এসে মুরশিদ কুলিকে দমন করার ব্যবস্থা করবেন। মুরশিদ কুলি খানের সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগের সেনাপতি ছিলেন মীর্জা বাকির খান। মুখলিস আলী খানের চক্রান্তের দরুন মুরশিদ কুলির সেনাপতিদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসঘাতকতার চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এই বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে আবিদ খান ও অন্য আফগান-সেনাপতিগণ মীর্জা বাকির খানকে অগ্রসর হয়ে আলীবর্দীর সৈন্যদের আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করছিলেন। কিন্তু মুরশিদ কুলি খান আত্মরক্ষামূলক পন্থা গ্রহণ করেছিলেন ও মীর্জা বাকির খানকে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আক্রমণ করা থেকে বিরত রেখেছিলেন। সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিতি বিরক্তিকর-রূপে দীর্ঘ হওয়ায় মীর্জা বাকির যৌবনসুলভ আবেগবশত বাঢ়হারের সৈয়দদের সমন্বয়ে গঠিত তাঁর দল নিয়ে ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এমতাবস্থায় মুরশিদ কুলিকেও বাধ্য হয়ে আলীবর্দীর সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধার্থে ব্যূহ রচনা করতে হয়। উভয়পক্ষ থেকে কামানের গোলা নিক্ষেপ দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং অল্পসময় পরে তা তলোয়ার ও বর্শা-যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। মীর আবদুল আজিজ বাঢ়হার তিনশত সৈয়দ-যোদ্ধাসহ পুরোভাগে নেতৃত্ব করছিলেন। বাঢ়হারের সৈয়দগণ তীরবেগে অশ্বচালনা ক'রে বিপক্ষকে আক্রমণ ক'রে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তাদের তরবারি ও বর্শার আঘাতে যাদের ভাগ্যে মৃত্যু লেখা ছিল তারা নিহত হয়। আলীবর্দীর যে সৈন্যদল সাহসে নিজেদের বন্যসিংহের মতো মনে করতো, তারা এই আক্রমণের ফলে ভেড়ার পালের মত পালিয়ে গেলো ও সম্পূর্ণ পরাজিত হল। আলীবর্দী স্বীয় বেগমসহ যে হস্তীর উপর ছিলেন সেটাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অর্ধ ফারসাখ পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হল।[২১] এই সংকট-মুহূর্তে মুখলিস খান ও আবিদ খান ওরফে ফরজন্দ আলী খান (যাদের উপর মুরশিদ কুলি খান পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছিলেন), অন্যান্য আফগান-সৈন্যাধ্যক্ষ ও মুকাররিব খান সমেত সকলে আফগান জাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দীর্ঘকাল মুরশিদ কুলির আশ্রয়ে প্রতিপালিত ও অন্যান্য উপকারের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে মুরশিদ কুলির পক্ষ ত্যাগ ক'রে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে

সরে দাঁড়ায়। এই সন্ধিক্ষণে বর্ধমানের রাজার পেশকার মানিক চাঁদ[২২] আলীবর্দী খানের সাহায্যার্থে উপযুক্ত সৈন্যদল নিয়ে উপস্থিত হয়ে যুদ্ধের অনিশ্চিত অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে ও ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে কৌশলে মুরশিদ কুলি খানকে তাঁর সন্ধি পতাকা দিতে প্ররোচিত করেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগদানের প্রতিশ্রুতি দেন। অরণ্যের যে-দিকে মীর্জা বাকির খানের সৈন্যগণ আলীবর্দী খানের পশ্চাদ্ধাবন করছিল, মানিকচাঁদ সেইদিকে গিয়ে মুরশিদ কুলির উক্ত পতাকা দেখান। যেহেতু উপরোক্ত মীর্জা তার (মানিকচাঁদের) উদ্দেশ্য জানতেন না; সেইহেতু তিনি তার অগ্রগতি রোধ করেন। মানিকচাঁদকে তখন বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হয়। মীর্জা বাকিরের সুদক্ষ সৈন্যগণ তখন যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় এরা বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ করতে থাকে এবং ভাগ্য পরিবর্তনের ফলে মীর্জা বাকিরের সৈন্যগণ পরাজিত হয়। আলীবর্দী খান এই সংবাদ পেয়ে দ্রুত তাঁর পরাজিত ও পলায়মান সৈন্যদের প্রলোভন দেখিয়ে একত্রিত করেন ও পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মীর আবদুল আজিজ ও তাঁর তিনশত সৈয়দ-বীর ঘোড়া থেকে নেমে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন এবং ভালিয়াদের বন্দুকের গুলিতে একে একে সকলে প্রাণবিসর্জন দেন। এইরূপে মুরশিদ কুলি খান পরাজিত হয়ে বালিসর (বলেশ্বর) বন্দরে পশ্চাদ্গমন করেন।[২৩] সেখানে তাঁর জন্য একটি হাল্কা নৌকা তৈরী ছিল। তিনি তাতে উঠে দক্ষিণে গিয়ে নওয়াব আসফ জাহের দরবারে উপস্থিত হন।[২৪] সৌভাগ্যক্রমে আলীবর্দী খান মহবত জং এই যুদ্ধে বিজয়ী হন। আলীবর্দী পরাজিত সৈন্যদের বলেশ্বর দুর্গ পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাবন করেন। সেখানে পৌঁছে তিনি মীর্জা খয়েরউল্লাহ বেগ, ফকিরউল্লাহ বেগ ও নূরুল্লাহ বেগকে একদল সৈন্যসহ ইয়াহিয়া খানকে[২৫] এবং মুরশিদ কুলির বেগমকে বন্দী ও তাদেব সমস্ত সম্পদ ও মালমাত্তা দখল করার জন্য প্রেরণ করেন। আলীবর্দী তাদের দ্রুত অগ্রসর হতে নির্দেশ দিয়ে নিজে অশ্বারোহণে তাদের পশ্চাদনুসরণ করেন। যখন মুরশিদ কুলি খানের দক্ষিণে চলে যাওয়ার সংবাদ কটকে পৌঁছায়, তখন পুরুষোত্তমের (পুরীর) রাজার[২৬] প্রধান সেনাপতি মুরাদ খান (যাকে

ইয়াহিয়া খান ও বেগমকে বরাহ্‌বাটি দুর্গে রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল) তৎক্ষণাৎ বেগম ও ইয়াহিয়া খানকে তাঁদের মালমাত্তা-সহ সিকাকুলের[২৭] পথে দক্ষিণে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। মণিমুক্তা, স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র হস্তী, উট ও গাড়ীর উপর চাপানো হয়েছিল। এমন সময় অকস্মাৎ আলীবর্দী খানের সৈন্যবাহিনী উপস্থিত হয়। হাতী ও উট-চালকেরা সব ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় সমস্ত মালমাত্তা উক্ত মীর্জাদের হস্তগত হয় এবং তারা মূল্যবান মণি-মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।[২৮] আলীবর্দী খানও অল্পকাল পরে পৌঁছে অবশিষ্ট মালমাত্তা ও সম্পদ দখল করেন এবং মুরশিদ কুলি খানের সমর্থকদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াফ্‌ত করেন। শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও প্রলোভন দেখিয়ে আলীবর্দী খান উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়কারী, জমিদার ও কর্মচারীদের স্বপক্ষে আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি রাজস্ব, কর, নজর ও জায়গীর বন্দোবস্ত করেন। এক মাসের মধ্যে উড়িষ্যা সুবার বন্দোবস্ত সম্পন্ন করার পর তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সঈদ আহমদ খানকে সুবার ভার দেন। সঈদ আহমদ খান পূর্বে রংপুরে ফৌজদারের কাজ করেছিলেন। আলীবর্দী খান তার জন্য বাদশাহের নিকট থেকে 'নাসির-উল-মুল্‌ক সঈদ আহমদ খান বাহাদুর সওলাত জং' উপাধির ব্যবস্থা করেন। গুজর খান নামক জনৈক রোহিলা-সেনাপতিকে তিন হাজার অশ্বারোহী ও চারহাজার পদাতিক সৈন্যসহ কটকে সঈদ আহমদ খানের সাহায্যার্থে রেখে বিজয়ী হয়ে আলীবর্দী খান বাংলায় ফিরে আসেন।

সওলাত জং বদমেজাজী ও অর্থগৃধ্নু ছিলেন। সামরিক ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে তিনি সলিম খান, দরবেশ খান, নিয়ামত খান, মীর আজীজ-উল্লাহ্‌ ও অন্য সৈন্যাধ্যক্ষদের নিয়োগ করেন এবং কটকের আয়ের স্বল্পতার অজুহাতে গুজর খানকে[২৯] মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দেন। উপরোক্ত সৈন্যাধ্যক্ষগণ তাদের পুরাতন মনিব মুরশিদ কুলি খানের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আগ্রহশীল ছিল এবং এখন সুযোগ বুঝে তারা বিদ্রোহী হয়। সওলাত জং সন্ধির শর্ত সাব্যস্ত করার জন্য তাদের নিকট গোলন্দাজ

বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক কাসেম বেগ ও কটকের ফৌজদার শেখ হেদায়েত উল্লাকে প্রেরণ করেন। উক্ত সেনাপতিগণ এইরূপ একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। দূতদ্বয়ের সঙ্গে কোনো প্রহরী নাই দেখে তারা (সেনা-পতিগণ) কাসিম বেগকে হত্যা করেন এবং হেদায়েত উল্লাহ্ আহত অবস্থায় পলায়ন করেন। নাগরিকগণ ও বিদ্রোহীরা এক সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারে সওলাত জংকে ঘিরে ফেলে এবং তাঁকে তাঁর অনুচরবৃন্দ ও আত্মীয়-স্বজনসহ বন্দী করে ও সমস্ত মালমাত্তা লুঠ করে। তৎপর মুরশিদ কুলি খানের জামাতা মীর্জা বাকির খানকে চিল্কা হ্রদের অপর পাড়স্থ সিকাকুল থেকে আহ্বান ক'রে তাঁকে উড়িষ্যার নিজামতের মসনদে বসায় এবং সৈন্য-বাহিনীসহ অগ্রসর হয়ে মেদিনীপুর ও হিজলী অধিকার করে।

কটকের সৈন্যবাহিনীর অগ্রসর হওয়ার সংবাদে বাংলায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। উপরোক্ত বিপর্যয়ের দরুন আলীবর্দী খান এক বিরাট সৈন্য-বাহিনী ও গোলন্দাজবাহিনী সংগ্রহ ক'রে সওলাত জংকে উদ্ধার ও উড়িষ্যা পুনরায় জয় করার উদ্দেশ্যে কটক অভিমুখে অগ্রসর হন। বর্ধমানের মধ্য দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হয়ে তিনি মেদিনীপুরে অপর শিবির স্থাপন করেন। মহবত জং-এর অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে কটকের সৈন্য-বাহিনী[৩০] যা হিজলী ও মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, এবার মেদিনীপুর ও জলিসারে একত্রিত হয় এবং রাজঘাট ও ফুলওয়ারের পারঘাটা পার হয়ে বলেশ্বর বন্দরে শিবির স্থাপন করে।[৩১] মীর্জা বাকিরের সৈন্যগণ পূর্বে ভালিয়াদের তীরের আঘাতে বিপর্যস্ত হয়েছিল। তারা হঠাৎ ভীত হয়ে নিজেদের সমস্ত জিনিসপত্র সিকাকুল পাঠিয়ে দিয়ে ভারমুক্ত হয়ে থাকে। মীর্জা বাকির সৈন্যদের এই অনানুগত্য ও ভীরুতার খবর পেয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছেন; অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি দক্ষিণে পশ্চাদ্গমন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। দক্ষিণে পশ্চাদ্গমনের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার সময় তিনি চাপ্‌রাঘাট[৩২] গমন করেন। চাপ্‌রাঘাট মহানদী নদীর একটি পারঘাটা। তিনি নিজে, সওলাত জং ও অন্যান্য বন্দীদের ও শিবিরসহ কাট্‌জুড়ি নদী অতিক্রম করেন। মহবত জং কটক থেকে চল্লিশ ক্রোশ দূরে কামহারিয়া[৩৩]

নদীতীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিনি মীর্জা বাকিরের পলায়নের সংবাদ পান। তৎক্ষণাৎ প্রধান সেনাপতি মীর মুহম্মদ জাফর, মুস্তফা খান, শমশের খান, সরদার খান, উমর খান, বুলন্দ খান, সিরন্দাজ খান, বালিসর খান ও অন্যান্য আফগান-সৈন্যাধ্যক্ষদের আহ্বান ক'রে পরামর্শ করেন। তাদের সম্মতি অনুযায়ী তিনি মীর্জা বাকির খানের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য মীর জাফর খানের অধীনে দ্রুত এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন। অব্যবহিত পরে অবশিষ্ট সৈন্যদল নিয়ে আলীবর্দী খান নিজেও যাত্রা করেন। যখন উপরোক্ত সেনাপতিগণ সৈন্যদলসহ কটকের পাঁচ ক্রোশের মধ্যে পোঁছায় তখন মীর্জা বাকির খান সংবাদ পেয়ে সওলাত জংকে একটি ঝালর দিয়ে ঘেরা রথে বসান এবং মুরশিদ কুলি খানের ভ্রাতা হাজী মুহম্মদ আমীনকে উম্মুক্ত ছোরা-হস্তে সেই রথে সঙ্গীরূপে বসিয়ে দেন। দু'জন সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্যকে রথের দু'পাশে দিয়ে তাদের নির্দেশ দেয়া হয় যে, যদি মহবত জং এর সৈন্যরা তাদের নাগাল পায় তা'হলে তৎক্ষণাৎ যেন সওলাত জংকে ছোরা ও বর্শার আঘাতে হত্যা করা হয় এবং তিনি যেন কোনক্রমেই পলায়ন করতে না পারেন। মীর্জা নিজে একটি ঘোড়ায় চড়ে উক্ত রথসহ কটকের লালবাগ প্রাসাদ[৩৪] ত্যাগ ক'রে মালিসর[৩৫] পোঁছান। সেইসময় পনের জন অশ্বারোহী সঙ্গীসহ বালিসর খান সেখানে পোঁছান। অশ্বারোহীদের পতাকা বনের মধ্য থেকে দেখা যাচ্ছিলো। দৈবক্রমে তখন অত্যধিক গরমের জন্য সওলাত জং ও মুহম্মদ আমীন রথের মধ্যে স্থান বিনিময় করছিলেন। বালিসর খানের অশ্বারোহীদের পতাকা দেখা মাত্রই রথের দুইপার্শ্বস্থ অশ্বারোহীদ্বয় হাজী মুহম্মদ আমীনকে সওলাত জং মনে ক'রে রথের ঘেরা পর্দার মধ্য দিয়ে বর্শার আঘাত ক'রে পালিয়ে যায়। বিধির বিধানে হাজী মুহম্মদ আমীন হাতে ও কাঁধে বর্শার আঘাতে জখম হন ও তাঁর হাত থেকে ছোরা পড়ে যায়। তিনি চীৎকার ক'রে বলেন, 'তোমরা আমাকে মেরে ফেলেছ'—বলতে বলতে হাজী[৩৬] রথের মধ্যে পড়ে যান। সওলাত জং-এর আয়ুষ্কাল তখনো শেষ না হওয়ায় তিনি অক্ষত থেকে যান। আফগান সৈন্যরা

যখন পরাজিত সৈন্যদের মালমাত্তা লুঠনে ব্যস্ত ছিল, সেইসময় মীর মুহম্মদ জাফর খান বাহাদুর ও মুহম্মদ আমীন[৩৭] খান বাহাদুর কয়েকজন লোক নিয়ে পলায়িতদের মধ্যে চারদিকে সঈদ আহমদ খান বাহাদুরের সন্ধান করছিলেন। শত্রুরা সন্ধান করছে মনে ক'রে সওলাত জং নিশ্চুপ হয়ে থাকেন। মুহম্মদ আমীন খান খুব নিকটবর্তী হওয়ায় তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে তাঁকে চিন্‌তে পেরে সওলাত জং উত্তর দেন। উপরোক্ত খান উত্তর শুনে তৎক্ষণাৎ রথের পর্দা ছিঁড়ে ও দড়ি কেটে সওলাত জংকে বাইরে নিয়ে আসেন। মীর মুহম্মদ জাফর খানও তখন সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে কোলাকুলি করেন এবং সওলাত জং এইভাবে রক্ষা পাওয়ায় তাঁরা সকলে আল্লাহ্ তা'আলার শুকুর-গুজারি করেন ও আনন্দে মগ্ন হন। যখন তাঁরা এই প্রকার কোলাকুলি ও আনন্দ করছিলেন, সেইসময় সুযোগ লাভ ক'রে হাজী মুহম্মদ আমীন ত্বরিত রথ থেকে নেমে মুহম্মদ আমীন খানের ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান। সওলাত জং-এর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করার পর যখন তাঁরা সকলে নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়তে যান, তখন মুহম্মদ আমীন খান নিজের ঘোড়া দেখতে না পেয়ে হতভম্ব হয়ে যান। রহস্য উদ্‌ঘাটনের পরে তাঁরা সকলে দুঃখিত হন।[৩৮] লুঠপাট শেষ করার পর আফগান-সৈন্যগণ মীর মুহম্মদ জাফর খানের চারদিকে সমবেত হয়। তখন সওলাত জংকে মহবত জং-এর নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা মীর্জা মুহম্মদ বাকিরের পশ্চাদ্ধাবন করেন। পলায়নের সম্ভাবনা ক্ষীণ দেখে মীর্জা বেপরোয়া হয়ে হাওই, তীর ও বন্দুক ছুড়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে যখন বর্শা ও তরবারির দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার উপক্রম হয়, সেই-সময় পুরীর রাজার[৩৯] সেনাপতি মুরাদ খান (যিনি এক বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে মীর্জা বাকিরকে সাহায্য করছিলেন) মীর্জার ঘোড়ার লাগাম ধরে ও বহু অনুরোধের পর তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। মুরাদ খান তাঁকে বনের মধ্যস্থ এক রাস্তা দিয়ে পথপ্রদর্শন ক'রে দক্ষিণ অভিমুখে নিয়ে যান। সওলাত জংকে নিরাপদে পাওয়ার জন্য আল্লার দরবারে শুকরিয়া আদায় ক'রে আলীবর্দী খান তাঁকে কটকে বিশ্রাম গ্রহণের

জন্য পাঠিয়ে দেন ; এবং নিজে কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণের পর শত্রু সম্বন্ধে উদ্বেগমুক্ত হয়ে বিজয়ীরূপে কটক প্রবেশ করেন। মীর্জা'র অনুচরবৃন্দ ও বন্ধুদের সম্পূর্ণরূপে শাস্তি দিয়ে আলীবর্দী মীর্জা'র চিহ্নিত অশ্বগুলো বাজেয়াফ্‌ত করেন।[৪০] অতঃপর শেখ মাসুম[৪১] নামক একজন দক্ষ সেনাপতিকে ওড়িসা (উড়িষ্যা) সুবার ডেপুটি নাজিম পদে নিয়োগ করেন এবং এই প্রদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার পর বাংলায় ফিরে যান।

যেহেতু ময়ূরভঞ্জের রাজা জগৎ ইসর মীর্জা বাকিরের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন ও মহবত জং-এর বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, সেইহেতু মহবত জং রাজার ঔদ্ধত্যে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সেই কারণে বলেশ্বর বন্দরে পৌঁছে তিনি রাজাকে দমন করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। রাজা তখন হরিহরপুরে আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ছিলেন। চতুর্দিকে গভীর অরণ্য এবং অসংখ্য চওয়ার[৪২] ও খান্দাইত তাঁর অধীনে থাকায় তিনি উদ্ধত হয়েছিলেন। সেই কারণে তিনি আলীবর্দীর সৈন্যবাহিনীর তোয়াক্কা করতেন না। আলীবর্দীর সৈন্যগণ রাজার রাজ্যে ব্যাপক লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয় ও লোকজনকে হত্যা করতে থাকে এবং খান্দাইত ও 'চওয়ারদের' স্ত্রীলোক ও সন্তানদের বন্দী ক'রে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। আলীবর্দীর সৈন্যবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি ক'রে রাজা তাঁর মালমাত্তা, অনুচর ও পোষ্যদের নিয়ে একটি পাহাড়ের চুড়ার গুপ্ত সুরক্ষিত স্থানে পালিয়ে যান। আলীবর্দী খান ময়ূরভঞ্জ দখল করার পর নির্দয়ভাবে সমস্ত অঞ্চল ধ্বংস করেন।

মুরশিদ কুলি খানের পরাজয়ের পর তাঁর প্রধান সেনাপতি মীর হবিব[৪৩] রঘুজী ভোঁসলার নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে বাংলা জয়ের জন্য প্ররোচিত করেন। এই সময় দক্ষিণের রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুজী ভোঁসলা বেরার সুবার গবর্নর ছিলেন। মহবত জং-এর উড়িষ্যায় ব্যস্ততা ও সমগ্র বাংলা অরক্ষিত থাকার সুযোগ নিয়ে রঘুজী ভোঁসলা তাঁর প্রধান সেনাপতি দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত ও আলী কারাওয়াল নামক একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে নাগপুর থেকে ষাট হাজার মারাঠা

অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে মীর হবিবের সঙ্গে অরণ্যের মধ্যস্থ পথে বাংলা আক্রমণ ও ধ্বংস করতে প্রেরণ করেন। মারাঠা দস্যুদের আগমনের সংবাদ পেয়ে মহবত জং ময়ূরভঞ্জের রাজার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ ক'রে বাংলায় প্রত্যাগমন করেন।

আলীবর্দী খান ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল অতিক্রম করার পূর্বেই মারাঠা দস্যুগণ বর্ধমান চাকলায়[৪৪] ঝাঁপিয়ে পড়ে। মহবত জং দিবারাত্র মার্চ ক'রে বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হয়ে বর্ধমানের সংলগ্ন উজালন সরাইতে উপস্থিত হন। মারাঠা দস্যুগণ বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ ক'রে তাঁর লটবহর ও শিবির লুঠ করতে থাকে। বাংলার সৈন্যবাহিনী মারাঠা দস্যুদের যুদ্ধরীতি ও কৌশল সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল; তবে তারা মারাঠাদের বর্বরতা ও ধ্বংসমূলক কার্যের কথা শুনেছিল। সেইজন্য বাংলার সৈন্যরা পাথরের মূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এবং মারাঠারা চতুর্দিক থেকে তাদের কোণঠাসা ক'রে ফেললো। বাংলার লটবহর তো লুণ্ঠিত হলই, তদুপরি তাদের রসদ সরবরাহের পথও মারাঠারা বন্ধ ক'রে দিলো। বাংলার সৈন্য, অশ্ব, হস্তী ও উট দস্যুরা দখল ক'রে নিয়ে গেল। দস্যুদের প্রচণ্ড আক্রমণ ও অবরোধের ফলে বাংলার সৈন্যরা ক্লান্ত হয়ে বিশৃংখল অবস্থায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। মারাঠারা চারদিক থেকে আক্রমণ ক'রে লাওাহু নামক হস্তীটি হস্তগত ক'রে নিজেদের শিবিরের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই হাতীর উপর মহবত জং-এর বেগম[৪৫] ছিলেন। সেনাপতি ওমর খানের পুত্র মোসাহেব মুহম্মদ খান[৪৬] তাঁর হিন্দুস্তানী বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দস্যুদের আক্রমণ করেন এবং রুস্তমের মতো সাহস ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ ক'রে হাতী ও বেগমকে দস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু মোসাহেব খান এবং তাঁর বহুসংখ্যক সঙ্গী ও আত্মীয় এই যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে এবং সেইস্থানেই তাদের দাফন করা হয়। যখন দস্যুগণ ঔদ্ধত্য সহকারে চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে তখন মহবত জং প্রয়োজনের তাগিদে চামড়ার থলি থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে মুদ্রা ছড়িয়ে দিতে আরম্ভ করেন।[৪৭] দস্যুরা যখন মুদ্রা আহরণে ব্যস্ত, সেই সুযোগে

আলীবর্দী খান বিদ্যুদ্বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে বর্ধমানে পৌঁছান। তিনদিনের অনাহারক্লিষ্ট সৈন্যগণ বর্ধমানে এসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। মারাঠা দস্যুরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। গ্রাম শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ পুড়িয়ে, লোকজনকে হত্যা অথবা বন্দী ক'রে, শস্যভাণ্ডারে আগুন দিয়ে মারাঠা দস্যুরা ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করেছিল। বর্ধমানের শস্যভাণ্ডার শেষ হলে এবং বাইরে থেকে শস্য সরবরাহের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর অনাহারের মৃত্যু এড়াবার জন্য মানুষ কলাগাছের মূল, পশুপাল ও বৃক্ষপত্র খেতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত এসবেরও অভাব হলো। প্রাতঃরাশ ও নৈশাহারের জন্য সূর্য ও চন্দ্র গোলকদ্বয় ব্যতীত অন্য কিছু তাদের সামনে ছিল না। দিনের পর দিন অশ্বপৃষ্ঠে বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত করতে হয়েছে। পরিশেষে আফগান ও ভালিয়া সৈন্যগণ বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধ ক'রে মৃত্যুবরণ করার সংকল্প করলো। মহবত জং পরাজয়ের চিহ্ন ও সৈন্যদের পরিশ্রান্ত অবস্থা দেখে পরামর্শসভার আহ্বান করেন। সভায় সাব্যস্ত হয় যে, লটবহর মধ্যস্থলে ও চতুর্দিকে গোলন্দাজ বাহিনী রেখে দ্রুত বর্ধমান থেকে কাটোয়া পৌঁছাতে হবে। কাটোয়ায় খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাবে, অথবা অভাব হলে জলপথে অথবা স্থলপথে মুর্শিদাবাদ ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ থেকে আমদানি ক'রে সৈন্যদের কষ্টের লাঘব করা সম্ভব হবে। এই পরিকল্পনানুযায়ী মহবত জং-এর সৈন্যবাহিনী রাত্রিকালে বর্ধমান থেকে রওয়ানা হয়ে অল্পসময়ের মধ্যে কাটোয়া পৌঁছায়। হাল্কা মারাঠা অশ্বারোহীরা দিনে চল্লিশ ক্রোশ অতিক্রম ক'রে মহবত জং-এর পৌঁছাবার পূর্বেই কাটোয়া পৌঁছে মাঠ, গোলাবাড়ি ও শস্যভাণ্ডার সব পুড়িয়ে দেয়। মহবত জং-এর সৈন্যগণ এবার সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে কতকটা নিম্নোক্তরূপে আর্তনাদ ক'রে উঠলো :

আমরা দুর্দশা থেকে উদ্ধার পাই না ;
যে দেশেই যাই না কেন
আমরা শুধু দেখি আকাশ।

ইতিমধ্যে হাজী আহমদ মুর্শিদাবাদের রুটি-ওয়ালাদের একত্রিত ক'রে রুটি তৈরী করিয়ে অন্যান্য খাদ্যসামগ্রীসহ নৌকাযোগে কাটোয়া

প্রেরণ করেন। এইরূপে আরও অনেক খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য রশদ বিপুল পরিমাণে পাঠানো হয়। অবশেষে মহবত জং-এর সৈন্যগণ ও পশুপাল অনাহারের কবল থেকে রক্ষা পায়। মহবত জং-এর সৈন্যগণ মুর্শিবাদের বাশিন্দা ছিল। তাই তারা ঘরের টানে ক্রমশঃ বাড়ী চলে যেতে থাকে।

সমস্ত মালমাত্তাসহ মীর হবিবের ভ্রাতা মীর শরিফ তাঁর পরিবারবর্গ ও পোষ্যগণসহ মুর্শিদাবাদে ছিলেন। তাঁদের উদ্ধার করার জন্য মীর হবিব সাতশত মারাঠা অশ্বারোহীসহ অতর্কিতে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করতে সাব্যস্ত করেন। দিবারাত্র দ্রুত অগ্রসর হয়ে একদিন ভোর বেলা তিনি ডিহুপাড়া ও গঞ্জ মুহম্মদ খান[৪৮] পৌঁছে উক্ত স্থানদ্বয় আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। দুর্গের বিপরীত দিক থেকে ভাগীরথী পার হয়ে তিনি নিজ বাড়ীতে পৌঁছান এবং মীর শরীফ ও তাঁর সমস্ত সম্পদ, পোষ্যবর্গ ও আত্মীয় স্বজনকে নিজের সঙ্গে রাখেন। এরপর তিনি নগরের বহুসংখ্যক বাড়ী লুঠপাট করেন এবং জগৎশেঠের বাড়ী লুঠ ক'রে যতটা পেরেছিলেন স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগ্রহ করেন। এতদ্ব্যতীত সরফরাজ খানের জামাতা মুরাদ আলী খানকে,[৪৯] রাজা দুর্লভ রামকে[৫০] ও বাকুতারা সায়ের-কর বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মীর শুজা-উদ-দীনকে বন্দী ক'রে তিরথকেনোয় শিবির সন্নিবেশ করেন। এই স্থানটি নগর থেকে এক ফারসাখ দূরে অবস্থিত। হাজী আহমদ, নওয়াজেশ আহমদ খান ও হোসেন কুলি খান এই সময় নগরে ছিলেন। মারাঠা অশ্বারোহীদের দেখেই তারা দু'একবার কামানের গোলা ছুড়ে নগরে প্রবেশের সমস্ত পথ ও দুর্গের দ্বার বন্ধ ক'রে দুর্গের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে থাকেন। মহবত জংও দিবারাত্র মার্চ ক'রে পরদিন নগরে প্রবেশ করেন। তখন মারাঠারা নগর আক্রমণের মতলব পরিত্যাগপূর্বক পারিপার্শ্বিক অঞ্চলসমূহ বিধ্বস্ত ক'রে কাটোয়া প্রত্যাবর্তন করে। এই সময় বর্ষা আরম্ভ হয়। নদীর তীব্র স্রোত দেখে মারাঠারা যুদ্ধ বন্ধ করে এবং কাটোয়া থেকে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে আত্মনিয়োগ করে। মীর হবিবকে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত নিজে কাটোয়া থাকেন এবং

লুঠপাটের জন্য বিভিন্ন দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল পাঠাতে থাকেন। মহবত জংও সৈন্যদের বিশ্রাম দেয়ার জন্য নগর থেকে বাইরে বে'র হন নাই।

পূর্বে মীর হবিব হুগলীতে ছিলেন, তাই সেখানে তাঁর বহু বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি ছিল। তাদের প্রধান মীর আবুল হোসেন সারখিশ এবার অতর্কিতে হুগলী দখল করার পরিকল্পনা করেন। বহুসংখ্যক মুঘলকে নিজ দলভুক্ত ক'রে তিনি মীর হবিবের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান করতে থাকেন। হুগলীর ডেপুটি ফৌজদার মীর মুহম্মদ রেজা[৫১] মীর আবুল হোসেনকে সকল ব্যাপারে নিজের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ গণ্য করতেন।

নিজের শিবিরে (দলে) একজন বিশ্বাসঘাতকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত থেকে ডেপুটি ফৌজদার দিবারাত্র আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকতেন। অবশেষে মীর আবুল হোসেনের প্ররোচণায় শীশ রাওয়ের নেতৃত্বে দু'হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ মীর হবিব হুগলী অভিমুখে অগ্রসর হন এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হয়ে মীর আবুল হোসেনকে তাঁর উপস্থিতির সংবাদ প্রেরণ করেন। সেইসময় মুহম্মদ রেজা কয়েকজন সুন্দরী রমণীর নৃত্য উপভোগ করছিলেন। মীর আবুল হোসেন তাঁকে বলেন, "মীর হবিব একা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন ও দুর্গদ্বারে অপেক্ষা করছেন।" মদ্য পানোন্মত্ত অবস্থায় ডেপুটি ফৌজদার নির্দ্বিধায় মীর হবিবকে দুর্গে প্রবেশের জন্য দুর্গদ্বার খুলে দিতে হুকুম দেন। দুর্গে প্রবেশ করার পর মীর আবুল হোসেনের সম্মতিক্রমে মুহম্মদ রেজা ও মীর্জা পিরানকে প্রহরাধীন রাখা হয় এবং তিনি নিজে দুর্গের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে দুর্গদ্বারে নিজ প্রহরী মোতায়েন করেন। শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও অধিবাসীরা সেই রাত্রেই চুচ্‌ড়া (চিন্‌সুড়া) ও অন্যান্য স্থানে পলায়ন ক'রে ডাচ ও ফরাসীদের শরণাপন্ন হয়। পরদিন সকালে শীশ রাও তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যসহ দুর্গে প্রবেশ করেন। মুঘল অধিবাসীদের মধ্যে অনেকে মীর হবিবের পরিচিত ছিল; মীর হবিব তাদের শীশ রাওয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। উক্ত রাও তাদের সঙ্গে সৌজন্যপূর্ণ ও সম্ভ্রম সহকারে ব্যবহার করেন, তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দেন এবং মারাঠা সৈন্যদের নগর লুণ্ঠন বা অগ্নিসংযোগ থেকে বিরত করেন। তিনি

জমিদারদের রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ এবং তা যথারীতি আদায় করতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং যথারীতি কাজী, মুহ্তাসিব ও বিচারকার্য সমাধার জন্য অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ ক'রে মীর আবুল হোসেনকে ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। মীর হবিব কতকগুলো কামান, গোলাবারুদ ও হুগলী নদীস্থ ক্ষুদ্র নৌকার বহর নিয়ে কাটোয়ার ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে যোগদান করেন।

তখন বর্ষাকাল। তাই মীর হবীব একদল বন্দুকধারীকে মীর মেহ্দির নেতৃত্বে গঙ্গার অপর তীরবর্তী মহলসমূহ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু মহবত জং-এর ভয়ে মীর মেহ্দি গঙ্গার অপর তীরে অবতরণ করেন নাই। জমিদারদের প্রতিনিধিরা মীর হবীবের নিকট উপস্থিত হয়ে বিপুল অর্থ দিয়ে তাদের এলাকা মারাঠা দস্যুদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য পাহারার ব্যবস্থা করেন। ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা পারিবারিক সম্মান রক্ষার জন্য বাস্তুত্যাগ ক'রে গঙ্গার অপর তীরে চলে যান।[৫২] আকবর নগর (রাজমহল) থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল ও জালিসার (জলেশ্বর) মারাঠাদের দখলে আসে। এই নরহন্তা দস্যুগণ বহু লোকের নাক, কান ও হাত কেটে নদীতে ডুবিয়ে মারে। অন্যদের মুখে আবর্জনার থলি বেঁধে, অঙ্গহানি ক'রে অবর্ণনীয় অত্যাচারের পর তাদের পুড়িয়ে মারে। এইরূপে তারা বিরাট একটা অঞ্চলের অগণিত পরিবারের সম্মান নষ্ট করে এবং সমগ্র অঞ্চল জনশূন্য ক'রে দেয়। দুর্বিনীত শত্রুকে দমন ও বহিষ্কার করার জন্য মহবত জং সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকেন। জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) জলঙ্গী, মালদহ, আকবর নগর (রাজমহল) প্রভৃতি স্থান থেকে বহুসংখ্যক নৌকা আমদানি ক'রে মহবত জং কাটোয়া যাওয়ার পথ তৈরী করেন। ভাগীরথির পূর্বতীর থেকে পুল তৈরী করার জন্য তিনি বারো হাজার লোককে আলাদা নিযুক্ত করেন এবং সেইসঙ্গে সৈন্যদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও বিশেষভাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন। তিনি ঘোড়া, হাতী, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করেন ; সৈন্যদের উপহার ও বর্ধিত হারে বেতন দিয়ে তাদের মন জয় করেন এবং তাদের যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করেন। শত্রুকে

জমিদার, রাজস্ব আদায়কারী ও প্রশাসকদের সম্পর্কে ব্যস্ত দেখে মহবত জং তাঁর আফগান ও ভালিয়া সেনাপতিদের সঙ্গে নৈশভাগে আক্রমণের উদ্দেশ্যে এক পরামর্শসভার আহ্বান করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে তিনি এক বৃহৎ সুদক্ষ সৈন্যবাহিনীসহ অতি দ্রুত অগ্রসর হয়ে কাটোয়ার ঠিক বিপরীত দিকে রাত্রি দ্বিপ্রহরে পোঁছান। রাত্রির অন্ধকারে পূর্ব-প্রস্তুত নৌকার পুল ভাসিয়ে বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ তিনি নদী অতিক্রম করতে আরম্ভ করেন। যখন তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ ও কিছুসংখ্যক অভিজ্ঞ সৈন্যসহ নদী পাব হয়ে গিয়েছেন, তখন বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর ভারে পুলের একাংশ হঠাৎ ভেঙ্গে যায় এবং কতকগুলো নৌকা বহুসংখ্যক আফগান ও ভালিয়া সৈন্যসহ নদীতে ডুবে যায়। এই বিপর্যয়ের সংবাদে মহবত জং হতভম্ব ও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সমগ্র সৈন্য-বাহিনী নদীর পূর্ব-তীরে আর তিনি কেবল মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ পাশ্চিম তীরে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে আছেন। ফলে, যদি শত্রুরা তাঁর গতিবিধির বিন্দুমাত্র সন্ধান পায় তা'হলে তাঁকে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত মশাল নিভিয়ে দিয়ে পুলের ভগ্ন অংশগুলো মেরামত করার আদেশ দেন। পুল মেরামত হওয়ার পর সমগ্র সৈন্য-বাহিনীকে নদী অতিক্রম করার হুকুম দেন। শত্রু তখন অসতর্ক থাকায় পরিণাম শুভ হল। ডেপুটি ফৌজদার কিশওয়ার খান ও পুল প্রস্তুত-কারীদের প্রধান, মণিকান্ত দ্রুত ও অত্যন্ত তৎপরতার সাথে কর্দম, কাঠের-টুক্‌রা ইত্যাদি দিয়ে লোকমানের মতো দক্ষতার সাথে নৌকাগুলো মেরামত ক'রে দেয়। তারপর সৈন্যবাহিনী সমুদ্র-তরঙ্গের মতো নদী পার হয়ে মহবত জং ও তাঁর সেনাপতিদের সঙ্গে মিলিত হয় এবং দ্রুত তরবারি কোষমুক্ত ক'রে চীৎকার করতে করতে সুদৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারদিক থেকে চীৎকারধ্বনি উঠ্‌লো।

রাত্রি তখন অন্ধকার ছিল সত্য, কিন্তু তলোয়ারের চমক দেখা যাচ্ছিলো

যেমন ঘন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে অপরিমেয় রক্তপ্রবাহে

ধরণীর বুক লাল হয়ে গেল।
মৃতদেহের স্তূপের উপর স্তূপ হতে লাগলো,
চারদিকে কেবল মৃতদেহের স্তূপ।

অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ে অভিভূত ও প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে মীর হবিব ও ভাস্কর পণ্ডিত অন্য মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন; সৈন্যদের ফেলে গেলেন যেমন গরুকে কসাইয়ের দয়ার উপর ছেড়ে যাওয়া হয়।[৩৩] মারাঠা বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে গেল এবং কিছুদূর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হ'ল। ভাস্কর পণ্ডিত ও অন্য মারাঠা সেনাপতিগণ রামগড়ে পৌঁছে সকলে একমত হয়ে উড়িষ্যা সুবা আক্রমণ ও লুঠ করার জন্য অরণ্যপথে তৎপরতার সঙ্গে অগ্রসর হ'ল।

উড়িষ্যার ডেপুটি নাজিম শেখ মুহম্মদ মাসুম শত্রুকে প্রতিরোধের জন্য কটক থেকে অগ্রসর হয়ে তাদের অগ্রগতিতে বাধা দেন। উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হওয়া মাত্রই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জমিদারগণ ডেপুটি নাজিমের পক্ষ ত্যাগ করা সত্ত্বেও তিনি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের এক ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে নির্ভীকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অটল হয়ে রইলেন। মারাঠা সৈন্যরা সংখ্যায় ছিল বেশুমার। তারা শেখ মাসুমকে চারদিন থেকে বৃত্তাকারে ঘিরে তাঁকে ও তার সঙ্গীদের হত্যা করে। বড়বাটি ও কটক শহরের দুর্গসহ ওড়িসা (উড়িষ্যা) আবার শত্রুর কবলে পতিত হয়।

এই বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে নওয়াব মহবত জং দ্রুত বর্ধমানে অগ্রসর হন। কাটোয়ার যুদ্ধে জয়ের জন্য তিনি প্রত্যেক সৈনিককে দু'মাসের বেতন ও অন্য উপহার দেন এবং কটক অভিমুখে অগ্রসর হন। মারাঠা সৈন্যদের বার বার আক্রমণ ক'রে তিনি তাদের কটক থেকে বিতারিত ক'রে বিজয়ী হয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন। সেনাপতি আবদুর রসুল খানকে (যিনি মুস্তফা খানের তুল্য ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন) ছ'হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যসহ উড়িষ্যার ডেপুটি নাজিম পদে নিয়োগ ক'রে মহবত জং বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ভাস্কর পণ্ডিতের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে শীশ রাও হুগলী দুর্গ ত্যাগ ক'রে বিষ্ণুপুরে পশ্চাদ্গমন করেন। রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সকল মারাঠা কর্মচারী বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত হয়েছিল তারাও পালিয়ে গেল। মহবত জং-এর রাজস্ব আদায়কারী ও ফৌজদারগণ লুণ্ঠিত অঞ্চলসমূহে পুনরায় প্রবেশ ক'রে লোক বসতির ব্যবস্থা করে।

কিন্তু, পরাজিত হওয়ার পর ভাস্কর পণ্ডিত বৈরাগী দস্যুদের আকবর নগর (রাজমহল), ভাগলপুর ও বিহার অভিমুখে প্রেরণ করেন। মহবত জং তখনো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেন নাই। এই অবস্থায় তিনি আবার বাংলা থেকে ঐ অঞ্চলে রওয়ানা হন। তিনি বিহার সুবায় পৌঁছাবার পূর্বেই বৈরাগীরা উক্ত অঞ্চল ত্যাগ ক'রে মুর্শিদাবাদে অতর্কিত হামলা করে। মহবত জং বিহার থেকে ফিরে এসে এদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। বৈরাগী দস্যুরা যখন বালুচর লুণ্ঠনে ব্যস্ত ছিল, সেইসময় মহবত জং-এর বাহিনীর অগ্রগামী দলের দামামাধ্বনি এই উন্মাদদের কর্ণগোচর হয়। নিরুৎসাহ হয়ে সব মালমাত্তা ফেলে তারা বালুচর থেকে পলায়ন করে। মহবত জং রামগড় পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করার পর ফিরে আসেন।

মোটের উপর এই প্রকার গেরিলা-যুদ্ধ তিন বৎসরকাল চলতে থাকে। উভয়পক্ষই কখনো জয়ী কখনো পরাজিত হয়েছে এবং কে যে সত্যিকার জয়ী হল তা নির্ণয় করা কঠিন। 'যুদ্ধ হচ্ছে প্রতারণা' এই নীতি অনুসরণ ক'রে মহবত জং কুটকৌশলে অন্যতম মারাঠা নেতা আলী কারাওয়ালের (যিনি পূর্বে মারাঠা ছিলেন ও পরে ইসলামধর্ম অবলম্বন করায় নামকরণ হয়েছিল আলী ভাই) সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। প্রয়োজনের তাগিদে তিনি তাকে আমন্ত্রণ করেন। তার সঙ্গে নরম ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ক'রে, কপট ও কৌশলে এবং বন্ধুত্ব ও উদারতা প্রদর্শন ক'রে ভাস্কর পণ্ডিত ও অন্য মারাঠা সেনাপতিদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে তিনি আলী ভাইকে সম্মত করান। তৎকালের (প্রচলিত) কপটতার দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে উক্ত নির্বোধ ফাঁদে পা দিলো ও দিকনগর পৌঁছালো। চৌথ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য

মহবত জং-এর প্রতিশ্রুতি বর্ণনা ক'রে সে ভাস্কর পণ্ডিত ও অন্য মারাঠা সেনাপতিদের মহবত জং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী করায়। এরা 'যার দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূরই দেখতে পায়'[৫৪] এই প্রবাদবাক্য অনুযায়ী অন্ধভাবে উক্ত প্রস্তাবে রাজী হ'ল এবং রাজা জানকী রাম ও মুস্তফা খানকে ডেকে সন্ধির ভিত্তি ও মহবত জং-এর প্রতিশ্রুতির সত্যতা যাচাই করতে বলেন। এরা ভাস্কর পণ্ডিতের নিকট গিয়ে নিজ নিজ ধর্মানুযায়ী প্রতিজ্ঞা করে। মুস্তফা খানের নিকট কাপড়ের মধ্যে কুরআনের পরিবর্তে একটি ইষ্টক ছিল; সেটা হাতে ক'রে মুস্তফা খান বার বার প্রতিজ্ঞা করে। মহবত জং-এর ফাঁদে পা দিয়ে ও শান্তি স্থাপনের প্রতিশ্রুতির পুনরুক্তি ক'রে ভাস্কর পণ্ডিত ও অন্য মারাঠা সেনাপতিগণ মানকরা[৫৫] নামক স্থানে মহবত জং এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং মুস্তফা খান ও রাজা জানকী রামকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। এই ব্যক্তিগণ মহবত জং-এর নিকট গিয়ে তাদের দৌত্যের সাফল্য ও পারস্পরিক প্রতিজ্ঞার বিবরণ বিবৃত করেন। মহবত জং এতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং সাড়ম্বরে মূল্যবান খেলাত ও মণিমুক্তা, হাতী, ঘোড়া ও অন্যান্য দুর্লভ বস্তু মারাঠা সেনাপতিদের উপহার দেয়ার জন্য সংগ্রহ করতে থাকেন। প্রকাশ্যে আসন্ন শান্তি স্থাপনের বিষয় ঘোষণা করেন এবং গোপনে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য ব্যবস্থা ক'রে সেটা সফল করার জন্য নিজ সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তিনি তাঁর বাহিনী থেকে অভিজ্ঞ ও সাহসী সৈন্যদের বাছাই করেন এবং ঘোড়া ও হাতী রাখার মতো দীর্ঘ ও প্রশস্ত তাঁবু মানকরায় খাটাতে আদেশ দেন। তিনি নিজে একটি তাঁবুতে গিয়ে বন্ধু ও সঙ্গীদের একটি বৃহৎ দল জমায়েত করেন। তাঁবুগুলোর মধ্যে বাছাই করা সুসজ্জিত সৈন্যদের রেখে তিনি ভাস্কর পণ্ডিতকে ও মারাঠা সেনাপতিদের আনবার জন্য আলী ভাইকে সংবাদ দেন। মোটের উপর, ভাস্কর পণ্ডিত তাঁর সমস্ত সৈন্য শিবিরে রেখে কেবল আলী ভাই ও একুশজন মারাঠা সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে আলীবর্দীর তাঁবুতে আসেন। পূর্ব-পরিকল্পিত নির্দেশ অনুযায়ী তাঁবু খাটানেওয়ালারা পর্দা ফেলে দেয় ও শক্তভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে

শত্রুমিত্র সকলের আগমন-নির্গমনের পথ বন্ধ ক'রে দেয়। মহবত জং-এর সঙ্গীরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। ভাস্করকে দেখেই মহবত জং তাঁর সঙ্গীদের বলেন, "এই বিধর্মী পাপীদের হত্যা কর।"[৫৬] তৎক্ষণাৎ মারাঠাদের উপর তরবারি উদ্যত হল।

আক্রমণের কোলাহলে আকাশ বিদীর্ণ হল,
তরবারির আঘাতে বক্ষপঞ্জর বিদ্ধ হল।

ভাস্কর ও একুশজন মারাঠা সেনাপতিকে হত্যা করা হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে মহবত জং হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে বিজয়বাদ্য বাজাতে এবং সেরা সৈন্যদলকে মারাঠাদের তরবারি দ্বারা আক্রমণ করতে আদেশ দেন। এই অবস্থা দেখে মারাঠা সেনাপতিদের মধ্যে একজন,[৫৭] যিনি দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ শামিয়ানার বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে অপেক্ষা করছিলেন, সসৈন্যে পলায়ন করলেন। সিংহ যেমন ভেড়ার পালের উপর পড়ে, তেমনি মহবত জং-এর সৈন্যগণ মারাঠা সৈন্যদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলো এবং ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছে যেখানে যাকে পেলো, হত্যা ক'রে মৃতদেহের স্তূপ তৈরী করলো। এই বিপর্যয়ের সংবাদ পেয়ে বর্ধমান ও দিকনগর[৫৮] প্রভৃতি স্থানের মারাঠা সৈন্যরা এবং অন্যান্য স্থানে যারা প্রহরায় রত ছিল, তারা সকলেই মেদিনীপুর ও আকবর নগর (রাজমহল) হয়ে নাগপুর পালিয়ে গেল।

এই চরম বিপর্যয়ের সংবাদ যখন রঘুজী ভোঁসলার নিকট পৌঁছায় তখন তিনি

ক্রোধান্ধ হয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন,
এবং মালমাত্তা নষ্ট হওয়ার জন্য সাপের মতো কুণ্ডলী
পাকাতে লাগলেন।
অন্তরে তাঁর ক্রোধের আগুন এমনই জ্বলে উঠলো,
যেন তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত পুড়ে গেল।

বর্ষার মওসুমের পর রঘুজী ভোঁসলা[৫৯] এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ ক'রে ভাস্কর ও অন্য মারাঠা সেনাপতিদের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ব্যাপক নরহত্যা ও

লুণ্ঠন করতে থাকেন; বন্দীদের অনেককে উৎপীড়ন ক'রে হত্যা করেন। এই সন্ধিক্ষণে রাজা শাহুর পেশোয়া ও প্রধান সেনাপতি বালাজী বাজী রাও[৬০] বাদশাহ মুহম্মদ শাহের নির্দেশ অনুযায়ী ৬০,০০০ মারাঠা অশ্বারোহীসহ বাদশাহী রাজধানী (দিল্লী) থেকে বাংলা অভিমুখে আলীবর্দীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। রাজা শাহু ছিলেন যুবক ও তাঁর সঙ্গে রঘুজীর ছিল বিরোধ। দু'দিক থেকে বন্যা আসছে দেখে মহবত জং দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতা দেখান। তিনি বালাজী বাজী রাওয়ের নিকট উপহারসহ অভিজ্ঞ দূত প্রেরণ ক'রে প্রতিসৌজন্য ও আন্তরিকতা সহকারে তাঁকে নিজ দলভুক্ত করেন এবং বীরভূমে তাঁব সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং উভয়ে একযোগে রঘুজী ভোঁসলাকে বিতারণের কথা সাব্যস্ত করেন। রঘুজী উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় না দেখে নিজের দেশে ফিরে যান। উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত হওয়ার পর মহবত জং বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ দিয়ে বালাজী বাজী রাওকে বাংলা থেকে সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞতার সাথে ফেরত পাঠান এবং নিজে বাংলায় ফিরে আসেন। রঘুজী কর্তৃক চৌথ আদায় সংক্রান্ত দাবীর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে মহবত জং সৈন্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন।

এই সময় আলীবর্দী খানের সঙ্গে আফগান সেনাপতি মুস্তফা খানের বিরোধ উপস্থিত হয়। আফগান সৈন্যরা মুস্তফা খানের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় সংকট বৃদ্ধি পায়। আফগান সৈন্যরা বিদ্রোহী হয়ে আজিমাবাদ (পাটনা) দখল এবং হাজী আহমদ ও জয়েন-উদ-দীন আহমদ খানকে বন্দী করার জন্য উক্ত শহরের দিকে অগ্রসর হয়। মুঙ্গেরে পৌঁছে মুস্তফা খান মুঙ্গের দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গের অধিনায়ক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মুস্তফা খানের অন্যতম চাচাতো ভাই আবদুর রসুল খান[৬১] সাহস ও বীরত্বের মদিরায় মত্ত হয়ে দুর্গদ্বার ভেঙ্গে বলপূর্বক দুর্গে প্রবেশ করতে অগ্রসর হন। দুর্গ-প্রাকারের প্রহরীরা তাঁর উপর এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করে। ফলে, রসুল খানের মস্তক চূর্ণ হয়ে যায়। এই বিপর্যয়কে অশুভ লক্ষণ গণ্য ক'রে মুস্তফা খান অবরোধ উঠিয়ে দ্রুত আজিমাবাদের (পাটনার) দিকে অগ্রসর হন ও উক্ত শহর অবরোধ করেন এবং জয়েন-

উদ-দীন আহমদ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। জয়েন-উদ-দীন আহমদ খানের অধিকাংশ সৈন্যদল আফগানদের আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে অক্ষম হয়ে দুর্গের মধ্যে পশ্চাদ্গমন করে। কিন্তু জয়েন-উদ-দীন নিজে অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও ভালিয়া বন্দুকধারীদের একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য মুক্ত প্রান্তরে রইলেন। এই সময় আফগানরা জয়েন উদ-দীনের পলায়িত সৈন্যদের শিবির লুণ্ঠনে রত হয়। মুস্তফা খানকে স্বল্পসংখ্যক সৈন্যপরিবৃত দেখে জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান গোলন্দাজ ও ভালিয়া বন্দুকধারীদের পুরোভাগে দিয়ে আক্রমণ আরম্ভ করেন।[৬২] কামান-বন্দুকের গোলাগুলি শিলাবৃষ্টির মতো পড়তে লাগলো। মুস্তফা খানের অধিকাংশ সঙ্গী তাতে নিহত হয়। একটি গুলি মুস্তফা খানের চোখে লাগায় তাঁর একটি চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়। তখন জয়েন-উদ-দীনের অন্য সৈন্যগণ যারা দুর্গের অভ্যন্তরে পলায়ন করেছিল, তারা বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করতে থাকে ও আফগানদের হত্যা করতে থাকে। জয়ী হয়ে জয়েন-উদ দীন খান বিজয়বাদ্য বাজিয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন এবং পরে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনের ব্যবস্থা করেন। মুস্তফা খান পরাজিত হয়ে জগদীশপুর[৬৩] পশ্চাদ্গমন করেন। মুস্তফা খান এবার রঘুজী ভেঁাসলার[৬৪] নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। রঘুজী এই প্রকার সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন, কাজেই তিনি সানন্দে সৈন্য-সাহায্য প্রেরণ করেন। কিন্তু মহবত জং এই সংবাদ শুনে দ্রুত আজিমাবাদ (পাটনা) অভিমুখে অগ্রসর হন। অনেক যুদ্ধের পর মুস্তফা খান নিজের অসহায় অবস্থা দেখে আজিমাবাদের সীমান্ত অতিক্রম ক'রে গাজীপুর চলে যান। মহবত জং বিজয়ী হয়ে মুর্শিদাবাদ ফিরে আসেন। মুস্তফা খান এক বৃহৎ অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদল সংগ্রহ ক'রে পুনরায় আজিমাবাদ আক্রমণ করেন। 'একবার যাকে পরাজিত করা গিয়েছে, দ্বিতীয়বার তাকে পরাস্ত করা যেতে পারে'—এই প্রবাদ বাক্য অনুসরণ ক'রে জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান তাঁর পূর্বের বিজয়ী সৈন্যদের নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেন এবং বহু চেষ্টা, হত্যা ও যুদ্ধের পর বিজয়ী হন এবং আনুগত্যহীনতার প্রতিশোধস্বরূপ মুস্তফা খান যুদ্ধক্ষেত্রে

যেতে চান। তাঁর সেনাপতিগণ তাঁকে ধৈর্য ধারণের জন্য বহু বাণী আবৃত্তি ক'রে ও সান্ত্বনা দিয়ে এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কার্যকরী পন্থা গ্রহণের প্রশ্ন ওঠে, তখন তারা সৈন্যদের অর্থ দেয়ার আবেদন জানায়। মহবত জং জানান যে, তাঁর নিকট অর্থ নাই। তখন নওয়াজেশ মুহম্মদ খান সাহামত জং সৈন্যদের বেতন দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও নিজ কোষাগার থেকে সৈন্যদের আশি লক্ষ টাকা নগদ দেন ও তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে রাজী করান। এইরূপে মহবত জং-এর উদ্বেগ কিছুটা প্রশমিত হওয়ার পর নওয়াজেশ মুহম্মদ খান সাহামত জংকে মুর্শিদাবাদে রেখে নিজে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী নিয়ে আজিমাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন।[৭৩] শমশের খানের প্ররোচণায় মীর হবিব মারাঠা দস্যুদল নিয়ে মহবত জং-এর পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং ডানে বামে গ্রাম জঙ্গল গোলাবাড়ী সব পুড়িয়ে দেন। মীর হবিব এই সময় মহবত জং-এর তাঁবুসমূহ ও অন্য জিনিসপত্র লুঠ করেন এবং প্রত্যেক দিন খণ্ডযুদ্ধ করতে করতে রাঢ় অতিক্রম করে। বৈকুণ্ঠপুরে[৭৪] শমশের খানের সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর এক যুদ্ধ হয়। টিকারির জমিদার রাজা সুন্দর সিং এক শক্তিশালী সৈন্যদলসহ আলীবর্দীর সঙ্গে যোগদান করেন। যখন উভয়পক্ষের মধ্যে হানাহানি আরম্ভ হয় সেইসময় মারাঠা দস্যুরা—যারা মহবত জং-এর সৈন্যবাহিনীকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছিল—পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রমণ করে। সম্মুখে আফগান সৈন্যগণ ও পশ্চাতে মারাঠা দস্যুগণ এই দু'য়ের মধ্যে মহবত জং-এর সৈন্যগণ পিষ্ট হয়। মহবত জং-এর বীর সৈন্যগণ উভয়দিক থেকে বিপর্যয় দেখে বেপরোয়া হয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করে। যেহেতু জয় নির্ভর করে ভাগ্যের উপর, সেইহেতু সৌভাগ্যবশত শমশের খান, সরদার খান, মুরাদ শের খান ও অন্য আফগান-সেনাপতিগণ বন্দুকের গুলিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের অনানুগত্যের প্রতিশোধ-স্বরূপ নিহত হয় ও অন্য আফগান-সৈন্যরা ভীরুর মতো পলায়ন করে। মহবত জং-এর সৈন্যগণ তরবারি, বর্শা, তীর, বন্দুক ও হাওই দ্বারা সাহসের সাথে হতভাগাদের আক্রমণ করে এবং মৃতদেহের স্তূপ জমে

ওঠে। আলীবর্দীর এই গৌরবজনক বিজয় দেখে মারাঠা সৈন্যগণ পশ্চাদপদ হয় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। মহবত জং তখন আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া নামাজ আদায় ক'রে বিজয়ী হয়ে আজিমাবাদ প্রবেশ করেন এবং জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান ও হাজী আহমদের সন্তান ও পরিবার বর্গকে উদ্ধার ক'রে অসম্মানের কবল থেকে রক্ষা করেন। তিনি সেইসঙ্গে বিশ্বাসঘাতক দুষ্ক্রিয়াকারীদের স্ত্রী-কন্যাদের বন্দী করেন।

কাল সর্বদা তরবারি হাতে প্রতিশোধ নিয়ে থাকে;
প্রতিশোধ নেয়ার প্রয়োজন কারো আছে কি?

নওয়াব মহবত জং সুবিবেচনার সাথে আফগান মহিলাদের[৭৫] পাথেয় দিয়ে দ্বারভাঙ্গা যেতে অনুমতি দেন। তিনি জয়েন-উদ-দীন আহমদের পুত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকে তাঁর পিতার স্থলে আজিমাবাদের সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন এবং রাজা জানকি রামকে সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করেন। এইভাবে সুবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পন্ন ক'রে মহবত জং মারাঠাদের বিতাড়ণের জন্য বাংলায় ফিরে আসেন।

এই সময় নওয়াব সইফ খানের পুত্র খান বাহাদুর[৭৬] বাদশাহী রাজধানীতে পলায়ন করায় পুর্নিয়ার ফৌজদারের পদ খালি হয়। আলীবর্দী তখন সঈদ আহমদ খান সওলাত জংকে পুর্নিয়ার ফৌজদার পদে নিয়োগ করেন। সওলাত জং মনে মনে বাংলার নিজামত দখল ক'রে এই সুবার শাসনকর্তা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। মহবত জং যখন শমশের খানের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেইসময় সিরাজ-উদ-দৌলা হাজী আহমদের জামাতা আকবর নগরের (রাজমহলের) ফৌজদার আতাউল্লাহ খান সাবিত জং-এর সাথে দুর্ব্যবহার করেন। আতা-উল্লাহ[৭৭] খানকে সাহসী ও সৈন্যদের প্রিয় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও স্থিরমস্তিষ্ক জেনে সিরাজ তাকে ধ্বংস করার মতলব করেন। আতাউল্লাহ সম্পর্কে আলীবর্দী খানের মনে তিনি সন্দেহ সৃষ্টি করেন এবং আতাউল্লাহকে দেশ ত্যাগ করতে অথবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিতে মহবত জংকে প্ররোচিত করেন। আতাউল্লাহ খান কিছুদিন আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন ও শেষ পর্যন্ত বাদশাহী রাজধানীতে গিয়ে নওয়াব উজীর-উল-মুলক

সফদর জং-এর[৭৮] সঙ্গে থাকেন। পরে রাজা পুন্ রায়ের[৭৯] সঙ্গে যোগ দিয়ে রোহিলা-আফগান যুদ্ধে ফর্রুখাবাদে নিহত হন।

আজিমাবাদে বিদ্রোহের সময় মারাঠা দস্যুগণ উড়িষ্যা সুবা দখল করেছিল। সেইজন্য মহবত জং বাংলায় না থেকে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করেন। মারাঠা দস্যুদের সুবা থেকে বহিষ্কৃত ক'রে মহবত জং মারাঠা দস্যুদের সহযোগী সৈয়দ নূর, সিরান্দাজ খান ও অন্য সৈন্যাধ্যক্ষ-দের প্রাণদণ্ড দেন। এরা বরাহবাটি দুর্গে সুরক্ষিত ঘাঁটি তৈরী করেছিল। কিন্তু কূটকৌশলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই সুরক্ষিত ঘাঁটি থেকে তাদের বে'র ক'রে হত্যা করা হয়।[৮০] এদের সহকর্মীদের ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র দখল ক'রে তাদের সকলকে কটক থেকে বহিষ্কার ক'রে মহবত জং বাংলায় ফিরে আসেন।

যেহেতু মীর হবিব এই সকল দুষ্ক্রিয়া ও গোলমালের মূল ছিল, সেইহেতু মহবত জং তাকে ধ্বংস করার এক ফন্দী করেন। মীর হবিবের এক পত্রের যেন উত্তর দেয়া হচ্ছে এই ভান ক'রে মহবত জং নিম্নরূপ এক পত্র মীর হবিবের নিকট প্রেরণ করেন: "আপনার পত্র পাওয়া গিয়েছে; মারাঠা দস্যুদের নির্মূল করার জন্য আপনার পরিকল্পনা আমি অনুমোদন করি। অত্যন্ত সুন্দর মতলব; আপনি ওদিক থেকে আর আমি এদিক থেকে সতর্ক থাকবো এবং অপেক্ষা করবো। এদিকে আসার জন্য বিশেষ চেষ্টা করবেন; তারপর আমাদের উভয়ের মনে যা আছে তাই হবে।" এই পত্রটি দিয়ে পত্রবাহককে এমন এক রাস্তা দিয়ে যেতে বলা হয় যাতে পথিমধ্যে এটি মারাঠাদের হাতে পড়ে। এই অভিসন্ধি সম্পূর্ণ সফল হয়। পত্রটি মারাঠাদের হস্তগত হয় এবং তারা মীর হবিবকে হত্যা করে।[৮১]

সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল মারাঠাদের সঙ্গে মহবত জং-এর যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ডের অগ্নি জ্বলতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারাঠারা চৌথ আদায় না ক'রে যায় নাই। জয়েন-উদ-দীন আহমদ খান ও হাজী আহমদের মৃত্যুতে মহবত জং-এর শক্তি হ্রাস পেয়েছিল। বার্ধক্য ও রুগ্নতার জন্য তাঁর দৈহিক শক্তিও হ্রাস পেয়েছিল। সুবিধা ও

প্রয়োজনের তাগিদে এবং নওয়াজেশ মুহম্মদ খান সাহামত জং-এর অনুনয়ে মহবত জং শেষ পর্যন্ত মারাঠা দস্যুদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। এই সন্ধির চুক্তি অনুসারে তিনি সুবাত্রয়ের চৌথ দিতে সম্মত হন এবং মীর হবিবের ভ্রাতুষ্পুত্র মসলিহ-উদ-দীন মুহম্মদ খান ও সদর-উল-হক খানের মধ্যস্থতায় শান্তি ও চৌথ দেয়ার বন্দোবস্ত স্থির করা হয়। চৌথের পরিবর্তে মহবত জং উড়িষ্যা সুবার রাজস্ব মারাঠাদের ছেড়ে দেন এবং সদর-উল-হককে প্রশাসক ও গবর্নর পদে নিয়োগ করেন।[৮২] এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিষ্পত্তি করার পর মহবত জং স্বস্তি লাভ করেন এবং ভ্রমণ ও শিকারে রত হন। ষোলো বৎসর শাসন করার পর ১১৬৯ হিজরীর ৯ই রজব শনিবার দিন, অর্থাৎ দ্বিতীয় আলমগীরের সিংহাসনে আরোহণের দ্বিতীয় বর্ষে শোথরোগে আক্রান্ত হয়ে মহবত জং-এর মৃত্যু হয় এবং তাঁকে খোশবাগে[৮৩] দাফন করা হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী সিরাজ-উদ-দৌলা নিজামতের মসনদে আরোহণ করেন।

নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলার নিজামত

নওয়াব আলীবর্দী খান মহবত জং যখন অনন্তধামে চলে যান তখন জয়েন-উদ-দীন আহমদ খানের পুত্র, আলীবর্দীর দৌহিত্র নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নিজামতের মসনদে বসেন। আলীবর্দী খান জীবিতকালেই তাঁকে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে ঘোষণা করেছিলেন ও তাঁকে (সিরাজকে) নিজামতের মসনদে বসিয়ে আলীবর্দী নিজে ও দরবারের অন্য আমীরগণ আনুগত্য দেখিয়েছিলেন ও উপহার দিয়েছিলেন। সিরাজ-উদ-দৌলা ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা দেখাতেন—অথচ এই আচরণ দু'টি নিকৃষ্টতম ও আল্লাহ্‌র নিকট অসন্তুষ্টিকর। সেইসময় নওয়াজেশ আহমদ খান সাহামত জং-এর বিধবা ঘসেটি বেগম মতিঝিলে

থাকতেন। কতকগুলো কারণে তিনি সিরাজ-উদ-দৌলার বিরোধিতা করতে সংকল্প করেন এবং তাঁর নিকট নানা প্রকার বাধ্য-বাধকতা সূত্রে আবদ্ধ কর্মচারী মীর নজর আলীকে পুরোভাগের সৈন্যদের সেনাপতি পদে ও নওয়াব বৈরাম খানকে নিজ সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি পদে নিয়োগ করেন। অতঃপর মহবত জং-এর বেগম ও জগৎশেঠ ঘসেটি বেগমের নিকট গিয়ে তাঁকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেন। সেইজন্য ঘসেটি বেগম বিরোধিতা ত্যাগ করেন। নজর আলী পলায়ন করেন; এবং বৈরাম খান একজন সেনাপতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সিরাজের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হন। তখন সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্যবাহিনী ঘসেটি বেগমকে বন্দী করে ও তাঁর সমস্ত মালমাত্তা বাজেয়াফ্‌ত করে। বেগম তখন যা কখনো দেখেন নাই অথবা শোনেন নাই, তাই দেখলেন ও শুনলেন। সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্যগণ বেগমের অট্টালিকাসমূহ ও প্রাসাদ ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে প্রোথিত ধনরত্ন উদ্ধার ক'রে মনসুরগঞ্জে নিয়ে যায়। সিরাজ-উদ-দৌলার রূঢ় মেজাজ, কর্কশ ও উগ্র কথাবার্তায় সকলে এতই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতো যে, তাঁর সামরিক বাহিনীর সেনাপতিগণ অথবা শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উদ্বেগশূন্য হয়ে থাকতে পারতেন না। কর্মচারীরা সিরাজ-উদ-দৌলার সামনে প্রাণ ও সম্মান হাতে ক'রে যেতেন এবং যারা অসম্মান অথবা দুর্ব্যবহার না পেয়ে ফিরে আসতেন তারা আল্লাহ্‌র নিকট শোকর-গুজার করতেন। মহবত জং-এর সেনাপতিদের ও আমীর-দের সিরাজ-উদ-দৌলা ব্যঙ্গ ও উপহাসের পাত্ররূপে মনে করতেন এবং প্রত্যেককে তাদের অনোপযোগী অবজ্ঞাজনক উপনাম দিতেন।[৮৪] যে-কোনো নাম তাঁর মুখে এলে সঙ্গে সঙ্গে ইতস্তত না ক'রে তিনি তাঁদের মুখের উপর তা বলে দিতেন। কেউ তাঁর সামনে স্বস্তির সঙ্গে নিশ্বাস ফেলতে পারতো না। মোহনলাল[৮৫] নামক জনৈক কায়স্থকে উজীর ও সর্ব-বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত ক'রে সিরাজ-উদ-দৌলা তাকে মহারাজ মোহন-লাল বাহাদুর উপাধি, এক বৃহৎ অশ্বারোহী ও পদাতিক দেহরক্ষীদল দিয়েছিলেন এবং সেনাপতি ও আমীরদের তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আদেশ দিয়েছিলেন। সকলেই সেই হুকুম পালন করেছিলেন; একমাত্র

মহবত জং-এর ভগ্নীপতি ও সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মীর মুহম্মদ জাফর খান তা পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি কিছু-দিন সিরাজ-উদ-দৌলাকে পর্যন্ত সম্মান প্রদর্শনে বিরত থাকেন। কিন্তু রাজা মোহনলাল সিরাজ-উদ-দৌলাকে এমনিভাবে হস্তগত করেছিলেন যে, তিনি নিজে ছাড়া অন্য সকলের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিলেন এবং পুরাতন কর্মচারীদের বরখাস্ত ক'রে নিজের আত্মীয়স্বজনকে খাস তালুকের ও অন্যান্য রাজস্ব আদায়কারীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। যথা, রাজা মোহনলাল নওয়াব গোলাম হোসেন খান বাহাদুরকে[৮৬] লিখেছিলেন যে, যদি তিনি দু'শ টাকা বেতনে চাকুরী করতে চান তো থাকতে পারেন; নতুবা যেন দেশ ত্যাগ করেন। সুতরাং গোলাম হোসেন কা'বা যাওয়ার অজুহাতে হুগলী চলে যান।

সেই বৎসরের গোড়ার দিকে নওয়াব মহবত জং-এর মৃত্যুর পর ১৩ই রবি-উল-আউয়াল তারিখে বাংলার দেওয়ান নওয়াব নওয়াজেশ আহমদ খান সাহামত জং-এর মৃত্যু হয়।[৮৭] তখন সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর পেশকার রাজা রাজবল্লভকে হিসাব নিকাশের অজুহাতে গ্রেফতার করেন। রাজা রাজবল্লভ আংশিক নগদ ও অবশিষ্ট দাবী সম্বন্ধে একটা আপোস মীমাংসার চেষ্টা করা সত্বেও সিরাজ তাতে সম্মত হন নাই ও রাজা রাজবল্লভকে প্রহরাধীন রাখেন।[৮৮] রাজবল্লভ তাঁর পরিবারবর্গ ও পুত্রদের কলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। সিরাজ-উদ-দৌলা রাজবল্লভের পরি-বারবর্গকেও গ্রেফতার করতে চেয়েছিলেন এবং তাদের গ্রেফতারের জন্য গোয়েন্দাদের প্রধান, রাজা রামকে কলকাতা পাঠান। মহবত জং অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকাকালে সিরাজ-উদ-দৌলাকে এই পন্থা অবলম্বন করতে বিরত করেন এবং বলেন যে, সুস্থ হওয়ার পর তিনি নিজেই তাদের তলব করবেন। এই সময় সিরাজ-উদ-দৌলা গোয়েন্দা-প্রধান রাজা রামকে কলকাতা গিয়ে রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে গ্রেফতার ক'রে আনতে হুকুম দিয়ে শা'বান মাসে নিজে আকবর নগর (রাজমহল) অভিমুখে ভ্রমণের অজুহাতে বেরিয়ে যান। যখন সিরাজ-উদ-দৌলা দুনাহ্পুর পৌঁছে কালাপানি নদীতীরে শিবির স্থাপন করেন, তখন তিনি

সংবাদ পান যে, কলকাতার ইংরেজ প্রধানগণ বিরোধিতা করছেন ও রাজবল্লভের পরিবারবর্গকে গ্রেফতারে বাধা দিচ্ছেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সিরাজ-উদ-দৌলা ক্রোধান্ধ হয়ে সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের তলব ক'রে বলেন, "আমি কলকাতার বিরুদ্ধে এক অভিযানে যাওয়ার ইচ্ছা করছি। এখন প্রয়োজন হচ্ছে আপনারা কেউ মুর্শিদাবাদ ফিরে যাবেন না; সকলে এখান থেকে সোজা চুনাখালি গিয়ে শিবির স্থাপন করুন।" পরদিন সকালে রওয়ানা হয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা চুনাখালি পৌঁছান এবং দ্রুত অগ্রসর হয়ে কলকাতা আক্রমণ করেন। রমজান মাসে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে সিরাজ উদ-দৌলা জয়ী হন এবং ইংরেজ-প্রধান জাহাজ-যোগে পলায়ন করেন।[৮৯] কলকাতা লুণ্ঠন[৯০] করার পর তিনি নগরের নাম রাখেন আলী নগর। রাজা মানিকচাঁদকে এক বৃহৎ সৈন্যদল দিয়ে তাঁকে কলকাতার গবর্নর পদে নিযুক্ত করেন। ইংরেজদের জাহাজ যাতায়াতের পথে মথুয়া ও বজবজিয়ায় (বজবজে) ও পারাপারের অন্যান্য স্থানে শক্তিশালী সৈন্যদল রেখে উক্ত মাসের শেষ দিকে সিরাজ-উদ-দৌলা মুর্শিদাবাদ ফিরে যান।

সেই বৎসরেই মহবত জং এর মৃত্যুর পূর্বে পুর্নিয়ার ফৌজদার সওলাত জং-এর মৃত্যু হয়েছিল ও তাঁর পুত্র, সিরাজ-উদ-দৌলার খালাতো ভাই শওকত জং পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। সিরাজ-উদ-দৌলা এই সময় (মহবত জং-এর মৃত্যুর পর) শওকত জংকে অপসৃত করার জন্য পুর্নিয়ার রাজস্ব দাবী করেন।[৯১] শওকত জং উত্তরে জানান: "আপনি তিনটি সুবার মালিক; আমি এক কোণে পড়ে আছি ও এক টুকরো রুটিতেই আমি সন্তুষ্ট। আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পক্ষে এই রুটির টুকরার প্রতি লোভ করা শোভন হয় না।" এই উত্তর দ্বারা সিরাজ-উদ-দৌলার মতলব সিদ্ধ না হওয়ায় দেওয়ান মোহনলাল, দোস্ত মোহাম্মদ খান, শেখ দীন মোহাম্মদ, মীর মোহাম্মদ ও জাফর খান প্রমুখ সেনাপতিদের বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ শওকত জং-এর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য পাঠান। অজিমাবাদের সুবাদার রামনারায়ণকেও দ্রুত পুর্নিয়া অভিমুখে অগ্রসর হতে লেখেন। অপরপক্ষে, শওকত জং যুদ্ধের জন্য শেখ জাহান ইয়ার,

প্রধান সেনাপতি কারগুজার খান, মীর মুরাদ আলী ও অন্যদের প্রেরণ করেন এবং পরে তিনি নিজেও রওয়ানা হয়ে হায়াতপুর গোলা আক্রমণ ক'রে পুড়িয়ে দিয়ে পুর্নিয়া ফিরে যান। মনিহারি পৌঁছে সিরাজ-উদ-দৌলার বাহিনী শিবির স্থাপন করে এবং এক ক্রোশ দূরবর্তী নওয়াবগঞ্জে শওকত জং-এর বাহিনী শিবির স্থাপন করে। পরদিন শওকত জং তাঁর সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন এবং সেইদিনই আজিমাবাদের সুবাদার রাজা রামনারায়ণ তাঁর সৈন্যদলসহ সিরাজ-উদ-দৌলার বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করেন। পরদিন সকালে রাজা মোহনলাল যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হন ও তাঁর 'মাহি' মর্যাদা চিহ্নিত পতাকা উত্তোলন করেন। 'মাহি' মর্যাদার চিহ্ন দেখে শওকত জং-এর ধারণা হয়েছিল যে, সিরাজ উদ-দৌলা নিজে তাঁর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হয়েছেন। তখন শওকত জংও নিজ বাহিনীসহ অগ্রসর হন। শেখ ইয়ার জং তখন শওকত জংকে নিরস্ত কবার জন্য বলেন, "অদ্য যুদ্ধ করার জন্য শুভ সময় নয়। ইন্‌শা আল্লাহু আগামীকল্য সকালে আমরা যুদ্ধ করব ও আল্লাহুর যা ইচ্ছা তাই হবে।" শওকত জং তাঁর কথায় কর্ণপাত না ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন। শেখ জাহান ইয়ারও তখন বাধ্য হয়ে নিজ সৈন্যদলসহ যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হন এবং বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় বন্দুকের গুলির আঘাতপ্রাপ্ত হন। জাহান ইয়ারের ভ্রাতা শেখ আবদুর রশিদ, জামাতা শেখ কুদরতউল্লাহ, তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও অন্য জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গৌরব অর্জন করেন। এই যুদ্ধে শেখ জাহান ইয়ারের ঘোড়ার গর্দানে তরবারির আঘাত লাগায় লাগাম কেটে যায় ও অশ্বটি দ্রুতবেগে আরোহীসহ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যায়। শেখ জাহান ইয়ার ইতিপূর্বেই কয়েকটি মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় বীরনগর পৌঁছাবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। সেই সংকটকালে শওকত জং নিজে যুদ্ধে যোগদান ক'রে তীর ছুড়তে ছুড়তে দোস্ত মুহম্মদ খানের সম্মুখীন হন। উক্ত খান বলেন, "আমার হাতীর উপর আসুন, আপনি নিরাপদ হবেন।" শওকত জং তার কথায় সম্মত না হয়ে একটি শরাঘাতে তার সম্মুখের দাঁতগুলো

চূর্ণ ক'রে দিলেন। এই সময় হবিব বেগ ও অন্য একজন অশ্বারোহী ব্যতীত অন্য কেউ শওকত জং-এর সঙ্গে ছিল না। হবিব বেগ নিজের ঘোড়া থেকে নেমে তাঁর (শওকত জং-এর) হাতীর সামনে দাঁড়ালেন। নিয়তির বিধানে দোস্ত মুহম্মদ খানের এক চাকরের বন্দুকের গুলি শওকত জং-এর কপালে আঘাত করে এবং তাঁর আত্মাপাখী খাঁচা-ছাড়া হয়ে যায়। কারগুজার খান, প্রধান সেনাপতি শেখ বাহাদুর নার্‌নূতি, আবু তোরাব খান, শেখ জাহান ইয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্র মুরাদ শের খান, নওয়াব সইফ খানের শিশু শেখ মুরাদ আলী, তীরন্দাজ মীর সুলতান খলিল, লোহা সিং হাজারি, মীর জাফর-উল-যো প্রমুখ সকলে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই ক'রে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। সিরাজ-উদ-দৌলা আকবর নগর (রাজমহল) পৌঁছে এই জয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হন এবং তিনি বিজয়বাদ্য বাজাতে আদেশ দেন। শওকত জং-এর পক্ষের বন্দীদের বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেয়ার আদেশ দেন। একান্নটি হাতী ও ঘোড়া, উট ও শওকত জং-এর অন্যান্য মালমাত্তা বাজেয়াফ্‌ত ক'রে রাজা মোহনলাল নিজ পুত্রকে পুর্নিয়ার ফৌজদারির ডেপুটি গবর্নররূপে নিযুক্ত ক'রে ফিরে আসেন।

শওকত জং-এর পতনের পর সিরাজ-উদ-দৌলা যখন মুর্শিদাবাদ পৌঁছান, তখন কালের ছকে নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছিল। ইংরেজরা কলকাতায় ছত্রভঙ্গ হওয়ায় ও তাদের কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ লুণ্ঠিত হওয়ার পর তাদের মধ্যে কেউ কেউ একটি দ্বীপে পালিয়ে গিয়েছিল।[৯১] সেখান থেকে তারা ইংলণ্ড ও অন্যান্য স্থানে সংবাদ পাঠায় এবং অল্পকালমধ্যে সাহায্য আসে। কয়েক মাস পরে সাবিত জং-এর (ক্লাইভের) অধীনে ত্রিশ হাজার সৈন্য জাহাজযোগে উপস্থিত হয় এবং বাইরের ঘাটিগুলো থেকে নওয়াবের সৈন্যদের পলায়ন করতে বাধ্য করে ও তৎপর রাজা মানিকচাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। রাজা শোচনীয়রূপে পরাজিত হন। ইংরেজরা হুগলী পৌঁছে কামানের গোলায় তথাকার দুর্গ ভূমিসাৎ করলে ফৌজদার পলায়ন করতে বাধ্য হন। ইংরেজদের বিজয়ের সংবাদ পেয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন এবং কলকাতার উপকণ্ঠে কারহাটির বাগানে শিবির স্থাপন করেন।

ইংরেজরা নৈশ-আক্রমণ করে। পরদিন যুদ্ধার্থে অগ্রসর হতে সিরাজ-উদ-দৌলার সাহস হয় নাই এবং বাহ্যত শান্তি ঘোষণা ক'রে উদ্বিগ্নভাবে মুর্শিদাবাদ ফিরে যান। মুর্শিদাবাদে পৌঁছানোর পর সিরাজ-উদ-দৌলা সকল আমীর ও সেনাপতিগণকে অসন্তুষ্ট দেখেন। এদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন মীর মুহম্মদ জাফর খান বাহাদুর। তিনি পূর্বে প্রধান সেনাপতি ছিলেন; কিন্তু তাঁর পরিবর্তে খাজা হাদী আলী খানকে প্রধান সেনাপতির পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। খাজা নিজে বাড়ীতে দুয়ার বন্ধ ক'রে বসে ছিলেন। মীর জাফরের প্রাসাদের সামনে বড় বড় কামান সাজিয়ে সিরাজ তাঁর অট্টালিকা ভূমিসাৎ করার উদ্যোগ করছিলেন এবং তাঁকে নগর ত্যাগ করতে আদেশ দেন। মীর জাফর কৈফিয়ৎ দেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন; কিন্তু গোপনে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন এবং ভালিয়া সেনাপতিগণ, অন্য সেনাপতিগণ ও জগৎশেঠকে[১৩] দলভুক্ত করার চেষ্টা করেন। পারস্পরিক প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি দ্বারা ষড়যন্ত্র অনুমোদিত হওয়ার পর মীর জাফর তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমীর বেগকে পত্র দিয়ে কলকাতায় পাঠান ও ইংরেজ-সৈন্য সাহায্য চান। আমীর বেগ[১৪] নানা প্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরেজ-প্রধানদের কলকাতা থেকে পলাশী অগ্রসর হতে প্ররোচিত করেন। কর্মের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর (অর্থাৎ যখন কাজ করা উচিত ছিল তখন না ক'রে) সিরাজ-উদ-দৌলা ইংরেজদের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে নগর (মুর্শিদাবাদ) থেকে অগ্রসর হন। তখন হঠকারিতা ত্যাগ ক'রে তিনি উপরোক্ত খানের (মীর জাফরের) তোষামোদ করতে থাকেন এবং মহবত জং-এর বেগমকে পাঠিয়ে অতীতের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতিশ্রুতি ও কার্যের উপর আস্থা না থাকায় মীর জাফর তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। অতঃপর, সিরাজ-উদ-দৌলা যখন চুনাখালি থেকে অগ্রসর হন তখন মীর জাফরও অগ্রসর হয়ে সিরাজের সৈন্যবাহিনী থেকে অর্ধ ফারসাখ দূরে শিবির স্থাপন করেন। গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান মীর মদন এই

সময় সিরাজ-উদ-দৌলাকে বলেন যে, ইংরেজরা মীর মুহম্মদ জাফরের প্ররোচণায় আসছে; সুতরাং মীর মুহম্মদ জাফরকে প্রথমে শেষ করা উচিত এবং তাঁকে হত্যা করার সংবাদ পেলে ইংরেজরা আর অগ্রসর হতে সাহস করবে না। যেহেতু নিয়তির তীর চেষ্টা দ্বারা রোধ করা যায় না এবং যেহেতু আল্লার ইচ্ছা অন্যরূপ, সেইহেতু

সেই বিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শের প্রতি

এই তরল-হৃদয় ব্যক্তি (সিরাজ-উদ-দৌলা) বধির হয়ে রইলো।

সিরাজ-উদ-দৌলা পরদিন দাউদপুর পৌঁছে সংবাদ পান যে, ইংরেজরা কাটোয়া পুড়িয়ে দিয়েছে। সেইসময় মোহনলাল তিরস্কার ক'রে সিরাজ-উদ-দৌলাকে বলেন, "আপনি আমার সর্বনাশ করেছেন; আমার সন্তানদের পিতৃমাতৃহীন করলেন। আপনি যদি মীর মুহম্মদ জাফর খান ও দুর্লভ রায়কে কাটোয়ার ছাউনি থেকে না সরাতেন, তা'হলে এই অবস্থা হত না।" মোটের উপর পরদিন সকালে মোতাবেক ৫ই শাওয়াল বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে —একদিকে ইংরেজ সৈন্যরা পলাশী থেকে এবং অন্যদিকে সিরাজ-উদ-দৌলা দাউদপুর থেকে কামানের গোলবর্ষণ দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মীর মুহম্মদ জাফর খান তাঁর বাহিনীসহ বাম দিকে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সিরাজ তাঁকে নিকটে আসবার জন্য তলব করা সত্বেও মীর জাফর নিজ স্থান ত্যাগ করলেন না। ঘোরতর যুদ্ধের সময় যখন হত্যাকাণ্ড চলছে ও সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্যবাহিনীর বিজয়ের সূচনা দেখা দিয়েছে, সেই সময় অকস্মাৎ একটি কামানের গোলার আঘাতে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান মীর মদনের পতন হয়। এই দৃশ্য দেখে সিরাজের সৈন্যদের মনোভাব পরিবর্তিত হয় ও গোলন্দাজরা মীর মদনের লাশ নিয়ে শিবিরে চলে যায়। তখন বেলা দ্বিপ্রহর; শিবিরের লোকেরা পলায়ন করতে আরম্ভ করে। নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলা তখনো যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন; সেইসময় শিবিরের অনুচরগণ পলায়ন ক'রে দাউদপুর থেকে অন্যদিকে চলে যায় এবং সৈন্যরাও ক্রমে পলায়ন করতে থাকে। সূর্যাস্তের দু'ঘণ্টা পূর্বে সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্যরা পলায়ন করে; এবং সিরাজও আর

প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে পলায়ন করেন। তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত মনসুর-গঞ্জে পৌঁছে তিনি কোষাগারের দ্বার খুলে সমস্ত অর্থ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করেন। কিন্তু অত্যধিক উদ্বেগে সেখানে না থাকতে পেরে সন্ধ্যার পর সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর বেগম, সন্তান এবং মালমাত্তা, মূল্যবান মণিমুক্তা ও প্রচুর মুদ্রাসহ এক নৌকায় উঠে পূর্নিয়া ও আজিমা-বাদের দিকে রওয়ানা হন। সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের পর মীর মুহম্মদ জাফর তাঁর শিবিরে প্রবেশ করেন ও রাত্রিতে ইংরেজ প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং পরদিন সকালে সিরাজ-উদ-দৌলার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে মুর্শিদাবাদ পৌঁছান। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অনুকূল দেখে মীর মুহম্মদ জাফর দুর্গে প্রবেশ ক'রে বাংলার মসনদে আরোহণের বিজয়বাদ্য বাজাবার আদেশ দেন। নগরে শান্তি ও নিরাপত্তা ঘোষণা ক'রে তিনি সুবাদারির পতাকা উত্তোলন করেন। জামাতা মীর মুহম্মদ কাসেমকে একদল সৈন্যসহ সিরাজ-উদ-দৌলাকে বন্দী করার জন্য প্রেরণ করেন ও ইংরেজ-সৈন্যবাহিনীকে বাবনিয়া[১৫] স্থান নির্দেশ ক'রে দেন। কিন্তু সিরাজ উদ-দৌলা নৌকাযোগে রাত্রিকালে দ্রুত মালদহ অতিক্রম ক'রে বাবিয়াল পৌঁছান। এখানে পৌঁছে জানতে পারেন যে, নাজিরপুরের মুখে নদীতে নৌকা চলাচল করতে পারে না। তখন তিনি বাধ্য হয়ে নৌকা থেকে নেমে সেখানকার অধিবাসী দান শাহ পীরজাদার বাড়ী যান। দান শাহ ইতিপূর্বে সিরাজ-উদ-দৌলার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। সিরাজকে নিজের আয়ত্বে পেয়ে সুযোগ বুঝে দান শাহ তাঁকে প্রতিশ্রুতি ও সান্ত্বনা দেন এবং বাহ্যতঃ খাদ্য প্রস্তুতের আয়োজন করেন। এদিকে দান শাহ মীর মুহম্মদ জাফর খানের ভ্রাতা আকবর নগরের (রাজমহলের) ফৌজদার মীর দাউদ আলী খানকে সংবাদ পাঠান। দাউদ আলী খানের গোয়েন্দারা সিরাজ-উদ-দৌলার সন্ধান করছিল এবং চরম বিজয় মনে ক'রে দ্রুত পৌঁছে সিরাজ-উদ-দৌলাকে বন্দী ক'রে দান শা'র[১৬] বাড়ী থেকে আকবর নগরে নিয়ে যায়। সেখান থেকে মীর মুহম্মদ কাসিম খান তাঁকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যান। মীর মুহম্মদ জাফর খান তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। পরদিন ইংরেজ প্রধানদের পরামর্শে ও জগৎ-

শেঠের জেদাজেদিতে তিনি তাঁকে হত্যা করেন এবং এই অত্যাচারিত শিকারের লাশ হাতীর পিঠে হাওদায় ক'রে নগর পরিক্রম করান। পরে নওয়াব মহবত জং-এর সমাধি-সৌধে খোশবাগে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। কিছুদিন পরে সিরাজ-উদ-দৌলার ছোট ভাই মীর্জা মেহদি আলী খানকেও অত্যাচার ক'রে হত্যা করে ও সিরাজের কবরের পাশে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলার[১৭] নিজামত ছিল এক বৎসর চার মাস। ১১৭০ হিজরীর শাওয়াল মাসের শেষ দিকে তাঁকে হত্যা করা হয়।

শুজা-উল-মুল্‌ক্ জাফর আলী খানের নিজামত

জাফর আলী খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নিজামতের মসনদে আরোহণ[১] করার পর তিনি সৈন্যবাহিনী ও যে সকল আমীর সিরাজ-উদ-দৌলাকে ধ্বংস করার জন্য তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন তাদের সন্তুষ্ট করার জন্য মনোনিবেশ করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র খাদেম হোসেন খানকে[২] পুর্নিয়ার ফৌজদার নিযুক্ত করেন; রামনারায়ণকে এক প্রস্ত সম্মানী পোশাক দেন ও তাঁকে আজিমাবাদ (পাটনা) সুবার[৩] ডেপুটি গবর্নর পদে পুনরায় নিয়োগ অনুমোদন করেন।

এই শাহ আলম[৪] আজিমাবাদ সুবা আক্রমণ করেন। উমর খানের পুত্রগণ রহিম খান, কাদের দাদ খান ও সিরাজ-উদ-দৌলার সমর্থক অন্য সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষদের জাফর আলী খান কূটনৈতিক কারণে পূর্বেই বিহারে সরিয়ে দিয়েছিলেন। এঁরা বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে যোগদান করেন। ফতুহা নামক স্থানে রামনারায়ণের সঙ্গে বাদশাহী সৈন্যদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রামনারায়াণ আহত হয়ে দুর্গে পলায়ন করেন। বাদশাহী পক্ষ দুর্গ অবরোধ করে। এই সংবাদ পেয়ে নওয়াব জাফর আলী খান পুত্র নওয়াব নাসির-উল-মুল্‌ক্ সাদিক আলী খান সাহামত জং ওরফে মীরনকে একদল ইংরেজ-সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। রাঢ়ের সংলগ্ন আধুয়া নদীর তীরে বাদশাহী সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাদশাহী সৈন্যদের পক্ষে কাদির দাদ খান ও কামগার খান প্রভৃত বীরত্ব দেখান। মুহম্মদ আমীন খান আহত হন; রাজবল্লভ পশ্চাদপসরণ ক'রে পলায়নের উপক্রম করছিলেন। কাদির দাদ খান ও অন্যরা সাহসিকতার সাথে কামান-শ্রেণী আক্রমণ করেন। চারশ'

মহিষে টানতো এই প্রকার ভারী একটি কামান সম্মুখভাগে ছিল। উক্ত ব্যক্তিগণ মহিষের পালের মধ্যে জড়িয়ে পড়ায় অগ্রসর হতে পারেন নাই। এই সন্ধিক্ষণে কাদির দাদ খানের হাতীর মাহুতের গুলির আঘাতে মৃত্যু হয়। কাদির দাদ খান নিজের পা দিয়ে হাতী চালিয়ে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে অগ্রসর হতে থাকেন। একটি শরাঘাতে নওয়াব সাদিক আলী খান আহত হন। এই সময় একটি কামানের গোলা কাদির দাদ খানের বুকের বাঁ দিকে আঘাত ক'রে তাঁকে শেষ ক'রে দেয়। এই দুর্ঘটনা দেখে কামগার খান ও অন্যরা আর অগ্রসর না হয়ে নিজেদের সৈন্য-শ্রেণীতে ফিরে যান। এই অবস্থা নির্ণয় ক'রে সাদিক আলী খানের সৈন্যগণ পুনরায় বাদশাহী সৈন্যদের আক্রমণ করে ও জয়ী হয়। বাদশাহী সৈন্যগণ পরাজিত হয়। রহিম খান ও জয়নুল আবেদীন খান ঘুরপথে গিয়ে সাদিক আলী খানের সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রমণ করার মতলব করেছিলেন। বিজয়বাদ্য শুনে তারা পশ্চাদ্দিকের পরিবর্তে দক্ষিণ দিক থেকে আক্রমণ করতে যান। কিন্তু ইংরেজদের কামানের গোলা-বর্ষণের ফলে তারা স্থির থাকতে পারেন নাই ও পরাজিত হন। পরাজিত হওয়ার পর বাদশাহী সৈন্যগণ বর্ধমানের দিকে যায়। সাদিক আলী খান চাকাই,[৫] খোতি[৬] ও বীরভূমের পথে বর্ধমান পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এদিক থেকে জাফর আলী খানও দ্রুত বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং বর্ধমানের সংলগ্ন নদীতীরে[৭] কামান-যুদ্ধ হয়। বাদশাহী সৈন্যগণ প্রতিরোধে অক্ষম হয়ে আজিমাবাদ ফিরে যায়।

এবার জাফর আলী খান ও সাদিক আলী খান নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলা ও মহবত জং-এর বেগম প্রমুখ সকলের মালমাত্তা ও সম্পদ বাজেয়াফত করতে আরম্ভ করেন। বেগমদের এক রাত্রির মতো খাদ্য-দ্রব্য না দিয়ে তারা এঁদের ইতিপূর্বে জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকায়) পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মহবত জং-এর বেগম ও তাঁর দুই কন্যা—একজন ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলার মাতা আমিনা বেগম[৮] ও অন্যজন ছিলেন সাহামত জং-এর বিধবা ঘসেটি বেগম; আর ছিলেন মহবত জং-এর পুরোবাসীনীগণ। এবার জাফর আলী খান ও সাদিক

আলী খান একশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ সেনাপতি বাকির খানকে জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) প্রেরণ করেন এবং ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগমকে বন্দী ক'রে বাকির খানের হাওয়ালে করিয়া দেয়ার জন্য তথাকার ফৌজদার জসরত খানের নিকট কড়া হুকুমনামা পাঠান। বাকির খান পৌঁছাবার পর জসরত খান[৯] বাধ্য হয়ে উক্ত আদেশ অনুযায়ী কার্য করেন। বেগমদ্বয়কে একটি নৌকা ক'রে জাহাঙ্গীর নগর থেকে এক ক্রোশ দূরে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। কথিত হয় যে, যখন বেগমদ্বয়কে নৌকায় নিয়ে যাওয়া হয় ও নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত হন, তখন তাঁরা নামাজ পড়েন ও বগলে পবিত্র কুরআন নিয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করার পর নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। হায়রে করুণাময় আল্লাহ্, একী অমানুষিক বর্বরতা! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাদিক আলী খানও স্বীয় জীবনে এর প্রতিফল পেয়েছিলেন।[১০]

ইতিমধ্যে রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য ব্যাপারে সাদিক আলী খানের সঙ্গে খাদেম হোসেন খানের মতানৈক্য ও ভুল বুঝাবুঝি হয়। খাদেম হোসেন খানকে বহিষ্কার ও ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পুর্নিয়া অভিমুখে এক অভিযান পরিচালনা করেন। খাদেম হোসেন খানও সসৈন্যে পুর্নিয়া থেকে অগ্রসর হয়ে গাণ্ডাগোলায় (কারাগোলায়) প্রতিরোধ ব্যবস্থা করেন। তখন হঠাৎ সংবাদ পাওয়া যায় যে, বাদশাহী সৈন্যরা আজিমাবাদ (পাটনা) দুর্গ অবরোধ ক'রে রামনারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সেই কারণে সাদিক আলী পুর্নিয়া অভিযান স্থগিত রেখে আজিমাবাদ যাত্রা করেন। খাদেম হোসেন খান নিজেকে প্রতিপক্ষের তুল্য নয় মনে ক'রে বাদশাহী রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। গঙ্গার দক্ষিণ তীর দিয়ে সাদিক আলী খানের ও উত্তর তীর দিয়ে খাদেম হোসেন খানের সৈন্যগণ অগ্রসর হচ্ছিল। যখন সাদিক আলী খানের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ আজিমাবাদে প্রচারিত হয়, তখন বাদশাহী সৈন্যগণ অবরোধ তুলে মুনির অভিমুখে পশ্চাদ্গমন করে। সাদিক আলী খান এবার অবসর লাভ ক'রে নদী পার হয়ে খাদেম হোসেন খানের পশ্চাদ্ধাবন করেন। খাদেম হোসেন খান বিদ্যুদ্বেগে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং সাদিক আলী

নিয়োগ ক'রে মীর কাসিম সমস্ত মালসামান্তা, হাতী, ঘোড়া, সম্পদ ও হারেমের গহনাপত্র, এমন কি ইমামবড়ার স্বর্ণ ও রৌপ্য—যে সবের মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা—সব নিয়ে বাংলা ত্যাগ করেন। মুঙ্গেরে পৌঁছে সেখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা[১৮] সুদৃঢ় করেন ও তারপর বাদশাহের নিকট হাজির হওয়ার জন্য আজিমাবাদ (পাটনা) রওয়ানা হন। মীর কাসিম পৌঁছাবার পূর্বেই বাদশাহ আজিমাবাদ পৌঁছান এবং ইংরেজরা তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে নিজেদের কুঠিতে[১৯] নিয়ে যায়। পরে মীর কাসিম খান পৌঁছান এবং বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্মান লাভ করেন। বাদশাহ তাঁকে (মীর কাসিমকে) 'নওয়াব আলীজাহ্ নাসির-উল মূল্ক্ ইমতিয়াজ-উদ-দৌলা কাসিম আলী খান নসরত জং' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। কিন্তু বাদশাহের কর্মচারীগণ কাসিম আলী খানের ব্যবহারে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং উক্ত খানকে[২০] কোনো সংবাদ না দিয়েই বাদশাহকে নিয়ে বানারস চলে যান। নওয়াব কাসিম আলী খান বক্সার ও জগদীশপুর পর্যন্ত তাঁদের পশ্চাদনুসরণ করেন এবং উক্ত স্থানদ্বয় লুণ্ঠন ক'রে আজিমাবাদ ফিরে এসে রামনারায়ণের বাড়ীতে থাকেন ও সেখান থেকে উক্ত স্থানের প্রশাসনিক কার্যে মনোনিবেশ করেন।[১]

কাসিম আলী খান যখন ইংরেজদের নিকট পণ্যদ্রব্যের শুল্ক দাবী করেন তখন তারা তা দিতে অস্বীকার করে এবং বিনা শুল্কে ব্যবসা চালাতে থাকে।[২২] নওয়াব কাসিম আলী খান সেইজন্য বাংলা ও বিহারের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কর আদায় বন্ধ করেন এবং বলেন যে, যতদিন তিনি ধনীদের নিকট থেকে কর আদায়ে অক্ষম থাকবেন ততদিন তিনি দরিদ্রদের নিকট থেকে কর আদায় করবেন না। এইজন্য ও অন্য কয়েকটি কারণে ইংরেজ প্রধানদের সঙ্গে তার মনোমালিন্য হয়। নওয়াব এবার তাদের (ইংরেজদের) নির্মূল করার মতলব করেন।[২৩] এই মতলব অনুযায়ী তিনি বাংলার সকল ডেপুটি ও ফৌজদারদের একটি নির্দিষ্ট দিনে সর্বত্র বিশ্বাস-ঘাতকতা অথবা বলপ্রয়োগপূর্বক সমস্ত ইংরেজ বাশিন্দাদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। এবং সেনাপতিদের প্রতি ইংরেজদের বন্দী' ও লুণ্ঠন করার চরম নির্দেশ দিয়ে তিনি মুঙ্গের ফিরে আসেন। নির্দিষ্ট

দিনে যখন কাসিম অলী খানের সৈন্যবাহিনী হুকুম মতো কর্তব্য সম্পাদন করতে প্রস্তুত হয়েছিল, তখন ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়।[২৪] অবশেষে পরপর কয়েকবার আক্রমণ ক'রে নওয়াব কাসিম আলী খানের সৈন্যরা জয়ী হয়[২৫] এবং সমস্ত ইংরেজদের হত্যা ও তাদের সব লুঠ করে। কিন্তু, দিনাজপুরের ফৌজদার সদর-উল-হক খান ও বর্ধমানের রাজা এই জঘন্য কার্য থেকে বিরত থাকেন।

যখন নওয়াব কাসিম আলী খান মুঙ্গেরে প্রবেশ করেছিলেন তখন তিনি বাংলা নিজামতের সকল কর্মচারীকে তাঁর নিকট আহ্বান করেন ও প্রদেশ কয়টির প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংগঠনে মনোনিবেশ করেছিলেন। রায় রায়ান উমিদ রায়, তার পুত্র কালীপ্রসাদ, রামকিশোর, রাজবল্লভ, জগৎশেঠ মাহতাব রায়, রাজা স্বরূপচাঁদ (জগৎশেঠের ভ্রাতা) দিনাজপুর, নদীয়া, খিবাহপুর[২৬] ও বীরভূম প্রভৃতি স্থানের জমিদারদের এবং ভোজপুরের দেওয়ান দুলাল রায়, রাজা সুন্দরের পুত্র টিকারির রাজা ফতেহ সিং, আজিমাবাদ সুবার ডেপুটি গবর্নর রামনারায়ণ, মুহম্মদ মাসুম, মুন্সি জগৎ রায় ও অন্যান্যদের একে একে তলব ক'রে তাদের সকলকে কারারুদ্ধ করেন। অতঃপর মুঙ্গের দুর্গ সুদৃঢ় ক'রে এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী বাংলায় প্রেরণ করেন। রাজমহলের সন্নিকটে আধুয়া নদীতীরে তিনি সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করেন এবং বাংলার ফৌজদারদের ও ডেপুটি নাজিমকে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য চরম হুকুম-নামা প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্যে নদীয়ার ডেপুটি ফৌজদার শেখ হেদায়েত উল্লা[২৭] এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ এবং জাফর খান ও নওয়াবের তুর্কী দেহরক্ষীদের সৈন্যাধ্যক্ষ আলম খান যুদ্ধার্থে দ্রুত কাটোয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। অন্যদিকে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী নওয়াব জাফর আলী খানকে পুনরায় বাংলার সুবাদাররূপে ঘোষণা করে ও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধের জন্য দুই ক্রোশ দূরবর্তী ডাঁইহাট[২৮] পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মহরম মাসের ৩রা তারিখে উভয় বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। কাসিম আলী খানের সৈন্যবাহিনীর কিছু-সংখ্যক লোক নিহত হওয়ায় পরাজিত হয়ে পলাশীতে বীরভূমের ফৌজদার মুহম্মদ তকি খানের নিকট পালিয়ে যায়। দু'দিন পরে বাংলার সৈন্যগণ

একত্রিত হওয়ার পর ইংরেজ সেনাপতিরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। মুহম্মদ তকি খান এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ যুদ্ধ করেন ; কিন্তু বন্দুকের গুলিতে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনি নিহত হন। তাঁর সৈন্যরা পরাজিত হয়ে মুর্শিদাবাদ পশ্চাদ্গমন করে। মীর তোরাব আলী খানের মুঙ্গেরে বদলী হওয়ার পর সৈয়দ মুহম্মদ খান বাংলার ডেপুটি নাজিমের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ থেকে অগ্রসর হয়ে চুনাখালিতে ঘাঁটি স্থাপন করেন। কিন্তু ইংরেজ-সৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর সৈন্যদের মধ্যে অনেকে ইতিপূর্বে যুদ্ধে আহত হওয়ায় বিনা যুদ্ধে ঘাঁটি ত্যাগ ক'রে সুতি পলায়ন করে। কাসিম আলী খানের বাহিনীও সুতি উপস্থিত হয়। সেখানে ফরাসী সেনাপতি সমরু ও অন্যান্য সেনাপতিগণ পূর্ব থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা সেখানেও তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং সুতিতে এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। কিন্তু তখন নওয়াব কাসিম আলীর ভাগ্য পতনের দিকে ও ইংরেজদের ভাগ্য উত্থানের দিকে ছিল এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ইংরেজরা জয়ী হয়। নওয়াব কাসিম আলী খানের সৈন্যবাহিনী ইংরেজদের কামানের গোলাবর্ষণের মুখে স্থির থাকতে অক্ষম হওয়ায় তারা পরাজিত হয়ে পূর্ববর্তী শিবির আধুয়া নালার তীরে পশ্চাদ্গমন করে। সেখানে নওয়াবের সমস্ত সৈন্য একত্রিত হয়ে পুনরায় যুদ্ধ করে। পরিশেষে, নওয়াব কাসিম আলী খানের অনেক সেনাপতি ও গোলন্দাজ বাহিনীর সেনাপতি গুরগিন খান ও অন্যরা ইংজেদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে। এইরূপে দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে ইংরেজদের নৈশ-আক্রমণে নওয়াবের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। নওয়াব শোচনীয়রূপে পরাজিত হন। পরাজিত সৈন্যগণ শোচনীয় অবস্থায় মুঙ্গের পৌঁছায়। এই পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে নওয়াব হতাশ ও আতংকগ্রস্ত হয়ে যান। যারা তাঁর নুন খেয়েছে তারাই বিশ্বাসঘাতকতা করায় নওয়াব আর যুদ্ধ চালনা অসম্ভব মনে করেন এবং পুনরায় যুদ্ধ করার আশা ত্যাগ ক'রে আজিমাবাদ চলে যান। সেখানে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি গুরগিন, জগৎশেঠ ও তার ভ্রাতাকে (যারা এই বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন এবং জাফর আলী খান ও খ্রীস্টান-ইংরেজদের গোপন-

পত্র দ্বারা আসতে বলেছিলেন ও যাদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পত্র ধরা পড়েছিল) তাদের হত্যা করেন। অন্য যে সকল জমিদার কারারুদ্ধ ছিল ও সেকালে যারা প্রত্যেকেই ষড়যন্ত্র করতে অদ্বিতীয় ছিলেন তাদেরও হত্যা করেন। আজিমাবাদ পৌঁছে সেখানেও নিরাপত্তার অভাব দেখে তিনি আউধ (অযোধ্যা) সুবার উজির-উল-মুল্‌ক নওয়াব শুজা-উদ-দৌলা বাহাদুরের নিকট চলে যান। সেখানেও নওয়াব শুজা-উদ-দৌলার সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি কাসিম আলী খানের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াফ্‌ত করেন। উক্ত স্থান ত্যাগ ক'রে নওয়াব পাহাড়ের দিকে চলে যান এবং সেখানে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় কিছুকাল বাস করার পর তাঁর মৃত্যু হয়।[২৯]

জাফর আলী খান বাহাদুরের দ্বিতীয়বার নিজামত

কাসিম আলী খানের পরাজয়ের পর ইংরেজ প্রধানগণ নওয়াব জাফর আলী খানকে আবার বাংলার নিজামতের মসনদে বসান। দেওয়ান হিসেবে কাজ করার জন্য সকল প্রদেশের রাজস্বের দশ আনা ভাগ ইংরেজদের বরাদ্দ করেন এবং নওয়াব জাফর আলী খান নিজের জন্য ছয় আনা অংশ রাখেন। এবারেও তিন বৎসরকাল নিজামতের গদীতে ব'সে অত্যন্ত দুর্বলতার সঙ্গে কাজ ক'রে ১১৭৮ হিজরীতে জাফর আলী খানের মৃত্যু হয়। ইংরেজ প্রধানগণ তাঁর পুত্র নজম-উদ-দৌলাকে[৩০] নিজামতের মসনদে বসান এবং নওয়াব মুহম্মদ রেজা খান বাহাদুর মুজফ্‌ফর জংকে নায়েব-নাজিমের পদে নিযুক্ত করেন। দু'বৎসর নিজামতের গদীতে বসার পর নজম-উদ-দৌলা অনন্তধামে চলে যান। নজম-উদ-দৌলার পর তাঁর ছোট ভাই সয়েফ-উদ-দৌলা[৩১] নিজামতের মসনদে বসেন; নওয়াব মুজফ্‌ফর জং নায়েব-নাজিম পদে অধিষ্টিত থাকেন। দু'বৎসর নাজিম পদে অধিষ্টিত থাকার পর বসন্তরোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

তখন তাঁর অন্য এক ভ্রাতা মুবারক-উদ-দৌলা নাজিম হন। ইংরেজ-প্রধানগণ নওয়াব মুজফ্ফর জংকে নায়েব-নাজিমের পদ থেকে অপসারিত ক'রে নাজিমের ভাতা বাবদ ষোল লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট করেন।[৩২] এই পরিমাণ অর্থ ইংরেজরা প্রতি বৎসর দিয়ে আসছে। ইংরেজরা এখন তিনটি সুবার উপরই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বিভিন্ন স্থানে জিলাদার নিযুক্ত করেছে।[৩৩] তারা কলকাতায় খালিসা কাছারি (সরকারী খাস জমির ব্যবস্থা করার জন্য) স্থাপন করেছে। তারা রাজস্বের হার নির্ধারণ করে ও আদায় করে, বিচার করে, আমিল (রাজস্ব আদায়কারী) নিয়োগ ও বরখাস্ত করে এবং নিজামতের অন্যান্য সকল কার্য পরিচালনা করে। এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হওয়ার দিন পর্যন্ত, অর্থাৎ ১২০২ হিজরী[৩৪] মোতাবেক বাদশাহ শাহ আলমের রাজত্বের একত্রিশতম বৎসর পর্যন্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা সুবাত্রয়ের উপর ইংরেজদের কর্তৃত্ব চালু ছিল।

পঞ্চম পর্ব

দক্ষিণ (দক্ষিণ ভারতে) ও বাংলায় ইংরেজ-খ্রীস্টানদের আধিপত্য বিস্তারের বিবরণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম ভাগ

পর্তুগীজ ও ফরাসী খ্রীস্টানদের দক্ষিণে ও বাংলায় উপস্থিতির বিবরণ

ইতিহাসের সম্পদ সংরক্ষণকারকদের উজ্জ্বল অন্তর এবং কাহিনী-সমূহের মণি-মাণিক্যের মূল্যাবধারণকারীদের নিকট একথা লুক্কায়িত নয় যে, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও ইহুদী ও খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা সমুদ্রপথে দক্ষিণের মালাবার প্রভৃতি বন্দরে বাণিজ্যার্থে আসতো এবং সেই অঞ্চলের জনসাধারণের সাথে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর বাড়ী ও বাগান তৈরী ক'রে দীর্ঘ কয়েক বৎসর বাস করতে থাকে। যখন মুসলিম বিশ্বাসের গ্রহের উদ্ভব হ'ল ও মুসলিম সূর্যের জ্যোতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে আলোকিত করলো, তখন হিন্দুস্তান ও দক্ষিণের দেশগুলোও ক্রমশঃ মুসলিম বিশ্বাসের চন্দ্র-কিরণালোক প্রাপ্ত হল এবং মুসলমানেরাও এই দেশে আসতে আরম্ভ করলো। ঐ সকল অঞ্চলের বহু রাজা ও শাসনকর্তা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন এবং গোয়া, দাবিল ও জাবিল প্রভৃতির রাজাগণ মুসলমান শাসন-কর্তাগণের মতো আরব থেকে আগত ব্যক্তিদের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল-সমূহে বসবাস করতে দেন ও তাঁদের সম্মান করতেন।[১] ফলে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের অন্তরে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলে ওঠে। যখন দক্ষিণ ও গুজরাটের রাজ্যসমূহ দিল্লীর মুসললান সম্রাটদের অধীনস্থ হয়[২] তখন দক্ষিণের রাজ্যে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তখন ইহুদী ও

খ্রীস্টানেরা তাদের জিহ্বার দ্বার অর্গলবদ্ধ করে এবং শত্রুতা ও ঘৃণাসূচক বাক্য উচ্চারণে বিরত থাকে। পরে ৯০০ হিজরীতে দক্ষিণের রাজ্য দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু হতে আরম্ভ করে।[৩] সেইসময় পর্তুগীজ খ্রীস্টানরা তাদের নিজ দেশের রাজার পক্ষে ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলসমূহে দুর্গ নির্মাণের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়। ৯০৪ হিজরীতে পর্তুগীজ খ্রীস্টানদের[৪] চারটি জাহাজ কান্দ্রিনা[৫] ও কালিকট উপস্থিত হয়। পর্তুগীজরা সমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের অবস্থা[৬] সম্পূর্ণ নির্ধারণ ক'রে ফিরে যায়। পরের বৎসর ছয়টি পর্তুগীজ-জাহাজ কালিকট[৭] যায় ও পর্তুগীজরা সেখানে জাহাজ থেকে নেমে তথাকার শাসনকর্তাকে—যাকে সামুরি বলা হত—আরবের মুসলমানদের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করার প্রার্থনা করে এবং বলে যে, তারা মুসলমানদের অপেক্ষা অধিক মুনাফা দেবে। সামুরি তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু খ্রীস্টানরা বাণিজ্যে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করায় সামুরি[৮] ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের (খ্রীস্টানদের) হত্যা করার আদেশ দেন। সত্তর জন নেতৃস্থানীয় খ্রীস্টান নিহত হয়। বাকী লোক নিজেদের রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র জাহাজে আরোহণ ক'রে কোচিন[৯] শহরের সন্নিকটে অবতরণ করে। কোচিনের রাজার সঙ্গে সামুরির বিবাদ ছিল। সেখানে তারা একটি দুর্গ তৈরী করার অনুমতি লাভ করে এবং অল্পদিনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ তৈরী করে ও সমুদ্রতীরবর্তী একটি মসজিদ ভেঙে তদস্থলে একটি গীর্জা তৈরী করে।[১০] ইতিমধ্যে কানোর বন্দরের অধিবাসীরাও তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করে। খ্রীস্টানরা সেখানেও একটি দুর্গ তৈরী করে। উদ্বেগমুক্ত হয়ে খ্রীস্টানরা মরিচ ও আদার ব্যবসায় আরম্ভ করে এবং অন্যদের[১১] এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হতে বাধা দেয়। এইজন্য সামুরি সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে কোচিনের রাজার পুত্রকে হত্যা ক'রে উক্ত অঞ্চল বিরান ক'রে ফিরে যান। নিহত শাসনকর্তার উত্তরাধিকারীগণ পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করেন ও বিরান অঞ্চলে পুনর্বাসন করেন এবং ফিরিঙ্গিদের পরামর্শ অনুযায়ী সমুদ্রে একটি নৌবহর রাখেন।[১২] সামুরি তজ্জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সমস্ত মালমাত্তা সৈন্যদের দিয়ে দু'বার বা তিনবার সসৈন্যে কোচিনের বিরুদ্ধে[১৩] অভিযান পরিচালনা করেন। প্রত্যেকবার পর্তুগীজরা কোচিনকে

সাহায্য করায় সাম্‌রি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। অসহায় হয়ে তিনি তখন ইজিপ্ট, জেদ্দা, দক্ষিণ ও গুজরাটের শাসনকর্তাদের নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং মুসলমানদের উপর খ্রীস্টানদের নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করেন ও তদ্বারা উক্ত শাসনকর্তাদের মধ্যে উৎসাহ ও ক্রোধের সঞ্চার করেন। অবশেষে সুলতান কাবসুর ঘোরি[১৪] আমীর হোসেন নামক একজন সেনাপতির অধীনে তেরোটি যুদ্ধ-জাহাজ ও অস্ত্রশস্ত্র ভারতীয় উপকূলে প্রেরণ করেন। গুজরাটের সুলতান মাহমূদ ও দক্ষিণের সুলতান মাহমূদ বাহমনিও বহুসংখ্যক জাহাজ সজ্জিত ক'রে দেও (দিউ), সুরাট, কোলাহ, দাবিল ও জাবিল বন্দরগুলোতে পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন। ইজিপ্টের জাহাজগুলো প্রথমে দেও বন্দরে পোঁছে গুজরাটের জাহাজগুলোর সঙ্গে মিলিত হয়ে পর্তুগীজদের আড্ডা জাবিল বন্দর অভিমুখে অগ্রসর হয়। সাম্‌রির কতক-গুলো জাহাজ এবং গোয়া ও দাবিলের কতকগুলো জাহাজও তাদের সঙ্গে মিলিত হলে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। কিন্তু হঠাৎ এক জাহাজপূর্ণ পর্তুগীজ নিঃশব্দে পশ্চাদ্দিক থেকে অগ্রসর হয়। পর্তুগীজরা কামান থেকে গোলাবর্ষণ ক'রে সমুদ্রকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে। দেও-এর শাসন-কর্তা মালিক আইয়াজ ও আমীর হোসেন তাদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেন; কিন্তু তাতে কোন সুফল হয় নাই। ইজিপ্টের কয়েকটি পুরাতন রণতরী ধৃত হয় এবং মুসলমানেরা শাহাদত বরণ করে ও পর্তুগীজরা বিজয়ী হয়ে নিজেদের বন্দরে ফিরে যায়। এই সময় রুমের (তুর্কীর) সুলতান সলিম থাকান[১৫] ইজিপ্টের ঘোরিয়া সুলতানকে[১৬] পরাজিত করলে তাঁর রাজত্ব শেষ হয়ে যায়। এই কারণে যুদ্ধের মূল হোতা সাম্‌রি নিরাশ হয়ে পড়েন ও পর্তুগীজরা তখন পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করে। ৯১৫ হিজরীর রমজান মাসে পর্তুগীজরা কালিকট গিয়ে তথাকার জামে মসজিদ পুড়িয়ে দেয় ও সমগ্র নগরী লুণ্ঠন করে। কিন্তু, পরদিন মালাবারের অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে খ্রীস্টানদের আক্রমণ করে ও ৫০০ নেতৃস্থানীয় পর্তুগীজকে হত্যা করে এবং অন্য অনেককে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারে। তলোয়ারের আঘাত থেকে যারা রক্ষা পেয়েছিল তারা

কোলাম[১৭] বন্দরে পলায়ন করে এবং তথাকার প্রধানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে শহর থেকে অর্ধ ফারসাখ দূরে একটি দুর্গ তৈরী করে ও সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে। সেই বৎসরেই তারা[১৮] ইউসুফ আদিল শাহের[১৯] অধীনস্থ গোয়া বন্দর বলপূর্বক দখল করে। কিন্তু পরে আদিল শাহ তাদের সঙ্গে আপোষ ক'রে বন্দরটি ফেরত পান। কিন্তু, অল্পদিন পরে পর্তুগীজরা তথাকার শাসনকর্তাকে প্রভূত অর্থ দিয়ে উক্ত বন্দরটি আবার অধিকার করে ও সেখানে তাদের রাজধানী স্থাপন করে। পরে তারা স্থানটিকে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করে। এই হীনতা ও দুঃখে ৯২১ হিজরীতে সামুরির মৃত্যু হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী ভ্রাতা বিরোধ ত্যাগ করেন ও পর্তুগীজদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করেন এবং তাদের কালিকট শহরের নিকটে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠার অধিকার দেন এই শর্তে যে, প্রতি বৎসর (তাঁর রাজ্য থেকে) চার জাহাজ মরিচ ও আদা আরবীয় বন্দরগুলোতে রফতানী করার অধিকার তাঁর থাকবে। কিছুদিন পর্তুগীজরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। কিন্তু দুর্গ নির্মাণ শেষ হওয়ার পর পর্তুগীজরা উক্ত বাণিজ্যে বাধা দিতে থাকে ও মুসলমানদের উপর নানা প্রকার অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে থাকে। অনুরূপভাবে কাদানক্লোরের[২০] ইহুদীরা সামুরির দুর্বলতার সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে সীমা অতিক্রম করতঃ বহুসংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে। সামুরি তাঁর অতীত নীতির জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রথমে কাদানক্লোরের দিকে অগ্রসর হন এবং ইহুদীদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেন। অতঃপর মালাবারের সকল মুসমানদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি পর্তুগীজদের কালিকট দুর্গ অবরোধ করেন এবং যুদ্ধে তাদের পরাজিত ক'রে প্রচণ্ড আক্রমণ দ্বারা দুর্গ অধিকার করেন। ফলে মালাবারের মুসলমানদের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং পর্তুগীজদের নিকট থেকে অনুমতিপত্র না নিয়েই নিজেরা মরিচ ও আদা আরবীয় বন্দরসমূহে রফতানী করতে থাকে। ৯৩৮ হিজরীতে পর্তুগীজরা কালিকট থেকে ছয় ক্রোশ দূরে জালিয়াতে এক বন্দর তৈরী করে এবং সেই কারণে মালাবার থেকে জাহাজ যাতায়াতের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে ঐ সময়ে বুরহান নিজাম শাহের শাসন-

কালে খ্রীস্টানরা[২১] জাবিল বন্দরের সন্নিকটে রহিকুণ্ডা নামক স্থানে একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা ক'রে সেখানে বসবাস করতে থাকে। ৯৪৩ হিজরীতে কাদান-ক্লোরেও একটি দুর্গ তৈরী ক'রে খ্রীস্টানরা বিশেষ শক্তি অর্জন করে। এই সময় তুর্কীর সুলতান সলিমের[২২] পুত্র সুলতান সোলায়মান পর্তুগীজদের ভারতীয় বন্দরগুলো থেকে বিতাড়িত ক'রে সেগুলো নিজে দখল করার পরিকল্পনা করেন। তখন এডেন বন্দর ভারতের নৌ-বাণিজ্যের প্রবেশ-পথ ছিল। সেইজন্য প্রথমে উক্ত স্থান অধিকার ও পরে ভারতীয় বন্দরসমূহে আসবার জন্য সুলতান একশত যুদ্ধ জাহাজসহ তাঁর উজীর সুলায়মান পাশাকে প্রেরণ করেন। সেই বৎসর সুলায়মান পাশা এডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রে শেখ দাউদকে হত্যা করেন ও উক্ত বন্দর অধিকার করেন। পরে সেখান থেকে দেও বন্দরে এসে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। তিনি বন্দরটি প্রায় অধিকার ক'রে এনেছিলেন এমন সময় তাঁর খাদ্যদ্রব্য ও অর্থের অভাব হয়। সুতরাং তিনি উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ রেখেই তুরস্কে ফিরে যান। ৯৬৩ হিজরীতে পর্তুগীজরা হরমুজ,[২৩] মস্কট, সুমাত্রা, মালাক্কা,[২৪] মিলাফোর, নাক, ফতন, নাশ্‌কুর, সিলোন্ ও বাংলা থেকে চীন সীমান্ত পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করে ও বহু স্থানে দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সুলতান আলী আখী বলপূর্বক সুমাত্রার দুর্গ অধিকার করেন এবং সিলোনের শাসনকর্তা পর্তুগীজদের পরাজিত ক'রে তাঁর দেশে তাদের অত্যাচার বন্ধ করেন। কালিকটের শাসনকর্তা সামুরি কোণঠাসা হয়ে আলী আদিল শাহের নিকট দূত পাঠান ও তাঁর রাজ্য থেকে পর্তুগীজ বিতাড়নের জন্য তাঁকে প্রবুদ্ধ করেন। ৯৭৯ হিজরীতে সামুরি যুদ্ধ ক'রে জালিয়াত দুর্গ অধিকার করে এবং নাজিম ও আদিল শাহ রহিকুণ্ডা ও গোয়া[২৫] অভিমুখে অগ্রসর হন। সামুরি তাঁর লোকলস্করের সাহস ও বীরত্বের জন্য জালিয়াত দুর্গ অধিকার করেছিলেন। কিন্তু, নাজিম শাহ ও আদিল শাহ তাঁদের অর্থলোভী ও আনুগত্যহীন কর্মচারীদের কার্যকলাপের দরুন পর্তু-গীজদের নিকট থেকে ঘুষ নিয়ে উদ্দেশ্য সাধন না করেই ফিরে যান। সেইসময় থেকে পর্তুগীজরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করার নিশ্চিত নীতি[২৬] অনুসরণ করে ও অনেক অত্যাচার করে। একদা বাদশাহ জালাল-

উদ-দীন মুহম্মদ আকবরের কতকগুলো জাহাজ পর্তুগীজদের বিনা অনুমতি-পত্রে মক্কায় গিয়েছিল এবং জেদ্দা থেকে ফেরবার পথে পর্তুগীজরা সেগুলো লুঠ করে, মুসলমানদের উপর হীন অত্যাচার করে এবং আদিল শাহের অধীনস্থ আদিলাবাদ ও ফারাবিন নগরদ্বয় লুঠ ও সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। এবং, ব্যবসায়ীর বেশে দাবিল বন্দরে এসে প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা উক্ত বন্দর অধিকার করার মতলব করে। কিন্তু, তখন সিরাজের অনেক বণিক খাজা আইন-উল-মুল্‌ক্‌ তথাকার গবর্নর ছিলেন। তিনি তাদের মতলব জানতে পেরে ১৫০ জন নেতৃস্থানীয় পর্তুগীজকে হত্যা করেন ও তাদের বিশৃংখলার অগ্নি নির্বাপিত করেন।

দ্বিতীয় ভাগ

বাংলা ও দক্ষিণ প্রভৃতি অঞ্চলে ইংরেজ খ্রীস্টানদের প্রাধান্যের বিবরণ

জ্ঞানী গবেষণাকারীগণ অবহিত হউন যে, জালাল-উদ-দীন মুহম্মদ আকবর বাদশাহের[২৭] জাহাজগুলো পর্তুগীজ খ্রীস্টানরা যখন দখল করে, তখন থেকে বাদশাহ আরব ও আযমে জাহাজ প্রেরণ সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে দেন। কারণ, পর্তুগীজদের নিকট থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে জাহাজ প্রেরণ বাদশাহ অসম্মানজনক মনে করেছিলেন; অথচ উক্তরূপ অনুমতিপত্র ব্যতীত জাহাজ প্রেরণ দ্বারা যাত্রীদের জীবন ও তাদের সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু নওয়াব আবদ-উর-রহিম খান-ই-খানান[২৮] প্রমুখ বাদশাহের আমীরগণ পর্তুগীজ খ্রীস্টানদের নিকট থেকে অনুমতি-পত্র নিয়ে উপরোক্ত অঞ্চলের বন্দরসমূহে জাহাজ প্রেরণ করতেন। নূর-উদ-দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পর ইংরেজ খ্রীস্টানদের সুরাটে[২৯]—যে অঞ্চল গুজরাটের[৩০] অন্তর্ভুক্ত ছিল—বসবাস করার অনুমতি দেন। ইংরেজ খ্রীস্টানগণের এবং পর্তুগীজ খ্রীস্টান ও ফরাসী খ্রীস্টানদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাসে সম্পূর্ণ পার্থক্য ছিল; এবং ইংরেজরা তাদের রক্তপাতের জন্য সর্বদা উদগ্রীব ছিল। ভারতীয় বন্দরগুলোর মধ্যে সুরাটেই ইংরেজরা প্রথম বসতি স্থাপন করে। ইতিপূর্বে ইংরেজ খ্রীস্টানরা জাহাজ-যোগে পণ্যদ্রব্য ভারতের বন্দরগুলোতে এনে সেগুলো বিক্রি ক'রে নিজেদের দেশে ফিরে যেতো। সুরাটে স্থায়ী হওয়ার পর ইংরেজ-খ্রীস্টানরাও খ্রীস্টান-পর্তুগীজ ও ফরাসী প্রভৃতির মতো দক্ষিণে[৩১] ও বাংলায়[৩২] বিভিন্ন স্থানে ক্রমশঃ কুঠি স্থাপন করে এবং তারা (ইংরেজরা) অন্যদের মতো শুল্ক দিত। বাদশাহ আওরঙ্গজেব আলমগীরের আমলে

ইংরেজরা আনুগত্যপূর্ণ কার্য করায় এক বাদশাহী ফরমান[৩৩] দ্বারা তাদের সাধারণভাবে বাদশাহের রাজ্যে, বিশেষতঃ বাংলায় কুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন এবং পূর্ব-বর্ণিতরূপে জাহাজে আনীত পণ্যদ্রব্যসমূহের শুল্ক তিন হাজার টাকার পরিবর্তে মাফ করেন। কলকাতা প্রতিষ্ঠার বিবরণ পূর্বে দেয়ার সময় এ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এই সময় থেকে বাংলায় ইংরেজদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

১১৬২ হিজরীতে নিজাম-উল-মুল্‌ক আসফ জা'র দৌহিত্র নওয়াব মুজফ্‌ফর জং আরকটের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হোসেন দোস্ত ওরফে চাঁদের প্ররোচণায় ফরাসী খ্রীস্টানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আর্‌কট অধিকারের উদ্দেশ্যে আনোয়ার-উদ-দীন খান সাহামত জং গোপামনিকে আক্রমণ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি নওয়াব নিজাম-উল মুল্‌ক আসফ জা'র আমল থেকে আরকটের নাজিম ছিলেন। এক প্রচণ্ড যুদ্ধে নওয়াব সাহামত জং সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও নিহত হন। নওয়াব আসফ জা'র মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় পুত্র নিজাম-উদ-দৌলা দক্ষিণের মসনদে গদিনশিন হওয়ার পর ভাগ্নের বিরোধিতার সংবাদ পেয়ে সত্তর হাজার অশ্বারোহী ও একলক্ষ পদাতিক সৈন্যসহ তাঁকে দমন করার জন্য অগ্রসর হন। ১১৬৩ হিজরীর ২৬শে রবি-উল-আউয়াল তারিখে বুলচারি (পণ্ডিচেরি) বন্দরে যুদ্ধ হয় এবং তাতে নওয়াব নিজাম-উদ-দৌলা জয়ী ও মুজফ্‌ফর জং বন্দী হন। নিজাম-উদ-দৌলা বর্ষাকাল আর্‌কটে অতিবাহিত করেন। বুলচারির (পণ্ডিচেরির) খ্রীস্টানরা নিজাম-উদ-দৌলার অধীনস্থ কার্নাটিকের হিম্মত খান ও অন্য আফগান সেনা-পতিদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে এদের বহু অর্থ ও জমির লোভ দেখিয়ে হস্তগত করে। এই বিশ্বাসঘাতকেরা বুলচারির (পণ্ডিচেরির) খ্রীস্টানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এবং ১১৭৪ হিজরীর ১৬ই মুহর্‌রম তারিখে বিদ্রোহ করে ও এক নৈশ-আক্রমণে নওয়াব নিজাম-উদ-দৌলাকে হত্যা করে। নওয়াব নিজাম-উদ-দৌলাকে হত্যা করার পর আফগানরা ও খ্রীস্টানরা (ফরাসী) নওয়াব মুজফ্‌ফর জংকে মসনদে বসায়। মুজফ্‌ফর জং আফগানদের একটি বৃহৎ দলসহ বুলচারি (পণ্ডিচেরি) নিয়ে বহুসংখ্যক ফরাসী খ্রীস্টানকে

গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে নিয়োগ করেন। সেই বৎসরই আফগান ও খ্রীস্টানদের এক বৃহৎ সৈন্যদলসহ তিনি হায়দরাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং আর্‌কট সীমান্ত অতিক্রম ক'রে আফগানদের অঞ্চলে উপস্থিত হন। ভাগ্যচক্রে আফগানদের সঙ্গে মুজফ্‌ফর জং-এর বিরোধ উপস্থিত হয় ও এর ফলে যুদ্ধ হয়। উক্ত বৎসরের ১৭ই রবি-উল-আউয়াল তারিখে উভয়পক্ষ যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হয়। একদিকে মুজফ্‌ফর জং ও ফরাসীরা এবং অন্যদিকে ছিল আফগানরা। আনুগত্যহীনতার ফলস্বরূপ হিম্মত খান ও অন্য আফগান সেনাপতিরা যুদ্ধে নিহত হয়। সেইসঙ্গে মুজফ্‌ফর জং-এর চক্ষেও একটি তীর বিদ্ধ হওয়ায় তিনিও নিহত হন। এরপর ফরাসী খ্রীস্টানরা আসফ জা'র তৃতীয় পুত্র আমীর-উল-মুমালিক সালাবত জং-এর অধীনে চাকুরী নেয় এবং সিকাকুল, রাজবন্দরি প্রভৃতি স্থান জায়গীর-স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের প্রভাব এতই বৃদ্ধি পায় যে, দক্ষিণে তাদের হুকুমই চালু হতে থাকে। দক্ষিণের বন্দরগুলোতে যাতায়াত করা সত্ত্বেও ইতিপূর্বে কোনো মুসলমান শাসনকর্তা ফরাসী খ্রীস্টানদের চাকুরীতে নিয়োগ করেন নাই। মুজফ্‌ফর জংই ফরাসী খ্রীস্টানদের চাকুরী দিয়ে তাদের মুসলমান রাজ্যে প্রবেশ করতে দেন। ফরাসী খ্রীস্টানদের প্রভাব এতটা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের রক্ত-পিপাসু ইংরেজ-খ্রীস্টানরাও সাম্রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার আশা পোষণ করে এবং দক্ষিণের কতকগুলো স্থান অধিকারভুক্ত ক'রে সুরাট বন্দর নিজেদের দখলে রাখে ও বাংলার কুঠিগুলো সুরক্ষিত করে। ফরাসীরা আর্‌কটের সুবাদার নওয়াব আনোয়ার-উদ-দীন খানকে হত্যা ক'রে অন্য একজনকে নামে মাত্র প্রধান হিসেবে বসিয়ে দক্ষিণে কর্তৃত্ব করায় নওয়াব আনোয়ার-উদ-দীন খানের পুত্র নত্তয়াব মুহম্মদ আলী খান ইংরেজ প্রধানদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন। এরা নওয়াব মুহম্মদ আলী খানকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করতঃ ফরাসীদের নির্মূল করার চেষ্টা করে। ১১৭৪ হিজরীতে ইংরেজরা ফুলচারি (পণ্ডিচেরি) অবরোধ ও দখল করে এবং সম্পূর্ণ ধ্বংস করে। ফরাসীরা অপ্রত্যাশিতভাবে সিকাকুল, রাজবন্দরি ও অন্যান্য জায়গীর ত্যাগ করে। ইংরেজদের সহায়তায় নওয়াব মুহম্মদ আলী খান ইংরেজ

প্রধানদের অধীনে ওয়ালিজাহ্ আমীর-উল-হিন্দ মুহম্মদ আলী খান নাম নিয়ে আরকটের সুবাদারি মসনদে বসেন ও আরাম-বিলাসে জীবন যাপন করতে থাকেন। বাংলার মতো আরকট সুবাও তখন ইংরেজ প্রধানদের অধীনে ছিল।

পূর্বেই বিবৃত হয়েছে যে, বাংলার নাজিম নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলা অনভিজ্ঞতাবশত যখন মৌচাকে ঢিল মারেন, তখন তাঁকে স্বভাবতই মৌমাছির দংশনের দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়। এবং নওয়াব জাফর আলী খান বাংলার নিজামতে ইংরেজদের বিশ্বাস করে ও স্বীয় সহ-কর্মীরূপে গণ্য করায় ইংরেজরা এই সুবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা হস্তগত করে। যেহেতু দিল্লীর মুসলিম সাম্রাজ্যে সম্পূর্ণ ভাঙ্গন ধরেছিল, সেই-হেতু প্রত্যেক সুবায় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ অর্ধ-স্বাধীন সামন্তরূপে ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। এই সময় প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশগুলো ইংরেজ-প্রধানদের কর্তৃত্বাধীন ছিল। গবর্নর-জেনারেলরূপে ইংরেজ-প্রধান ইংলণ্ড থেকে এসে কলকাতায় থাকেন এবং রাজস্ব আদায়, দেওয়ানী ও ফৌজদারি বিচার ও ব্যবসায়ের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ ক'রে প্রত্যেক স্থানে পাঠান। কলকাতায় খালিসা কাছারি (সরকারের খাস জমির আদালত)[৩৪] প্রতিষ্ঠা ক'রে গবর্নর-জেনারেল প্রত্যেক জেলার রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করেন এবং জিলা-দায়রা (কালেক্টর) রাজস্ব আদায় ক'রে কলকাতায় পাঠান।

১১৭৮ হিজরীতে যখন ইংরেজরা আউধ ও এলাহাবাদের নাজিম নওয়াব উজীর-উল-মুল্‌ক্ শুজা-উদ-দৌলার সঙ্গে যুদ্ধে[৩৫] বিজয়ী হয়, তখন উভয়পক্ষের মধ্যে সন্ধির শর্তানুযায়ী ইংরেজরা নওয়াব উজীরের এলাকা ত্যাগ করে। সেইসময় থেকে ইংরেজরা উক্ত সুবার উপরও প্রভাব বিস্তার করে এবং বানারস জেলাকে সুবা থেকে পৃথক ক'রে নিজেদের অধিকার-ভুক্ত করে। এবং, ইংরেজ সৈন্যরা নওয়াব উজীরের সুবায় তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী হিসেবে সৈন্যসংরক্ষণ ক'রে সুবার সকল বিষয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এই অবস্থার পরিণতি কী হয় তা বিধাতাই জানেন।

অনুরূপভাবে দক্ষিণেও ইংরেজরা পুরাতন কুঠি মাদ্রাজ দুর্গে বৃহৎ সৈন্যবাহিনী রাখে। তারা আরকট প্রদেশও পায়। তারা নিজাম আলী খানের অধীনে গঞ্জম, বরমপুর, ইছাপুর, সিকাকুল, ইসহাক পট্টম, কাসিম কোটাহ্ দুর্গ, রাজবন্দর, ইলোর, মছলি বন্দর (মসলিপট্টম), বাজোয়ারা, কোন্দ্‌বালি দুর্গ প্রভৃতি জায়গীররূপে পায় এবং এই সকল স্থানের জমিদারগণ ইংরেজদের নিকট রাজস্ব দেয়। যখনই নিজাম আলী খানের সৈন্য-সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখনই ইংরেজরা শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করে ও বাহ্যতঃ নিজাম আলী খানের আদেশ অমান্য করে না।

কিন্তু ইংরেজ-খ্রীস্টানগণ[৮৩] জ্ঞানী ও কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে সক্ষম। তাদের সৌজন্য ও সুবিবেচনার শক্তি আছে। সংকল্পের দৃঢ়তায় তারা অতুলনীয়; যুদ্ধে অথবা ভোজে তারা সর্বদা অতি-সতর্ক। প্রজাদের নিরাপত্তার জন্য সুবিচার প্রয়োগে, অত্যাচার দূরীকরণে ও দুর্বলের রক্ষায় তাদের সমকক্ষ কেউ নয়। প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তারা তা রক্ষা করে; মিথ্যাবাদীদের নিজ সমাজে প্রবেশ করতে দেয় না। তারা উদার, বিশ্বস্ত, সহনশীল ও সততাসম্পন্ন। তারা প্রতারণা শিক্ষা করে নাই; অথবা অসাধুতার পুস্তক পাঠ করে নাই। বিশ্বাসের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের বিশ্বাস, আইন ও ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না।

খ্রীস্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে যতো তর্ক সবই শেষ পর্যন্ত
একই লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায়;
সাম্রাজ্যের স্বপ্ন এক ও অভিন্ন; কেবল ব্যাখ্যায়
যা তফাৎ।

পরিশিষ্ট

ইংরেজী অনুবাদক মওলবী আবদুস সালাম সাহেবের টীকা।

প্রথম পর্ব

গ্রন্থকারের নিবেদন ও ভূমিকা

১. মুসলমানদের বিশ্বাস আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম হজরত মুহম্মদ (দঃ)-এর নূর বা জ্যোতি সৃষ্টি করেছিলেন; পরে অন্য সব সৃষ্টি করেন—যদিও পয়গম্বর দৈহিকরূপে অস্তিত্ব লাভ করেন অন্য সকল পয়গম্বরের পরে। এখানে এই বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এখানে ফাতেমীয় পরিবারের যাঁদের পূর্বপুরুষ স্বয়ং হজরত পয়গম্বর (দঃ) ছিলেন, সেই পরিবারের হোসেন ও অন্যান্যদের শাহাদতের উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ'র প্রশংসা দ্বারা পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাকে আরবীতে বলা হয় 'হাম্‌দ' এবং পয়গম্বর (দঃ)-এর প্রশংসাকে বলা হয় না'ত।

৪. গোলাম হোসেন সলিম জইদপুরী 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' অর্থাৎ বাংলার ইতিহাসের রচয়িতা। ইলাহি বখ্‌শ তাঁর 'খুরশিদ জাহান নামা' পুস্তকে গোলাম হোসেনের উল্লেখ করেছেন। মি. বিভারিজ ইলাহি বখশের বইয়ের একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় একটি প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছেন। তিনি (ইলাহি বখ্‌শ) বলেন, গোলাম হোসেন অযোধ্যায় জইদপুরের অধিবাসী ছিলেন; পরে মালদহে বাস করতে থাকেন এবং মি. জর্জ উড্‌নির অধীনে ডাক-মুন্সির চাকুরি করতেন। মালদহের দাতব্য ঔষধালয়ের উল্লেখ ক'রে ইলাহি বখ্‌শ বলেন, গোলাম হোসেনের বাড়ী ছিল এখানেই। উক্ত স্থানের 'কাক্ কোরবান

আলী' মহল্লায় গোলাম হোসেনের কবর আছে। তাঁর মৃত্যু হয় ১২৩৩ হিজরী অর্থাৎ ১৮১৭ সালে। গোলাম হোসেনের শিষ্য আবদুল করিম কর্তৃক উৎকীর্ণ কালনিরূপক বাক্য منشی ز عالم رفته থেকে ১২৩৩ হিজরী গণনা করা যায়। মি. উড্‌নি সেইসময় মালদহের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি বাণিজ্য-বিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মনে হয়।

৫. হাতিম আরবের ইয়েমনের রাজকুমার ছিলেন। বদান্যতার জন্য তিনি প্রাচ্যে সুপরিচিত।

৬. নওশেরোঁয়া ইরান অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের বাদশাহ ছিলেন। তিনি ছিলেন সাসানীয় বংশীয় ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন। 'জাফর নামার' গ্রন্থকার বুজুরচেমেহের অর্থাৎ বুজোর তাঁর উজীর ছিলেন। নওশেরোঁয়ার সুবিচার পৃথিবীতে প্রবাদবাক্যস্বরূপ হয়ে আছে।

৭. 'দিনার' স্বর্ণমুদ্রা—ওজন এক 'মিসকাল' অর্থাৎ ১৩/৭ দিরহাম। বিশদ বিবরণীর জন্য 'আইন-ই-আকবরি' প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য (ব্লকম্যানের অনুবাদ ৩৬ পৃঃ)।

৮. আমাদের গ্রন্থকার (গোলাম হোসেন) বাংলাকে 'জিন্নাত-উল-বিলাদ' অথবা 'প্রদেশসমূহের বেহেশ্‌ত' আখ্যা দিচ্ছেন। এই শব্দটির ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে—যতটা ভিত্তি আছে বাদশাহ হুমায়ুন কর্তৃক বাংলার গৌড় নগরীকে 'জিন্নাত-আবাদ' নামকরণ করায়। (তবকত-ই-আকবরিঃ ইলিয়টের হিস্টরি অব ইণ্ডিয়া, পঞ্চম খণ্ড, ২০১ পৃঃ ; আইন-ই-আকবরি, দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৩ পৃঃ ; এবং বদাউনি, প্রথম খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। যাইহোক, উর্বরতা, উৎপাদনের প্রাচুর্য ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুলতার জন্য বাংলা 'জিন্নাত-উল-বিলাদ' বা 'প্রদেশসমূহের বেহেশ্‌ত' আখ্যার যোগ্য ছিল। মুসলমান শাসন আমলে বাংলা দিল্লীর বাদশাহদের সর্বাধিক রাজস্ব জোগাতো এবং তজ্জন্য দিল্লীর শাহজাদাগণ এখানকার সুবাদারির লোভ করতেন। বাদশাহ শামসুদ্দীন আলতামস

ও গিয়াসুদ্দীন বলবনের পুত্রগণ থেকে আরম্ভ ক'রে দিল্লীর মুঘল বাদশাহদের পরিবারস্থ শাহজাদাগণ এই সুবার সুবাদারীর জন্য আগ্রহশীল ছিলেন। বৃটিশ আমলেও বাংলা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুরের সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চল ভারতের বৃহত্তম প্রশাসনিক বিভাগ; এই বিভাগে সমগ্র বৃটিশ ভারতের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যার বাস এবং ১৭ বা ১৮ মিলিয়ন টাকা অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সামগ্রিক রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ আদায় হয়ে থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, মুঘল সম্রাটদের সরকারী দলিলপত্রেও একথা উল্লেখ করা হয়েছে (১৯০৯ সালের জার্নাল্র অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, Vol. LXX, প্রথম খণ্ড, ১ নম্বর বা প্রথম সংখ্যা, ২১-২২ পৃঃ দ্রঃ)।

৯. 'রিয়াজ-উস-সালাতিন'—ক্রোনোগ্রাম থেকে ১২০২ হিজরী মোতাবেক ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ পাওয়া যায়। এই বৎসরে ইতিহাসটি সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। ফার্সী 'রওজা' শব্দের অর্থ উদ্যান; রওজার বহুবচন 'রিয়াজ' অর্থাৎ উদ্যানসমূহ। 'সালাতিন' অর্থ রাজাগণ। সুতরাং 'রিয়াজ-উস-সালাতিন' অর্থ হয় রাজাদের উদ্যানসমূহ। দুঃখের বিষয় যে, গ্রন্থকার তাঁর ইতিহাসের সূত্র-পুস্তকসমূহের উল্লেখ করেন নাই। তবে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ থেকে দেখা যায় তিনি মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তবকত-ই-নাসিরি', জিয়া-উদ-দীন বর্ণিত ও সিরাজ আফিফের 'তারিখি ফিরোজ শাহী' (এতে ১১৯৮ থেকে ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার বিবরণীর উল্লেখ আছে), নিজাম-উদ-দীন আহমদের 'তবকত-ই-আকবরি' (এতে ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলার বিবরণী আছে), আবুল ফজল প্রণীত 'বদাওনি' ও 'আকবর নামা' (আকবরের আমলের বিবরণ) এবং 'তুজুক', 'ইকবাল নামা', 'পাদশাহ নামা', আলমগীর নামা' ও 'মা'সিরে আলমগীরি' প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সলিম বাংলা সংক্রান্ত আরো কতকগুলো স্বল্পপরিচিত

পুস্তক দেখেছিলেন ; সম্ভবতঃ সেগুলো বর্তমানে প্রচলিত নেই, অথবা হয়ত পাণ্ডুলিপি আকারে ছিল। আমাদের গ্রন্থকার মাঝে মাঝে লিখেছেন: 'আমি একটি ছোট বইতে দেখেছি'। তিনি কান্দাহারের হাজী মোহাম্মদ লিখিত একটি পুস্তকের উল্লেখ করেছেন ; বইটি এখন পাওয়া যায় না বলে মনে হয়। গ্রন্থকার গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্তম্ভাদি, মসজিদসমূহ ও মাজারসমূহের পুরাতন অন্তর্লিখনের পাঠোদ্ধারে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করেছেন বলে মনে হয়। এই কারণে এই ইতিহাসের মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে ও অনুরূপ অন্যান্য পুস্তকের অপেক্ষা উন্নততর এবং আমাদের গ্রন্থকারকে প্রাচীন নিদর্শনাদি সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানকারীদের ও গবেষকদের মধ্যে প্রথম সারিতে স্থান দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, গোলাম হোসেন প্রধানতঃ মুসলিম বাংলার ঐতিহাসিক। কারণ, তাঁর পূর্বের ও পরের গ্রন্থকারগণ বাংলার ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অংশ সম্বন্ধে লিখেছেন। অথচ গোলাম হোসেনের বিবরণীতে প্রাচীনতম পৌরাণিক আমল থেকে বৃটিশ শাসনের আদিকাল পর্যন্ত বিবরণ দিয়েছেন। তবে, তিনি বাংলার মুসলিম শাসকবর্গের অধিকতর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। স্টুয়ার্টের বাংলার ইতিহাস অনেকটা 'রিয়াজের' ভিত্তিতে লিখিত; যদিও স্টুয়ার্ট সপ্তদশ শতাব্দীর দক্ষিণী ঐতিহাসিক ফেরেশতার স্বল্পসঠিক বিবরণীর উপর নির্ভর করেছেন। বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ব্লকম্যান তাঁর Contributions to the History and Geography of Bengal পুস্তকে লিখেছেন, "বাংলার মুসলমানদের ফার্সী ভাষায় লিখিত ইতিহাসগুলোর মধ্যে 'রিয়াজে' পূর্ণতম বিবরণী থাকায় এটাকে অত্যন্ত মূল্য দেয়া হয়।" অধ্যাপক ব্লকম্যান আরো বলেন, "প্রাথমিক আমলের বিবরণীর জন্য গোলাম হোসেন সলিম বর্তমানে অজ্ঞাত পুস্তকসমূহ ব্যবহার করেছেন ; তথাপি তিনি মূল্যবান তারিখসমূহের উল্লেখ করেছেন যেগুলো সমকালীন অন্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয়। সলিম এছাড়াও, গৌড় জেলার পুরাতন নিদর্শনসমূহের বিশেষ ব্যবহার করেছেন।"

১০. মুসলমানেরা শুক্রবারে, ঈদের নামাজে ও অন্যান্য বিশেষ সময়ের নামাজে খুত্‌বা পাঠ করে। কারো নামে খুত্‌বা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলনকে মুসলমানেরা রাজকীয় ক্ষমতার প্রতীকরূপে গণ্য করে।

১১. চাঘ্‌তাই খান ছিলেন চাঙ্গেজ খানের অন্যতম পুত্র। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ বাবুর মায়ের তরফে চাঘ্‌তাই খানের বংশধর ছিলেন। সেই কারণে ভারতের মুঘল সম্রাটগণ 'মুঘলের' পরিবর্তে চাঘ্‌তাই বংশের বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন। পৈতৃক অথবা মাতৃগোষ্ঠীর তরফে উন্নত বংশীয়রূপে পরিচয় দেওয়ার জন্য মুসলমানেরা প্রথা ও নীতিগতভাবে 'মুঘল' শব্দটি তেমন সম্মানজনক গণ্য না করায় এই পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হতেন।

১২. নাজিম পদ মুঘল সরকার অথবা শের শাহ্ সৃষ্টি করেছিলেন (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৬৫ পৃঃ)। প্রত্যেক প্রদেশ বা সুবাতে মুঘল সরকার দু'জন প্রশাসনিক প্রধান নিযুক্ত করতেন—একজন নাজিম, অন্যজন দেওয়ান। নাজিম ছিলেন প্রদেশের গবর্নর বা প্রতিনিধি। তিনি প্রদেশের প্রশাসনিক ও সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ছিলেন এবং ফৌজদারি বিচার করতেন। দেওয়ান দিল্লীর বাদশাহের সরাসরি অধীনস্থ ছিলেন; গবর্নরের অধীন ছিলেন না; তিনি রাজস্ব বিভাগের ও রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান ছিলেন এবং দেওয়ানি বিচার বিভাগের ভার ছিল তাঁর উপর। এইরূপে প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় দু'টো স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিভাগ ছিল। নাজিমের অধীনে নায়েব-নাজিম, সরলস্কর, ফৌজদার, কোতোয়াল ও থানাদার শ্রেণীর কর্মচারীরা প্রশাসনিক বিভাগে কাজ করতো। বিচার বিভাগে দেওয়ানের অধীনে ছিল কাজী-উল-কুজ্জাত (প্রধান বিচারপতি), কাজী, মুফ্‌তি, মীর-আদল ও সদর্ (এদের উপরে ছিলেন সদরে-সদর্) এবং রাজস্ব বিভাগে ছিল নায়েব বা স্থানীয় দেওয়ান, আমিল, শিকদার, কার্‌কুন, কানুনগো ও পাটোয়ারি শ্রেণী। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচার বিভাগদ্বয় প্রায়ই নাজিম ও দেওয়ান থেকে স্বাধীন ছিল; এঁরা দিল্লীর বাদশাহী সদ্‌র-ই-সদর অথবা

সদর-ই-কুন, অথবা সদর-ই-জাহানের (আইন-উজীর) অধীন থাকতেন। শেষোক্ত পদাধিকারী তাঁর সৎ আচরণের জন্য স্বয়ং মুঘল বাদশাহের নিকট দায়ী থাকতেন (আইন, ২য় খণ্ড, ৩৭-৪৯ পৃঃ এবং ১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ দ্রঃ)।

১৩. 'সুবা' নামের উৎপত্তি হয় বাদশাহ আকবরের আমলে। তিনি দশ-বার্ষিকী বন্দোবস্তির সময় রাজস্ব বিভাগগুলোকে নিম্নরূপে বিভক্ত করেছিলেনঃ কতকগুলো 'সরকারের' সমন্বয়ে 'সুবা' গঠিত; 'সরকার' কতকগুলো 'দস্তরের' সমন্বয়ে গঠিত ; দস্তর (যেটাকে স্যার হেনরি ইলিয়ট তাঁর Glossary-তে 'দস্তর-ই-আমলের' সংক্ষিপ্ত নাম একটি জেলার সমান বলে ব্যাখ্যা করেছেন) কতকগুলো পরগণা বা মহলের সমন্বয়ে গঠিত ; পরগণা বা মহল মুঘল সম্রাটদের অধীনে স্থানীয় প্রধানদের অধীনস্থ এক একটি রাজস্ব বিভাগের প্রাথমিক স্তর। আকবরের আমলের পূর্বে পরগণা অপেক্ষা বৃহত্তর রাজস্ব বিভাগ-সমূহকে 'শা'ক', 'খাত্তাহ্', 'আরসাহ্', 'দিয়ার', 'ভেলায়েত', 'ইক্তা', 'বিলাত' ও 'মামলকাত' আখ্যা দেয়া হোত। এইজন্য চতুর্দশ শতাব্দীর মুসলমানদের রচিত ইতিহাসে আমরা 'শা'ক-ই-সামা', 'খাত্তা-ই-আউধ', 'আরসা-ই-গোরখপুর', 'দিয়ার' বা 'ভেলায়েতে লখ্‌নৌতি', 'ভেলায়েতে মিয়াঁ-দোয়াব', 'ইকতা-ই-কারা', 'বিলাদে বং', 'মামলকাতে লখ্‌নৌতি' প্রভৃতি নামের পরিচয় পাই (ইলিয়টের Glossary ; 'আইন' দ্বিতীয় খণ্ড, ১১৫ পৃঃ ; 'তবকত-ই-নাসিরি', ১৪৮ ও ২৬২ পৃঃ দ্রঃ)।

১৪. মুসলমান জ্যোতির্বিদ ও ভূগোলবিদগণ পৃথিবীকে সাতটি অংশে বিভক্ত ক'রে প্রত্যেকটিকে 'ইক্লিম' অথবা 'আবহাওয়া' নাম দিয়েছিলেন (আইন-ই-আকবরি, জেরেটের অনুবাদ, তৃতীয় খণ্ড ৪৩ পৃঃ)।

১৫. ইসলামাবাদ বা চিটাগাং। এই জেলা প্রথমে বাংলার স্বাধীন মুসলমান সুলতানগণ জয় করেছিলেন। প্রায় ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দ কালে যখন ইবনে বতুতা চিটাগাং আসেন তখন উক্ত স্থান সোনারগাঁওয়ের

সুলতান ফখর-উদ-দীনের অধীন ছিল। উমিদ খানের নেতৃত্বে মুঘলেরা ১৬৬৫ খ্রীস্টাব্দে এই স্থান পুনরায় জয় করে ও নওয়াব শায়েস্তা খান এই স্থানের নাম পরিবর্তন ক'রে ইসলামাবাদ রাখেন (ব্লকম্যানের Contributions to History and Geography of Bengal এবং 'আলমগীর নামা', ৯৪০ পৃঃ ও 'আইন', দ্বিতীয় খণ্ড, ১২৫ পৃঃ দ্রঃ)।

১৬. তেলিয়াগড়ি একটি গিরিপথ। এর দক্ষিণে রাজমহল ও উত্তরে গঙ্গা নদী। পূর্বে এই গিরিপথটি বাংলায় প্রবেশের জন্য সামরিক কৌশলের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রস্তর-নির্মিত একটি বৃহৎ দুর্গের ধ্বংসাবশেষের অস্তিত্ব এখনো আছে; এর ভেতর দিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ গিয়েছে (হাণ্টারের Imp. Gazetteer, ১৩শ খণ্ড, ২৩৬ পৃঃ এবং 'আইন', ২য় খণ্ড, ১১৬ পৃঃ দ্রঃ)।

১৭. 'করোহ' অথবা 'কোশ'—'আইনে' লিখিত আছে, ১০০ 'তানাবে' এক 'কোশ'; ৫০ ইলাহি গজ বা ৪০০ বাঁশে এক 'তানাব'; ১২॥ গজে এক বাঁশ। শেরশাহ ৬০ 'জরিবে' এক 'কোশ' নির্দিষ্ট করেন; ৬০ সিকন্দরি গজে এক 'জরিব'। তিন 'কোশে' (ক্রোশে) হয় এক 'ফারসাখ' (আইন-ই-আকবরি, ২য় খণ্ড, ৪১৪ পৃঃ দ্রঃ)।

১৮. সরকার মাদারনের (মান্দারনের) সীমানা হচ্ছে—"অর্ধ বৃত্তাকারে পশ্চিম বীরভূমের 'নাগোর' থেকে রানিগঞ্জ হয়ে দামোদার (নদী) বরাবর বর্ধমানের উপর দিয়ে খন্দগোশ, জাহানাবাদ, চন্দ্রকোণা (পশ্চিম হুগলী জেলা) থেকে রূপনারায়ণ নদীর মুখে মণ্ডলঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সরকারে ১৭টি মহল ছিল ও রাজস্বের পরিমাণ ২৩৫,০৮৫ টাকা। (ব্লকম্যানের Contributions to History and Geography of Bengal; আইন-ই-আকবরি, ২য় খণ্ড, ১৪১ পৃঃ দ্রঃ)।

১৯. কালাপাহাড় ছিলেন বাংলার সুলতান সুলায়মান কররানির প্রসিদ্ধ সেনাপতি, দক্ষিণ উড়িষ্যার পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রসিদ্ধ

বিজেতা। ৯৯০ হিজরীতে কোলং ও গড়িতে উড়িষ্যার মাসুম ও কতলুর সঙ্গে আজিজ কোকার যে যুদ্ধ হয় তাতে বন্দুকের গুলির আঘাতে কালাপাহাড় নিহত হন। কালাপাহাড় কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের বিশদ বিবরণ 'মখজানি-আফগান' পুস্তকে বিবৃত হয়েছে। (আইন, ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃঃ, ২য় খণ্ড ১২৮ পৃঃ দ্রঃ)।

২০. বাংলার শেষ আফগান সুলতান দাউদের আমলে ইশা খাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। আবুল ফজল তাঁর 'আইন' পুস্তকে তাঁকে 'মর্‌জবানে ভাটি' এবং বারো জন বৃহৎ জমিদার বা ক্ষুদ্র রাজাদের তথা বারো ভুঁইয়ার প্রধান আখ্যা দিয়েছেন। ইশার গদি 'মসনদ-ই-আলী' নামে পরিচিত ছিল। ময়মনসিং-এর হায়বত নগর ও জংগলবাড়ীর দেওয়ানেরা ইশার বংশধর ব'লে দাবী করেন। আবুল ফজলের বিবরণী অনুসারে ভাটি পূর্ব-পশ্চিমে ৩০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। সুতরাং, এর মধ্যে সুন্দরবন ও মেঘনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুন্দরবন ও পারিপার্শ্বিক জোয়ার-প্লাবিত সমস্ত নিম্নভূমি (হিজলীসহ) এলাকাকে গ্রান্ট 'ভাটি' সংজ্ঞা দিয়েছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কখনো 'সুন্দরবন' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁরা হিজলী থেকে মেঘনা পর্যন্ত সমুদ্র-পার্শ্বস্থ এলাকাকে 'ভাটি' আখ্যা দিয়েছেন—এতে জোয়ার-প্লাবিত নিম্নভূমি অঞ্চলের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। (আইন-ই-আকবরি ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ; জে. এ. এস., ১৮৭৪ সালের ৩য় সংখ্যা ও ১৮৭৫ সালের ২য় সংখ্যা; 'আইন', ২য় খণ্ড, ১১৭ পৃঃ দ্রঃ)।

২১. 'আইনে' সুবে বাংলা ৭৮৭টি মহলের সমন্বয়ে ২৪টি সরকারে গঠিত এবং রাজস্বের পরিমাণ ৫৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫৯ হাজার, ১৯ দাম মোতাবেক ১৪,৯৬১,৪৮২ টাকা ১৫ আনা ৭ পাই উল্লিখিত হয়েছে। 'আইনে' দেখা যায়, এই সুবার স্থায়ী সামরিক বিভাগে ছিল ২৩,৩৩০ জন অশ্বারোহী, ৮০১,১৫০ জন পদাতিক সৈন্য, ১১৭০টি হস্তী, ৪২৬০টি বন্দুক, ৪৪০০টি নৌকা। সৈন্যদের সাধারণতঃ নগদ অর্থ দ্বারা বেতন না দেয়ায় ও সামরিক জায়গীর

দেয়ার কথা স্মরণ করলে এই সুদূরকালেও বাংলায় মুসলমান সামন্তগণের প্রচুর উপনিবেশ স্থাপনের বিষয় অনুমান করা যায়। (আইন-ই-আকবরি, ২য় খণ্ড, ১২৯ পৃঃ, ১ম খণ্ড ৩৭০ পৃঃ দ্রঃ)।

২২. মুসলমানদের আমলে বাংলার সীমানা ঃ

এই পুস্তক এবং 'আকবর নামা' ও 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি' পুস্তকদ্বয়ের বিবরণী অনুযায়ী বাংলার দক্ষিণে সমুদ্র ; উত্তরে পর্বতসমূহ (অর্থাৎ নেপাল, সিকিম ও ভূটানের দক্ষিণ দিকে) ; পূর্বে পাহাড়-সমূহ (অর্থাৎ চিটাগাং ও আরাকানের পাহাড়সমূহ) ; পশ্চিমে সুবে বিহার। তবে, স্বাধীন মুসলমান সুলতানদের আমলে (যথা, ইলিয়াস শাহ, ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দীন হোসেন শাহ এবং তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী নসরত শাহের আমলে) বাংলার মুসলমান রাজ্য এর ভৌগলিক সীমান্ত অপেক্ষাও বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যে উড়িষ্যা বা জাজ নগরের উত্তরাঞ্চল, কোচবিহার, কামরূপ বা পশ্চিম-আসাম ও আসামের পূর্বাঞ্চলের কিয়দংশ, বিহারের সমগ্র উত্তরাঞ্চল (বাংলার মুসলমান সুলতানদের একজন প্রতিনিধি পাটনার বিপরীত দিকে হাজিপুরে নিয়োজিত থাকায়), এবং সরকার মুঙ্গের ও বিহার-সহ বিহারের পূর্বাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল (জে. এ. এস. বি., ৩য় সংখ্যা, ১৮৭৩, ২২১-২২২ পৃঃ দ্রঃ)। বাংলার মুসলমান আফগান সুলতানদের মধ্যে শেষ সুলতানের পূর্ববর্তী সুলতান সুলায়মান কর্‌-রানির আমলে উড়িষ্যা বিজিত হয় ও বাংলা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

যখন বখতিয়ার খালজী বাংলা জয় করেন, তিনি দিল্লীর বাদশাহ কুত্‌ব উদ-দীন আইবেকের প্রতিনিধিরূপে দিনাজপুর, মালদহ, রংপুর, নদীয়া, বীরভূম ও বর্ধমানের অংশসমূহের সমন্বয়ে তৎকালে 'দিয়ারে-লখনৌতি' নামে পরিচিত অঞ্চলে শাসন করেছিলেন ; এবং বিহারও তাঁর অধীনস্থ ছিল (তবকত-ই-নাসিরি, ১৫৬ পৃঃ)। তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী দু'জন উত্তরাধিকারীর সময়েও এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। অতঃপর আমরা দেখতে পাই হুসাম-

উদ-দীন ইওয়াজ (ইনি সুলতান আলতামসের সমসাময়িক) তাঁর রাজ্যের সীমানা—পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও দক্ষিণে সাগরতীর পর্যন্ত বিস্তার করেছেন এবং সুলতান গিয়াস-উদ-দীন নাম নিয়ে স্বাধীন সুলতান-রূপে রাজত্ব করেছেন (তবকত-ই-নাসিরি, ১৬৩ পৃঃ)। 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'র ৮২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে যে, মুঘিস-উদ-দীন তুঘরলের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে বাদশাহ বলবন পূর্বদিকে সোনারগাঁও পর্যন্ত গিয়েছিলেন। এ থেকে দেখা যায় সোনারগাঁও তুঘরলের বাংলা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার ইব্‌নে বতুতা যখন চিটাগাং-এ এসেছিলেন তখন এই গুরুত্বপূর্ণ বন্দর সোনারগাঁওয়ের সুলতান ফখরুদ্দীনের অধীনে ছিল। বাংলার মুসলমান রাজাদের মুদ্রা সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা প্রসঙ্গে মি. টমাস উল্লেখ করেছেন যে, দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বাংলার সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল এবং বাগদাদ ও বসরা প্রভৃতি আরবীয় বন্দরসমূহের মধ্যে অবাধ নৌ-বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। এতে অনুমান করা যায় যে, মুসলমানদের বাণিজ্যিক তৎপরতা এবং উন্নততর সামরিক ও নৈতিক গুণাবলী সমগ্র বাংলায় মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করেছিল।

পরে, গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহের রাজত্বকালে আমরা দেখি, বাংলার মুসলমান রাজ্য এতো বিস্তৃত হয়ে পড়েছে যে, বাংলা থেকে বিহার পৃথক করতঃ স্বতন্ত্র একজন গবর্নরের অধীনে দেয়া হয়েছে এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাংলাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ; যথা—(১) পূর্ব-বাংলাকে 'দিয় রে সোনার-গাঁও' ; (২) পশ্চিম বাংলাকে 'দিয়ারে সাতগাঁও' এবং (৩) উত্তর ও মধ্য-বাংলাকে 'দিয়ারে লখনৌতি' করা হয়েছে। এই তিনটি প্রশাসনিক বিভাগের প্রত্যেকটিতে একজন ক'রে গবর্নর নিয়োগ করা হয়। তবে, লখনৌতির গবর্নরকে সর্বপ্রধান পদ দেয়া হয়, অর্থাৎ তিনি বাদশাহের 'ভাইসরয়' রূপে কাজ করতে থাকেন এবং অন্য দু'জন গবর্নর সাধারণভাবে তাঁর অধীন থাকেন (তারিখ-ই-

ফিরোজ শাহী, ৪৫১ পৃঃ)। কিন্তু এই অবস্থা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ, মুহম্মদ শাহ তুঘলকের শাসনকালে (তারিখি ফিরোজ শাহী ৪৮০ পৃঃ) বাংলায় আবার স্বাধীন মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পূর্ব-বর্ণিতরূপে সমগ্র উত্তর-বিহার ও দক্ষিণ বিহারের পূর্বাঞ্চল পুনরায় বাংলা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়; উড়িষ্যাও পরে এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আকবরের সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত এই অবস্থা চলতে থাকে। তাঁর আমলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা দিল্লীর মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় (তবকত-ই-নাসিরি; তারিখি ফিরোজ শাহী; আকবর নামা; ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং মি. টমাসের Initial Coinage of Bengal; জে. এ. এস. বি., ১ নং, ১৮৬৭ সাল ও ৪ নং, ১৮৭৩ সাল, ২২১-২২২ ও ৩৪৩ পৃঃ দ্রঃ)।

২৩. 'আইন-ই-আকবরি', ২য় খণ্ড, ১১৭ পৃঃ অনুরূপ বর্ণনা আছে।

২৪. এই সকল স্থানের পরিচয়ের জন্য জে. এ. এস. বি., ১৮৭২, ৪৯ পৃঃ দ্রঃ।

২৫. 'তবকত-ই-নাসিরি', ১৫৬ পৃষ্ঠায় 'মেচ' ও 'কোচ'। ১৮৭২ সালের জে. এ. এস., ৪৯ পৃঃ; 'আকবর নামা', ২০৭ পৃঃ; 'তুজুখ', ১৪৭ পৃঃ এবং 'পাদশাহ নামা', ২য় খণ্ড, ৬৪ পৃঃ দ্রঃ।

২৬. কামরূপের (তবকত-ই-নাসিরি, ১৬৩ পৃষ্ঠায় কামরূদ) মধ্যে ছিল আসামের পশ্চিমাঞ্চল; বাংলার রংপুর, রাঙামাটি (বর্তমানে গোয়ালপাড়া জেলায়) ও সিলহট। বখতিয়ার খিলজীর অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারী হুশাম-উদ-দীন ইওয়াজ ওরফে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে উক্ত রাজ্য প্রথম জয় করেন ও মুসলমানদের অধীনস্থ করেন (তবকত-ই-নাসিরী, ১৬৩ পৃঃ)। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত রাজ্যের রাজা নিলাম্বর বাংলার রাজা হোসেন শাহ কর্তৃক পরাজিত হন। প্রাচীনকালে কামরূপ যাদুবিদ্যা ও তথাকার নারীদের সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। কথিত হয়, বখতিয়ার খিলজী তিব্বত অভিযানের সময়

রংপুর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন [জে. এ. এস., ১৮৭২, ৪৯ পৃঃ ; আলমগীর নামা, ৬৭৮ ও ৭৩০ পৃঃ দেখুন, তাতে এটাকে হাজো (কোচ-হাজো), গোহাটি ও তদধীন বর্ণনা করা হয়েছে]।

২৭. ভুটান রাজ্যস্থ পর্বতমালাকে সাধারণভাবে 'তঙ্গিস্তান' আখ্যা দেয়া হয়। 'তঙ্গস' অর্থ গিরিপথ। আবুল ফজলও এই 'তাঙ্গন' ঘোড়ার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বাংলার নিম্নাংশে 'কোচের' নিকটবর্তী অঞ্চলে 'তাঙ্গন' নামক এক শ্রেণীর ঘোড়া পাওয়া যায়।" তাঙ্গন ঘোড়া সাধারণতঃ তেরো হাত উঁচু, অবয়ব খর্বকায়, বুক প্রশস্ত ও অত্যন্ত চটপটে।

২৮. মারি, মজমি, দফলা, ভিলান্দা ও নাগ গোষ্ঠীসমূহ—ভালিন্দা বা লান্ধা গোষ্ঠীকে 'আকাস' গোষ্ঠী বা উপজাতিরূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই সকল গোষ্ঠী অনার্য্য তিব্বত-বর্মী গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত ; এরা হিমালয়ের প্রান্ত অঞ্চলে বাস করতো ; এরা উত্তর-পূর্ব গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল। প্রাগৈতিহাসিক কালে এরা মধ্য-এশিয়ায় মঙ্গোল ও চীনাদের পূর্বপুরুষদের পাশাপাশি বাস করতো। তিব্বত-বর্মী গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত প্রধান প্রধান গোষ্ঠি হচ্ছেঃ (১) কাছারিরা ; (২) গারো ; (৩) তিপুরা বা মুরুঙ্গরা ; (৪) ভুটিয়া ; (৫) গুরুং ; (৬) মাগ্মি ; (৭) নেওয়ার ; (৮) লেপচা ; (৯) মিরি ; (১০) আকাস ; (১১) মিশমি ; (১২) নাগা ; (১৩) দফলা। (১৮৭২ সালের জে. এ. এস. পত্রিকার ৭৬ পৃষ্ঠার কর্নেল ডাণ্টনের Ethnology of Bengal এবং আলমগীর নামার ৭২২ পৃষ্ঠায় আসাম ও আসামীদের বর্ণনা দ্রষ্টব্য)।

২৯. নকলনবিস এখানে 'গনেশ্বর পাহাড় শ্রেণীর' পরিবর্তে এই ভুল নাম লিখেছেন (জে. এ. এস., ১৮৭২, ৭৬১ পৃঃ দ্রঃ)। 'আলমগীর নামায়' 'শ্রীনগর' উল্লিখিত হয়েছে, ৭২২ পৃঃ।

৩০. 'মাক্তিরানীকে' কামরূপের 'দেশরানী' নামক পরগণারূপে চিহ্নিত করা হয়েছে (১৮৭২ সালের জে. এ. এস., ৭৬ পৃঃ দ্রঃ)।

৩১. আহম প্রধানদের উক্তরূপে সমাধিস্থ করার বিবরণ তাদের কবর

খনন দ্বারা সমর্থিত হয়েছে (১৮৭২ সালের জে. এ. এস., ৮২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দেখুন)।

৩২. চীন বহুকাল এশীয়দের নিকট খুটাই বা খাটা অথবা খাটা ও মাচিন নামে পরিচিত ছিল।

৩৩. পিকিংকে 'খান বালিগ' নাম দেয়া হয়েছে। এর অর্থ মহান খানের দরবার। ভি-হার্বেলট ও ইউলের 'মার্কো পোলো' দেখুন।

৩৪. কিছুদিন পূর্বেও চিটাগাং আরাকান বা মগ-দেশের অন্তভুক্ত ছিল। এই অঞ্চল একটি বৃহৎ বৌদ্ধ-রাজত্ব ছিল। এর সংলগ্ন উত্তরে ছিল ত্রিপুরার হিন্দু-রাজ্য। 'আলমগীর নামার' ৯৪০ পৃষ্টায় আরাকানকে 'রাখং' ও তথাকার অধিবাসীদের 'মগ' উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৫. পেগু বর্তমানে রেঙ্গুন, বেসিন প্রভৃতি শহরের সমন্বয়ে গঠিত বৃটিশ-বর্মার একটি বিভাগ।

৩৬. মগ ও আরাকানীরা একই গোষ্ঠীভুক্ত। তাদের দেশ হচ্ছে আরাকান বা আরখাং। সশস্ত্র নৌবহর দ্বারা এরা পুনঃ পুনঃ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় হামলা করতো। ঢাকাব মুঘল সুবাদার নওয়াব শায়েস্তা খাঁর আমলে তাদের হামলা বিশেষরূপে দমিত হয়; মেঘনা নদীর মুখে মগদের কয়েকটি নৌবহর দখল করা হয় এবং চট্টগ্রাম দুর্গও পুনরায় দখল করা হয়। সন্দীপ থেকেও মগদের বহিস্কার করা হয়। চিটাগাং, বাকেরগঞ্জ, নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় বহু সংখ্যক মগ-বাশিন্দা এখনো দেখা যায়। পূর্বে এরা ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী; এখন এবা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রণের ফলে হিন্দু অথবা আধা-হিন্দু হয়েছে (আলমগীব নামা, ৯৪০ পৃঃ দ্রঃ)।

৩৭. ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজির অধীনস্থ কর্মচারী মুহম্মদ শিরানের নেতৃত্বে মুসলমানেরা জাজ নগর বা উত্তর-উড়িষ্যা প্রথম আক্রমণ করেছিল। পরে হুশাম-উদ-দীন ইওয়াজ, তুঘন খান ও তুঘরলের আমলে আক্রমণ করা হয় (তবকত-ই-নাসিরি, ১৫৭, ১৬৩, ২৫৪, ২৬২ পৃঃ দ্রঃ)। হুসেন শাহের সময় ইসমাইল গাজী

জাজ নগর বা উড়িষ্যা অক্রমণ করেন এবং রাজধানী কটক ধ্বংস করেন ও প্রচণ্ড আক্রমণ দ্বারা পবিত্র নগরপুরী অধিকার করেন (জে. এ. এস., ১৮৭৪, ২১৫ পৃঃ; ১৮৭২ সাল, ৩৩৫ পৃঃ)। ১৫৬৭-৬৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার সুলতান সুলায়মান কররানি তাঁর প্রসিদ্ধ সেনাপতি কালাপাহাড়ের অধীনে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী-সহ উড়িয্যা আক্রমণ করেন এবং জাজপুর ও কটকের সন্নিকটে যুদ্ধে তথাকার শেষ স্বাধীন রাজা মুকুন্দ দেবকে পরাজিত করেন। পরবর্তীকালে আকবরের আমলে যখন বাংলার আফগান-রাজ্য অধিকৃত হয়, তখন বহুসংখ্যক আফগান উড়িষ্যায় চলে যায়। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে বালেশ্বর অঞ্চলে জলেশ্বরের নিকটবর্তী মুঘলমারি নামক স্থানে (বদাউনির ১৯৩ পৃষ্ঠায় বাজহোরায়) মুঘল ও আফগানদের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে শেষ আফগান রাজা দাউদ পরাজিত ও নিহত হন। অল্পকাল পরে (১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে) উড়িষ্যা কার্যতঃ একটি মুঘল প্রদেশে পরিণত হয় এবং বাংলার মুঘল প্রতিনিধি এই প্রদেশের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। আবুল ফজল লিখিত 'আইন' বইতে উল্লিখিত হয়েছে যে, উড়িষ্যার হিন্দু রাজাদের উপাধি ছিল 'গজপতি'। বাংলাস্থ মুঘল প্রতিনিধি' বা ভাইস্‌রয় নওয়াব আলীবর্দী খানের আমলে উড়িষ্যা মারাঠা দস্যুদের শিকারের স্থান হয়েছিল। আলীবর্দীর সঙ্গে মারাঠাদের যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণী 'সিয়ারুল মুতাক্ষেরীনে' পাওয়া যায় (তবকত-ই-নাসিরি, তারিখি ফিরোজ শাহী, আকবর নামা ও মখজান-ই-আফগানি দ্রঃ)। বদাউনি (প্রথম খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করেছেন, ১৩২৩ খ্রীস্টাব্দে (৭২৩ হিঃ) গিয়াস-উদ-দীন তুঘলকের রাজত্বকালে উলুঘ খান জাজ নগর দমন করে-ছিলেন; ১৩৬০ খ্রীস্টাব্দে ফিরোজ শাহ তুঘলক জাজ নগর দমন করেছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে (বদাউনি, ১ম খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ; শাম্‌স্‌ সিরাজ লিখিত তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, ১১৫ পৃঃ)। সিরাজ উল্লেখ করেছেন যে, ফিরোজ শাহ জগন্নাথের প্রতিমা

দিল্লী নিয়ে গিয়েছিলেন (১১৯ পৃঃ)।

৩৮. 'সিয়ারুল মুতাক্ষেরীনে' এই স্থানের নাম বারাহুবাটি বলে উল্লিখিত হয়েছে। বারাহুবাটি দুর্গ মহানন্দা নদীর দক্ষিণ তীরে কটক নগরের বিপরীত দিকে অবস্থিত; বর্তমানে ধ্বংসাবস্থায় রয়েছে। দুর্গের বিবরণী 'সিয়ার' থেকে অনুবাদ ক'রে নিয়ে দেয়া হলঃ "মহানন্দা ও কাঠজুরি নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে বারাহুবাটি দুর্গ ও কটক নগর অবস্থিত ··· দুর্গটি মহানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত এবং প্রাকারসহ এব পরিধি প্রায় তিন ক্রোশ। দুর্গের পাথর, ইট, চুন ও সিমেণ্ট দ্বারা প্রাকার তৈরী হয়েছিল ও প্রশস্ত পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। কটক নগরী কাঠজুরি নদীর তীরে অবস্থিত; দুর্গ ও নগরের মধ্যে ব্যবধান দুই ক্রোশ . . .।"

৩৯. এখানে রাজা মুকুন্দ দেব হরিচন্দ্রেব কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি ১৫০০ থেকে ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনি জাতিতে তেলেগু ছিলেন। ১৫৬৪-৬৫ খ্রীস্টাব্দে পারস্পরিক দূত বিনিময়ের পর বাদশাহ আকবর ও উক্ত রাজার মধ্যে সন্ধি-চুক্তি সম্পাদিত হয় ('বদাউনি' ৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে যে, আকবর বাদশাহ দূতস্বরূপ হাসান খান খাজাঞ্চি ও মহাপাত্রকে উড়িষ্যার রাজার নিকট পাঠিয়েছিলেন)। বাংলার মুসলমান আফগান-রাজা সুলায়মান কর্‌রারখ (কররানি) উড়িষ্যা বাংলা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার এবং আকবরের জৌনপুরস্থ বিদ্রোহী গবর্নর খান জমানকে তিনি (সুলায়মান) সাহায্য করার পরিকল্পনা করেছিলেন। সুলায়মানকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আকবর উক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। অল্পকাল পরে আকবরকে পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধে ব্যাপৃত দেখে বাংলার রাজা সুলায়মান কররানি উড়িষ্যার রাজাকে আক্রমণ করেন (উড়িষ্যার রাজা এই সময় গঙ্গাতীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন)। রাজা কোটনামা দুর্গে পলায়ন করেন। বাংলার রাজা তাঁর সেনাপতি কালাপাহাড়ের অধীনে এক সৈন্যদল আলাদা ক'রে দেন ও তাঁকে ময়ূরভঞ্জ

অতিক্রম ক'রে উড়িষ্যা অভিমুখে এবং সেখান থেকে পরে দক্ষিণ দিকে কাওয়াবাসা নদীর ধার দিয়ে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিধ্বস্ত করেন ও রাজার প্রতিনিধিকে পরাস্ত করেন। অব্যবহিত পরে রাজাও নিহত হন এবং অবশেষে ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানেরা উড়িষ্যা জয় করেন। উড়িষ্যা বিজয়ের পর সুলায়মান কররানি (তিনি ১৫৬৩ থেকে ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন) তাঁর উজির খান জাহান লোদীকে উড়িষ্যায় ভাইস্‌রয় নিযুক্ত করেন ও কটকে সদর দফতর স্থাপন করেন। কতলুকে পুরীর গবর্নর পদে নিয়োগ করেন (বদাউনি, ২য় খণ্ড, ১৭৪ পৃঃ)।

৪০. এটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। পূর্ববর্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

৪১. কালাপাহাড়ের আসল নাম রাজু থাকায় অধ্যাপক ব্লকম্যান অনুমান করেছেন যে, কালাপাহাড় মূলে হিন্দু ছিলেন ও পরে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। মি. বেভারিজ তাঁর Analysis of Khurshid Jahan Nama-তে অধ্যাপক ব্লকম্যানের মত গ্রহণ করেছেন। এই মত গ্রহণ করার কোনো কারণ আমি দেখি না। এই মত সত্য হলে সমকালীন পুস্তক 'মখজান-ই-আফগানি' ও 'আকবর নামাতে' এর উল্লেখ থাকতো। কারণ, এটা মুসলমান ঐতিহাসিকগণের অতিরিক্ত উল্লাসের কারণ হোত। উক্ত পুস্তকে তাঁকে বাবরের অন্যতম আমীররূপে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বাবর তাঁর পৌত্র আকবরের মতো কোনো হিন্দুকে উচ্চ সামরিক পদে অথবা আমীর করার কথা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নাই। উপরন্তু, রাজু নাম মুসলমানদের মধ্যেও প্রচলিত আছে (ব্লকম্যানের 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ দ্রঃ; তাতে রাঢ়ের সৈয়দ রাজু নামক একজনের উল্লেখ আছে; 'বদাউনি' ২য় খণ্ড, ৩২৩ পৃঃ ও 'আইন', ২য় খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ দ্রঃ)। বদাউনি তাঁর 'মুন্তাখিব-উল-তওয়ারিখ' গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৪২ পৃঃ) কালাপাহাড়কে শের শাহের পরিবারের সিকান্দার শাহ ওরফে আহমদ খান সুরের—যিনি আকবরের অধীনে

বিহারের 'তুয়ল' ছিলেন—ভ্রাতারূপে উল্লেখ করেছেন ['মখজন-ই-আফগানীতে' কালাপাহাড়ের বিজয়ের পূর্ণ বিবরণ দেয়া আছে। ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে কোলগং ও রাজমহলের মধ্যবর্তী স্থানে আজিজ কোকার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি (কালাপাহাড়) নিহত হন]।

৪২. বাংলার স্বাধীন মুসলমান রাজাদের শাসনকালে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শেখ কবীর খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি এক মহান একেশ্বরবাদ আন্দোলনের নেতা ছিলেন। মুসলমান ও হিন্দুদের ধর্মের সমন্বয়; ভারতের উভয় ধর্মাবলম্বীরা যে একই ঈশ্বরের সন্তান ও পূজক এই শিক্ষা দান ; মুসলমানদের আল্লাহ ও হিন্দুদের পরমেশ্বর ; একে অন্যের প্রতি সহনশীল হওয়া উচিত এবং পরস্পরকে ভ্রাতারূপে গণ্য করা; —এইসব শিক্ষা দেয়া ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কবীরের কার্যকাল ১৩৮০ থেকে ১৪২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্যাপৃত ছিল বলা যায়। এটা কেবল যে তাঁর পক্ষে প্রশংসনীয় তা নয়; পরন্তু এ থেকে ইসলামের আবির্ভাবে ভারতবাসীদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবীরের মতবাদ এতই উদার ও সার্বজনীন ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই তাঁর মৃতদেহ দাবী করেছিল। কবির যে একেশ্বরবাদ আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, পরবর্তী শতাব্দীতে বাংলার নদীয়া জেলার চৈতন্য কর্তৃক তা প্রসার লাভ করেছিল। চৈতন্য বাংলার রাজা সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে প্রভাব লাভ করেছিলেন।

৪৩. আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরিতে' বাংলা শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন (জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ১১৫ পৃঃ)। 'তবকত-ই-নাসিরিতে' সর্বদা 'বঙ্গ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীতে' 'বাঙ্গালা' অথবা 'বেঙ্গল' নাম ব্যবহৃত হয়েছে।

৪৪. পারস্য দেশীয়, পঞ্জিকায় বারোটি সূর্য-মাসের নাম এইরূপঃ (১) ফারওয়ার্‌দিন (মার্চ); (২) উর্দী বিহেশ্‌ত (এপ্রিল); (৩)

খুর্‌দাদ (মে); (৪) তির (জুন); (৫) মুর্দাদ (জুলাই); (৬) শাহ্‌রিয়ার (আগস্ট); (৭) মিহ্‌র (সেপ্টেম্বর); (৮) আবান (অক্টোবর); (৯) আদার (নভেম্বর); (১০) দী (ডিসেম্বর); (১১) বাহ্‌মন (জানুয়ারী); (১২) সেপান্দরমাজ (ফেব্রুয়ারী)। রিচার্ডসনের ফার্সী অভিধান এবং আমীর আলীর History of Saracens, ৩১৬ পৃঃ দ্রঃ।

৪৫. অতীতে ভারতে যে সকল দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তাব বিশদ বিবরণ 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী', 'বদাওনি' ও 'মা'সিরে আলমগীরিতে' পাওয়া যায়।

৪৬. আবুল ফজল তাঁর 'আইন' গ্রন্থে লিখেছেন, "এখানে ফসল সর্বদা প্রচুর হয়; ওজনের জন্য পীড়াপীড়ি করা হয় না; শস্যের পরিমাণ আন্দাজ ক'রে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। বাদশাহ্ আকবর সদয় হ'য়ে এই প্রথা অনুমোদন করেছেন।" (আইন-ই-আকবরি, ২য় খণ্ড, ১২১-১২২ পৃঃ)।

৪৭. মুহুরীর অর্থ কেরানী।

৪৮. পাটোয়ারী—গ্রাম্য হিসাব-রক্ষক। এই পদ এখনো আছে।

৪৯. কারকুন—গ্রাম্য পাটোয়ারীদের তত্ত্বাবধায়ক। এরা বাদশাহী কর্মচারী ও পরগণার হিসাব-রক্ষক। এদেরে উপরওয়ালাদের 'আমিল' আখ্যা দেয়া হয়। আমিলগণ কতকগুলো পরগণা বা জেলার হিসাব-রক্ষক। এখানে আমরা সেকালের রাজস্ব বিভাগের হিসাব-রক্ষণ বিভাগের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই। মুসলমানি আমলের রাজস্ব আদায় বিভাগে শিকদারগণ মহলসমূহের ভারপ্রাপ্ত ছিল; মজমুয়াহ্‌দারগণ (বর্তমানে হিন্দু পারিবারিক নাম মজুমদার) কতকগুলো মহল বা তরফের (বর্তমান জেলার সমান) ভারপ্রাপ্ত ছিল; কতকগুলো জেলা অথবা বিভাগের উপরে ছিল স্থানীয় দেওয়ান। শেষোক্ত দু'টি পদ প্রায়ই মুসলমানেরা অধিকার করতো এবং প্রথমোক্ত পদ দু'টি প্রায়ই হিন্দুদের দেয়া হোত।

৫০. আমাদের গ্রন্থকার বর্ণিত 'সিংহাসন'কে আবুল ফজল তাঁর 'আইন'

গ্রন্থে 'সুখাসন' নামে উল্লেখ করেছেন (আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, ১২৬ পৃঃ দ্রঃ)।

৫১. 'আইনে' আবুল ফজল ও আমাদের গ্রন্থকার যে স্থানকে কাজী-হাটা বলেছেন, সেটা পদ্মা নদীর বামতীরস্থ হাজরাহাটি বলে মনে হয়। বর্তমানে রামপুর বোয়ালিয়ার নিচে বরাল নদীর প্রবেশ-মুখে একটি পারঘাটা আছে।

৫২. পারস্যদেশীয় হারকিউলিস রুস্তমের উপাধি ছিল 'দাস্তান'। তাঁর অন্য নাম হচ্ছে রুস্তম জাল।

৫৩. মুসলমানদের আমলে বর্তমান ছোটনাগপুর 'ঝাড়খণ্ড' নামে পরিচিত ছিল। বীরভূমসহ সাঁওতাল পরগণাকে বলা হোত 'ভার-কুণ্ডা'।

৫৪. আমার মনে হয়, নকলনবিস 'গণ্ডওয়ানা'কে ভুলক্রমে 'গণ্ডওয়ারা' লিখেছেন। এই অঞ্চলটি বর্তমানে 'মধ্য-প্রদেশ'রূপে চিহ্নিত হয়েছে। এর রাজধানী ছিল 'গড়হা-কাতাঙ্গা' (বর্তমান জবল-পুর)।

৫৫. উল্লেখযোগ্য যে, সুরজ-গড় (বা সুরজের দুর্গ) নামক একটি শহর মুঙ্গের জেলায় আছে। শহরটি গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মওলা নগরের সন্নিকটে অবস্থিত। এখানে মহবত জং কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের একটি পুরাতন খানকাহ্ আছে।

৫৬. 'ফেরেশ্‌তা'য় 'শংগল' বলা হয়েছে। 'আইন-ই-আকবরী'তে হিন্দু রাজাদের তালিকায় এই নাম আমি পাই নাই।

৫৭. ১১৯৮ খ্রীস্টাব্দে (৫৯৪ হিজরীতে) মুসলমানেরা এই নগর জয় করেন ও বাংলায় তাদের প্রথম রাজধানী স্থাপন করেন। তখন থেকে এই নগরের প্রামাণ্য ইতিহাস আরম্ভ হয় (তবকত-ই-নাসিরি, ফার্সি সংস্করণ, ১৫১ পৃঃ)। এই সময়ই তারা বহুসংখ্যক মসজিদ ও অন্যান্য অট্টালিকা তৈরী করেন (হাণ্টার ইম্পিরিয়েল গেজেটিয়ার, ৩য় খণ্ড, ৩৩৩ পৃঃ; রেভেন্‌স ও ক্রেটনের Ruins

of Gaur দ্রঃ)। যখন বাংলায় মুসলমান রাজাগণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁরা সোনারগাঁও ও পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অল্পদিন পরে পাণ্ডুয়া পরিত্যক্ত হয় এবং রাজধানী গৌড়ে পুনরায় স্থানান্তরতি হয় ও সোনারগাঁও পূর্ববাংলার রাজধানী হয়। ৳৩১ হিঃ বা ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দে মিনহাজুস সিরাজ এই নগর দেখেছিলেন এবং 'তবকত-ই-নাসিরি'তে এর একটা বৃত্তান্ত দিয়েছেন (ফার্সি সংস্করণ ১৬২ পৃঃ)। আবুল ফজল তাঁর 'আইন' গ্রন্থে এর উল্লেখ করেছেন ('আইন', জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ১২৩ পৃঃ) এবং লিখেছেন, সেইসময় এই নগরী লখনৌতি ও গৌড় উভয় নামেই পরিচিত ছিল ও পরে হুমায়ুন শেষোক্ত নাম পরিবর্তন ক'রে 'জিন্নতাবাদ' রাখেন। বদাউনি (ফার্সি সংস্করণ, ১ম খণ্ড; ৫৮ পৃঃ) বলেন যে, বখতিয়ার ঘোরি একটি নগর প্রতিষ্ঠা ক'রে নিজ নামানুসারে 'গৌড়' নাম রেখেছিলেন। সুলায়মান কররানির আমলে রাজধানী আরো পূর্বদিকে টাণ্ডায় স্থানান্তরিত হয়। বাদশাহ আকবরের আমলে বাংলা বিজয়ের সময় গৌড়ে পুনরায় মুঘল সরকারের সদর দফতর স্থাপিত হয় এবং মুনায়েম খান-ই-খানানের অধীনে (ইনিই প্রথম মুঘল ভাইস্রয় ছিলেন) এই নগর অধিকার করে। কিন্তু, এক মহামারীতে মুনায়েম খানের মৃত্যু হয় এবং প্রত্যহ হাজার হাজার সৈন্য ও সাধারণ লোকের মৃত্যু হয় (আইন, ১ম খণ্ড, ৩১৮ ও ৩৭৬ পৃঃ, ব্লকম্যানের অনুবাদ; বদাউনি, ২য় খণ্ড, ২১৭ পৃঃ)। বাংলার মুঘল রাজধানী তখন টাণ্ডায় স্থানান্তরিত হয়। অল্পদিন পরে রাজমহল বা আকবর নগরে স্থানান্তরতি হয়। পরে ঢাকা বা জাহাঙ্গীর নগরে ও শেষে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। ডক্টর বুকানান হেমিল্টন বলেছেন, গৌড় নগরীর আয়তন ছিল ২০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ। 'খুরশিদ জাহান নামা'র গ্রন্থকার নিম্নোক্ত প্রধান প্রধান অট্টালিকার উল্লেখ করেছেন:

(১) কদম রসুল—দুর্গের মধ্যে চতুষ্কোণ এক গম্বুজবিশিষ্ট

অট্টালিকা। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নসরত শাহ তৈরী করেছিলেন। (২) কদম রসুলের উত্তর-পূর্ব দিকে 'মিনার'। তৈরী করেছিলেন সুলতান ফিরোজ শাহ। মিনারেরর উচ্চতা প্রায় ৫০ হাত ও পরিধি প্রায় ৫ হাত। ফিরোজ ৮৯৬ হিঃ বা ১৪৮৭ খ্রীস্টাব্দে রাজত্ব করেছিলেন।

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন মালদহ থেকে গৌড় দেখতে যাই, তখন সেখানে দুর্গ-প্রাকার, সিংহদ্বার ও কদম-রসুলের কিছু কিছু অংশের অস্তিত্ব দেখেছিলাম।

৫৮. 'তবকত-ই-নাসিরি'তে বাঁধানো রাস্তার উপর একটি পুলের উল্লেখ আছে (১৬২ পৃঃ)। এই রাস্তা পশ্চিম দিকে লখনৌতি থেকে রাঢ়ের লখনৌর এবং পূর্বদিকে বরেন্দ্রের দেবকোটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিল। তৈরী করেছিলেন হুশাম-উদ-দীন ইওয়াজ ওরফে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন।

৫৯. মুর্শিদাবাদ বাংলার শেষ মুসলমান রাজধানী। তৎপূর্বে প্রায় এক শতাব্দীকাল রাজধানী ছিল পূর্ববঙ্গের ঢাকা বা জাহাঙ্গীর নগরে। ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন মুঘল দেওয়ান মুরশিদ কুলী খানের (জাফর খান নামেও পরিচিত) সাথে ঢাকার মুঘল ভাইস্‌রয় বা নওয়াব শাহজাদা আজিম-উশ-শানের মতবিরোধ হওয়ায় মক্‌সুদাবাদ নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে সরকারী দফতর স্থানান্তরিত করেন ও নিজ নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম রাখেন 'মুর্শিদাবাদ'। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ উক্ত নগরে প্রবেশ করেন ও নিম্নোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ "এই নগর লণ্ডনের মতোই বৃহৎ, জনবহুল ও সম্পদশালী। ......অধিবাসীরা যদি ইউরোপীয়দের ধ্বংস করতে ইচ্ছা করতো, তা'হলে লাঠি ও পাথর দ্বারাই তারা তা করতে পারতো।" পলাশীর যুদ্ধের পরেও কয়েক বৎসর মুর্শিদাবাদ রাজধানী ছিল। ক্লাইভ ও জনসাধারণ পলাশীর যুদ্ধের ফলাফলে সন্তুষ্ট হয়েছিল। কারণ, উক্ত যুদ্ধের ফলে সিরাজ-উদ-দৌলার কুশাসনের অবসান হয়;

সিরাজ যৌবনসুলভ রঙ্গকৌতুক ও খেয়ালিপনার দরুন জনসাধারণ ও ইংরেজদের অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। তখন এতদ্দ্বারা মুসলিম শাসনে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল বলে গণ্য করা হয় নাই। কেবল সিরাজ-উদ-দৌলার পরিবর্তে একজন নতুন নওয়াব (মীর জাফর) হলেন মনে করা হয়েছিল। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর মুঘল সম্রাট শাহ আলমের নিকট থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় দেওয়ানি লাভ করে। পরের বৎসর বাদশাহের দেওয়ানরূপে লর্ড ক্লাইভ পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। সেইসময় দিল্লীর সম্রাটের প্রশাসনিক ও সামরিক প্রতিনিধিরূপে যুবক নওয়াব নাজিম মসনদে বসেছিলেন এবং তাঁর দক্ষিণ দিকে বসেছিলেন লর্ড ক্লাইভ। তখনো প্রশাসনিক কার্যাদি মুসলমান কর্মচারীদের হাতে ছিল। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ উচ্চতম দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। কিন্তু, তিন বৎসর পর ফৌজদারি বা নিজামত আদালত পুনরায় মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৭৯০ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে সমস্ত রাজস্ব দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিভাগের কর্মচারীদের কলকাতায় নিয়োগ করা হয়। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে রাজধানীর প্রাধান্যের প্রতীক টাকসাল বিলোপ করা হয়। এর পর থেকে মুর্শিদাবাদ কেবল মীর জাফরের বংশধর নওয়াবের বাসস্থান হয়ে থাকে এবং এর গুরুত্ব বিলুপ্ত হয়।

৬০. উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার প্রথমদিকে মুসলমান সুলতানদের আমলে নিম্নোক্ত শহরগুলোতে টাকশাল ছিলঃ (১) লখনৌতি; (২) ফিরোজাবাদ (পাণ্ডুয়া); (৩) সাতগাঁও; (৪) শহর-ই-নও (অচিহ্নিত); (৫) গিয়াসপুর; (৬) সোনারগাঁও; (৭) মোয়াজ্জমাবাদ (সিলহট অথবা ময়মনসিং-এ); (৮) ফতেহাবাদ (ফরিদপুর শহর); (৯) খলিফাবাদ (যশোরের বাগেরহাট শহর); (১০) হুসেনাবাদ (সম্ভবতঃ গৌড়ের সন্নিকটে)। টমাসের

'Initial Coinage ও ব্লকম্যানের Contributions দ্রঃ।

৬১. উর্ফি ছিলেন সিরাজের বিখ্যাত ফার্সি কবি; তিনি জাহাঙ্গীর বাদশাহের দরবারে ছিলেন। তাঁর উঁচুদরের কবি-প্রতিভা ছিল এবং বাদশাহ তাঁকে অত্যন্ত প্রশংসা করতেন। বহু বৎসর পূর্বে আমি তাঁর কতকগুলো কবিতা ও কসিদার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলাম।

৬২. নওয়াব মীর জাফর গদি-নশিন হওয়ার পর কয়েক বৎসর 'মতিঝিল প্রাসাদ' বাংলার নওয়াব-নাজিমদের দরবারস্থ বৃটিশ পলিটিকেল এজেন্টের বাসভবন ছিল।

৬৩. সাতগাঁও ছিল বাংলার প্রাচীন রাজকীয় বন্দর বা Ganges Regia। হুগলী ও পবিত্র সরস্বতী নদীদ্বয়ের সংযোগস্থলে এই বন্দর ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সরস্বতী নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় পর্তুগীজ বণিকগণ এই বন্দর লাভজনক মনে করতো না। সেইজন্য ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে নদীর পূর্বতীরেই ঘোলাঘাটে তাদের বন্দর প্রতিষ্ঠা করে। অত্যল্পকাল মধ্যে ঘোলাঘাট প্রধান গঞ্জে পরিণত হয় এবং নদীর নামানুসারে হুগলী শহর বা বন্দর নাম গ্রহণ করে। বর্তমানে সাতগাঁও একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়েছে। ১৮৮৮ সালে যখন আমি হুগলী দেখতে যাই, তখন সেখানে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদের চিহ্ন দেখেছিলাম। মুসলমানদের ইতিহাসে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুঘলক শাহ যখন সোনারগাঁওয়ের রাজা বাহাদুর শাহকে দমন করার জন্য বাংলা আক্রমণ করেন, তখন আমি সাতগাঁওয়ের নামের প্রথম উল্লেখ দেখতে পাই (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ৪৫-৪৬ পৃঃ দ্রঃ)।

৬৪. আমীরগণ পৃথিবীর জাতিসমূহকে (বা মানবজাতিকে) আরবী ও আযমী (বা যারা আরবীয় নয়) এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। খাস পারস্যকে বলা হোত ইরাক-ই-আযম।

৬৫. 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লিখিত হয়েছে যে, ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা ছিল সরকার সাতগাঁও-এর অধীনে একটি রাজস্ব প্রদান-

কারী গ্রাম ('আইন', ২য় খণ্ড, ১৪১ পৃঃ, জেরেটের অনুবাদ)। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে মুসলমান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় মি. চার্নকের নেতৃত্বে ইংরেজ বণিকগণ উক্ত স্থান ত্যাগ ক'রে সুতানুটি (বর্তমান কলকাতার উত্তরের একটি অংশ) পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। শীঘ্রই তাদের নতুন বাসস্থান দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়—প্রথমে প্রসারিত হয় কলকাতার (বর্তমান শুল্ক-ভবন ও টাকশালের মধ্যবর্তী স্থান) দিকে এবং পরে গোবিন্দপুর গ্রাম অভিমুখে (গোবিন্দপুর গ্রাম ফোর্ট উইলিয়ামের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ছিল)। ১৬৮৯ খ্রীস্টব্দে এই স্থান (কলকাতা) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাংলার কুঠিসমূহের কর্মচারীদের সদর দফতরে পরিণত হয়। ১৬৯৬ সালে মূল ফোর্ট উইলিয়াম তৈরী হয়; ১৭৪২ সালে আওরঙ্গজেব বাদশাহের পুত্র শাহজাদা আজিমের নিকট থেকে তিনটি গ্রাম খরিদ করা হয় এবং দুর্গটি নতুন তৈরী করা হয়। ১৭৫৬ সালে নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলা শহরটি দখল ও ধ্বংস করেন এবং শহরের নাম পরিবর্তন ক'রে রাখেন 'আলীনগর'। ১৭৫৭ সালে এডমিরেল ওয়াটসন ও ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজরা শহর পুনরায় দখল করে। ক্লাইভ নতুন দুর্গ (বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম) তৈরী আরম্ভ করেন; কিন্তু তৈরী শেষ হয় ১৭৭৩ সালে; সেইসময় ময়দানও উন্মুক্ত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'সিয়ারুল মুতাক্ষেরীন' গ্রন্থের লেখক যদিও সিরাজ-উদ-দৌলার বিরোধী ও সমসাময়িক ছিলেন, তথাপি তিনি অন্ধকূপের ব্যাপার সম্পর্কে একটি কথাও উল্লেখ করেন নাই।

৬৬. ১৭০৭ সালে কলকাতাকে প্রেসিডেন্সিরূপে ঘোষণা করা হয়; তৎপূর্বে এই অঞ্চল মাদ্রাজের ইংরেজ-উপনিবেশের অধীনে ছিল। ১৭০৭ থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সমান মর্যাদাসম্পন্ন। ১৭৭৩ সালে পার্লামেণ্টের এক বিধান দ্বারা ঘোষণা করা হয় যে, প্রেসিডেন্সি অব কলকাতা ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ অন্যান্য

অঞ্চলের উপর সাধারণভাবে তত্ত্বাবধানের কাজ করবে এবং প্রেসিডেন্সি অব কলকাতার প্রধানের উপাধি হবে গবর্নর-জেনারেল। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের উপর বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার—যা এ পর্যন্ত মুসলমান নিজামত কর্মচারীদের হাতে ছিল—দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং মুর্শিদাবাদ থেকে রাজকোষ বা ট্রেজারি কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। এইরূপে কলকাতা বাংলার রাজধানী ও সরকারের উচ্চতম সদর দফতরে পরিণত হয়। ১৮৩৪ সালে বাংলার গবর্নর-জেনারেলকে ভারতের গবর্নর-জেনারেল করা হয় এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলার কার্য সম্পাদনের জন্য বাংলায় ডেপুটি গবর্নর নিয়োগের ক্ষমতা তাঁকে দেয়া হয়। ১৮৫৪ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় স্বতন্ত্র লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর নিয়োগ করা হয় (উইলসনের Early Annals of the English in Bengal; বাক্‌ল্যাণ্ডের Bengal under Lieutanent Governors of Bengal দ্রঃ)।

৬৭. ১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে ফরাসীদের একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশরূপে চন্দন নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডুপ্লের অধীনে এই শহরের বাণিজ্যিক গুরুত্ব অর্জিত হয়।

৬৮. সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল ডাচ বণিক সাতগাঁও ও হুগলী বন্দরে বাস করতো, তারাই হুগলী শহরের একটু নীচে চিনসুড়ায় তাদের কুঠি ও বন্দর প্রতিষ্ঠা করে।

৬৯. সপ্তদশ শতাব্দীতে ডেইন্সরা (ডেনমার্কের অধিবাসীরা) চন্দন নগরের আট মাইল দক্ষিণে সিরামপুরে (শ্রীরামপুরে) তাদের কুঠি ও বন্দর স্থাপন করে।

৭০. ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পুর্নিয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। 'আইন ই-আকবরী'তে পুর্নিয়া সরকারের বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, এই সরকারের মধ্যে ছিল ৯টি মহল ; রাজস্ব ছিল ৬৪,০৮,৭৭৫ দাম (জেরেটের অনুবাদ, 'আইন' পুস্তকের ২য় খণ্ডের ১৩৪ পৃঃ দ্রঃ)। নওয়াব জাফর খানের সমসাময়িক পুর্নিয়ার শাসকর্তা

নওয়াব সয়েফ খানের আমলে এই সরকারের প্রভূত উন্নতি হয়। এখানকার 'বিদের' কাজ এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। ১৮৯৮ সালে আমি যখন পুর্নিয়ায় ছিলাম, তখন এই শিল্প মৃতপ্রায় দেখেছিলাম।

৭১. পুর্নিয়া জেলার উত্তর সীমান্ত থেকে খাস নেপালের প্রান্ত পর্যন্ত অঞ্চলকে স্থানীয়ভাবে 'মুরং' বলা হয়।

৭২. এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনো আছে। বর্তমানে এটা পুর্নিয়ার রেল স্টেশনের কয়েক মাইল উত্তরে পুর্নিয়ার মি. ফর্বেসের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত।

৭৩. 'মা'সুর-উল-উমারা'তে (১ম খণ্ড, ৩য় পর্ব, ৬৭৭-৬৮৭ পৃঃ) আমীর খানের বিশদ জীবনবৃত্তান্ত উল্লিখিত হয়েছে। আমীর খানকে মা'সির 'আমীর খান মীরি মীরন' বলে উল্লেখ করেছেন। আমীর খানের মাতা হামিদা বানু বেগম আমিন-উদ-দৌলা আসফ খানের পৌত্রী ছিলেন।

৭৪. বীর নগর বর্তমানে পুর্নিয়ার দ্বারভাঙ্গা রাজার জমিদারীর একটি সার্কেল ও একজন সাব-ম্যানেজারের অধীনস্থ।

৭৫. বর্তমানে এর প্রত্যেকটি এক-একটি পুলিশ সার্কেল।

৭৬. 'আলমগীর নামা'য় কয়েকজন দুর্জন সিং-এর উল্লেখ আছে। শ্রী-নগরের জমিদার জনৈক বীর সিং-এব নামও উল্লিখিত আছে।

৭৭. ১৮৯৮ সালে আমি যখন পুর্নিয়ায় ছিলাম তখন আমি এরূপ দেখি নাই। আমার মনে হয়েছিল, পুরাতন নগর বা শহর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং পূর্বতন সমৃদ্ধির কোন চিহ্ন প্রায় নাই।

৭৮. আমি যখন পুর্নিয়ায় ছিলাম, তখন এগুলোর কোনো চিহ্ন দেখতে পাই নাই।

৭৯. এখনো কারাগোলায় একটা মেলা হয়। নেপালি, ভুটানি ও অন্য পার্বত্য উপজাতিরা পূর্বের মতোই এখনো মেলায় আসে।

৮০. 'আলমগীর নামা'য় কুচবিহার যাওয়ার ৩টি পথের উল্লেখ আছে (৬৮৩ পৃঃ)।

৮১. ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে মুরশিদ কুলী খান কর্তৃক বাংলার রাজধানী মুর্শিবাদে স্থানান্তরতি হওয়ার পূর্বে প্রায় এক শতাব্দীকাল ঢাকা বা জাহাঙ্গীর নগর মুঘল আমলে বাংলার মুসলমান ভাইস্‌রয়গণের রাজধানী ছিল। ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার মুঘল ভাইস্‌রয় ইসলাম খান রাজমহল বা আকবর নগর থেকে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। রাজধানী স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল এই কারণে যে, তখন বাংলায় মুসলমান রাজ্য পূর্ব-দিকে বিশেষ প্রসারিত হওয়ায় রাজমহল আর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল না এবং এই সময় আরাকান থেকে মগ ও আরাকানীরা প্রায়ই হামলা চালাতো। শেষোক্তদের হামলা প্রতিহত করার জন্য ঢাকায় একটি শক্তিশালী নৌবহর তৈরী করা হয় ও সংরক্ষিত করা হয় এবং সেগুলো পদ্মা ও মেঘনা নদীতে রাখা হয়। পূর্ববঙ্গের সর্বত্র, বিশেষতঃ যুদ্ধের জন্য কৌশলপূর্ণ বিভিন্ন স্থানে মুসলমান সামন্তদের উপনিবেশ স্থাপন করা হয় (বর্তমানে এই সকল সামন্ত নির্মূল হয়ে গিয়েছেন ও কৃষক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছেন)। বিরোধী আফগানদের ও ষড়যন্ত্রকারী মগ হামলাকারীদের প্রতি-বোধ করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। শাহজাদা শাহ শুজা ষোল বৎসরকাল বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত করে-ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সপ্তদশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণরূপে ঢাকা বাংলার রাজধানী ছিল এবং তৎকালে জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গ-জেব এই তিনজন বিখ্যাত মুঘল সম্রাট (দিল্লীতে) রাজত্ব করেছিলেন। বাংলার মুঘল ভাইস্‌রয়দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন ইসলাম খান, আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা এবং (সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র) শায়েস্তা খান। শেষোক্ত নওয়াব দু'জন অট্টালিকা নির্মাণে উৎসাহ দানের জন্য ও জনসাধাণের কল্যাণকর বহু কার্য সম্পন্ন করার জন্য আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন; প্রথমোক্ত ব্যক্তি আফগান বিরোধিতা নির্মূল করেছিলেন। কথিত হয়, ঢাকার উপকণ্ঠ পনের মাইল বিস্তৃত ছিল; বর্তমানে

গভীর জঙ্গলাবৃত হয়ে গিয়েছে। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন শিল্প বর্তমানে ধ্বংসপ্রায়। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত পুরাতন দুর্গের চিহ্ন এখন নেই। পুরাতন সরকারী অট্টালিকা-সমূহের মধ্যে এখন আছে ১৬৪৫ সালে শাহ শুজা নির্মিত কাটরা ও লালবাগ প্রাসাদ ; কিন্তু দুইটি ধ্বংসোন্মুখ (Taylor's Topography of Dacca এবং ডক্টর ওয়াইজের History of Dacca দ্রঃ)। 'আকবর নামা'য় উল্লিখিত হয়েছে যে, ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা একটি বাদশাহী থানা ছিল ও এটা ঢাকা বাজুমহলের অন্তর্ভুক্ত ছিল (আইন ই-আকবরী, জেরেটর অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ২য় পর্ব, ১৩৮পৃঃ)। পূর্বতন সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা এখনো ঢাকার বর্তমান উদাব ও জনকল্যাণকর কার্যে উদ্বুদ্ধ নওয়াবদের জন্য বাংলার একটি সাধারণ শহরে পরিণত হয় নাই।

৮২. সোনারগাঁও নগর ঢাকার সন্নিকটে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ; বহুকাল এই নগর বাংলার মুসলমানদের রাজধানী ছিল। ১২৭৯ খ্রীস্টাব্দে সুলতান মুঘিস-উদ-দীন নাম নিয়ে তুঘরল নিজেকে সুলতান ঘোষণা করায় ১২৮১ খ্রীস্টাব্দে (বার্নি লিখিত 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী', ৮৭ পৃঃ) বাদশাহ বলবন দিল্লী থেকে এসে তুঘরলের পশ্চাদ্ধাবন করেন। ৬১০ হিজরীতে (১২১৪ খ্রীঃ) বখতিয়ার খালজীর অব্যবহিত পরবর্তী অন্যতম স্থলাভিষিক্ত সুলতান গিয়াস-উদ-দীন সোনারগাঁও ও বঙ্গসহ (পূর্ববঙ্গ) সমগ্র অঞ্চল দখল করেন (তবকত-ই-নাসিরি, ফার্সী সংস্করণ, ১৬৩ পৃঃ)। সোনার-গাঁও-এর ইতিহাস বেদনাদায়ক স্মৃতি বিজড়িত। কারণ, এখানে বাংলার বলবনী সুলতানদের (১২৮২ থেকে ১৩৩১ খ্রীস্টাব্দ) বংশ শেষ হয় ; এখানেই বাংলার শেষ বলবনী সুলতান বাহাদুর শাহকে সম্রাট মুহম্মদ শাহ তুঘলকের আদেশ অনুসারে বন্দী ও নিহত করা হয় এবং তাঁর চামড়া অন্য বস্তুদ্বারা পূর্ণ ক'রে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শিত হয়েছিল। অতঃপর, ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার প্রথম স্বাধীন মুসলমান সুলতান ফখরুদ্দীন

আবুল মুজাফফর মুবারক শাহ সোনারগাঁও-এ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সেখানে তিনি বাসস্থান স্থাপন করেন ও টাকশালে মুদ্রা তৈরী করেন (টমাসের Initial Coinage ও 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী', ৪৮০ পৃঃ দ্রঃ)। মুবারক শাহের পুত্র গাজী শাহ (তৃতীয় স্বাধীন সুলতান) সোনারগাঁওয়ে থাকতেন ও টাকশালে মুদ্রা তৈরি করতেন। ১৩৫২ খ্রীস্টাব্দে হাজী ইলিয়াস বা সুলতান শামসুদ্দীন আবুল মুজাফফর ইলিয়াস শাহ (চতুর্থ স্বাধীন সুলতান) সোনারগাঁও-এ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন (টমাসের Initial Coinage দ্রঃ) ও সেখানে একটি নতুন স্বাধীন বাংলার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ (প্রায় ৪০ বৎসর ব্যতীত) প্রায় এক শতাব্দীকাল (১৩৫২-১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ) রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁরা গৌড় ও সোনারগাঁও-এ থাকতেন। সিরাজের বিখ্যাত কবি হাফিজ এই সোনারগাঁও-এ সুলতান গিয়াস-উদ দীনের (সিকান্দার শাহের পুত্র ও ইলিয়াস শাহের পৌত্র) নিকট তাঁর বিখ্যাত গজল পাঠিয়েছিলেন। সোনারগাঁও বর্তমানে একটি নগণ্য গ্রামে পরিণত হয়েছে। পূর্বতন সমৃদ্ধির কোনোই চিহ্ন নাই (সোনারগাঁও সম্পর্কে ডঃ ওয়াইজের মন্তব্য, জে. এ. এস., ১৮৭৪, ৮২ পৃঃ দ্রঃ)।

৮৩. আন্দাজ ১৩৫০ খ্রীস্টাব্দে ইবনে বতুতা যখন চিটাগাং আসেন তখন উক্ত স্থান সোনারগাঁও-এর সুলতান ফখরুদ্দীনের দখলে ছিল। হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নসরত শাহ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে উক্ত স্থান পুনরায় দখল করেন। টোডর মলের রাজস্ব তালিকায় এই স্থানের রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২,৮৫,৬০৭ টাকা এবং এই সরকারে সাতটি মহল ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলায় আফগান ও মুঘলদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের সময় অস্থায়ীভাবে স্থানটি মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়। নওয়াব শায়েস্তা খান ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে স্থানটি পুনরায় দখল করেন। তিনি ছিলেন ঢাকার বাদশাহ আওরঙ্গজেবের ভাইস্‌রয়। তিনি

এর নাম রাখেন ইসলামাবাদ (আলমগীর নামার ৯৪০-৯৫৬ পৃষ্ঠায় চিটাগাং পুনর্জয়ের আকর্ষণীয় বর্ণনা দ্রঃ)। অতি প্রাচীন-কাল থেকে চিটাগাং একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। পর্তু-গীজরা প্রথমদিকে একে বলতো 'পোর্টো গ্র্যাণ্ডো'।

৮৪. আবুল ফজলের 'আইন'-এ বর্ণিত হয়েছে যে, সরকার বোগ্‌লা বা বাবলায় চারটি মহল ছিল। রাজস্ব ছিল ১,৭৮,৭৫৬ টাকা। বাকিরগঞ্জ জেলা, সুন্দরবন জেলা ও ঢাকা জেলার দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে এই মহল গঠিত ছিল। 'সিয়ারুল মুতাক্ষরীনে'র লেখক এটাকে সরকার হোগ্‌লা লিখেছেন।

৮৫. দিনাজপুর, রংপুর ও বগুরা জেলার অংশ নিয়ে সরকার ঘোড়া-ঘাট গঠিত ছিল। কুচবিহারের সংলগ্ন উত্তর সীমান্তে এই জেলা অবস্থিত থাকায় সামন্তনীতি অনুযায়ী বহুসংখ্যক আফগান ও মুঘল প্রধানদিগকে বৃহৎ জায়গীর দিয়ে এই অঞ্চলে উপনিবেশসমূহ স্থাপন করা হয়েছিল। অনেক মহলের নাম সম্পূর্ণ মুসলমানি ধরনের; যথাঃ বাজু জাফর শাহী, বাজু ফওলাদ শাহী, নস-রতাবাদ, বায়াজিতপুর, তা'লুক হোসেন, তা'লুক আহমদ খান, কাবুল, মসজেদে হোসেন শাহী। এই সরকারে প্রচুর কাঁচা রেশম উৎপাদিত হোত। ৮৪টি মহল; রাজস্ব ২,০২,০৭৭ টাকা। গঙ্গা-রামপুরের নিকটবর্তী দেওকোটস্থ পুরাতন মুসলমান ঘাঁটি এই সরকারের মধ্যে ছিল। বখতিয়ার খালজির সময় এই ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (ব্লকম্যানের Contr., জে. এ. এস., ১৮৭৩, ২১৫ পৃঃ; 'তবকত-ই-নাসিরি', ১৫৬ পৃঃ; 'আইন-ই-আকবরী', ২য় খণ্ড, ১৩৫ পৃঃ, ১ম খণ্ড, ৩৭০ পৃঃ দ্রঃ)। ৯৮২ হিজরীতে পাটনার যুদ্ধের পর দাউদ যখন উড়িষ্যায় পশ্চাদ্ধাবন করেন ('বদা-উনি', ২য় খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ) তাঁর সেনাপতিদ্বয় কলাপাহাড় ও বাবু মানক্লি ঘোড়াঘাট অভিমুখে অগ্রসর হন ('বদাউনি', ১৯২ পৃঃ)। আকবরের সেনাপতি মজনুন খানের ঘোড়াঘাটে মৃত্যু হয়েছিল।

৮৬. বাংলার সুলতান মাহমূদ শাহের নামে সরকার মাহমূদাবাদের নামকরণ হয়েছিল। নদীয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চল, যশোরের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও ফরিদপুরের পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়েছিল। এই সরকারে ছিল ৮৪টি মহল ; রাজস্ব ২,৯০,২৫৬ টাকা। সান্তোর, নল্‌দি, মাহমূদ শাহী ও নসরত শাহী ছিল এর প্রধান মহল। ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দে আকবরের সৈন্যবাহিনী মুনিম খান-ই-খানানের অধীনে যখন বাংলা আক্রমণ করে, তখন অন্যতম বাদশাহী সেনাপতি মুরাদ খান দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেন। 'আকবর নামা'য় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বাক্‌লা ও ফত্‌হাবাদ (ফরিদপুর) সরকার জয় করেন এবং সেখানেই বাস করেন ও সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ফরিদ-পুরের সন্নিকটে খান-খানানপুর নামক একটি গ্রাম আছে (বর্তমানে একটি রেল স্টেশন)। সম্ভবতঃ এখানেই মুরাদ খানের বাসস্থান ছিল। এর নিকটে রাজবাড়ী নামক একটি স্থান আছে (সম্ভবতঃ পুরানো রাজাদের বাসস্থান)। তাঁর পুত্রকে ভুসনা ও ফত্‌হা-বাদের রাজা মুকুন্দ নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যা করে ('আইন-ই-আকবরী', ব্লকম্যানের অনুবাদ, ৩৭৪ পৃঃ)। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে মুকুন্দের পুত্র শত্রুজিত গোলমাল করতে থাকে। অবশেষে শাহজাহানের রাজত্বকালে তাকে বন্দী ক'রে ঢাকায় প্রাণদণ্ড দেয়া হয় (১৬৩৬ খ্রীঃ)। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে নওয়াব জাফর খান এই সরকার ভেঙ্গে এর একাংশ রাজশাহীর সঙ্গে ও অন্য অংশ ভুসনা চাক্‌লার সঙ্গে মিলিয়ে দেন। প্রাচীন মুসলিম উপনিবেশ বনগলধি ও দক্ষিণবাড়ীর সন্নিকটে ভুসনা অবস্থিত। কৌতুহলের সাথে উল্লেখ্য যে, এর পশ্চিম দিকে নবগঙ্গার তীরে প্রাচীন মুসলিম উপনিবেশ আলুকদির সন্নিকটে শত্রুজিতপুর অবস্থিত। আবার, ফরিদপুরের বিপরীত দিকে 'মুকুন্দ-চর' দেখতে পাই ; স্থানটি পূর্বোক্ত খান-খানানপুর স্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। শত্রুজিতের বংশধর বা উত্তরাধিকারী

কুখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের সদর দফতর ছিল মাহমূদপুর শহরে —যশোরের বরাশিয়া ও মধুমতি নদীর সংযোগস্থলে। মাহমূদপুরের অতি সন্নিকটে শিরগাঁও নামক একটি পুরাতন মুসলমান উপনিবেশ আছে ('আইন-ই-আকবরী', ২য় খণ্ড, ১৩২ পৃঃ; ব্লকম্যানের Contr., জে. এ. এস., ১৮৭৩, ২১৭ পৃঃ দ্রঃ)।

৮৭. সরকার বারবাকাবাদ—বাংলার সুলতান বরবক শাহের নামানুসারে নামকরণ হয়েছিল। সরকার লখনৌতি অথবা গৌড় থেকে পদ্মার ধার দিয়ে বগুড়া পর্যন্ত এই সরকার বিস্তৃত ছিল। এর মধ্যে মালদহ, দিনাজপুর, রাজশাহী ও বগুড়া অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখানকার কাপড়, বিশেষতঃ 'খাচা' কাপড় বিশেষ পরিচিত ছিল। ৩৮টি মহল; রাজস্ব ৪,৩৬,২৮৮ টাকা ('আইন-ই-আকবরী', ২য় খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ; ব্লকম্যানের Contributions, জে. এ. এস., ১৮৭৩, ২১৫ পৃঃ দ্রঃ)।

৮৮. সরকার বাজুহা—সরকার বারবাকাবাদের সীমান্ত থেকে দক্ষিণ দিকে ঢাকা নগরীর কিঞ্চিত অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা ও ময়মনসিংহের অংশ এর মধ্যে ছিল। ৩২টি মহল; রাজস্ব ৯,৮৭,৯২১ টাকা ('আইন', ২য় খণ্ড, ১৩৭ পৃঃ দ্রঃ)।

৮৯. সরকার সিলহট সরকার বাজুহার সংলগ্ন ছিল। প্রধানতঃ সুরমা নদীর পূর্বদিকে বিস্তৃত। চতুর্দশ শতাব্দীতে যখন আফগান সুলতান শামসুদ্দীন গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করতঃ বাংলায় রাজত্ব করছিলেন, সেইসময় সৈনিক-দরবেশ শাহ জালাল এই দেশ জয় করেন। আজও শাহ জালালের মাজার সিলহটে বিদ্যমান। সিলহট থেকে ভারতে খোজা সরবরাহ করা হোত। জাহাঙ্গীর সিলহটের লোকদের ও বালকদের খোজা করা বারিত ক'রে ফরমান জারী করেন। ৮টি মহল; রাজস্ব ১,৬৭,০৩২ টাকা ('আইন', ২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ; ব্লকম্যানের Contributions, জে. এ. এস., ১৮৭৩, ২১৬, ২৩৫, ২৭৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৯০. সরকার শরিকাদের মধ্যে ছিল বীরভূমের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল, এবং বর্ধমান শহরসহ বর্ধমানের অধিকাংশ। ২৬টি মহল; রাজস্ব ৫,৬২,২১৮ টাকা ('আইন-ই-আকবরী', ২য় খণ্ড, ১২৯ পৃঃ)।

৯১. সরকার মাদারন—পশ্চিম বীরভূমের নাগোর থেকে রানীগঞ্জসহ দামোদরের তীব দিয়ে বধমানের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত এবং সেখান থেকে খাণ্ডগোশ, জাহানাবাদ, চন্দ্রকোণা (হুগলী জেলার পশ্চিমাঞ্চল) থেকে রূপনারায়ণ নদীর মোহনাস্থ মণ্ডলঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৬টি মহল; রাজস্ব ২,৩৫,০৮৫ টাকা ('আইন', ২য় খণ্ড, ১৪১ পৃঃ)।

৯২. শের শাহ ইতিপূর্বেই বাংলার রাজধানী টাণ্ডা থেকে আগমহলে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; কিন্তু বাংলায় আকবরের গবর্নর রাজা মানসিং এই পরিকল্পনা কার্যকরী করেন এবং প্রথমে এই স্থানের নাম রাখেন রাজমহল ও পরে আকবরের নামানুসারে আকবর নগরে পরিবর্তিত করেন। মানসিং-এর পূর্বে বাংলার আফগান সুলতান দাউদ আগমহল সুরক্ষিত করেন (৯৮৪ হিঃ)। আকবরের সেনাপতি খান জাহানের অধীনে মুঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন (বদাউনি, ২য় খণ্ড, ২২৯ পৃঃ)। পরে জাহাঙ্গীরের আমলে রাজমহলে শাহজাদা শাহজাহানের সঙ্গে বাংলার জাহাঙ্গীরের ভাইস্রয় ইব্রাহিম খান ফতেহ জং-এর এক প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল ও এই যুদ্ধে ইব্রাহিম খান নিহত হন (ইকবাল নামা ই-জাহাঙ্গীরী, ২২১পৃঃ)। শাহজাদা শাহ শুজার আমলে এই শহর বাংলার ভাইস্রয়ের রাজধানী ছিল প্রায় কুড়ি বৎসর কাল। তিনি এই শহরে মার্বেল-নির্মিত সুন্দর প্রাসাদসমূহ তৈরী করেছিলেন। বর্তমানে সে-সবের কোনোই চিহ্ন নাই (আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, ৩৪০ পৃঃ)।

৯৩. ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অনুমতি নিয়ে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে একটি রেশমের কুঠি স্থাপন করেছিল। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে মালদহের সন্নিকটস্থ ইংলিশ বাজার বাণিজ্য-কুঠি

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'তে মালদহের উল্লেখ আছেঃ "যখন আমি (জাহাঙ্গীর) শাহজাদা ছিলাম তখন আমি তাজউইনের সয়েফি সৈয়দ মীর জিয়াউদ্দীনকে (ইতিমধ্যে তিনি মুস্তফা খান উপাধি পেয়েছেন) ও তাঁর সন্তানসন্ততিকে বাংলার সুপরিচিত পরগণা মালদহ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। এই প্রতিশ্রুতি এখন আমি রক্ষা করলাম (১৬১৭ খ্রীস্টাব্দ)। (জে. এ. এস., ১৮৭৩, ২১৫ পৃঃ দ্রঃ)।

৯৪. গৌড়ের মতো পাণ্ডুয়া মালদহ জেলার মধ্যে অবস্থিত। আলী মুবারকের রাজধানী ছিল পাণ্ডুয়ায়। বাংলার তৃতীয় স্বাধীন মুসলমান আফগান সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ এই স্থান সুরক্ষিত করেছিলেন এবং আন্দাজ ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্থায়ী-ভাবে তথায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। বাংলায় সাতজন স্বাধীন আফগান সুলতানদের আমলে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকাল পাণ্ডুয়ায় বাংলার রাজধানী ছিল। অতঃপর ১৪৪৬ খ্রীস্টাব্দে নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে পুনরায় গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। মুসলমানেরা প্রায় তিন শতাব্দীকাল রাজধানী গৌড়ে রেখেছিল। পাণ্ডুয়ার প্রধান প্রধান অট্টালিকা হচ্ছে—মখদুম শাহ জালাল ও তাঁর পৌত্র কুতব শাহের মাজার; ইষ্টক-নির্মিত দশ গম্বুজবিশিষ্ট ও গ্রানিট-শিলার তৈরী প্রাচীর-বেষ্টিত স্বর্ণ-মসজিদ (১৫৮৫ খ্রীঃ); এক-লাখি মসজিদ—এখানে বাংলার পঞ্চম স্বাধীন মুসলমান সুলতান ২য় গিয়াসউদ্দীনের সমাধি আছে; আদিনা মসজিদ (চতুর্দশ শতাব্দীর)—মি. ফার্গুসনের মতে পাঠান স্থাপত্যের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত; এবং সত্তর গড় (৭০টি স্তম্ভবিশিষ্ট) প্রাসাদ। এককালে স্থানীয় কাগজ প্রস্তুতের জন্য পাণ্ডুয়া প্রসিদ্ধ ছিল; বর্তমানে এই শিল্পের কোনোই চিহ্ন নাই। ডক্টর বুকানান হ্যামিল্টন পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এবং 'খুরশিদ জাহান নামা' পুস্তকে তা সম্পূরিত হয়েছে। (মি. বেভারিজ এগুলো বিশ্লেষণ ক'রে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন)।

১৫. শেখ জালাল-উদ-দীন তাব্রিজী শাহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্দীর খলিফা এবং খাজা কুতুবউদ্দীন ও শেখ বাহা-উদ-দীন জাকারিয়ার বন্ধু ছিলেন। দিল্লীর শেখ-উল-ইসলাম শেখ নজম-উদ-দীন তাঁর শত্রু ছিলেন। সেইজন্য উক্ত দরবেশ বাংলায় চলে আসেন। দেবমহলে (তথা মালডিভ দ্বীপে) তাঁর মাজার রয়েছে (আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, ৩৬৬ পৃঃ)।

১৬. শেখ নূরে কুত্‌ব-উল-আলম ছিলেন শেখ আলাউল হকের পুত্র ও খলিফা। শেখ আলাউল হক ছিলেন শেখ আখী সিরাজের খলিফা। তিনি উঁচু দরের সুফী ছিলেন। ৮০৮ হিজরীতে (১৪০৫ খ্রীঃ) তাঁর মৃত্যু হয় এবং পাণ্ডুয়ায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় (আইন, ২য় খণ্ড, ৩৭১পৃঃ)

১৭. বাংলার সরকারসমূহ সম্পর্কে মন্তব্য প্রধানতঃ ব্লকম্যানের Contributions, 'তবকত-ই-নাসিরি', 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী', 'আইন-ই-আকবরী', 'বদাওনি', টমাসের Initial Coinage, 'ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীরি', 'বাদশাহ নামা' ও 'আলমগীর নামা' থেকে সংগৃহীত।

পরবর্তী বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের গ্রন্থকার বাংলার সকল পুরাতন মুসলমান প্রশাসনিক বিভাগ বা জেলাগুলোর বিবরণ দেন নাই।

১১৯৮ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানগণ কর্তৃক বাংলা বিজয়ের পূর্বে এই দেশ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। যথাঃ (১) রাঢ়—গঙ্গার দক্ষিণ ও হুগলীর পশ্চিম দিকে; (২) বাগ্‌দী—গঙ্গার ব-দ্বীপান্তর্গত অঞ্চল; (৩) বঙ্গ—ব-দ্বীপের পরে পূর্ব-প্রান্তীয় অঞ্চল; (৪) বরেন্দ্র—পদ্মার উত্তর দিকে করতোয়া ও মহানন্দা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল (হ্যামিল্টনের Hindustan দ্রঃ)। এই সকল বিভাগ বিভিন্ন হিন্দু রাজা অথবা ক্ষুদ্র সরদারদের অধীনস্থ ছিল বলে অনুমিত হয়। এরা কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির আনুগত্য

স্বীকার করতো না। এদের শাসনব্যবস্থা গোষ্ঠীপতি শাসনের তুল্য ছিল। যখন বখতিয়ার খালজী অষ্টাদশ অশ্বারোহীসহ ১১৯৮ খ্রীস্টাব্দে (৫৯৪ হিঃ) তৎকালীন বাংলার হিন্দু-রাজধানী নদীয়া আক্রমণ ও জয় করেন, তখন তিনি মিথিলা, বরেন্দ্র, রাঢ় ও বাগ্‌দীর উত্তর-পশ্চিম অংশ জয় করেছিলেন বলে মনে করা যায়। এই অঞ্চলকে রাজধানী লখনৌতি নগরীর নামানুসারে 'ভেলায়েতে লখনৌতি' আখ্যা দেয়া হয়। ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দে (৬৪১ হিঃ) 'তবকত-ই-নাসিরি'র লেখক মিনহাজ-উস-সিরাজ যখন লখনৌতি সফর করেন, তখন ভেলায়েতে লখনৌতির সীমানা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, এই রাজ্য গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থিত ও এর দুইটি অংশের সমন্বয়ে এই রাজ্য গঠিত। পূর্বাঞ্চলকে বলা হয় বরেন্দ্র—এই অংশে দেবকোট অবস্থিত এবং পশ্চিমাঞ্চল হচ্ছে 'রাল' (রাঢ়) ও এই অংশে লখনৌতি অবস্থিত। একটি জাঙ্গাল দ্বারা লখনৌতি শহর একদিকে দেবকোটের সঙ্গে ও অন্যদিকে লাখ্‌নোরের সঙ্গে সংযোজিত পথটি দশ দিনের রাস্তা। দিনাজপুরের দক্ষিণে গঙ্গারামপুরের সন্নিকটে, পুনর্ভবার বাম শাখার তীরে অবস্থিত দমদমাহ গ্রামে অবস্থিত একটি দুর্গ পুরাতন দেবকোট বলে চিহ্নিত হয়েছে। বখতিয়ার খালজীর অব্যবহিত পরবর্তী স্বলাভিষিক্ত সুলতান গিয়াসউদ্দীন ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে (৬১০ হিঃ) বাংলা জয় করেছিলেন বলে মনে হয় (তবকত, ১৬৩ পৃঃ)। স্বাধীন মুসলমান সুলতানদের আমলে (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রীঃ) বাংলা-রাজ্যের আয়তন 'আইন-ই-আকবরী'তে এবং ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে আকবরের রাজস্ব-সচিব খাজা মুজফ্‌ফর আলী ও টোডর মলের তৈরী রাজস্ব তালিকার আয়তন অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল (জে. এ. এস., ১৮৭৩, ২৫৪ পৃঃ ; তবকত-ই-নাসিরি, তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী ও টমাসের Initial Coinage দ্রঃ)। আকবরের রাজস্ব তালিকায় নিম্নোক্ত ১৯টি সরকারের সমন্বয়ে খাস বাংলা গঠিত ছিল ঃ

গঙ্গার উত্তর ও পূর্ব দিকের সরকারসমূহ

(১) সরকার লখনৌতি বা জিন্নতবাদ : তেলিয়াগড়ি (কোলগং-এর নিকটবর্তী) থেকে প্রসারিত। বর্তমান ভাগলপুর ও পুর্নিয়া জেলাসমূহের কয়েকটি মহল এবং সমগ্র মালদহ এর মধ্যে ছিল। ৬৬টি মহল; খালসা রাজস্ব ৪,৭১,১৭৪ টাকা।

(২) সরকার পুর্নিয়া : বর্তমানে পুর্নিয়া জেলার অধিকাংশ—মহানন্দা পর্যন্ত। ৯টি মহল; রাজস্ব ১,৬০,২১৯ টাকা।

(৩) সরকার তাজপুর: মহানন্দার পূর্ব দিকে পুর্নিয়ার পূর্বাঞ্চল, এবং পশ্চিম দিনাজপুর। ২৯টি মহল; রাজস্ব ১,৬২,০৯৬ টাকা।

(৪) সরকার পাঞ্জরাহ্ : দিনাজপুর জেলার অধিকাংশসহ দিনাজপুর শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। ২৯টি মহল; রাজস্ব ১,৪৫,০৮১ টাকা।

(৫) সরকার ঘোড়াঘাট : ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত—দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলাসমূহের অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। ৮৪টি মহল; রাজস্ব ২,০২,০৭৭ টাকা।

(৬) সরকার বারবাকাবাদ: মালদহ ও দিনাজপুরের অংশ এবং রাজশাহী ও বগুড়ার অধিকাংশ নিয়ে গঠিত ছিল। ৩৮টি মহল; রাজস্ব ৪,৩৬,২৮৮ টাকা।

(৭) সরকার বাজুহা : রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিং প্রভৃতি জেলাগুলোর অংশসহ দক্ষিণ দিকে ঢাকা শহর অতিক্রম ক'রে সমগ্র অঞ্চল গঠিত। ৩২টি মহল; রাজস্ব ৯,৮৭,৯২১ টাকা।

(৮) সরকার সিলহট : ৮টি মহল; রাজস্ব ১,৬৭,০৩২ টাকা।

(৯) সরকার সোনারগাঁও : মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরে অবস্থিত; পশ্চিম ত্রিপুরা, ঢাকার পূর্বাঞ্চল, ময়মনসিং ও নোয়াখালীসহ। ৫২টি মহল; রাজস্ব ২,৫৮২৮৩ টাকা (ডক্টর ওয়াইজের Note on Sonargaon, J. A. S., ১৮৭৪, ১নং, ৮২ পৃঃ দ্রঃ)।

(১০) সরকার চাটগাম : ৭টি মহল; রাজস্ব ২,৮৫,৬০৭ টাকা।

গঙ্গার ব-দ্বীপের সরকারসমূহ

(১১) সরকার সাতগাঁও : হুগলীর পশ্চিম দিকের ক্ষুদ্র অংশ কবোদক নদী পর্যন্ত বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার অধিকাংশ, মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ ; দক্ষিণ দিকে ডায়মণ্ড হারবারের নীচে হাতিয়াগড় পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সরকারের মধ্যে মহল 'কাল-কাত্তা' (কলিকাতা) ছিল ; এই মহল অন্য দুইটি মহলসহ ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে ২৩,৪০৫ টাকা রাজস্ব দিতো। ৫৩টি মহল ; রাজস্ব ৪,১৮,১১৮ টাকা। জে. এ. এস., ১৮৭০, ২৮০ পৃঃ দ্রঃ)।

(১২) সরকার মাহমূদাবাদ : বাংলার সুলতান মাহমূদ শাহের (৮৪৬ হিঃ) নামে এই সরকারের নাম হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব নদীয়া, উত্তর-পূর্ব যশোর ও ফরিদপুরের পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে এই সরকার গঠিত। ৮৮টি মহল ; রাজস্ব ২,৯০,২৫৬ টাকা।

(১৩) সরকার খলিফতাবাদ : দক্ষিণ যশোর ও পশ্চিম বাকির-গঞ্জ (বাকেরগঞ্জ) নিয়ে গঠিত। বাগেরহাটের সন্নিকটস্থ হাভেলি পরগণা খলিফতাবাদের নামে এই সরকারের নামকরণ হয়েছিল। যসোর (যশোর) বা রসুলপুর এই সরকারের সর্ববৃহৎ মহল। ৩৫টি মহল ; রাজস্ব ১,৩৫,০৫৩ টাকা। আলাইপুর এই সরকারের মধ্যে অবস্থিত। অধ্যাপক ব্লকম্যান অনুমান করেন, বাংলার সুলতান হওয়ার পূর্বে এখানে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের বাসস্থান ছিল।

(১৪) সরকার ফত্‌হাবাদ : বাংলার সুলতান ফত্‌হ শাহের (৮৮৬ হিঃ) নামে এই সরকারের নামকরণ করা হয়েছিল। যশোরের ক্ষুদ্রাংশ, ফরিদপুরের বৃহৎ অংশ, উত্তর বাকেরগঞ্জ, ঢাকা জেলার একাংশ, দক্ষিণ শাহবাজপুর দ্বীপ ও সন্দ্বীপ (মেঘনার মোহনায়) নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়েছিল। ফরিদপুর শহর ফত্‌হাবাদ হাভেলি পরগণার মধ্যে অবস্থিত। ৩১টি মহল ; রাজস্ব ১,৯৯,২৩৯ টাকা।

(১৫) সরকার বাক্‌লা বা বোগ্‌লা : উপরোক্ত সরকারের দক্ষিণ-পূর্বদিকে। বাকেরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশ নিয়ে গঠিত। ৪টি মহল ; রাজস্ব ১,৭৮,৭৫৬ টাকা।

গঙ্গার দক্ষিণ ও ভাগিরথীর (হুগলী) পশ্চিমের সরকারসমূহ

(১৬) সরকার উদনার বা টাণ্ডা : মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ ও বীরভূমের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত। ৫২টি মহল ; রাজস্ব ৬,০১,৯৮৫ টাকা। ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে সুলায়মান কররানী সরকারী সদর দফতর গৌড় থেকে টাণ্ডায় স্থানান্তরিত করেছিলেন অর্থাৎ গৌড় ধ্বংস সহওয়ার এগারো বৎসর পূর্বে (আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ দ্রঃ)।

(১৭) সরকার শরিফাবাদ : উপরোক্ত সরকারের দক্ষিণ দিকে। বীরভূমের বাকী অংশ, বর্ধমান জেলার বৃহৎ অংশ ও বর্ধমান শহর নিয়ে এই সরকার গঠিত হয়েছিল, ২৬টি মহল ; রাজস্ব ৫,৬২,২১৮ টাকা।

(১৮) সরকার সুলায়মানাবাদ : বাংলার সুলতান সুলায়মান শাহের নামে। বর্তমান নদীয়া জেলার দক্ষিণ দিকের কয়েকটি পরগণা, বর্ধমান ও হুগলী জেলার সমগ্র উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত। ই. আই. আর.-এর পাণ্ডুয়া এই সরকারের মধ্যে ছিল। এই সরকারের প্রধান শহর সুলায়মানাবাদ (পরে সলিমাবাদে পরিবর্তিত হয়েছিল) বর্ধমান শহরের দক্ষিণ-পূর্বে দামোদর নদের বাম তীরে অবস্থিত ছিল। ৩১টি মহল ; রাজস্ব ৪,৪০,৭৪৯ টাকা।

(১৯) সরকার মাদারন : পশ্চিম বীরভূমের নগর থেকে অর্ধবৃত্তাকারে রানীগঞ্জ হয়ে দামোদর নদীর তীর দিয়ে বর্ধমান পর্যন্ত

এবং সেখান থেকে খাণ্ডগোশ, জাহানাবাদ, চন্দ্রকোণা (হুগলী জেলার পশ্চিমাঞ্চল) হয়ে রূপনারায়ণ নদীর মুখে মণ্ডলঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৬টি মহল; রাজস্ব ২;৩৫,০৮৫ টাকা।

১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে উপরোক্ত ১৯টি সরকার নিয়ে খাস বাংলা গঠিত ছিল। খালসা জমির রাজস্ব এবং লবণ, হাট ও মাছ ধরার অধিকারের দরুন কয়েকটি করসহ রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬,৩৩৭,৫৫২ টাকা। গ্রাণ্টের মতে জায়গীর জমির রাজস্ব ৪,৩৪৮,৯২ টাকা নির্ধারিত হয়েছিল। সুতরাং ১৫৮২ সালে ও তৎপূর্ব থেকেই বাংলার মোট রাজস্ব ছিল ১৫,৬৮৫,৯৪৪ টাকা (জে. এ. এস., ১৮৭৩, ২১৯ পৃঃ দ্রঃ)। এই রাজস্ব সুলতানের অংশ বাবদ প্রজাদের নিকট থেকে জমির উৎপাদনের মূল্য হিসাব ক'রে এক ষষ্ঠমাংশ আদায় করা হোত (আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, ৫৫ ও ৬৩ পৃঃ)। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এই রাজস্ব-তালিকা বজায় ছিল। শাহজাহানের আমলে বাংলার সীমানা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মেদেনিপুর ও হিজলী এবং পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ত্রিপুরা ও কোচ-হাজো জয় করতঃ প্রসারিত হয়েছিল। শাহ-জাদা শুজাকে যখন বাংলার গবর্নর নিয়োগ করা হয়, তখন তিনি অনুমান ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে নতুন রাজস্ব তালিকা তৈরী করেন। এই নতুন রাজস্ব-তালিকায় ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০টি মহল দেখানো হয়েছিল; এবং খাল্‌সা ও জায়গীর জমির মোট রাজস্বের পরিমাণ দেখানো হয় ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা (জে. এ. এস., ১৭৮০, ২১৯ পৃঃ দ্রঃ)। শুজার রাজস্ব-তালিকা ১৭২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বজায় ছিল। আওরঙ্গজেবের আমলে চিটাগাং, আসাম ও কোচবিহার জয় করায় কিছুটা যোগ হয়। ঐ বৎসর নওয়াব জাফর খান (মুর্শিদ কুলী খান) 'কামিল জমা-তুমারি' (সম্পূর্ণ রাজস্ব তালিকা) তৈরী করেন। তাতে বাংলাকে ৩৪টি সরকার, ১৩টি চাক্‌লা ও ১৬৬০টি পরগণায় ভাগ করা হয় এবং রাজস্বের পরিমাণ ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা নির্ধারিত হয়। নওয়াব জাফর

খানের শাসনকালের পর আবওয়ারের দরুন রাজস্ব তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। নওয়াব জাফরের উত্তরাধিকারী শুজা খানের আমলে আবওয়ারের পরিমাণ দেখানো হয় ২১,৭২,৯৫২ টাকা (ব্লকম্যানের Cnotributions ও টমাসের Report দ্রঃ)। নওয়াব আলীবর্দী খান ও কাসিম খানের আমলে এর পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে, ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন বাদশাহ্ শাহ্ আলমের নিকট দেওয়ানি লাভ করে, তখন খাস বাংলার সমগ্র রাজস্বের পরিমাণ ছিল ২,৫৬,২৪,২২৩ টাকা (গ্রাণ্টের Report দ্রঃ)।

একটি বিষয়ে আমি অধ্যাপক ব্লকম্যানের সঙ্গে একমত হতে পারছি না। তিনি যেন বলতে চান যে, ১৫৮২ সালে টোডরমলের রাজস্ব-তালিকা, 'আইন-ই-আকবরী', 'ইকবাল নামা', 'পাদশাহ্ নামা' ও 'আলমগীর নামা' থেকে তৈরী উপরোক্ত রাজস্ব-তালিকা প্রাক-মুঘল আমলের বাংলা রাজ্যের অধীনস্থ অঞ্চলের ও আর্থিক ক্ষমতার নিদর্শনরূপে গণ্য করা যেতে পারে (জে. এ. এস., ১৮৭৩, ২১৪ পৃঃ)। তাঁর এই মত ভ্রান্ত; কারণ প্রাক-মুঘল আমলের কয়েকজন সুলতানের আমলে সমগ্র উত্তর-বিহার এবং কয়েকজনের আমলে উড়িষ্যা ছাড়াও পশ্চিমে মুঙ্গের ও বিহার সরকারদ্বয়ও মুসলমান বাংলা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রাক-মুঘল আমলের মুসলমান বাংলা-রাজ্যের আয়তনগত ও আর্থিক শক্তি অধ্যাপক ব্লকম্যানের সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বিস্তৃততর ছিল। 'আইন-ই-আকবরী'তে উড়িষ্যাকে সুবে বাংলার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; উড়িষ্যায় ৫টি সরকার ছিল। সুতরাং, সুবে বাংলায় ২৪টি সরকার (উড়িষ্যার ৫টি সরকারসহ), ৭৮৭টি মহল এবং ১,৪৯,৬১,৪৮২৷৶৭ পাই রাজস্ব বলে বর্ণিত হয়েছে (আইন, ২য় খণ্ড, ১২৯ পৃঃ)। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের দরবারস্থ মুতামাদ খান তাঁর 'জাহাঙ্গীরের বাদশাহীর সপ্তম বর্ষের' বিবরণীতে বাংলার রাজস্ব ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা

বর্ণনা করেছেন (ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ৬০ পৃঃ দ্রঃ)।

৯৮. রাজা ভগীরথ বা ভগদত্ত ছিলেন নারকের পুত্র। তাঁর রাজধানী ছিল প্রাক্-জ্যোতিষপুর (বর্তমান গৌহাটি)। মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে যে, ভগীরথ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন ও অর্জুন কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। 'আইন-ই-আকবরী'র (১৪৪ পৃঃ, ২য় খণ্ড) মতে ভগীরথ বা ভগদত্তের বংশের তেইশ জন তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে রাজত্ব করেছিলেন।

৯৯. 'আইন' (১৪৭ পৃঃ) অনুসারে 'জর্জধন'।

১০০. এই সময় তাঁর বংশধরগণ রাজত্ব করেছিলেন। 'আইন' (১৪৪ পৃঃ) অনুসারে ২৪১৮ বৎসর।

১০১. 'আইন', ১৪৫ পৃঃ, "ভোজ গোড়ীয়া"।

১০২. 'আইন', ১৪৫ পৃঃ, '৫২০ বৎসর'।

১০৩. 'আইনে' 'আদ্‌সুর'।

১০৪. 'আইন', ১৪৬ পৃঃ, '১০৬ বৎসর'।

১০৫. 'আইনে' '৪৫৪৪ বৎসর'।

১০৬. 'আইনে' 'সুখ সিন'। তাঁকে বৈশ্য বলে বর্ণনা করা হয় নাই।

১০৭. 'আইনে' 'নওগা'।

১০৮. 'ফেরেস্তা'য় 'লখমনাহ' ; 'তবকত-ই-নাসিরি'তে 'লখমনিয়া'।

১০৯. 'তবকত-ই-নাসিরি'তে 'নওদিয়া' বা 'নতুন দ্বীপ'। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেন ১০৬৩ খ্রীস্টাব্দে এই শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি কখনো গৌড়ে ও প্রধানতঃ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে বাস করতেন। ৫৯৪ হিঃ বা ১১৯৮ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে এই দুর্গ দখল করেছিলেন। এটা হিন্দু রাজার দুর্বলতার দুঃখজনক পরিচিতি।

১১০. এই বর্ণনা কয়েকটি মুসলমান (লিখিত) ইতিহাসে পুনরুক্তি হয়েছে। যথা, 'তবকত-ই-নাসিরি' ; 'ফেরেশ্‌তা' ; 'আইন-ই-আকবরী'। 'তবকত' অতি নিকটবর্তী সমসাময়িক পুস্তক বিধায় বিশেষভাবে

এর বর্ণনা উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ উক্ত পুস্তকের গ্রন্থকার মিনহায-উস-সিরাজ অল্পদিন পরে ৬৪১ হিজরীতে লখনৌতি সফর করেছিলেন। এখানে একলক্ষ কড়ি উল্লিখিত হয়েছে (তবকত, ১৫১ পৃঃ)।

১১১. মিনহায-উস-সিরাজ তাঁর 'তবকত' পুস্তকে (১৫০-১৫১ পৃঃ) রাজার উচ্চপ্রশংসা করেছেন ; এবং তাঁর সদ্‌গুণ ও ঔদার্যের বিপুল প্রশংসা করেছেন। এই ব'লে শেষ করেছেন : 'আল্লাহ্ পরকালে তাঁর শাস্তির পরিমাণ হ্রাস করুন'। সত্যিই মিনহায নিজেও উদার মতাবলম্বী ছিলেন।

১১২. 'ফেশে্‌তা' (ফার্সি সংস্করণ) ১ম খণ্ড, ১২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, সুরজের পিতা বহদাজ নূহের বংশধর। উল্লেখ্য যে, মুঙ্গেরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে মৌলা নগরের নিকটে 'সুরজগড়' বা 'সুরজের দুর্গ' নামক একটি শহর আছে। পুস্তকে বর্ণিত রাজা সুরজের জন্মস্থান কি এখানে হোতে পারে না? স্থানটি এমন যে, তাঁর পক্ষে বিন্দ্য পর্বতের গিরিপথ দিয়ে পুস্তকে কথিত দক্ষিণে হামলা চালানোর সুবিধা ছিল।

১১৩. পুস্তকে 'রায় বহদাজের' পরিবর্তে এটা ভুল লেখা হয়েছে। 'ফেরেশ্‌তা'য় বলা হয়েছে যে, রায় বহদাজ রায় সুরজের পিতা ও নূহের বংশধর।

১১৪. আমরা 'ঝাড়খণ্ড' নাম 'আকবর নামা'তেও পাই। ছোট নাগপুরকে মুসলমানেরা ঝাড়খণ্ড আখ্যা দিতো; যেমন সাঁওতাল পরগণাকে নাম দিয়েছিল 'ভাড়কুণ্ড'।

আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আর্যগণ নিশ্চয়ই এমন নিম্নস্তরে পৌঁছেছিল যে, সাঁওতাল পরগণা থেকে দ্রাবিড় অথবা সাঁওতালি ব্রাহ্মণ আনিয়ে তাদের ধর্মশিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়েছিল।

ছোটনাগপুরের গিরিসংকট থেকে 'আধ্যাত্মিকতার আলোক' রাজা সুরজের আমলে আমদানি করার বৃত্তান্ত থেকে সুরজগড় (যা ছোটনাগপুর থেকে দূরে নয়) যে রাজা সুরজের বাসস্থান

ছিল, আমার এই অনুমান দৃঢ়তর হচ্ছে। আরো উল্লেখ্য যে, সাঁওতালীরা তাদের পূর্ব-পুরুষের প্রতিমা পূজা করে। সেই কথা পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে।

১১৫. গশ্‌টাপ বা কেস্‌টাব : গ্রীকদের ডেরায়াস হাইস্‌টেস্‌পাস ; তিনি কাইনিয়ান বংশীয় ছিলেন। তাঁর পুত্র ইস্‌ফন্দার—গ্রীকদের জারাকসেস ও তাঁর পৌত্র বাহ্‌মন—গ্রীকদের আর্টাজেরেক্‌সিস লঙ্গিমেনাস (নামা-ই-খসরুওম, ৫৯ পৃঃ)।

১১৬. টাইথাগরাইয়ের শিষ্য মনুচেহেরের বংশীয় এক ব্যক্তির নাম জইদশ্‌ত বা জরদাশ্‌ত বা জর্দাহস্ত। পারস্যের বাদশাহ গস্তাস্পের আমলে নিজেকে পয়গম্বর বলে দাবী করেন এবং অগ্নি উপাসনার প্রবর্তন করেন। মেগিয়ানগণ তাঁকে পয়গম্বর বলে স্বীকার করে ও বলে যে, তাঁর নাম ইব্রাহিম এবং তাঁর গ্রন্থ জেন্দ্‌ বা জেন্দাবার্তা ঈশ্বর প্রেরিত বলে দাবী করে। অনুমিত হয়, গ্রীকরা তাঁকেই জোরোয়াস্তর বলে।

১১৭. 'ফেরেস্তায়' 'সঙ্গলদ্বীপ'কে 'সঙ্গল' উল্লেখ করা হয়েছে। এই পুস্তকেও অন্যত্র 'সঙ্গল' উল্লিখিত হয়েছে। 'ফেরেশ্‌তা'র (ফার্সি (সংস্করণ) ২য় খণ্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠায় 'সঙ্গলদ্বীপ' বা 'সঙ্গলের' নিম্নোক্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছে : "রাজা কেদার ব্রাহ্মণের রাজত্বের শেষ দিকে সঙ্গল 'কোচের' (বা কুচবিহারের) পার্শ্বস্থ অঞ্চল থেকে নির্গত হয়ে কেদারের উপর জয়ী হন ও লখনৌতি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এই নগর গৌড় নামেও পরিচিত। 'সঙ্গল' চার হাজার হাতী, এক লক্ষ অশ্বারোহী ও পাঁচ লক্ষ পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং তুরান বা টার্টারি বা সিদিয়ার রাজা আফ্রাসিয়াবকে কর দেয়া বন্ধ করেন। আফ্রাসিয়াব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রধান সেনাপতি পিরান-ভিসাকে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ সঙ্গলকে শাস্তি দেয়ার জন্য পাঠান। এই বইয়ের অবশিষ্ট বিবরণী 'ফেরেশ্‌তা'র অনুরূপ।

১১৮. কুচবিহার প্রাচীনকালে কোচ জাতির অথবা কেবল কোচদের

অঞ্চলরূপে পরিচিত ছিল।

১১৯. তুরান অথবা টার্টারি অথবা সিদিয়ার স্থানে (আফ্রাসিয়াব সেখানকার রাজা ছিলেন) ভুলক্রমে ইরান বা পারস্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রাচীনকালে পারস্যের মতো ভারতও সিদিয়ানরা জয় করেছিল।

১২০. পারস্য-বিজয়ী আফ্রাসিয়াব তুরান বা টার্টারি বা সিদিয়ার প্রাচীনকালের রাজা ছিলেন। মঙ্গোল বংশে তাঁর জন্ম। তিনি পারস্য জয় ক'রে স্বহস্তে নজরকে হত্যা করেন ও খ্রীস্টীয় অব্দের সাত শতাব্দী পূর্বে তথায় প্রায় বারো বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু পরে জালজার নামক প্রসিদ্ধ নেতা দ্বারা অক্সাস নদীর অপর প্রান্তে বিতাড়িত হন। আফ্রাসিয়াব পুনরায় পারস্য আক্রমণ করেন; কিন্তু জালজার ও তাঁর সুপ্রসিদ্ধ পুত্র পারস্যদেশীয় হারকিউলিস রুস্তম কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। তবে, ফেরাওযা, টলেমি ও সিজারের মতো আফ্রাসিয়াবও একটা পারিবারিক নাম বলে অনুমিত হয়।

১২১. চীনের রাজধানীকে সেকালে 'খান বালিগ' বা 'মহান খানের নগর' বলা হোত।

১২২. রুস্তম—পারস্যদেশীয় হারকিউলিস। পারস্যদেশের কায়ানীয় বংশের প্রথম আমলের রাজাদের আমলে তুরানী বা সিদীয় রাজাগণ যখন পারস্য আক্রমণ করেন, তখন রুস্তম সাফল্যজনকভাবে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। সিদীয় বা তুরানী বা মঙ্গোলীয়দের সঙ্গে ইরানী বা পারস্যদেশীয়দের যুদ্ধের বিশদ বিবরণীর জন্য প্রাচ্যের হোমার ফেরদৌসীর 'শাহনামা' দেখুন। উল্লেখযোগ্য যে, ফেরদৌসীর অমর ফার্সি মহাকাব্যে চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সাসানীয় বংশের পারস্যদেশীয় রাজা বাহ্রাম গৌড়ের অভিযান সংক্রান্ত বিষয়ে সঙ্গল নামক একজন ভারতীয় রাজার নাম উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এই সঙ্গল পূর্ববর্তী সঙ্গলের (যাকে আফ্রাসিয়াব বন্দী করেছিলেন) বংশধর ছিলেন। এই প্রসঙ্গে পারস্য-

দেশীয় রাজবংশগুলোর ক্রমানুমিক পরিচয়ের জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে যে, পারস্যদেশে পুরাকালে নিম্নোক্ত চারিটি বংশ রাজত্ব করেছিল : (১) পেশদাদিয়ানগণ—এদের মধ্যে কাইমুরাগণ, জামসেদগণ ও ফেরেদু'গণ ছিল। (২) কাইনাইয়ানগণ—আন্দাজ খ্রীস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে কায়কোবাদ এই বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ; কায়খসরু, বাহ্‌মন, দারা (ডেরায়াস) প্রভৃতি এই বংশীয় ছিলেন। (৩) আশকানিগণ—হরমুজ প্রভৃতি এই বংশীয় ছিলেন। (৪) সাসানীয়গণ—আদিশের বাকোনে খ্রীস্ট-পূর্ব ২০২তে এই বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ; বাহ্‌রাম গোড়, নওশেরে'য়া প্রভৃতি এই বংশীয় ছিলেন ('নামা-ই-খসরুয়ান'—মীর্জা মোহাম্মদ লিখিত পারস্যদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দ্রঃ)।

১২৩. সুলতান মুঈজুদ্দীন মুহম্মদ সাম ওরফে সাহাব-উদ-দীন ঘোরি যখন হিন্দুস্তান আক্রমণ করেন, তখন রাজা জয়চাঁদ রাঠোর কনৌজ ও বানারসে এবং রাজা পিথোরা তনওয়াব দিল্লীতে রাজত্ব করতেন (তবকত, ১২০ পৃঃ)।

১২৪. বিশেষরূপে উল্লেখ্য যে, সম্ভবতঃ নকলনবিসের ভুলবশতঃ এখানে বিভিন্ন ঘটনার ক্রমানুকিতা সঠিকরূপে বর্ণিত হয় নাই।

১২৫. পাঞ্জাবের নিকটে আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে হিন্দু রাজা পুরুর যুদ্ধ হয়েছিল। পুরু কনৌজ থেকে অগ্রসর হয়েছিলেন ও সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন।

১২৬. 'আইন' গ্রন্থে আবুল ফজল বলেন : "সুবে দিল্লীর উত্তরাঞ্চলের পর্বতমালার একাংশের নাম কুমায়ুন। এখানে সোনা, রূপা সীসা, লোহা, তামা ও সোহাগার খনি আছে। এখানে কস্তুরিমৃগ, কুলাস গরু এবং রেশমও পাওয়া যায় (আইন-ই আকবরী, ২য় খণ্ড, ২৮০ পৃঃ)।

১২৭. 'ফেরেশ্‌তা'য় 'রামদেও রাঠোর'।

১২৮. প্রাক-মুসলমান আমলের বাংলা ও ভারত সংক্রান্ত এই সকল পুরা-কাহিনীর অধিকাংশ গ্রন্থকার 'ফেরেশ্‌তা' থেকে নিয়েছেন।

এর অধিকাংশই পৌরাণিক কাহিনী। এর মধ্য থেকে ঐতিহাসিক-সত্য নির্ণয়ের দায়িত্ব আমি অধিকতর যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। তথাপি উল্লেখযোগ্য যে, (আমাদের গ্রন্থকারের বর্ণনা থেকে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়) অতি পুরাকালে ভারত ও বাংলার সঙ্গে সিদিয়া ও (এর মাধ্যমে) পারস্যের কোনো রকমের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। সম্ভবতঃ সিদিয়দের আক্রমণের ফলে তাদের সঙ্গে আর্যদের অনেকটা মিশ্রণ হয়েছিল এবং অতঃপর দক্ষিণ দিক থেকে দ্রাবিড়দের আক্রমণের ফলে অধিকতর মিশ্রণ হয়েছিল।

দ্বিতীয় পর্ব : প্রথম পরিচ্ছেদ

১. ১১৯৮ থেকে ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এঁদের শাসন চলেছিল।

২. এটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। বখতিয়ার খালজী-আল-গাজী (তবকত-ই-নাসিরি, ১৪৬ পৃঃ) ৫৯৪ হিজরী বা ১১৯৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা জয় করেছিলেন ('তারিখ' সম্বন্ধে আলোচনার জন্য 'তবকত', ১৫০ পৃঃ ; ব্লকম্যানের Contributions to the History of Bengal দ্রঃ)। তখন বাদশাহ শাহাব-উদ্দীন ঘোরি ওরফে মুঈজুদ্দীন মুহম্মদ শাম জীবিত ছিলেন এবং তাঁর ভাইস্‌রয়রূপে কুতবুদ্দীন আইবেক দিল্লীতে শাসন করছিলেন। অর্থাৎ, ৫৮৭ হিজরী বা ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে মুসলমানগণ দিল্লী জয় করার মাত্র সাত বৎসর পরে বঙ্গ বিজয় হয়েছিল (তবকত, ১২৮, ১৩৯ ও ১৪০ পৃঃ)। কুতবুদ্দীনকে আইবক বলা হোত ; কারণ তাঁর কণিষ্ঠাঙ্গুলি দুর্বল অথবা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ছিল (তবকত, ১৩৮ পৃঃ)। অন্য বর্ণনায় 'আইবক' অর্থ 'অত্যুৎকৃষ্ট নেতা'। 'কুতব মসজিদ' ও 'কুতব মিনার' তাঁর স্মৃতি বহন করছে—যদিও এগুলো অন্য বীর-গণের স্মৃতি রক্ষার্থে তৈরী করা হয়েছিল। বখতিয়ার প্রথমে নিজ উদ্যমে বাংলা জয় করেন—তিনি শাহাব-উদ্দীনের ও পরে দিল্লীর বাদশাহ হওয়ার পর কুতবুদ্দীনের সার্বভৌমত্ব নামে স্বীকার করতেন (তবকত ১৪০ পৃঃ)। 'তবকতে' শাহাব-উদ্দীন ওরফে মুঈজুদ্দীনের অধীনস্থ মালুক ও সুলতানদের যে তালিকা পাওয়া যায়, তাতে বখতিয়ারকে কুতবুদ্দীনের সমান পদ দেয়া হয়েছে (তবকত, ১৪৬ ও ১৩৭ পৃঃ), এই বৃত্তান্ত থেকে উপ-রোক্ত মন্তব্যের সত্যতা অনুমান করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে, প্রথম আমলের মুসলমান শাসনকর্তাদের ভুলবশতঃ

'ভারতে পাঠান শাসক' আখ্যা দেয়া হয়। মেজর রেভার্টি তাঁর 'তবকত-ই-নাসিরি'র অনুবাদে দেখিয়েছেন যে, ভারতের প্রাক-মুঘল মুসলমান শাসকগণ ঘোরি অথবা দাস অথবা 'দিল্লীর দাস রাজাগণ' অথবা তুঘলকগণ অথবা খালজীরা আসলে আফগান অথবা পাঠান ছিলেন না; এঁরা সকলেই ছিলেন তুর্কী-জাতীয় (তবকত-ই-নাসিরি, ১৫০ পৃঃ দ্রঃ; এখানে বিহার ও বাংলার প্রথম মুসলমান বিজেতাদের সম্পর্কে 'তুর্কান' অথবা 'তুর্কী' শব্দ অনবরত ব্যবহৃত হয়েছে)। ১৮৭৫ সালের A.S.J., ১ম সংখ্যা, ৩৭ পৃষ্ঠায় মেজর রেভার্টি বলেছেন যে, 'মুসালিক-উল-মুমালিক' অনুসারে "খালজীরা তুর্কী-জাতীয়; পূর্বে তারা সিজিস্তান ও হিন্দ্ অঞ্চলের মধ্যবর্তী স্থানে গ্রামসিরে এসে বসবাস করতে থাকে। চেহারায় ও পোশাকে তারা তুর্কীদের মতো; তুর্কীদের আচার ও প্রথা মেনে চলে; সকলেই তুর্কী ভাষায় কথা বলে।" কিছু-সংখ্যক লেখক খালজী বা খিলজীদের ভুলবশতঃ 'গাল্‌জী' বা 'গিল্‌জী' নামক আফগান গোষ্ঠীভুক্ত বলে মনে করেছেন। কুতবুদ্দীন আইবক থেকে গণনা ক'রে ভারতের ত্রিংশৎ মুসলমান শাসনকর্তা লোদী গোষ্ঠীর বহ্‌লুল প্রথম আফগান বা 'পাঠান' যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন।

৩. উল্লেখযোগ্য যে, বখতিয়ার খালজী ও তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী স্থলাভিষিক্তগণের আমলে দক্ষিণ বিহার ছিল বাংলা বা লখনৌতি সুবার অন্তর্ভুক্ত। ৬২২ হিজরীতে বাদশাহ আলতামস দক্ষিণ বিহারকে বাংলা সুবা থেকে পৃথক করেন ও আলাউদ্দীন জানী নামক একজন স্বতন্ত্র গবর্নরের অধীনস্থ করেন। বাদশাহের প্রত্যাগমনের পর বাংলার শাসনকর্তা গিয়াসউদ্দীন পুনরায় বিহার দখল করেন (তবকত-ই-নাসিরি, ১৬৩ পৃঃ)। ১৩২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিহার বাংলা-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময় বাদশাহ গিয়াসউদ্দীন তুঘলক আবার বিহার পৃথক করেন। ১৩৯৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে বিহার জৌনপুরের শর্‌কি রাজ্যের অধীন ছিল। অনুমান

১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দ বা ৯০৩ হিজরীতে পুনরায় গবর্নর দরিয়া খানের পুত্র ইব্রাহিম বাহাদুর খান বিহারে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। গৌড়ের মুসলমান সুলতান হোসেন শাহ ও নসরত শাহের আমলে দক্ষিণ বিহার কম-বেশী তাঁদের অধীন ছিল। প্রথম দিকের মুঘল বাদশাহদের আমলে বিহার একটি স্বতন্ত্র সুবা ছিল; কিন্তু পরবর্তী মুঘল বাদশাহদের আমলে দক্ষিণ-বিহার ও উড়িষ্যা উভয়ই বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত হয়। উত্তর-বিহার সাধারণতঃ বাংলার মুসলমান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে হয় (তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, ১৫১ ও ৫৮৬ পৃঃ দ্রঃ)।

৪. আবুল ফজল বলেছেন, কান্দাহারের উত্তরে 'ঘোর' ও পশ্চিমে 'গারমসির'। ঘোরি সুলতানদের রাজধানী ফিরোজকোহ্ উক্ত গারমসির অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত।

৫. 'তবকত-ই-নাসিরি'তে নিকটতম সমকালীন বিবরণ পাওয়া যায়। উক্ত পুস্তকে (ফার্সী সংস্করণ, ১৪৬ পৃঃ) বখতিয়ার খালজীকে কর্মতৎপর, চট্‌পটে, সাহসী, নির্ভীক, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বইতে বলা হয়েছে, তিনি সুলতান মুঈজুদ্দীনের অধীনে চাকুরীর সন্ধানে গজনী গিয়েছিলেন। কিন্তু শীর্ণকায় হওয়ায় সুলতানের সমর-সচিব তাঁকে গ্রহণ করেন নাই। নিরাশ হয়ে তিনি দিল্লী এসেছিলেন। কিন্তু এখানেও সমর সচিব তাঁকে চাকুরী দেন নাই (দেওয়ান-ই-আর্‌জ্‌)।

৬. সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বিবরণী 'তবকত-ই-নাসিরি'র ১৪৭ পৃষ্ঠায় 'বদাওন'। 'তবকতে' উল্লিখিত হয়েছে যে বদাওনের সামন্তের নাম ছিল সিপাহ্‌সালার (সেনাপতি) হাজ্‌বার-উদ-দীন হাসান আর্নাব।

৭. বখতিয়ার খালজীর জায়গীর বানারসের দক্ষিণে ও চুনারগড়ের পূর্বে অবস্থিত 'ভগওয়াত' ও 'ভয়েলি' পরগণাদ্বয় ছিল বলে মেজর রেভার্টি শনাক্ত করেছেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান এই মত সন্তোষজনক বলেছেন (রেভার্টির 'তবকত-ই-নাসিরি'র অনুবাদ এবং ব্লকম্যানের Contri-

butions to History and Geography of Bengal দ্রঃ)।

৮. 'তবকত-ই-নাসিরি'তে প্রদত্ত বর্ণনার সঙ্গে এটা ঠিক মিলে না (রেভার্টী সংস্করণ, ১৪৭ পৃঃ)। 'তবকতে' বর্ণিত হয়েছে যে, ক্ষীণকায়ের জন্য গজনী ও দিল্লীতে সমর-সচিবগণ কর্তৃক গৃহীত না হওয়ার পর বখতিয়ার খালজী বদাওন যান ও সেখানকার সামন্ত-সেনাপতি হাজবার-উদ-দীন আরনাবের সামনে উপস্থিত হন। তিনি তাঁকে নির্দিষ্ট ভাতা বরাদ্দ করেন। অতঃপর বখতিয়ার আউধে (অযোধ্যা) গিয়ে তথাকার সামন্ত মালিক হাসাম-উদ-দীন উঘলবাকের নিকট উপস্থিত হন। মালিক তাঁকে সাহ্‌লাত ও সাহ্‌লি (ভাগওয়াত ও ভোয়েলি বলে শনাক্ত হয়েছে) জায়গীর দেন এবং সাহসী ও নির্ভিক দেখে তাঁকে পাটনার নিকটবর্তী মুনির ও বিহার শহরে সামরিক উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরণ করেন। এক বা দুই বৎসরকাল পর্যবেক্ষণমূলক অভিযানের সময় বখতিয়ার বিপুল লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করেন। তখন দিল্লীর ভাইস্‌রয় কুতবুদ্দীন অপারগ হয়ে তাঁর গুণ উপলব্ধি করেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, বখতিয়ারের নিজের অনমনীয় ও দুর্ধর্ষ মনোভাব না থাকলে গজনী ও দিল্লীর সমর-সচিবদের নির্বুদ্ধিতার দরুন এদেশের মুসলিম সাম্রাজ্য একজন মূল্যবান নতুন কর্মী থেকে বঞ্চিত হোত এবং সম্ভবতঃ বিহার ও বাংলার দিকে দ্রুত সম্প্রসারণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে থাকতো।

৯. 'তবকত-ই-নাসিরি' ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে, বখতিয়ার পশমের কাপড় দ্বারা আবৃত। ঘোড়ার দু'শ' জিন ও অস্ত্র-শস্ত্রসহ বিহার দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে উক্ত দুর্গ বলপূর্বক অধিকার করেছিলেন এবং সেইসময় বখতিয়ারের সঙ্গে ছিলেন নিজাম-উদ-দীন ও সাম্‌স-উদ-দীন (ফরগণার) নামক দুই জ্ঞানী ভ্রাতা।

১০. বিহার জয়ের পর দ্বিতীয় বৎসরে বখতিয়ার খালজী বাংলা অভি-

মুখে অগ্রসর হন ও বলপূর্বক নদীয়া দখল ও জয় করেন। সুতরাং, ৫৯২ হিজরী বা ১১৯৬ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গ বিজয় হয়েছিল।

এই বৃত্তান্ত সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সমকালীন ইতিহাস 'তবকত-ই-নাসিরি'তে প্রদত্ত বিবরণীর সাথে সম্পূর্ণ মিলে না। আউধের সামন্তের অধীনে নিযুক্ত থাকাকালে (তবকত, ফার্সী সংস্করণ, ১৪৭ পৃঃ) বখতিয়ার এক বা দুই বৎসরকাল বিহার পরিদর্শন ও বিপুল মালমাত্তা লুঠ করেছিলেন। তখন দিল্লীস্থ ভাইসরয় কুতবুদ্দীন তাঁকে লাহোর আহ্বান করেন ও বখতিয়ারের গুণ অগত্যা স্বীকার করেন এবং তাঁকে বহু উপহার দেন। বখতিয়ার বিহার ফিরে আসেন ও উক্ত অঞ্চল জয় ক'রে বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ দিল্লীতে কুতবুদ্দীনের নিকট উপস্থিত হন। সেখানে শ্বেত-দুর্গে (দিল্লীর কসর-ই-সফেদ) তাঁকে হিংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোতে হয়। অতঃপর, কুতবুদ্দীনের নিকট উপহার প্রাপ্ত হয়ে বিহার জয়ের দ্বিতীয় বৎসরে তিনি আবার এখানে ফিরে আসেন এবং বাংলা আক্রমণ ও জয় করেন। এই সময় তিনি নদীয়া দখল ও ধ্বংস করার পর লখনৌতি গ্রাম বা মৌজায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন (তবকত-ই-নাসিরি, ১৫১ পৃঃ)। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তিনি লখনৌতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং নিকট-বর্তী হলেও গৌড় ও লখনৌতি ভিন্ন স্থান।

১১. 'তবকত'-এ (ফার্সী সংস্করণ, ১৫১ পৃঃ) বর্ণিত হয়েছে যে, রাজা (লখমনিয়া) তখন অন্দর মহলে সোনা ও রূপার বাসনে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য আহার করতে বসেছিলেন। এমন সময় বখতিয়ার আঠারো জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ অকস্মাৎ আক্রমণ করায় রাজা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে নগ্নপদে পিছনের দরজা দিয়ে সনকট ও বঙ্গে পালিয়ে যান। তাঁর সমস্ত সম্পদ, পুর মহিলাগণ, দাসগণ, চাকর-চাকরানীরা ও হস্তীসমূহ বখতিয়ারের হস্তগত হয়।

১২. কোনো কোনো 'তবকত-ই-নাসিরি' বইতে 'সকনট' ও কোথাও 'সনকনট' লিখিত হয়েছে। 'তবকত-ই-আকবরী'তে 'জগন্নাথ'।

অধিকতর নির্ভরযোগ্য বিবরণীতে প্রকাশ, রাজা নদীয়া থেকে ঢাকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বিক্রমপুরে পলায়ন করেছিলেন। সুতরাং আমার মনে হয়, মুদ্রিত ফার্সী সংস্করণে 'সকুনাত' ও 'বঙ্গ' কথা-গুলো 'সকুনতে বঙ্গ'-এর (অর্থাৎ 'রাজার বাংলার আবাসস্থল') স্থলে নকলনবিসের ভুলক্রমে লেখা হয়েছে। রাজার বাসস্থান পূর্ব থেকেই বিক্রমপুরে ছিল।

কামরূদ (অথবা কামরূপ) এবং সক্নট ও বঙ্গের উল্লেখ নদীয়া থেকে ব্রাহ্মণ ও সাহাদের পূর্বেই পলায়ন প্রসঙ্গে 'তবকতে' উল্লিখিত হয়েছে (তবকত, ফার্সী সংস্করণ, ১৫০ পৃঃ)। বিহার জয়ে বখতিয়ারের বীরত্বের কথা শুনে ব্রাহ্মণ ও সাহারা আশংকা করেছিল যে, তিনি বাংলাও আক্রমণ করবেন। সমস্ত সৈন্যসহ নদীয়া ত্যাগ ক'রে বিক্রমপুর চলে যেতে তারা রাজাকে পরামর্শ দিয়েছিল। জ্যোতিষীগণও বখতিয়ারের (বঙ্গ) বিজয় সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী রাজাকে জানিয়েছিল। রাজা কারো পরামর্শে কর্ণপাত করেন নাই ; কিন্তু ব্রাহ্মণ ও সাহারা পলায়ন করেছিল। উভয় পক্ষের কারো কোনো অন্যায় কৌশল বা কুটকার্যের ফলে বখতিয়ার অষ্টাদশ অশ্বারোহীসহ রাজাকে পরাজিত করেছিলেন, এরূপ ধারণা অসঙ্গত। কারণ, রাজা ছিলেন সৎ, মহান ও উদার এবং জনসাধারণের ভক্তির পাত্র। এমন কি মুসলমান ঐতিহাসিক-গণও (তবকত-ই-নাসিরির গ্রন্থকার) তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেছেন (তবকত, ১৪৯ পৃঃ দ্রঃ)।

১৩. মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী কেবল একজন সামরিক লুঠেরা বা ধর্মান্ধ ব্যক্তি ছিলেন না ; তিনি নিঃসন্দেহে ইসলামের পরম সমর্থক ছিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁর মধ্যে উঁচুদরের সৈনাপত্য ও বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের গুণও ছিল। 'তবকত-ই-নাসিরি'তে (ফার্সী সংস্করণ, ১৫১ পৃঃ) আমরা দেখতে পাই যে, বিহার ও বাংলা বিজয়ের পরেই তিনি বহু মসজিদ, কলেজ, খানকারা দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, সরাই ও নগর তৈরী করেছিলেন এবং কৌশলপূর্ণ

স্থানসমূহে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন (তবকত, ১৪৯ ও ১৫১ পৃঃ দ্রঃ)। তিনি বাঁধ তৈরী করেছিলেন ; উত্তরাঞ্চলের সামরিক ঘাঁটি দেওকোট থেকে দক্ষিণাঞ্চলের সামরিক ঘাঁটি লাক্নোর (সম্ভবতঃ বীরভূমের নগোর) পর্যন্ত রাস্তা তৈরী ক'রে নবপ্রতিষ্ঠিত রাজধানী লখনৌতির সঙ্গে যোগ স্থাপন করেছিলেন।

১৪. অর্থাৎ, ৫৯৪ হিজরী বা ১১৯৮ খ্রীস্টাব্দ। যদি বখতিয়ার খালজী বাহ্যতঃ দিল্লীর সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতেন, তথাপি তাঁর (এবং অন্ততঃ অব্যবহিত পরবর্তী দু'জন উত্তরাধিকারীর আমলে) এই অধীনতা ছিল নামে মাত্র। কারণ, বখতিয়ার নিজস্ব উদ্যমে বাংলা ও বিহার জয় করেছিলেন।

১৫. এটি বাণ্ডা জেলার একটি শহর ও বিখ্যাত পার্বত্য দুর্গ।

১৬. গ্রন্থে 'মাহমা' লিখিত আছে। এটা নকলনবিসের ভুল। মাহবা একটি শহরের নাম—লক্ষ্ণৌ শহর থেকে পনের মাইল দূরে অবস্থিত।

১৭. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'যমুনা' নদীর দক্ষিণ তীরস্থ জালাওঁ জেলার একটি শহর।

১৮. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'সোত' নদীর তীরে অবস্থিত। গজনীর সুলতান মাহমুদের ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ সবর মাসুদ গাজী ১০২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রথম জয় করেছিলেন। ১১৯৬ খ্রীস্টাব্দে কুতবুদ্দীন পুনরায় জয় করেন।

১৯. 'তবকত-ই-নাসিরি'র ১৫২ পৃষ্ঠায় 'তিব্বত' ও 'তুর্কীস্তান'।

২০. উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলো থেকে বখতিয়ার খালজী যে কী বিপুলসংখ্যক মুসলমান সৈন্যবাহিনী আমদানি করেছিলেন, তা এ থেকে সহজেই অনুমেয়। সৈন্যসংখ্যা এত অধিক ছিল যে, নববিজিত বাংলা ও বিহারের স্থানীয় সামরিক বাহিনী দুর্বল না ক'রেও তিব্বত অভিযানের জন্য দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পৃথক করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। বিশেষতঃ আমরা 'তবকতে' দেখতে পাই, এই সময় তিনি জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করার

জন্য মুহম্মদ শিরানের অধীনে আর একদল সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন (তবকত, ১৫৭ পৃঃ)। বাংলার বর্তমান মুসলমান জনসংখ্যা দেখে যারা বিস্মিত হন ও বিভিন্ন মত প্রকাশের জন্য কষ্ট স্বীকার করেন, তাদের পক্ষে এই ঐতিহাসিক তথ্য স্মরণ রাখা উচিৎ।

২১. 'তবকত-ই-নাসিরি'র ১৫২ পৃষ্ঠায় 'মর্ধন কোট' ও 'বর্ধন কোট'। 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠায় 'ব্রাহ্মন'। বর্ধনকোটের ধ্বংসাবশেষ বগুড়ার উত্তরে গোবিন্দগঞ্জের নিকটে করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এই স্থান ঘোড়াঘাট থেকে দূরে নয় এবং অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে এই স্থানই উল্লেখ করা হয়েছে।

২২. তুরান বা তুর্কীস্তান বা তার্তারি বা সিদিয়ার জনৈক রাজা। কিন্তু, 'নামায়ে খসরুয়ামে'র ৭ম পৃষ্ঠায় তাঁকে পারস্যের পেশদাদিয়ান বংশের শেষ রাজা ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ফেরেশতা'য় উল্লিখিত হয়েছে যে, গরশাপ তুর্কীস্তান থেকে হিন্দুস্তান আক্রমণ করেছিলেন এবং বর্ধন নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

২৩. 'তবকত-ই-নাসিরি'র ১৫২ পৃষ্ঠায় 'বাগমতি' বা 'বাগমডি'। 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠায় 'ব্রাহ্মণ পুত্র' ও 'ব্রামকাদি'। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে উল্লিখিত নদীটি হচ্ছে করতোয়া নদী। এই নদী দীর্ঘকাল প্রাচীন মুসলমান বাংলা ও কামরূপের মধ্যবর্তী সীমানা ছিল।

২৪. করতোয়া ও তিস্তা নদীদ্বয়ের তীর ধরে (বখতিয়ার সসৈন্যে) অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৮৭৪ সালের পূর্বে তিস্তা নদী করতোয়া নদীর পশ্চিমে প্রবাহিত হতো এবং আত্রাই নদীর সঙ্গে যোগ দিয়ে পদ্মার সঙ্গে যোগ দিতো। বাংলার সকল নদীর মধ্যে তিস্তা নদী তিব্বতের সর্বাপেক্ষা অধিক দূর পর্যন্ত গিয়েছে। মুসলমান-বাংলা ও কামরূপের রাজার রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে বখতিয়ার অগ্রসর হয়েছিলেন। বখতিয়ারের তিব্বত অভিযান ৬০৫ হিজরীর শেষ দিকে (১২০৯ খ্রীঃ) অথবা ৬০৬ হিজরীর (১২১০ খ্রীঃ) প্রথম দিকে নিশ্চয়ই আরম্ভ হয়েছিল।

২৫. এই পুল দারঝেলিং বা দার্জিলিং-এর নিকটবর্তী ছিল নিশ্চয়ই। সেকালে এই পুল (বা যে নদীর উপর এই পুল) মেচদের ও পার্বত্য উপজাতীয়দের এলাকার সীমানা ছিল। 'তবকত-ই-নাসিরি'তে (ফার্সী সংস্করণ, ১৫২ পৃঃ) এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গে তিনটি উপজাতির বাস ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে, অর্থাৎ: (১) কোচ; (২) মেচ এবং (৩) থারো (ডাল্টনের Ethnology of Bengal দ্রঃ)।

২৬. 'তবকত-ই-নাসিরি'তে (ফার্সী সংস্করণ, ১৫৩ পৃঃ) এই অগ্রগমন এইরূপে বর্ণিত হয়েছে: "একজন তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষ ও একজন খালজী সৈন্যাধ্যক্ষকে বৃহৎ একটি সৈন্যদলসহ পুল পাহারা দেয়ার জন্য রেখে ··· বখতিয়ার খালজী পনের হাজার সৈন্যসহ উচ্চপর্বত ও নীচু গিরিপথ দিয়ে পনের দিনের পথ অগ্রসর হওয়ার পর ষোড়শ দিবসে (পুল থেকে যাত্রা আরম্ভ করার পর) তিব্বতের উন্মুক্ত সমতল ভূমিতে পৌঁছান এবং বহু জনবহুল গ্রাম অতিক্রম করেন ··· এবং প্রায় আট ঘণ্টাকাল প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সেখানে একটি দুর্গে সুরক্ষিতভাবে ঘাঁটি স্থাপন করেন।

২৭. 'তবকত-ই-নাসিরি'তে এই নগরের নাম 'করমবতেন'। বখতিয়ার পুল থেকে উত্তর দিকে ষোল দিনের পথ অতিক্রম করেছিলেন।

২৮. দিনাজপুরের ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে নেক-মর্দনের মেলায় প্রত্যেক বৎসর বহুসংখ্যক পাহাড়িয়া ঘোড়া আমদানি হয়। সেখান থেকে সেগুলো বাংলা ও অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়।

২৯. বখতিয়ার খালজী পনের দিনে তিব্বতের পর্বতমালা থেকে কামরূপের সমতলভূমিতে পশ্চাদগমন করেন। মেজর রেভার্টির মতে বখতিয়ার খালজী দার্জিলিং-এর পর্বতমালা থেকে সিকিমের ভেতর দিয়ে সংপো অভিমুখে তিব্বত অগ্রসর হয়েছিলেন।

৩০. খুব সম্ভব কামরূপ জেলার 'মহসানি মন্দির'।

৩১. দেখা যায়, কামরূপের রাজা প্রথমে বখতিয়ার খালজীকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ও পরে বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

৩২. বখতিয়ার খালজীর তিব্বত অভিযানে যাতায়াতের পথ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য রেভার্টির Notes on the Translation of Tabakat-i-Nasiri এবং ব্লকম্যানের Contributinos to the History and Geography of Bengal, J. A. S., ১৮৭৫, ৩য় সংখ্যা, প্রথম ভাগ, ২৮৩ পৃঃ দ্রঃ।

'তবকত-ই-নাসিরি'তে (মুদ্রিত ফার্সী সংস্করণ, ১৫৬ পৃঃ) উল্লিখিত হয়েছে যে, বখতিয়ার খালজী মাত্র একশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ সাঁতরে নদী পার হোতে সক্ষম হয়েছিলেন; অন্য সকলে ডুবে গিয়েছিল।

৩৩. দেওকোট বা দমদমাহ্—গঙ্গারামপুরের নিকটে দিনাজপুরের দক্ষিণে। বখতিয়ার খালজীর সময় এই স্থানে মুসলমান এলাকার উত্তর সীমানায় সামরিক ঘাঁটি ছিল। বখতিয়ার 'দেওকোট' অথবা লখনৌতি থেকে তিব্বত অভিযানে যাত্রা করেছিলেন।

৩৪. ৬০৬ হিজরী বা ১২১০ খ্রীস্টাব্দে আলী মর্দান দেওকোটে বখতিয়ার খালজীকে হত্যা করেছিলেন। যদি বখতিয়ার খালজী ৫৯৪ হিজরী বা ১১৯৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা জয় ক'রে থাকেন (যা উত্তম বিবরণী থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়) এবং যদি তিনি বারো বৎসর বাংলায় রাজত্ব ক'রে থাকেন, এই হিসাবে উপরোক্ত কাল নির্ণয় করা যায়। ৬০২ হিজরীতে বখতিয়ার নিহত হয়েছিলেন ব'লে অধ্যাপক ব্লকম্যান মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বাংলা বিজয় হয়েছিল ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দে, এটা তিনি গ্রহণ করেছেন। এতে কাল-ক্রমানিকতায় বৈপরীত্য দেখা যায়।

মি. টমাসের Initial Coinage of Bengal-এ বলা হয়েছে যে, আলাউদ্দীন উপাধি নিয়ে আলী মর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করেন যে-বৎসর কুতবুদ্দীন আইবক লাহোরে ইন্তেকাল করেন—অর্থাৎ ৬০৭ হিজরীতে। যদি গণ্য করা হয় যে, মালিক আজুদ্দীন আট মাসকাল শাসন করেছিলেন, তা'হলে ৬০৬ হিজরীর

মধ্যভাগে বখতিয়ার খালজী নিহত হয়েছিলেন (আমি এই সময়কেই পূর্বে নির্ণয় করেছি)।

'বদাওনি'তে উল্লিখিত হয়েছে যে, বখতিয়ার খালজী কেবল আন্দাজ তিন শ' অশ্বারোহী সৈন্যসহ তিব্বত থেকে দেওকোটে ফিরে আসেন ও অভিযানকারী সৈন্যদলের অন্য সকলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। বিরক্তিতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হন, ও বলতেন, "নিশ্চয়ই সুলতান মুহম্মদ মুঈজুদ্দীন দুর্ঘটনায় পড়েছেন ও সেইজন্য ভাগ্য আমার বিরুদ্ধে গিয়েছে।" যখন তিনি রোগে দুর্বল হয়ে পড়েন, তখন তাঁর অন্যতম প্রধান কর্মচারী (বা সেনাপতি) তাঁকে শয্যাশায়ী দেখে মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে ছোরার এক আঘাতে তাঁকে হত্যা করেন। নিকটতম সমকালীন ইতিহাস 'তবকত-ই-নাসিরি'তে (ফার্সী সংস্করণ, ১৫৬ পৃঃ) ঘটনার এইরূপ বিবৃতি দেয়া হয়েছে ঃ "যখন বখতিয়ার খালজী আন্দাজ একশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ নদী অতিক্রম ক'রে পলায়ন করতে সক্ষম হন, তখন আলী মেচ ও তাঁর আত্মীয়গণ তাঁকে উত্তমরূপে সহায্য করে এবং বখতিয়ার খালজীকে দেওকোটে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। দেওকোটে পৌঁছে অতিরিক্ত অপমানে বখতিয়ার অসুস্থ হয়ে পড়েন ও ঘরের মধ্যে দুয়ার বন্ধ ক'রে থাকেন। তিনি অশ্বারোহণে বাইরে বেরোতেন না। কারণ, বেরোলেই মৃত সৈন্যগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষদের বিধবারা ও পিতৃহীন সন্তানেরা তাঁকে ছাদের উপর থেকে ও রাস্তায় অভিশাপ ও গালা-গালি দিত। বখতিয়ার বলতেন, 'সুলতান মুঈজুদ্দীনের নিশ্চয়ই কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে ; সেইজন্য ভাগ্যের স্রোত আমাব প্রতিকূল হয়েছে'। কথাটা সত্য; কারণ, সেইসময় সুলতান মুঈজুদ্দীন জনৈক 'ঘাক্কার' (জাতীয়) হত্যাকারী কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। অত্যধিক অপমানে মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী অসুস্থ ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন এবং পরিশেষে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্য বিবরণী অনুসারে তাঁর অন্যতম সেনাপতি আলী মর্দান খালজী, যিনি সাহসী ও

হিংস্র প্রকৃতির ছিলেন ও দেওকোটের জায়গীরের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তিনি দেওকোটে এসে তাঁকে শয্যাশায়ী দেখে মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে হত্যা করেন।"

৩৫. তাঁর নাম ছিল 'আজুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খালজী' (তবকত-ই-নাসিরি, ফার্সী সংস্করণ, ১৫৭ পৃঃ)। তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচয় 'তবকত' থেকে নিয়ে দেয়া হ'ল: "মুহম্মদ শিরান ও আহমদ ইরান দুই ভাই ছিলেন। উভয়েই খালজী গোষ্ঠীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন ও বখতিয়ারের অধীনে কাজ করতেন। তিব্বত অভিযানে যাওয়ার সময় বখতিয়ার উক্ত দুই ভাইকে এক সামরিক বাহিনী-সহ লখনৌতি ও জাজনগর (উড়িষ্যা) অভিমুখে প্রেরণ করেন। এঁরা বখতিয়ারের হত্যার সংবাদ পেয়ে দেওকোট ফিরে আসেন এবং সেখানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্নের পর আলী মর্দান খালজীর জায়গীর নারকোটি (এই স্থানের অবস্থিতি নির্ণীত হয় নাই; সম্ভবতঃ দেওকোট থেকে অধিক দূরে ছিল না) অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁরা আলী মর্দানকে বন্দী করেন এবং তথাকার কোতোয়াল বাবা কোতোয়াল ইসপাহানির হেফাজতে রেখে দেওকোট ফিরে যান। মুহম্মদ শিরান উদ্যমশীল ও মহৎ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। নদীয়া বিজয়ের সময় তিনি তথাকার (রাজার) হাতীগুলো হস্তগত ক'রে দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন। খালজী গোষ্ঠীর নেতা বিধায় খালজী-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁকে নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত করেন ও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। ইতিমধ্যে আলী মর্দান খালজী পলায়ন ক'রে দিল্লী যান এবং বাংলার খালজী শাসকগোষ্ঠীকে দমন করার জন্য কয়মাজ রুমিকে আউধ (অযোধ্যা) থেকে লখনৌতি প্রেরণ করার জন্য সুলতান কুতবুদ্দীনকে রাজী করান। হুশাম-উদ-দীন ইওয়াজ কাংকতোরির (কাংগর—দেওকোটের নিকটবর্তী) জায়গীর বখতিয়ারের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। হুশাম-উদ-দীন অগ্রসর হয়ে কয়মাজ রুমিকে অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁর সঙ্গে দেওকোট যান ও রুমির তদ্‌বিরের ফলে দেওকোট জায়গীর লাভ করেন। কয়মাজ

যখন দেওকোট থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন, সেইসময় মুহম্মদ শিরান ও অন্য খালজী-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেওকোট পুনর্জ্জয়ের চেষ্টা করেন। কয়মাজ ফিরে এসে খালজীদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে মুহম্মদ শিরান পরাজিত হয় ও খালজীরা ছত্রভঙ্গ হয় এবং মাকিদাহ (মাসিদাহ—দেওকোটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটি পরগণা) ও মন্তোষে (মন্তোষ—দেওকোটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি পরগণা) নিজেদের মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়; তাতে মুহম্মদ শিরান নিহত হন। মন্তোষে (আত্রেয়ী নদীর তীরে) তাঁকে দাফন করা হয়।

৩৬. বখতিয়ার খালজীর হত্যাকারী আলী মর্দান খালজী ও আজুদ্দীন খালজী ৬০৭ থেকে ৬০৯ বা ৬১০ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। কুতবুদ্দীন আইবকের মৃত্যুর পর তিনি সুলতান আলাউদ্দীন নাম ধারণ ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। 'তবকত-ই-নাসিরি'তে উক্ত হয়েছে যে, তিনি নিজ নামে খোত্‌বা পড়িয়েছিলেন; কিন্তু বদাওনি বলেন যে, তিনি মুদ্রা প্রস্তুতও করিয়েছিলেন। আমি তাঁর কোনো মুদ্রা দেখি নাই। মি. টমাস তাঁর Initial Coinage of Bengal-এ উলাউদ্দীনের উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দীনের ৬১৬ হিজরীতে তৈরী মুদ্রার উল্লেখ করেছেন (J. A. S., ৩৫৪ পৃঃ, Vol. XLII, 1873 দ্রষ্টব্য)। 'তবকত-ই-নাসিরি'তে (ফার্সী সংস্করণ, ১৫৯ পৃঃ) আরো উক্ত হয়েছে যে, অত্যধিক ধৃষ্টতার দরুন তিনি ইরান ও তুরান দেশগুলো নিজ সমর্থকদের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়েছিলেন। এগুলো যে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, একথা তাঁকে বলার মতো সাহস কারো ছিল না। এক ব্যক্তি নিজের দুঃস্থতার কথা আলাউদ্দীনকে জানায়। আলাউদ্দীন তার বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করেন। ইসপাহান থেকে আসছে শুনে আলাউদ্দীন তাকে ইসপাহানের জায়গীর দেয়ার ফরমান তৈরী ক'রে দিতে উজীরদের আদেশ দেন।

'তবকতে' উক্ত হয়েছে যে, নারকোটির কোতোয়ালের কবল

থেকে পালিয়ে আলী মর্দান দিল্লীতে সুলতান কুতবুদ্দীনের নিকট গিয়ে লখনৌতির শাসনকর্তার (বা ভাইস্রয়ের) পদ লাভ করেন। তিনি কোশি নদী অতিক্রম করার পর দেওকোট থেকে হুশাম-উদ-দীন অগ্রসর হয়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসেন ও দেওকোটের মসনদে বসান। আলী মর্দান নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রকৃতির ছিলেন; খালজী গোষ্ঠীর বহুসংখ্যক সম্রান্ত ব্যক্তিকে তিনি হত্যা করেন এবং স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁর সামনে কাঁপতো। প্রজাবৃন্দ ও সৈন্যগণ তাঁর উপর বিরক্ত ছিল।

৩৭. তাঁর প্রকৃত নাম ছিল হুশাম-উদ-দীন ইওয়াজ-বিন আল-হোসেন। তিনি গ্রামসিরস্থ খালজী গোষ্ঠীর একজন প্রধান ছিলেন। বখতিয়ার খালজীর সঙ্গে যোগদানের পর প্রথমে তাঁকে কাংগোরের (দেওকোটের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত) জায়গীর দেয়া হয়; এর পরে দেওকোটের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটির ভার দেয়ায় তাঁর পদোন্নতি হয়। আলী মর্দান খালজী বাংলার শাসনকর্তারূপে নিয়োগের পর হুশাম-উদ-দীন কোশি নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন ও দেওকোটে গদি-নশীন হওয়ার বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। কুতবুদ্দীন আইবকের মৃত্যুর পর আলী মর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। খালজী আমীরগণ তাঁকে হত্যা করার পর ৬০৯ বা ৬১০ হিজরীতে তাঁরা হুশাম-উদ-দীনকে খালজী গোষ্ঠীর প্রধানরূপে নির্বাচন করেন। কুতবুদ্দীনের উত্তরাধিকারী আরাম শাহের দুর্বলতা দেখে হুশাম-উদ-দীন স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং লখনৌতি রাজধানী করেন ও আন্দাজ ৬১২ হিজরীতে সুলতান গিয়াসউদ্দীন নাম ধারণ করতঃ নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। মি. টমাস তাঁর Initial Coinage of Bengal-এ ৬১৪ ও ৬২০ হিজরীতে তৈরী গিয়াসউদ্দীনের কয়েকটি মুদ্রার কথা উল্লেখ করেছেন। এই মুদ্রাগুলো পরীক্ষা করলে একটি অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, ৬২০ হিজরীতে গিয়াসউদ্দীন বাগদাদের খলিফার সঙ্গে যোগস্থাপন করেছিলেন (অর্থাৎ দিল্লীর বাদশাহ

আলতামাশেরও পূর্বে—আলতামাশ ৬২৬ হিজরীতে এই মর্যাদা লাভ করেছিলেন) এবং বাংলার শাসকরূপে স্বীকৃতি হিসেবে খলিফার ফরমান লাভ করেছিলেন। এই অবস্থা দেখে মি. টমাস মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, সেকালে ভারতের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলের তুলনায় বাংলার সমুদ্র তীরবর্তী মুসলমানদের সঙ্গে বসরা ও বাগদাদের আরবীয়দের সঙ্গে অধিকতর যোগাযোগ ছিল।

৬২২ হিজরীতে দিল্লীর বাদশাহ আলতামাশ বাংলা আক্রমণ করেন এবং সুলতান গিয়াসউদ্দীন কর প্রদান করায় শান্তি স্থাপিত হয়। ৬২৪ হিজরীতে সুলতান গিয়াসউদ্দীন যখন কামরূপ ও বঙ্গে (পূর্ববঙ্গে) ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় বাদশাহ আলতামাশের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন লখনৌতি আক্রমণ করেন ও যুদ্ধে গিয়াসউদ্দীনকে নিহত করেন। নাসিরুদ্দীন তাঁর পিতা বাদশাহ আলতামাশের অনুমোদন অনুসারে আধা-স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। তিনি জাজনগর (উড়িষ্যা), বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ), কামরূদ (বা কামরূপ, পশ্চিম-আসাম) ও তিরহুত পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন (তবকত-ই-নাসিরি, ফার্সী সংস্করণ, ১৬৩ পৃঃ)। 'তবকতে'র লেখক মিনহায-উস-সিরাজ ৬৪১ হিজরীতে লখনৌতি সফর করেছিলেন এবং গিয়াসউদ্দীনের উন্নয়নমূলক কার্যের উচ্চপ্রশংসা করেছেন (তবকত, ফার্সী সংস্করণ, ১৬১ পৃঃ)। ৬২৭ হিজরীতে বাদশাহ আলতামাশও এই মহান শাসকের (গিয়াসউদ্দীনের) প্রশংসা করেন ও তাঁর স্মৃতির মর্যাদা রক্ষার্থে তাঁর (গিয়সউদ্দীনের) কবরকে সুলতান গিয়াসউদ্দীনের কবররূপে অভিহিত করার জন্য ফরমান জারী করেছিলেন। 'তবকত-ই-নাসিরি'তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বাস্কট দুর্গ (গৌড়ের নিকটবর্তী বসনকোট) তৈরী করেছিলেন এবং বহু মসজিদ ও মিলনায়তন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৩৮. তাঁর মৃতদেহ দিল্লী আনীত হয়েছিল এবং স্নেহবৎসল পিতা বিখ্যাত কুতবমিনারের তিন মাইল পশ্চিমে একটি সুন্দর মাজার

তৈরী করেছিলেন (সুলতান গাজীর মাজার নামে পরিচিত)। মাজারে নাসিরুদ্দীনের পরিচয়রূপে খোদাই করা আছে, 'পূর্ব-দেশের সম্রাট' বা 'মালিক-উল-মলুক-উল-শর্ক'। বাদশাহ আলতামাশ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে এতই স্নেহ করতেন যে, তিনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রেরও 'নাসিরুদ্দীন' নামকরণ করেছিলেন। এই নাসিরুদ্দীন পরে বাদশাহ হয়েছিলেন এবং তাঁরই নামানুসারে 'তবকত-ই-নাসিরি' বইয়ের নাম হয়েছিল।

৩৯. 'তবকত-ই-নাসিরি'তে 'বাল্কা মালিক খালজী'। সঠিক নাম হচ্ছে 'মালিক ইখতির-উদ-দীন বাল্কা'। তিনি দওলত শাহ নাম গ্রহণ করেছিলেন ও মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন (নিজ নামে)। Initial Coinage of Bengal-এ মি. টমাস ৬২৭ হিজরীতে তৈরী দওলত শাহের একটি মুদ্রার উল্লেখ করেছেন। দওলত শাহকে দমন করার জন্য বাদশাহ আলতামাশ স্বয়ং ৬২৭ হিজরীতে দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করেছিলেন এবং দওলত শাহকে পরাজিত ও নিহত ক'রে আলাউদ্দীন খান বা আলাউদ্দীন জানিকে বাংলার শাসনভার প্রদান করেন (তবকত-ই-নাসিরি, ফার্সী সংস্করণ, ১৭৪ পৃঃ)।

'বদাওনি'তে 'মালিক আলাউদ্দীন খাফি'; 'তবকত-ই-নাসিরি'তে 'আলাউদ্দীন জানি'। ৬২২ হিজরীতে প্রথমবার বাংলা আক্রমণ করার পর বাদশাহ আলতামাশ বাংলা থেকে বিহার পৃথক ক'রে আলাউদ্দীন জানিকে গবর্নর নিযুক্ত ক'রে যান (বিহার সুলতান গিয়াসউদ্দীনের অধীন ছিল)। আলতামাশের প্রত্যাবর্তনের পর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বিহার পুনরায় দখল করেন এবং এইজন্য আলতামাশের পুত্র দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করেছিলেন।

৪০. নিকটতম সমকালীন বিবরণী 'তবকত-ই-নাসিরি' থেকে এই ব্যক্তির সম্পর্কে সংক্ষেপ-বৃত্তান্ত নিচে দিলাম (ফার্সী সংস্করণ, ২৩৮ পৃঃ): "মালিক সায়েফুদ্দীন ইঘানতাত খাটার একজন তুর্কী। তিনি সম্রান্ত মালিক ছিলেন এবং তাঁর বহু সদ্‌গুণ ছিল। বাদশাহ

আলতামাশের পুত্র বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ তাঁকে খরিদ করেন ও নিজের সঙ্গে রাখেন। প্রথমে তাঁকে আমীর-উল-মজলিস (লর্ড চেম্বারলেন) পদে নিযুক্ত করেন ও অতঃপর সরস্বতীর জায়গীর প্রদান করেন। পরে উত্তম কার্যের জন্য তাঁকে বিহারের গবর্নর পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং যখন বাংলার ভাইস্‌রয় আলাউদ্দীন জানিকে পদচ্যুত করা হয় তখন তাঁকে বাংলা (লখনৌতির) ভাইস্‌রয় পদে উন্নীত করা হয়। তিনি 'ভেলায়েতে বঙ্গে' (পূর্ববঙ্গে) কতকগুলো হাতী ধরে আলতামাশের নিকট উপহার প্রেরণ করেছিলেন ও তজ্জন্য 'ইয়ানতাত' উপাধি লাভ করেন।

৪১. তাঁর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত আমি 'তবকত-ই-নাসিরি' থেকে সংগ্রহ ক'রে দিলাম (ফার্সী সংস্করণ, ২৪২ পৃঃ) ঃ "মালিক তুঘন খান তুর্কের চেহারা ছিল সৌম্য এবং অন্তর ছিল উদার। তিনি খাটা থেকে এসেছিলেন। তিনি উদার ও দানশীল ছিলেন ও তাঁর বহু সদ্‌গুণ ছিল। ঔদার্যে ও দানশীলতায় লোকের অন্তর জয় করাতে তিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীতে অতুলনীয়। বাদশাহ আলতামাশ তাঁকে খরিদ ক'রে প্রথমে বাদশাহের পানপাত্র বাহক নিযুক্ত করেন ; পরে 'দাওয়াত-দার' বা বাদশাহের মোহর-রক্ষক নিযুক্ত করা হয়। বাদশাহের মণি-মুক্তাখচিত দোয়াত হারিয়ে ফেলার জন্য পদমর্যাদা হ্রাস ক'রে তাঁকে জনৈক শাহজাদার 'চাশনি-গির' নিযুক্ত করা হয়। বহুদিন পর তাঁকে বাদশাহের আস্তাবলের তত্ত্বাবধায়ক (আমীর-ই-আখুর) পদে নিযুক্ত করা হয়। কিছুদিন পর বদাওনে জায়গীরদার পেদ দয়া হয়। পরে যখন ইযানতাত সায়েফুদ্দীন আইবককে বাংলার (লখনৌতির) ভাইস্‌রয়ের পদ দেয়া হয়, তখন তাঁকে বিহারের গবর্নর পদে নিয়োগ করা হয়। পরিশেষে সায়েফুদ্দীনের মৃত্যুর পর তুঘন খানকে বাংলার (লখনৌতির) ভাইস্‌রয়ের পদ দেয়া হয়। বাদশাহ আলতামাশের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন

মাহমুদের মৃত্যুর পর তুঘন খান এবং লাকোর আইবক নামক লখনৌতির জনৈক সামন্তের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়। বসনকোটের দুর্গের সম্মুখে যুদ্ধে তুঘন খান লাকোর আইবককে পরাজিত ও নিহত করেন এবং লখনৌতির উভয় অংশ—একটি হচ্ছে লাকোরের দিকে রাঢ় অঞ্চল (সম্ভবতঃ) নগোর ও অন্যটি হচ্ছে দেওকোটের দিকের বরন্দ (বরেন্দ্র)—এক করেন। এই সময় সম্রাজ্ঞী রাজিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তুঘন খান দিল্লীতে উপহারসহ দূত প্রেরণ করেন এবং প্রতিদানে কাজী জালালউদ্দীনের মারফতে বাদশাহী উপহার প্রাপ্ত হন। তুঘন লখনৌতি থেকে তিরহুত জেলায় যান ও সেখানে বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য ও সম্পদ লাভ করেন। যখন সুলতান মুঈজুদ্দীন বাহরাম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখনও তুঘন খান দিল্লীতে উপঢৌকন প্রেরণ করেন। যখন সুলতান আলাউদ্দীন বাহরাম শাহের স্থলাভিষিক্ত হন, তখন বাহাউদ্দীন হুল্লাল-সুদানী আউধ, মানিকপুর ও কারাহ্ আক্রমণ করেন এবং পূর্বাঞ্চলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। বাহাউদ্দীনকে ঠাণ্ডা ক'রে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রণোদিত করতে তুঘন খান মানিকপুর ও কারাহ্ গিয়েছিলেন। 'তবকত-ই-নাসিরি'র গ্রন্থকার মিনহায-উস-সিরাজের সঙ্গে আউধে তুঘন খানের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর সঙ্গে ৬৪১ হিজরীতে লখনৌতি ফিরে যান। এই সময় জাজনগরের রাজা লখনৌতি লুঠ করেছিলেন। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সেই বৎসর তুঘন খান জাজনগর আক্রমণ করেন (মিনহায-উস-সিরাজ তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন)। উড়িষ্যা সীমান্তের বক্তাসন দুর্গ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজিত হয়। তুঘন খান লখনৌতি ফিরে এসে সাহায্যলাভের জন্য শরফ-উল-মুল্ক আশারীকে দিল্লীর বাদশাহের নিকট পাঠান। বাদশাহের আদেশ অনুযায়ী আউধের সামন্ত তামার খান কমর-উদ-দীন কিরানের নেতৃত্বে এক বৃহৎ সৈন্যদল জাজনগরের (উড়িষ্যার) বিধর্মীদের বিতাড়নের

ও শাস্তি দেয়ার জন্য প্রেরিত হয়। পূর্ববর্তী এক অভিযানে মুসলমানেরা উড়িষ্যার কাতাসান (বা বক্তাসন) দুর্গ ধ্বংস করার জন্য জাজনগরের রাজা লখনৌতি আক্রমণ করেছিলেন। উড়িয়ারা প্রথমে লাকোর (সম্ভবতঃ নাগোর) অধিকার করে এবং তথাকার মুসলমান সেনাপতিসহ বহুসংখ্যক মুসলমানকে হত্যা করে। অতঃপর তারা লখনৌতির দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং এখানে কিছুটা যুদ্ধের পর উড়িয়ারা পশ্চাদগমন করে। এরপর তুঘন খান ও তামার খানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় ও তাদের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে বহু লোক নিহত হয়। 'তবকত-ই-নাসিরি'র গ্রন্থকার মিনহায-উস-সিরাজের মধ্যস্থতায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এই শর্তে যে, লখনৌতি তামার খানের দখলে থাকবে এবং তুঘন খান সমস্ত সম্পদ, হস্তী ও মালমাত্তাসহ দিল্লী চলে যাবেন। তুঘন খান শর্ত প্রতিপালন করেন ও মিনহায-উস-সিরাজ সহ দিল্লী চলে যান। বাদশাহ তাঁকে প্রচুর উপহার দেন ও আউধের গবর্নর পদে নিয়োগ করেন। তামার খান বাংলায় ভাইসরয় হয়ে থাকেন। তামার খানের লখনৌতিতে ও তুঘনের আউধে একই রাত্রে মৃত্যু হয়।

এই বৃত্তান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই পুস্তকে চেঙ্গিজ খান কর্তৃক বাংলা আক্রমণের যে উল্লেখ আছে, তা ভুল ও কল্পনাপ্রসূত। জাজনগরের হিন্দুগণ কর্তৃক লখনৌতি আক্রমণকে ভুলক্রমে চেঙ্গিজের আক্রমণ বলা হয়েছে। বহু ইতিহাসে এই ভুলের পুনরুক্তি আছে। কিন্তু 'তবকতে'র বিবরণী সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য; কারণ, গ্রন্থকার এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

৪২. বাদশাহ আলতামাশের কন্যা রাজিয়া পিতার ইচ্ছানুসারে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন ৬৩৪ হিজরী বা ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দে। সেকালে ভারতীয় মুসলমানদের দৃষ্টিতে এক অনাবৃতা নারীর সিংহাসনে উপবেশন একটি অদ্ভুত ঘটনা ব'লে মনে হয়েছিল এবং সেইজন্য আমাদের গ্রন্থকার এটাকে 'ভোজবাজির আকাশ' ব'লে

মন্তব্য করেছেন। রাজিয়া ১২৩৬ থেকে ১২৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন। বদাওনির মতে সম্রাজ্ঞী অত্যুত্তম গুণবতী, সাহসী, উদার ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি ন্যায়ের পথ ও সুবিচারের নীতি অনুসরণ করতেন এবং তাঁর সং-ভাই সুলতান রুকন-উদ-দীন ফিরোজ শাহের স্বল্পকালীন রাজত্ব-কালে রাজ্যে যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়েছিল, তার সুব্যবস্থা করেন। পরোপকার ছিল তাঁর লক্ষ্য। নিজামুল জুনেয়দিকে তিনি প্রধান উজীরের পদে নিয়োগ করেছিলেন। সম্রাজ্ঞী কুর্তা ও কুলা পরিধান ক'রে পুরুষের বেশে পর্দার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসে সিংহাসনে বসতেন। 'তবকত-ই-নাসিরি'র মতে হিন্দুরা তাঁকে হত্যা করেছিল। তিনি কুরআনে পণ্ডিত ছিলেন; সরকারী কাজে পরিশ্রমী ছিলেন; প্রত্যেক সংকটকালে দৃঢ় ও উদ্যমশীল ছিলেন। সত্যিই তিনি একজন মহান নারী ও মহান রানী ছিলেন।

৪৩. মালিক কুরা বেগ তামার খান বা কমরুদ্দীন কিরান তামার খান ৬৪২ থেকে ৬৪৪ হিজরী পর্যন্ত বাংলার গবর্নর ছিলেন। এই সময় (৬৪৪ হিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলায় তাঁর কর্মজীবন সম্বন্ধে পূর্ববর্তী এক টীকায় উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, তাঁর পূর্বের কর্মজীবন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 'তবকত-ই-নাসিরি' (ফার্সী সংস্করণ, ২৪৭ পৃঃ) থেকে সংক্ষেপে নিয়ে উল্লেখ করলাম: "মালিক তামার খান তুর্ক সৎ ব্যক্তি ছিলেন; তাঁর আচরণ ছিল মার্জিত। তিনি অত্যন্ত উদ্যমশীল, বদান্য, কর্মতৎপর ও সাহসী ছিলেন। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর। বাদশাহ শামসুদ্দীন আলতামাশ ৫০,০০০ চিতল দিয়ে তাঁকে খরিদ ক'রে বাদশাহী অশ্বশালার সহকারী তত্ত্বাবধায়ক পদে নিয়োগ করেছিলেন। তখন তুঘন খান ছিলেন প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। সম্রাজ্ঞী রাজিয়ার রাজত্বকালে তিনি কনৌজের সামন্ত পদে নিয়োজিত হয়েছিলেন। কাহুওয়ার ও মালোয়া

অভিযানে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি 'কারার' জায়গীর লাভ করেন ও সেখানেও কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁকে আউধের গবর্নর পদে নিয়োগ করা হয়। আউধে থাকাকালে তিনি তিরহুত-সহ পূর্বদিকের সমস্ত অঞ্চল আক্রমণ করেন ও বিপুল মালমাত্তা লাভ করেন। অতঃপর, উড়িয়াদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তুঘন খানের সাহায্যার্থে তাঁকে লখনৌতি প্রেরণ করা হয় এবং বাংলার ভাইস্‌রয় পদে অধিষ্ঠিত হন।

৪৪. তাঁরই নামানুসারে 'তবকত-ই-নাসিরি' গ্রন্থের নামকরণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থ মুসলমান শাসনের আরম্ভ থেকে ৬৫৮ হিজরী (১২৬০ খ্রীঃ) পর্যন্ত ভারতের সাধারণ ইতিহাস। গিয়াসউদ্দীন বলবন (পরে বাদশাহ বলবন) তাঁর উজীর ছিলেন। ৬৫৮ হিজরী থেকে ৬৬৪ হিজরী (বাদশাহ বলবন গদিনশীন হওয়া পর্যন্ত) সময়ের কোনো জানা ইতিহাস নাই। জিয়াউদ্দীন বার্নির 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' আরম্ভ হয়েছে গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজত্বকাল থেকে। বাদশাহ বলবন ১২৬৫ থেকে ১২৮৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

৪৫. জালালুদ্দীন মাস্উদ মালিক জানি খালজী খান ৬৫৬ হিজরীতে বাংলার গবর্নর হয়েছিলেন।

'তবকত-ই-নাসিরি'তে তাঁর সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ পাই নাই।

৪৬. ইজুদ্দীন বলবন ৬৫৭ হিজরীতে বাংলার গবর্নর ছিলেন। সেই বৎসর তাজউদ্দীন আরসালান খান সন্‌জর-খাওয়ারিজিমি তাঁকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ইজুদ্দীন পরে তাঁকে লখনৌতিতে বন্দী অথবা হত্যা করেন। সুতরাং তাজউদ্দীন আরসালান খানকে বাংলার গবর্নরদের মধ্যে গণ্য করা যায় না (ব্লকম্যানের Contribution to History and Geography of Begal ; তবকত-ই-নাসিরি, ফার্সী সংস্করণ, ২৬৭ পৃঃ দ্রঃ)।

৪৭. বাদশাহ বলবন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন (৬৬৪ হিঃ)

তখন আরসালান খান সনজরের পুত্র মুহম্মদ আরসালান তাতার খান কিছুদিন বাংলার গবর্নর ছিলেন (জিয়াউদ্দীন বার্নি লিখিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', ফার্সী সংস্করণ, ৫৩ ও ৬৬ পৃঃ দ্রঃ)। তিনি দানশীল, উদার ও সাহসী ছিলেন। কয়েক বৎসর পর তুঘরল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। সুলতান মুঘীসুদ্দীন নাম নিয়ে তুঘরল নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন।

৪৮. শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে অধ্যাপক ব্লকম্যান তাঁর Contributions to History and Geography of Bengal-এ যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে এই বিবরণীর কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে বলবনের সিংহাসনারোহণের অল্পদিন পরে মুহম্মদ তাতার খানের মৃত্যু হয় এবং শের খানকে লখনৌতির বাদশাহী গবর্নর নিয়োগ করা হয়। এরপর তুঘরলের ডেপুটি বা নায়েব আমিন খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। বলবনের অসুখের সংবাদ শুনে তুঘরল আমিন খানকে আক্রমণ ও পরাজিত ক'রে সুলতান মুঘীসুদ্দীন নাম নিয়ে নিজেকে বাংলার সুলতানরূপে ঘোষণা করেন (১২৭৯ খ্রীঃ)। অল্পদিন পরে বলবন সুস্থ হয়ে উঠেন এবং স্বয়ং বাংলা আক্রমণ করতঃ সোনারগাঁয়ের নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে যেখানে দনুজ রায় জমিদার ছিলেন সেখানে তুঘরলকে পরাজিত করেন (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ৮৭ পৃঃ)। ৬৮১ হিজরী বা ১২৮২ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ত্যাগের পূর্বে বলবন তাঁর পুত্র বুগ্‌রা খানকে সুলতান নাসিরুদ্দীন উপাধি দিয়ে বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ৬৯১ হিজরী বা ১২৯২ খ্রীস্টাব্দে নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু হয়েছিল বলে মনে হয়—অর্থাৎ তাঁর পিতা প্রসিদ্ধ বাদশাহ বলবনের মৃত্যুর প্রায় পাঁচ বৎসর পরে। সুলতান মুঘীসুদ্দীন নামধারী তুঘরল সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণীর জন্য 'তবকত-ই-নাসিরি' (ফার্সী সংস্করণ, ২৬১ পৃঃ) ও জিয়াউদ্দীন বার্নির 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' (ফার্সী সংস্করণ, ৮১-৯৪ পৃঃ) দ্রষ্টব্য। বাংলার গবর্নর হওয়ার পূর্বে তিনি নিম্নলিখিত পদগুলো অধিকার

করেছিলেনঃ শামসুদ্দীন আলতামাশের অধীনে 'চাশনিগির'; বাদশাহ রুকন-উদ-দীনের অধীনে 'আমীর-উল-মজলিস', 'হাতীর তত্বাবধায়ক'; অতঃপর সম্রাজ্ঞী রাজিয়ার অধীনে 'অশ্বশালার তত্বাবধায়ক'; সুলতান আলাউদ্দীনের আমলে 'তবরহিন্দের সামন্ত', পরে 'কনৌজের সামন্ত' ও 'আউধের গবর্নর', এবং এরপর 'বাংলার ভাইস্‌রয়'। তিনি সাফল্যের সাথে জাজনগর (উড়িষ্যা), আউধ ও কামরূপ (উত্তর-আসাম) আক্রমণ করেছিলেন এবং তারপর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তুঘরল কর্মতৎপর, উদ্যমশীল, সাহসী, নির্ভীক, উদার ও দানশীল ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'র গ্রন্থকার (৯৩ পৃঃ) সর্বপ্রথম 'ইকলিম-ই-লখনৌতি', 'ইকলিম-ই-সোনারগাঁও', 'আরসাহ্-ই-বাঙ্গালা' প্রভৃতি নাম উল্লেখ করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তুঘরল বাংলারাজ্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছিলেন।

৪৯. 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে 'কতলু খান শাম্‌সি'।

৫০. এখানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে উড়িষ্যার জাজনগর উল্লিখিত হয়েছে মনে হোতে পারে। কিন্তু এটা পূর্ববঙ্গের কোনো স্থান হবে (সম্ভবতঃ ত্রিপুরার)। 'জাজনগর' সম্বন্ধে বিশদ ও আকর্ষণীয় বিবরণীর জন্য ব্লকম্যানের Contributions to History and Geography of Bengal দ্রঃ।

৫১. 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী'তে 'দনুজ রায়' (৮৭ পৃঃ)।

৫২. সম্ভবতঃ ব্রহ্মপুত্র অথবা মেঘনা নদীর কথা বলা হয়েছে। ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বদিকে তেরো মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে সোনারগাঁও অবস্থিত। সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবনের বাংলা অভিযানের বিশদ ও সমকালীন বিবরণীর জন্য 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' দ্রষ্টব্য (ফার্সী সংস্করণ, ৮৫-৯৪ পৃঃ)।

৫৩. 'ফেরেশ্‌তা'র 'বারবক বার্‌লাস'; 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে 'বারিক বেগতরাস'।

৫৪. 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে "মালিক মুহম্মদ শিরান্দাজ" (৮৮ পৃঃ)। 'কোয়েল' হচ্ছে আলীগড় জেলার একটি তহশিল।

৫৫. প্রদত্ত বিবরণী থেকে মনে হয় তুঘরল ওরফে সুলতান মুঘীসুদ্দীন সোনার্গাঁয়ের অদূরে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। অথবা, অনুমান করা যায়, ঠিক এই সময় তিনি আরো পূর্বদিকে মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরে পুরাতন মানিক নগর পারঘাটার নিকট অথবা বর্তমান ভৈরব বাজার পারঘাটার নিকট তাঁবু সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং ঢাকা এলাকা থেকে নৌকাযোগে নদী পার হয়ে ত্রিপুরা এলাকায় (এখানে ত্রিপুরা অঞ্চলই জাজনগররূপে চিহ্নিত হয়েছে) যাওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। কারণ, তখন দিল্লীর বৃদ্ধ ও শক্তিশালী বাদশাহ (গিয়াসউদ্দীন বলবন) তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন। সুতরাং এই জাজনগর উড়িষ্যার জাজনগর থেকে পৃথক ও বাংলায় অবস্থিত ছিল।

৫৬. এই কবিতার চারণগুলো সম্ভবতঃ গিয়াসউদ্দীন বলবনের সভাকবি আমীর খসরুর কবিতার সামান্য পরিবর্তন ক'রে রচিত।

৫৭. 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে(৮৮পৃঃ) 'মালিক বরবক বেকতারা'।

৫৮. 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে (৮৮পৃঃ) 'মালিক মুহম্মদ শিরান্দাজ'।

৫৯. 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' অনুসারে (৮৮, ৯০, ৯১ পৃঃ) 'মালিক মুকদ্দর' ও 'তুঘরল-হন্তা' দু'জন পৃথক ব্যক্তি ব'লে মনে হয়।

৬০. 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'র গ্রন্থকার বলেছেন যে, লখনৌতির প্রধান বাজারের এক ক্রোশ দীর্ঘ রাস্তার উভয় পাশে পুরুষ, নারী ও বালক-বালিকাদের ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। জিয়াউদ্দীন বার্নি সখেদে বলেছেন যে, 'দিল্লীর পূর্ববর্তী কোনো মুসলমান বাদশাহ এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য করেন নাই' (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ৯১-৯২ পৃঃ)।

৬১. বাদশাহ বলবনের পুত্র বুঘ্রা খান বাংলার মসনদে আরোহণ করার পর সুলতান নাসিরুদ্দীন রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন। ১২৮২ থেকে ১৩৩১ খ্রীস্টাব্দ (৬৮১-৭৩১ হিঃ) পর্যন্ত যে বলবন-

বংশীয় সুলতানগণ বাংলা শাসন করেছিলেন, বুঘ্‌রা খান ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম শাসক। তাঁরা ঢাকার সন্নিকটে সোনারগাঁয়ে প্রধানতঃ বাস করতেন। বাদশাহ বলবনের পুত্র নাসিরুদ্দীন বুঘ্‌রা খান ৬৮১-৬৯১ হিজরী (১২৮২ ১২৯২ খ্রীঃ) পর্যন্ত বাংলা শাসন করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী ও পুত্র রুকন-উদ-দীন রাজকীয় উপাধি 'সুলতান কয়-কাউস' গ্রহণ করেছিলেন। গঙ্গা-রামপুর ও লক্ষ্মীসরাইয়ের নিকটবর্তী খগোলে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ৬৯৭ হিজরীতে (১২৯৭ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন। তাঁর ভ্রাতা শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ নাম নিয়ে তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন বলে মনে হয়। ফিরোজ শাহের কয়েকটি পুত্র ছিল; যথাঃ বুঘ্‌রা খান, নাসিরুদ্দীন, গিয়াসউদ্দীন বা বাহাদুর শাহ, কতলু খান ও হাতিম খান। তৃতীয় পুত্র গিয়াসউদ্দীন পূর্ববঙ্গ জয় ক'রে ঢাকার সন্নিকটে সোনারগাঁয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৩১১ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে মুদ্রা তৈরী করেছিলেন। পঞ্চম পুত্র হাতিম খান ১৩০৯ ও ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দে আউধের গবর্নর ছিলেন। ৭১৮ হিজরীতে (১৩১৮ খ্রীঃ) ফিরোজ শাহের মৃত্যু হয়। ফিরোজ শাহের পুত্রদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহাব-উদ-দীন বুঘ্‌রা শাহ উপাধি নিয়ে ১৩১৮-১৩১৯ সালে লখনৌতিতে রাজত্ব করেন। সিংহাসনে আরোহণের অল্পদিন পরে বুঘ্‌রা শাহ তাঁর ভ্রাতা সোনারগাঁয়ের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ কর্তৃক পরাজিত হন। বুঘ্‌রা শাহ ও তাঁর ভ্রাতা নাসিরুদ্দীন বাদশাহ তুঘলক শাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন (তিনি ১৩২০ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন)। বাহাদুর শাহ তাঁর অন্য ভ্রাতা কতলু খানকে হত্যা ক'রে বাংলা ও বিহারের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন এবং সোনারগাঁয়ে জাঁকজমকপূর্ণ দরবার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ইবনে বতুত্তা বলেছেন, পলাতক বুঘ্‌রা শাহ ও নাসিরুদ্দীনের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে বাদশাহ তুঘলক শাহ বাংলা আক্রমণ করেন। বাদশাহী বাহিনী দিল্লী থেকে যাত্রা করার পর বাহাদুর শাহ সোনারগাঁয়ে চলে যান ; এবং নাসিরুদ্দীন তিরহুতে বাদ-শাহের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর সঙ্গে লখনৌতি আসেন। বাদশাহ তাঁকে লখনৌতির গবর্নর নিয়োগ করেন। বাদশাহ তাঁর পালক-পুত্র জাফরাবাদের (জৌনপুরের নিকটবর্তী) গবর্নর তাতার খানের সঙ্গে এক সৈন্যবাহিনী দিয়ে সুলতান বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহাদুব শাহকে বন্দী ক'রে গলায় শিকল পরিয়ে দিল্লী পাঠান হয়। এই সময় বাংলায় দুইটি অতিরিক্ত বিভাগ—সোনারগাঁও ও সাতগাঁও—গঠিত হয় এবং প্রত্যেকটিকে একজন সামরিক শাসনকর্তার অধীনে রাখা হয়। বাংলা থেকে বিহার পৃথক করা হয়। সোনারগাঁও তাতার খানের অধীনে রাখা হয়।

বাদশাহ তুঘলক শাহের আকস্মিক মৃত্যুতে এবং তাঁর উত্তরাধি-কারী বাদশাহ মুহম্মদ শাহ তুঘলকের সিংহাসনে আরোহণের পর বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থাব আরো পরিবর্তন সাধিত হয়। নতুন বাদশাহ বন্দী বাহাদুর শাহকে মুক্তি দিয়ে সোনারগাঁয়ে ফিরে যেতে অনুমতি দেন ; কিন্তু এই শর্তে যে, বাংলার মুদ্রায় বাহাদুর ও বাদশাহ মুহম্মদ তুঘলকের নাম যুগ্মভাবে থাকবে এবং খোতবাও উভয়ের নামে পঠিত হবে।

তাতার খান এযাবত সোনারগাঁয়ের সামরিক শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁকে বাহ্‌রাম খান উপাধি দিয়ে সোনারগাঁয়ে বাহাদুর শাহের দরবারে বাদশাহের প্রতিনিধিরূপে নিয়োগ করা হয়। নাসিরুদ্দীনকে লখনৌতির অধীনস্থ গবর্নররূপে থাকার অনুমতি দেয়া হয়।

৭২৬ হিজরীতে (১৩২৬ খ্রীঃ) নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু হয় এবং মুহম্মদ শাহ লখনৌতির গবর্নররূপে মালিক বেদার খালজীকে কদর খান উপাধি দিয়ে নিয়োগ করেন। সোনারগাঁয়ের রাজা

বাহাদুর শাহ অল্পদিন পরে বাদশাহের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন। বাদশাহ তখন বাহ্‌রামের সাহায্যার্থে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। শেষ বলবনী সুলতান ও বাদশাহ গিয়াসউদ্দীন বলবনের শেষ রাজকীয় প্রতিনিধি বাহাদুর শাহ ৭৩১ হিজরীতে (১৩৩১ খ্রীঃ) পরাজিত ও নিহত হন। ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে বাহ্‌রাম খানের মৃত্যু পর্যন্ত বাংলা দিল্লীর বাদশাহের অধীন ছিল। বাহ্‌রামের মৃত্যুর পর ফখরুদ্দীন সাফল্যের সাথে বিদ্রোহ করেন ও কদর খানকে হত্যা ক'রে বাংলা স্বাধীন করেন (ব্লকম্যানের Contribution to History and Geography of Bengal; টমাসের Initial Coinage; ইবনে বতুতা; তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী, ৯২, ১৮১, ২৫৪, ৪৫০, ৪৫১, ৪৬১, ৪৮০ পৃঃ দ্রঃ)।

৬২. বাদশাহ বলবন তাঁর পুত্র বুঘ্‌রা খানের বাংলা যাত্রার পূর্বে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছিলেন তা 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী'তে (৯৫-১০৬ পৃঃ) বর্ণিত আছে ও পড়বার যোগ্য। তাতে বাদশাহের আচরণ সম্পর্কে অতি মূল্যবান নীতি বিবৃত হয়েছে এবং এই মুসলমান বাদশাহের রাজকীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে মহান ও উন্নত ধারণা প্রকাশ পেয়েছে।

৬৩. 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে (১০৭ পৃঃ) "তিন বৎসর পর"।

৬৪. 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'র গ্রন্থকার জিয়াউদ্দীন বার্নি বলেছেন (১২১ পৃঃ) যে, ৬৮৮ হিজরী (১২৮৭ খ্রীঃ) মৃত্যুর পূর্বে বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধেয় বাদশাহ গিয়াসউদ্দীন বলবন দিল্লীতে তথাকার কোতোয়াল মালিক-উল-উমারা ফখরউদ্দীন, প্রধান উজীর খাজা হোসেন বস্‌রি ও অন্য কয়েকজনকে আহ্বান ক'রে সুলতান মুহম্মদের পুত্র কয়-খসরুকে সিংহাসনে বসাতে বলেন। কিন্তু, বাদশাহের মৃত্যুর পর কোতোয়াল ও তাঁর দলের লোকেরা বাংলার সুলতান ও বাদশাহের দ্বিতীয় পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন বুঘ্‌রা খানের পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসায়। সুলতান মুঈজুদ্দীন কায়কোবাদের অধীনে শাসনব্যবস্থার কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন:

(১) দিল্লীর কোতোয়াল মালিক-উল-উমারা ; (২) মালিক-উল-উমারার ভ্রাতুষ্পুত্র নিজাম-উদ-দীন হয়েছিলেন 'দাদচিগ' বা প্রধান বিচারপতি এবং পরে প্রধান উজীর ; (৩) মালিক কুয়াস-উদ-দীন হয়েছিলেন 'ওকিলদার' বা এডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল। সতের বৎসর বয়স্ক বাদশাহ কায়কোবাদ বিলাসপরায়ণ ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় ভোগবিলাসে দিল্লীর উপকণ্ঠে কিলুখাড়িস্থ মনোহর উদ্যান-ভবনে কালাতিপাত করতেন। উজীর নিজাম-উদ-দীন এই সময় নিজাম-উল-মুলক উপাধি গ্রহণ ক'রে বলবান গোষ্ঠীর ধ্বংসকার্যে রত হন (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ১৩২ পৃঃ দ্রঃ)।

৬৫. এখানে বর্ণনাটি কিঞ্চিৎ এলোমেলো হয়েছে। 'ফেরেশ্‌তা'য় নিম্নোক্ত বর্ণনা দেয়া হয়েছেঃ "যখন সুলতান মুঈজুদ্দীন কায়কোবাদ তাঁর পিতার (বাংলার সুলতান নাসিরুদ্দীন বুঘ্‌রা খানের) অভিপ্রায় ও তাঁর বিহার পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার কথা অবগত হলেন, তখন তিনিও (বাদশাহ কায়কোবাদ) সৈন্যবাহিনী সজ্জিত ক'রে বৎসরের সর্বাধিক গরমের সময় ঘাগর নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে অপেক্ষা করলেন। সুলতান নাসিরুদ্দীন এই সংবাদ শুনে বিহার থেকে অগ্রসর হয়ে স্রো নদীর তীর পর্যন্ত পৌঁছে অপেক্ষা করলেন।" সুলতান নাসিরুদ্দীন বুঘ্‌রা খান ও তাঁর পুত্র বাদশাহ কায়কোবাদের সাক্ষাতের বিবরণী 'কিরান-উস-সাদাইনে'র পৃষ্ঠায় দিল্লীর সুবিখ্যাত কবি আমীর খসরু অমর ক'রে রেখেছেন। পিতার শিবির ছিল স্রো বা স'রু বা সাক নদীর তীরে। এই নদী তখন বাংলারাজ্য ও দিল্লী সাম্রাজ্যের সীমারেখা ছিল (বিহার তখন বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল)। পুত্রের শিবির ছিল স্রো'র বিপরীত তীরে (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ১৪১ পৃঃ)। 'কিরান-উস-সাদাইনে' পিতা-পুত্রের সাক্ষাতের স্থান ঘাগর নদীর তীরবর্তী অযোধ্যা নগরী বলে নির্দিষ্ট করেছেন।

৬৬. বলা হয়েছে যে, বিদায় নেয়ার দিন সুলতান নাসিরুদ্দীন বুঘ্‌রা খান পুত্র বাদশাহ কায়কোবাদকে নামাজ পড়তে ও রোজা

রাখতে তাগিদ দেন এবং বাদশাহী সংক্রান্ত কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম ও রীতি সম্পর্কে উপদেশ দেন। অত্যধিক মদ্যপান ও রাজকার্যে অবহেলা না করার জন্য সাবধান করেন; কয়-খসরু ও গিয়াসউদ্দীন বলবনের আমীর ও মালিকদের হত্যা করার জন্য তিরস্কার করেন। এতদ্ব্যতীত নিজাম-উদ-দীন ওরফে নিজাম-উল-মুল্ক্কে উজীরের পদ থেকে অপসারণের পরামর্শ দেন (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ১৪৪-১৫৬ পৃঃ দ্রঃ)।

৬৭. 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', ১৭৪ পৃঃ দ্রঃ। অন্যান্য বিবরণী মতে জালালুদ্দীন খালজীর সঙ্গে আমীর-উল-উমারার যোগসাজস ছিল এবং শেষোক্ত ব্যক্তির প্ররোচণায় বাদশাহ কায়কোবাদকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়। কায়কোবাদের মৃত্যুর সঙ্গে দিল্লীর বলবনী বংশ শেষ হয়। কিন্তু, এই পুস্তকের অন্য এক বিবৃতি মতে বাংলায় বলবনী সুলতানদের রাজত্বকাল আরো কিছুকাল বজায় ছিল।

৬৮. কথিত হয়, সুলতান জালালুদ্দীন খালজী চাঙ্গেজ খানের জামাতা কালেজ খানের বংশধর ছিলেন। তিনি সামানার গবর্নর ছিলেন এবং বাদশাহ কায়কোবাদের উজীরমণ্ডলীতে 'আরজ-ই-মমালিক' (স্টেট সেক্রেটারী) ছিলেন। জালালুদ্দীন ১২৯০ খ্রীস্টাব্দ বা ৬৮৯ হিজরীতে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন; এবং তখন থেকে খালজী বংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ১৩২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই বংশ ভারতে রাজত্ব করেছিল। জালালুদ্দীনের রাজত্বকালে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খালজীর শক্তিমত্তার জন্য দক্ষিণ-ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য বিস্তার হয় (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ১৭০-১৭৪ পৃঃ; বদাওনি, ১ম খণ্ড, ১৬৭ পৃঃ দ্রঃ)। বদাওনি বলেন, 'কালিজ' ও 'খাল্জ' স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং 'খাল্জ' ছিলেন নূহের পুত্র ইয়াফুসের অন্যতম সন্তান।

৬৯. সুলতান কুত্বুদ্দীন খালজী ছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খালজীর পুত্র (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ৩৮১ ও ৪০৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৭০. জিয়াউদ্দীন বার্নি বলেছেন (১৮০ পৃঃ) বাদশাহ বলবনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন বুঘ্‌রা খানের বাংলায় দুর্বল শাসনের জন্য দিল্লী অঞ্চলে ধৃত ডাকাতদের জাহাজ বোঝাই ক'রে বাংলায় পাঠিয়ে ছেড়ে দেয়া বাদশাহ জালালুদ্দীনের একটা প্রিয় রীতি ছিল।

৭১. খসরু খানের পরাজয়ের পর আমীরগণ গাজী-উল-মুল্‌ককে দিল্লীর সিংহাসনে বসান (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ৪২০, ৪২১ পৃঃ)। গাজী-উল-মুল্‌ক্‌ অতঃপর গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মালিক। তিনি গিয়াসউদ্দীন বলবনের তুর্কী গোলাম ছিলেন। গাজী-উল-মুল্‌কের মাতা ছিলেন পাঞ্জাবী পরিবারের। সাহসী ও উদার ছিলেন তিনি। তিনি তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন ও এই বংশ ৯৪ বৎসরকাল (১৩২০-১৪১৪ খ্রীঃ) দিল্লীতে বাদশাহী করেছিল। দিল্লীর ৪ মাইল পূর্বদিকে তুঘলকাবাদ নগর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৩২০-১৩২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বাহাদুর শাহের পূর্ণ স্বাধীনতার ধারণা দমন করার জন্য গিয়াসউদ্দীন তুঘলক সোনারগাঁয়ে অভিযান পরিচালনা করেন এবং যুদ্ধে বাহাদুর শাহকে পরাজিত ও বন্দী করেন ও তাঁকে নিয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তিরহুত দুর্গ আক্রমণ ও দখল করেন। নাসিরুদ্দীনকে ভেলায়েতে লখনৌতির গবর্নর নিযুক্ত ক'রে যান। গিয়াসউদ্দীন বাংলারাজ্যকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেন ; যথা ঃ (১) ভেলায়েতে লখনৌতি ; (২) ভেলায়েতে সাতগাঁও ও (৩) ভেলায়েতে সোনারগাঁও। প্রত্যেকটি বিভাগে একজন স্বতন্ত্র গবর্নর নিযুক্ত করেছিলেন এবং গবর্নরদের উপরে সোনারগাঁয়ে, একজন ভাইসরয় নিযুক্ত করেছিলেন (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ৪৫১ পৃঃ)।

৭২. এই নাসিরুদ্দীন ছিলেন বাদশাহ বলবনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন বুঘ্‌রা শাহের পৌত্র। তিনি লখনৌতির গবর্নর ছিলেন। কিন্তু

সোনারগাঁয়ে অবস্থিত বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহ তাঁকে বিতাড়িত করেন। এই নাসিরুদ্দীন ও তাঁর এক ভ্রাতা বুঘ্‌রা খান সেইসময় দিল্লীর বাদশাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁদের প্ররোচণায় তুঘলক শাহ তাঁদের ভ্রাতা বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহকে শাস্তি দেয়ার জন্য বাংলা আক্রমণ করেন। এই পুস্তকের মন্তব্য বিভ্রান্তিকর; এতে মনে হয় যেন এই নাসিরুদ্দীনই বাদশাহ বলবনের পুত্র সুলতান নাসিরুদ্দীন বুঘ্‌রা শাহ (যাই হোক ব্লকম্যানের Contributions to History and Geography of Bengal এবং তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ৪৫০-৪৫১ পৃঃ দ্রঃ)।

৭৩. এই গ্রন্থের বর্ণনা সকল বিষয়ে ঠিক নয়। বাংলার বলবনী বংশ সম্পর্কে পূর্ববর্তী টীকা দ্রষ্টব্য।

৭৪. উলাঘ খান বা আলাঘ খান ওরফে ফখর-উদ-দীন জুনা ছিলেন বাদশাহ গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা। নব-নির্মিত একটি মঞ্চের ছাদের আকস্মিক পতনে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহের মৃত্যু হওয়ায় উলাঘ খান সুলতান মুহম্মদ শাহ তুঘলক উপাধি ধারণ ক'রে ৭২৫ হিজরীতে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সুপণ্ডিত, প্রথম শ্রেণীর সেনাপতি ও বিশেষ কর্মদক্ষ ছিলেন। কিন্তু, খামখেয়ালী ও কল্পনাময় পরিকল্পনার দরুন বাদশাহ হিসেবে তাঁর সাফল্য নষ্ট হয়। সমগ্র পৃথিবী জয় ক'রে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। পারস্য আক্রমণ ও চীন বিজয়ের জন্য তিনি তাঁর অতিসুদক্ষ সৈন্যবাহিনী অকারণ নষ্ট করেছিলেন। যদিও তিনি স্বীয় প্রতিভার দরুন একটা রাজস্ব ব্যবস্থা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তথাপি তাম্র-মুদ্রা প্রবর্তনের খামখেয়ালির জন্য তাঁর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অকার্যকরী হয়ে যায়। মিসরের খলিফা তাঁকে রাজকীয় সনদ দিয়ে দূত প্রেরণ করেছিলেন ও তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে দিল্লীতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ও তজ্জন্য লোকে দিল্লী ত্যাগ ক'রে

বাংলায় আসে। তিনি শর্তাধীনভাবে বাহাদুর শাহকে সোনার-গাঁয়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন ; কিন্তু পরে তাঁকে গদিচ্যুত করেন। তাঁর রাজত্বকালে ফখরুদ্দীনের অধীনে বাংলা স্বাধীন হয়েছিল (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ৪২৮, ৪৫৩, ৪৫৭-৪৬১, ৪৭৩, ৪৭৫, ৪৭৮, ৪৮০, ৪৯২ পৃঃ দ্রঃ)।

তৃতীয় পর্ব : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১. বাংলায় মুসলমান সুলতান ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। ফখরুদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর মুবারক শাহ্ প্রথম স্বাধীন সুলতান ছিলেন। তিনি পূর্বে সোনার-গাঁয়ের গবর্নর বাহ্‌রাম খানের 'সিলাদার' বা অস্ত্র-বাহক ছিলেন। ৭৩৯ হিজরী বা ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মনিবের মৃত্যুর পর ফখ্‌রা লখনৌতির গবর্নর কদর খানকে হত্যা করেন এবং লখনৌতি, সাত-গাঁও ও সোনারগাঁও দখল করেন ও ফখরুদ্দীন উপাধি ধারণ ক'রে স্বাধীন হন (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ৪৮০ পৃঃ)। সোনারগাঁয়ের টাকশালে তাঁর তৈরী মুদ্রা থেকে দেখা যায়, তিনি দশ বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করেছিলেন (টমাসের Initial Coinage-এ প্রকাশিত)। ইবনে বতুতা উল্লেখ করেছেন, তিনি একজন বিশিষ্ট ও উদার ব্যক্তি ছিলেন। সোনারগাঁয়ে তাঁর রাজধানী ছিল ব'লে প্রতীয়মান হয়। তাঁর জামাতা জাফর খান সোনারগাঁও থেকে পালিয়ে দিল্লীতে ফিরোজ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ফিরোজ শাহ্ তাঁর অনুরোধে সিকান্দার শাহের রাজত্বকালে দ্বিতীয়বার বাংলা আক্র-মণ করেন (শাম্‌স-ই-সিরাজ লিখিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', ১০৫-১১৪ পৃঃ)। এই স্বাধীন মুসলমান সুলতানদের আমলে বাংলা প্রভূত সম্পদশালী হয়েছিল। বহু দুর্গ, সরকারী ভবন, মসজিদ, কলেজ, ছাত্রাবাস, সরাই ও খান্‌কা প্রভৃতি রাজ্যের সকল অঞ্চলে তৈরী হয়েছিল; পুকুর খনন ও রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল। দুই মহান রাজবংশ—একটি হাজী ইলিয়াসের ও অন্যটি আলাউদ্দীন হোসেন শাহের (মধ্যে কেবল ৪০ বৎসর ব্যতীত, যে সময় রাজা

কংস ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ বাংলারাজ্য দখল করেছিলেন)—এই সময় রাজত্ব করেছিল। এই সময় বাংলারাজ্যের আয়তনও সম্প্রসারিত হয়েছিল। পশ্চিম-আসাম (বা কামরূপ), কুচবিহারের অংশ, জাজনগর (বা উড়িষ্যার অংশ), সমগ্র উত্তর-বিহার বাংলা-রাজ্যের মধ্যে ছিল (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ৫৮৬ পৃঃ)। বিহার শহর পর্যন্ত দক্ষিণ-বিহারের পূর্বাঞ্চল সাধারণভাবে বাংলারাজ্যের অধীন ছিল। এযাবত মেঘনা নদী মুসলমানদের রাজ্য সম্প্রসারণে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ ছিল; কিন্তু এই সময় এই বাধা অতিক্রম ক'রে মেঘনার পূর্বদিকে বহুদূর- সিলহট, টিপারার পশ্চিমাঞ্চল ও নোয়াখালী প্রভৃতি জেলাসমূহ ও চিটাগাং—পর্যন্ত মুসলমান বাহিনী অধিকার করেছিল। উভয় জাতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে এই সময় বিরাট একেশ্বরবাদ আন্দোলনের আবির্ভাব হয়েছিল। উদার মতাবলম্বী মহান আধ্যাত্মিক নেতা কবীর ও চৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছিল এই কালে।

২. এটা হয়েছিল ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে।

৩. বদাওনি অনুরূপ বিবরণী দিয়েছেন (ফার্সী সংস্করণের ১ম খণ্ড, ২৩০ পৃঃ)। বদাওনি বলেনঃ "৭৩৯ হিজরীতে সোনারগাঁয়ের গবর্নর বাহ্‌রাম খানের মৃত্যুর পর সিলাদার বা কোয়ার্টার-মাস্টার-জেনারেল মালিক ফখরুদ্দীন বিদ্রোহ করেন ও ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করেন এবং তিনি লখনৌতির গবর্নর কদর খানের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। দ্বিতীয়বার যুদ্ধে ফখরুদ্দীন কদর খানকে পরাজিত করেন (কদর খানের সৈন্যরাই তাঁকে হত্যা করেছিল) ও সোনারগাঁও প্রদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর সেনাপতি মুখলিস খানকে লখনৌতি অভিযানে প্রেরণ করেন। কদর খানের সৈন্যবাহিনীর এডজুট্যান্ট-জেনারেল (আরিজ-ই-লস্কর) আলী মুবারক তখন মুখলিসকে হত্যা করেন ও লখনৌতিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আলী মুবারক বাদশাহ মুহম্মদ শাহ তুঘলকের নিকট পত্র পাঠান। বাদশাহ মালিক ইউসুফকে প্রেরণ করেন;

কিন্তু পথিমধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর বাদশাহ অন্যান্য ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় অন্য কাউকে বাংলায় প্রেরণ করেন নাই। সোনারগাঁয়ে ফখরুদ্দীনের বিরোধিতা লক্ষ্য ক'রে রাজকীয় কারণে আলী মুবারক লখনৌতিতে সুলতানি মর্যাদাসহ সুলতান আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। মালিক ইলিয়াস হাজী নামক জনৈক গোষ্ঠী-সরদার ও সৈন্যাধ্যক্ষ কিছুদিন পর লখনৌতির কিছুসংখ্যক আমীর ও মালিকের সঙ্গে যোগ-সাজসে আলাউদ্দীনকে হত্যা করেন ও নিজে শামসুদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। ৭৪১ হিজরীতে বাদশাহ মুহম্মদ শাহ তুঘলক সোনারগাঁয়ে অভিযান পরিচালনা করেন এবং ফখরুদ্দীনকে বন্দী করতঃ লখনৌতিতে এনে হত্যা করেন ও তৎপর দিল্লী ফিরে যান। অতঃপর শামসুদ্দীন হাজী ইলিয়াস বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন।

৪. তাঁর মুদ্রা থেকে দেখা যায় (টমাসের Initial Coinage-এ প্রকাশিত) তাঁর নাম ছিল আলাউদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর আলী শাহ্। তাঁর সমস্ত মুদ্রা ফিরোজাবাদের (পাণ্ডুয়ার) টাকশালে তৈরী হওয়ায় অনুমান করা যায় যে, তাঁর রাজধানী ছিল পাণ্ডুয়ায়। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডুয়া আলী শাহের রাজধানীরূপে পরিচিত।

৫. শেখ জালালুদ্দীন তাব্রিজী ছিলেন শেখ সৈয়দ তাব্রিজীর মুরিদ। কিছুদিন ভ্রমণ করার পর তিনি শেখ শাহাব-উদ-দীনের সঙ্গে যোগদান করেন এবং তাঁর খলিফা বা প্রধান মুরিদ হন। তিনি খাজা কুতব-উদ-দীন ও শেখ বাহাউদ্দীনের পরম বন্ধু ছিলেন। শেখ নজম-উদ-দীন (ছোট) যখন দিল্লীর শেখ-উল-ইসলাম ছিলেন, সেইসময় তিনি জালালুদ্দীন তাব্রিজীর বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর সাধুতা ও চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগ করেন। সেইজন্য জালালুদ্দীন বাংলায় চলে যান। দেওমহল বন্দরে (মালদ্বীপে) তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় ('সিয়ার', ১ম খণ্ড, ২৩১ পৃঃ এবং 'আইন' দ্রঃ)।

৬. মালদহ জেলার ইংলিশ বাজার থেকে বারো মাইল উত্তরে পাণ্ডুয়া

অবস্থিত। শামসুদ্দীন ইলিয়াসের রাজত্বের আরম্ভ থেকে রাজা কংস পর্যন্ত ছয়জন রাজা ৫২ বৎসরকাল (৭৪৩-৭৯৫ হিঃ) সেখানে রাজত্ব করেছিলেন। পাণ্ডুয়ার শাসনকর্তাদের মধ্যে সম্ভবতঃ আলী মুবারককেও গণ্য করা উচিৎ। ৭৪১ হিজরীতে (১৩৪০ খ্রীঃ) তাঁর রাজত্ব আরম্ভ হয়েছিল মনে হয়। অধ্যাপক ব্লকম্যান পাণ্ডুয়াকে আলী শাহের রাজধানী গণ্য করেছেন (J. A. S. B., XLII, ২৫৪ পৃঃ)। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মত আমাদের গ্রন্থকার দ্বারাও সমর্থিত হয়। আমাদের গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, আলী মুবারক পাণ্ডুয়ায় আউলিয়া জালালুদ্দীনের মাজার তৈরী করেছিলেন এবং শামসুদ্দীন ইলিয়াসের পাণ্ডুয়া উপস্থিতির কথা বলেছেন। ৭৯৫ হিজরীতে (১৩৯২ খ্রীঃ) রাজা কংসের পুত্র জালালুদ্দীন (যিনি মুসলমান হয়েছিলেন) রাজধানী গৌড় অথবা লখনৌতিতে স্থানান্তরিত করেন।

৭. ৭৪৬ হিজরীতে হাজী ইলিয়াস প্রথমে পশ্চিম-বাংলায় আধিপত্য স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয়। সেইসময় মুবারক শাহের পুত্র ইখতিয়ার-উদ-দীন আবুল মুজফফর গাজী শাহ পূর্ববঙ্গের সোনার-গাঁয়ে রাজত্ব করছিলেন। অল্পদিন পরে (৭৫৩ হিজরীতে) হাজী ইলিয়াস পূর্ববঙ্গ অধিকার করেন ও সোনারগাঁয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর বংশ ৮৯৬ হিজরী পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দেড় শতাব্দীকাল (মাঝে অল্পদিন ব্যতীত) রাজত্ব করেছিল। তিনি তাঁর রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত বানারস পর্যন্ত বিস্তার করেন ও হাজীপুর শহর প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলক তাঁকে শাস্তি দেয়ার জন্য অভিযান পরিচালনা করেছিলেন; কিন্তু তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। ইলিয়াসের মুদ্রার জন্য টমাসের Initial Coinage of Bengal, J. A. S., ১৮৬৭, ৫৭-৫৮ পৃঃ দ্রঃ।

এই সুলতানের নিকটতম সমকালীন বিবরণীর জন্য জিয়াউদ্দীন

বার্নির 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', ৫৮৬ পৃঃ ও 'সিরাজ আফিফ' ৭৭ পৃঃ দ্রঃ।

৮. সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ওরফে মালিক ফিরোজ বারবক ছিলেন মুহম্মদ শাহ তুঘলকের এক চাচার পুত্র ও গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর পিতার নাম রজব সালার। তিনি সংসার ত্যাগ করতঃ দরবেশ হয়ে যান। ৭৫৫ হিজরীতে যখন তাঁর (ফিরোজের) বয়স ৫০ বৎসর, তখন তিনি হিন্দুস্তানের বাদশাহ হন। তিনি বিজ্ঞ, মহৎ ও সুশিক্ষিত বাদশাহ ছিলেন। কৃষি ও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বিচার বিভাগের সংস্কার করেন; অত্যাচার ও দুর্নীতি দমন করেন; ভূমি-রাজস্বের হার হ্রাস করেন এবং জমির উৎপাদনের ভিত্তিতে ও প্রজাদের আর্থিক সামর্থের ভিত্তিতে রাজস্বের হার স্থির করেন; দ্বারাদেয় শুল্কপ্রথা বিলুপ্ত করেন। তিনি ৩০টি কলেজ, ৫টি হাসপাতাল, ৪০টি জুম'আ মসজিদ, ২০০ পান্থনিবাস, ২০টি হুজরাখানা, ১০০টি প্রাসাদ ও অট্টালিকা, ১৫০টি হামাম, অসংখ্য উদ্যান ও পুল তৈরী করেছিলেন। হান্‌সির নিকটে তিনি 'হিসার-ই-ফিরোজ' নামক একটি দুর্গ তৈরী ক'রে একটি খাল খনন করতঃ যমুনা নদীর সঙ্গে এর যোগস্থাপন করেন। তাঁর সর্ববৃহৎ কার্য হচ্ছে পুরাতন যমুনা খাল। যেখানে যমুনা নদী পর্বত থেকে নির্গত হয়েছে, এই খাল সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং বহু সেচ-খাল দ্বারা ঘাগর ও সতলেজ নদীর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে ও চারিদিকের বহু জমি তজ্জন্য উর্বর হয়েছে। তিনি কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ করিয়েছিলেন এবং শিক্ষা ও বিদ্বানদের উৎসাহ দিতেন। মিসরের খলিফা আবুল ফাতাহের নিকট থেকে তিনি এক সনদ পেয়েছিলেন। ১৩৫১ থেকে ১৩৮৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন। ১৪১৪ খ্রীস্টাব্দে তুঘলক বংশ বিলুপ্ত হয়। শেষ প্রকৃত তুঘলক সুলতান মুহম্মদ শাহ তুঘলকের আমলে ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে তৈমুরের আক্রমণের ফলে

সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় (জিয়াউদ্দীন বার্নির 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী', ৫৪৮, ৫৭০ পৃঃ দ্রঃ ; 'শাম্‌স-ই-সিরাজ' দ্রঃ)।

৯. পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী ফিরোজাবাদের স্থলে এখানে ফিরোজপুরাবাদ উল্লিখিত হয়েছে ।

১০. মি. ওয়েস্টমেকটের মতে একডালা দিনাজপুরের নিকটে অবস্থিত। মি. বিভারিজের মতে ঢাকার সন্নিকটে। একডালা দুর্গের অবস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ব্লকম্যানের Contribution to History and Geography of Bengal, J. A. S., ১৮৭৩, ২১৩ পৃঃ ; এবং মি. বিভারিজের Analysis of Khurshid Jahan Nama দ্রঃ ।

জিয়া বার্নির 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে একডালার নিম্নলিখিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে (ফার্সী সংস্করণ, ৫৮৮ পৃঃ) ঃ "পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী একটি মৌজার নাম একডালা। এর একদিকে নদী ও অন্যদিকে জঙ্গল।" জিয়া বার্নি সেকালের সমকালীন ঐতিহাসিক। তাঁর বর্ণনানুযায়ী একডালা পাণ্ডুয়ার নিকটে অবস্থিত। সুতরাং, মি. বিভারিজ তাঁর Analysis of Khurshid Jahan Nama বইতে একডালা ঢাকা জেলাস্থ ভাওয়ালের জঙ্গলে অবস্থিত, এবং মি. ওয়েস্টমেকট দিনাজপুরের সন্নিকটে অবস্থিত বলে যে মত প্রকাশ করেছেন, সেরূপ বিতর্কের অবকাশ থাকে না। অধ্যাপক ব্লকম্যান 'একডালা' একটি সাধারণ (বর্গীয়) নাম বলে মত প্রকাশ করেছেন (J. A. S. B., ১৮৭৩, ২১২-১৩ পৃঃ দ্রঃ)। রেনেল 'হিন্দুস্তানের মানচিত্রে' ঢাকার উত্তরে আর একটি একডালা চিহ্নিত করেছেন। শাম্‌স-ই-সিরাজ তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে (ফার্সী সংস্করণ, ৭৯ পৃঃ) এটাকে 'একডালা দ্বীপপুঞ্জ' (Islands of Ekdalah) নাম দিয়েছেন।

১১. ৭৫৪ হিজরীতে (১৩৫৩ খ্রীঃ) বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলকের প্রথম বাংলা অভিযানের পূর্ণ বিবরণী সমকালীন ঐতিহাসিক জিয়া বার্নি কর্তৃক 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে (ফার্সী সংস্করণ, ৫৮৬

পৃঃ) দেয়া আছে। এই ঐতিহাসিক ফিরোজ শাহের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত ঘটনাদির বিবৃতি দিয়ে তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন। (বাংলার) সুলতান শামসুদ্দীন হাজী ইলিয়াস তিরহুত ও তৎকালীন বাংলারাজ্য ও দিল্লীর বাদশাহী এলাকার সীমান্ত (তখন স্রো নদী উভয় রাজ্যের মধ্যে সীমানা নির্দিষ্ট ছিল) আক্রমণ ও বিধ্বস্ত করায় ফিরোজ শাহ তাঁকে শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে এই অভিযান পরিচালনা করেন। ৭৫৪ হিজরীর ১০ই শাউয়াল তারিখে দিল্লী থেকে রওয়ানা হয়ে বাদশাহ আউধে পৌঁছে স্রো নদী অতিক্রম করেন। তখন ইলিয়াস শাহ তিরহুতে পশ্চাদপসরণ করেন। বাদশাহ স্রো নদী অতিক্রম ক'রে আরসা-ই-খারোসা (এই স্থানের পরিচয় পাওয়া যায় নাই) ও গোরখপুরের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হন। এই স্থানের রাজারা বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন ও তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন। তখন ইলিয়াস শাহ তিরহুত থেকে পাণ্ডুয়ায় চলে আসেন। বাদশাহ লখনৌতি ও পাণ্ডুয়া অভিমুখে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। জগত বা জাকত (পরিচয় পাওয়া যায় নাই) ও তিরহুত অতিক্রম করেন। এই সকল এলাকার রাজারাও বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করেন। বাদশাহ পাণ্ডুয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ায় ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গে পশ্চাদপসরণ করেন ও সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন করেন। বাদশাহ পাণ্ডুয়া লুণ্ঠন করেন নাই; সেখানকার জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন না ক'রে একডালা দুর্গের সামনে নদী পার হয়ে কয়েকদিন দুর্গ অবরোধ ক'রে থাকেন। দুর্গের অধিবাসীদের নির্বিচারে ধ্বংস করা সম্পর্কে তিনি দ্বিধাবোধ করছিলেন। সেইজন্য পশ্চাদপসরণের ভান ক'রে নদী আবার পার হন। ফলে ইলিয়াস শাহ দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসেন। তখন উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ হয়। বাংলার সৈন্যবাহিনীতে হস্তীযূথই ছিল প্রধান; যুদ্ধে ইলিয়াস শাহ পরাজিত হন এবং বাদশাহীপক্ষ ৪৪টি বাংলাদেশীয় হাতী ইত্যাদি দখল করে। বর্ষার মওসুম আসন্ন দেখে বাদশাহ তিরহুতে রাজস্ব আদায়কারীদের নিযুক্ত ক'রে

দ্রুত দিল্লী ফিরে যান। ৭৫৫ হিজরীর (১৩৫৪ খ্রীঃ) ১২ই শাবান তিনি দিল্লী পৌঁছান।

শাম্‌স্ সিরাজ আফিফ নামক আর একজন প্রায় সমকালীন ঐতিহাসিক বাদশাহের প্রথম অভিযানের বর্ণনা দিয়েছেন ও বার্নির 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'র পরবর্তী ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন (ফার্সী পাণ্ডুলিপি, ৭৬ পৃঃ দ্রঃ)। এই বিবরণী থেকে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়ঃ

(১) ফিরোজ শাহ এক হাজার যুদ্ধ-নৌবহর নিয়ে বাংলা যাত্রা করেন; পথে স্রো, গঙ্গা ও কোশি নদী পড়েছিল। তাঁর সামরিক বাহিনীতে ৭০,০০০ খান ও মালুক, দু'লক্ষ পদাতিক ও ৬০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। তা ছাড়া হস্তীযূথ ছিল।

(২) ফিরোজ শাহ কোশী নদী অতিক্রম করার পর বাংলার সুলতান ইলিয়াস শাহ পাণ্ডুয়া থেকে একডালায় পশ্চাদপসরণ করেন। এতে একডালাকে 'একডালা দ্বীপপুঞ্জ' বলা হয়েছে।

(৩) ফিরোজ শাহ কয়েকদিন যাবত একডালা দুর্গ অবরোধ ক'রে থাকেন। কিন্তু তাতে কোনো প্রকার নিশ্চিত ফল না হওয়ায় তিনি একডালা থেকে সাত ক্রোশ পশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণের ভান করেন। বাদশাহ পশ্চাদপসরণ করছেন মনে ক'রে ইলিয়াস শাহ একডালা দুর্গ থেকে বেরিয়ে অগ্রসর হন ও বাদশাহী ফৌজ আক্রমণ করেন। বাদশাহী ফৌজ তাঁকে পরাজিত করে এবং বাংলা-বাহিনীর একলক্ষ সৈন্য হত্যা করে ও ৫০টি হস্তী দখল করে।

(৪) তখন ইলিয়াস শাহ আবার একডালা দুর্গে পলায়ন করেন। বাদশাহী ফৌজ বলপূর্বক দুর্গ দখলের উপক্রম করায় ঘাঁটিস্থ স্ত্রীলোকেরা খালি মাথায় উচ্চ আর্তনাদ করতে থাকে। তাতে ফিরোজ শাহের অন্তর নরম হয় ও তিনি ধ্বংসকার্য থেকে বিরত হন।

(৫) দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে ফিরোজ শাহ কয়েকদিন

পাণ্ডুয়ায় অবস্থান করেন ও স্থানের নাম পরিবর্তন ক'রে ফিরোজাবাদ রাখেন ; নিজ নামে খোতবা প্রচলন করেন। একডালার নাম পরিবর্তন ক'রে রাখেন 'আজাদপুর'।

(৬) ফিরোজ শাহের অভিযান এগারো মাসকালব্যাপী ছিল।

১২. বাদশাহ ফিরোজ শাহ যখন শামসুদ্দীন হাজী ইলিয়াস শাহকে একডালা দুর্গে অবরোধ করেন সেইসময় (১৩৫৩ খ্রীঃ, ৭৫৪ হিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়।

১৩. ইলিয়াস শাহের মুদ্রা সম্পর্কে তথ্যের জন্য টমাসের Initial Coinage of Bengal, J.A.S., ১৮৬৭, ৫৭-৫৮ পৃঃ দ্রঃ।

"৭৪৬ হিজরীতে পশ্চিমবঙ্গ দখল করার পর ৭৫৩ হিজরীতে ইলিয়াস শাহ ঢাকার নিকট সোনারগাঁয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এইরূপে একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করেন—এই বংশ হিজরীর নবম শতাব্দীর প্রথমদিকে ৪০ বৎসরকাল ছাড়া ৮৮৬ হিজরী পর্যন্ত বাংলা শাসন করেছিল" (ব্লকম্যানের Contribution, J.A.S., ১৮৭৩, ২৫৪ পৃঃ)।

তাঁর মুদ্রাগুলো থেকে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। কতকগুলো সোনারগাঁয়ের টাকশালে তৈরী হয়েছিল। (সোনারগাঁয়ের উল্লেখ আছে, "হজরত জাল্লাল সোনারগাঁও" নামে—অর্থাৎ সোনারগাঁয়ে সুবিখ্যাত রাজকীয় বাসস্থান)। মুদ্রাগুলোর তারিখ হচ্ছে ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮ হিজরী। মুদ্রার উপর অঙ্কিত তাঁর নাম "শামসুদ্দীন আবুল মোজাফ্ফর ইলিয়াস শাহ"।

১৪. সোনারগাঁয়ের অধিপতি সুলতান ফখরুদ্দীন মুবারক শাহের জামাতা জাফর খানকে গদি-নশীন করার উদ্দেশ্যে ৭৬০ হিজরীতে (১৩৫৯ খ্রীঃ) বাদশাহ ফিরোজ শাহ দ্বিতীয়বার বাংলা আক্রমণ করেন। (বিশদ বৃত্তান্তের জন্য শাম্‌স্ সিরাজ আফিফের 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', ফার্সী পাণ্ডুলিপি, ৯৭ পৃঃ দ্রঃ)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সোনারগাঁয়ের মুসলমান সিংহাসন (রাজত্ব) পাণ্ডুয়া

অপেক্ষা প্রাচীন ছিল। প্রথম বাংলা অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ কয়েকদিনের মধ্যে নৌকাযোগে সোনারগাঁও পৌঁছান (এই তথ্য অনুযায়ী পূর্বোল্লিখিত ১০৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত অধ্যাপক ব্লকম্যানের বিবরণীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে)। সেইসময় (৭৫৫ হিঃ, ১৩৫৪ খ্রীঃ) সুলতান ফখরুদ্দীন নিশ্চিন্ত-ভাবে সোনারগাঁয়ে রাজত্ব করছিলেন। শামসুদ্দীন আকস্মিক আক্রমণ করতঃ তাঁকে বন্দী ও হত্যা করেন এবং লখনৌতি ও পাণ্ডুয়া রাজ্যের সঙ্গে সোনারগাঁও রাজ্য যোগ ক'রে নেন। সেইসময় ফখরুদ্দীনের জামাতা জাফর খান সোনারগাঁয়ের অভ্যন্তর-ভাগে রাজস্ব আদায় ও রাজস্ব আদায়কারীদের আচরণ সম্পর্কে সরেজমিন তদন্তকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। উক্ত সংবাদ পাওয়ার পর তিনি জাহাজযোগে সমুদ্রপথে সোনারগাঁও থেকে থাটা ও সেখান থেকে দিল্লী গিয়ে ফিরোজ শাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। জাফর খানকে সোনারগাঁও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে সম্মত হওয়ায় সিকান্দার শাহের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু জাফর খান দিল্লী যাওয়াই শ্রেয়ঃ গণ্য করেন। ইলিয়াস শাহের মতো সিকান্দার শাহও একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা থেকে ফিরোজ শাহ জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন ও তথাকার রাজাকে পরাজিত করেন। রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন; জগন্নাথের প্রতিমা দিল্লী নিয়ে যাওয়া হয় (১১৯ পৃঃ) এবং বাদশাহ বহুসংখ্যক হস্তী দখল করেন। এই অভিযানের সময় বাদশাহ বাংলা ও জাজনগরে দু'বছর সাত মাস ছিলেন (১৩১ পৃঃ)। এই প্রসঙ্গে শাম্‌স্‌ সিরাজ আফিফের 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', ফার্সী পাণ্ডুলিপি, ১১৫ পৃষ্ঠায় এবং 'মুন্তাখিবুল তওয়ারিখে' (ফার্সী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ) জাজনগরের আকর্ষণীয় বিবরণ পাওয়া যায়। বাদশাহ বলবনের সোনারগাঁও অভিযান প্রসঙ্গে জাজনগর সম্পর্কে জিয়া বার্নির মন্তব্যের প্রেক্ষিতে দু'টো জাজনগরের—একটি উড়িষ্যায় ও অন্যটি ত্রিপুরায়—অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি বরঞ্চ

অধ্যাপক ব্লকম্যানের সঙ্গে একমত। পূর্বোল্লিখিত 'মুন্তাখিবুল তওয়ারিখ' এবং শাম্‌স্‌ সিরাজ আফিফের 'তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহী'র বিবরণীদ্বয়ের মধ্যে কিঞ্চিত পার্থক্য রয়েছে। 'মুন্তাখিবে' বদাওনি বলেন যে, ফিরোজ শাহ দ্বিতীয়বার বাংলা অভিযান সম্পন্ন করার পর (৭৬০ হিঃ) পাণ্ডুয়া থেকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে জৌনপুর পৌঁছান (মুন্তাখিব, ফার্সী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ, তৃতীয় পর্ব)। জৌনপুরে বর্ষাকাল কাটিয়ে ফিরোজ শাহ বৎসরের শেষভাগে বিহারের পথে জাজনগর (উড়িষ্যা) অভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে সাথিধিরা, বারানসী অতিক্রম করেন। বারানসীর রাজা তেলিঙ্গায় পলায়ন করেন এবং সাথিঘিরার রাজা দূরপ্রান্তে পলায়ন করেন। অতঃপর ফিরোজ শাহ রাজা প্রিহান দেওয়ের রাজ্যে পৌঁছালে রাজা তাঁকে ৩২টি হাতী ও অন্যান্য মূল্যবান উপহার দেন। এরপর বাদশাহ শিকারের জন্য পদ্মাবতী ও পিরেমতলার জঙ্গলে যান। এই জঙ্গলে শক্তিশালী ও বৃহদাকার হাতী পাওয়া যেতা। তিনি এখানে তিনটি জীবন্ত হাতী ধরেন ও ২টি হাতী বধ করেন এবং ৭৬২ হিজরীতে বিজয়ী হয়ে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

শাম্‌স্‌ সিরাজের 'তারিখ ই-ফিরোজশাহী'তে প্রদত্ত বিবরণী অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কারণ, সিরাজের পিতা এই অভিযানে বাদশাহের সঙ্গে ছিলেন (১১৫ পৃঃ)। সিরাজ সঠিকভাবে 'বানারসী' উল্লেখ করেছেন (স্পষ্টতঃ তিনি 'কটক বানারসের' উল্লেখ করেছেন ; সুতরাং, বদাওনির 'বানারসী' ভুল বলে মনে হয়) ; তা ছাড়া তিনি জাজনগরের রায় (অধিপতি) 'আদাবাহু', 'রায় শানিদ' ও 'রায় থাড'-এর উল্লেখ করেছেন। জাজনগরে বহু জাহাজ ও হাতী এবং প্রস্তরনির্মিত উচ্চপ্রাসাদসমূহ ও উদ্যান ছিল বলে উল্লেখ করেছেন (১১৬ পৃঃ)।

১৫. জৌনপুরের কিছুটা নিচে গুম্‌তি নদীর বাম তীরে জাফরাবাদ অবস্থিত। 'মানচিত্রে' 'জাফরাবাদের' অপভ্রংশরূপে 'যাফরাবাদ'

লিখিত আছে। 'আইন-ই-আকবরী'তে জাফরাবাদকে সুবা ইলাহাবাদের (এলাহবাদ) অন্তর্গত জৌনপুর সরকারের অন্তর্ভুক্ত একটি পরগণারূপে উল্লেখ করা হয়েছে (জেরেট কর্তৃক 'আইনে'র অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ১৬৪ পৃঃ)।

১৬. এই সুন্দর মসজিদটি পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত। এই মসজিদের অন্তর্লিখন J.A.S.B., ১৮৭৩, ২৫৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। ৭৭০ হিজরীতে (১৩৬৯ খ্রীঃ) এটা লিখিত হয়েছিল।

১৭. চিহ্নিত হয় নাই। তবে এটা নিশ্চয়ই গোনারগাঁয়ের নিকটবর্তী।

১৮. এই গ্রামটি পাণ্ডুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অতি নিকটে অবস্থিত বলে অধ্যাপক ব্লকম্যান চিহ্নিত করেছেন (J.A.S., ১৮৭৩, ২৫৬ পৃঃ)। কিন্তু ডক্টর ওয়াইজ তাঁর Notes on Sonargaon-এ (J.A.S., ১৮৭৪, ৮৫ পৃঃ) এই স্থানটি ঢাকা জেলার জাফরগঞ্জের সন্নিকটে বলে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন—স্থানটি গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলের প্রায় বিপরীত দিকে। ডক্টর ওয়াইজ বলেন, 'আট বৎসর পূর্বে সিকান্দার শাহের কবর এই অঞ্চলে দেখানো হয়েছিল।'

১৯. তাঁর মুদ্রা সম্পর্কে টমাসের Initial Coinage দ্রষ্টব্য (J.A.S., ১৮৬৭, দ্বিতীয় অংশ)। মুদ্রায় দেখা যায় তাঁর নাম ছিল "আবুল মোজাহিদ সিকান্দার শাহ"। তাঁর কতকগুলো মুদ্রা সোনারগাঁয়ের টাকশালে তৈরী।

২০. শেখ আলাউদ্দীন আলা-উল-হক ৮০০ হিজরীর ১লা রজব অর্থাৎ ২০শে মার্চ, ১৩৯৮সালে ইনতেকাল করেন ও তাঁর মাজার পাণ্ডুয়ায় অবস্থিত। অধ্যাপক ব্লকম্যান এই আউলিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী J.A.S.B., ১৮৭৩, ২৬২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী শেখ নূর-উদ-দীন নূরে কুত্‌ব্‌-উল-আলম ৮৫১ হিজরী (১৪৪৭ খ্রীঃ) ইন্‌তেকাল করেন ও পণ্ডুয়ায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। নূরে কুত্‌ব্‌-উল-আলমের উত্তাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর পুত্রদ্বয়—রফিউদ্দীন ও শেখ আনোয়ার।

২১. মুদ্রায় তাঁর নাম 'গিয়াসউদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর আজম শাহ'

ব'লে উল্লিখিত আছে (টমাসের Initial Coinage of Bengal, J.A.S., ১৮৬৭, ৬৮-৬৯ পৃঃ দ্রঃ)। তাঁর প্রথমদিকের মুদ্রা-সমূহ পূর্ববঙ্গের মোয়াজ্জমাবাদে তৈরী ; পিতা সিকান্দার শাহের জীবিতকালে তাঁর রাজধানী ছিল সোনারগাঁয়ে। পিতার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। তাঁর দরবার বিদ্বজ্জনের আশ্রয়স্থল ছিল। তিনি নিজে সৎ, সুবিচারক, সুশিক্ষিত ও অমায়িক ছিলেন। পারস্যের সুবিখ্যাত কবি হাফিজকে তিনি নিজ দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সোনারগাঁয়ে তাঁর সমাধি অবস্থিত (J.A.S., ১৮৭৪, ৮৫ পৃঃ)।

২২. পারস্য দেশের শিরাজের সুবিখ্যাত কবি হাফিজ ৭৯১ হিজরীতে ইনতেকাল করেন।

২৩. জেরেট কর্তৃক প্রথম দুই ছত্রের অনুবাদ (আইন, ২য় খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ দ্রঃ) ;

"এবং এখন হিন্দুস্তানের তোতাপাখী-সব চিনি নিয়ে মত্ত থাকবে,

এই মধুর ফার্সী কবিতার মধ্যে, যা সুদূর বাংলাদেশে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে।

২৪. মুসলমানী আইন অনুসারে কতকগুলো অপরাধের ক্ষেত্রে আপোষ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বর্তমানের ইংরেজী দণ্ডবিধি অনু-সারেও (যদিও সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে) এই প্রকার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

২৫-২৬. চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় মুসলমান রাজত্বকালে বিশুদ্ধ সুবিচারের বিধি সম্পর্কে এই গল্প থেকে বিশেষরূপে প্রকাশ পায়। একজন সামান্য পিওনের সততা ও কর্তব্যবোধ, বিচারকের নির্ভীকতা ও ন্যায়পরায়ণতা এবং রাজার আইনানুগতার এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

২৭. নাগোরের শেখ হামিদের বাস ছিল যোধপুরের নাগোরে।

২৮. এই রাজার মুদ্রা সম্পর্কে টমাসের Initial Coinage, J. A. S. B., ১৮৬৭, ৬৮-৭০ পৃঃ দ্রঃ।

তাঁর প্রথম আমলের মুদ্রাসমূহ মোয়াজ্জমাবাদের টাকশালে তৈরী হওয়ায় অনুমান করা যায় যে, তিনি প্রথমে পূর্ববঙ্গ জয় করেছিলেন (মোয়াজ্জমাবাদের এলাকা মেঘনা থেকে উত্তর-পূর্ব-ময়মনসিং ও সুরমা নদীর দক্ষিণ তীরব্যাপী বিস্তৃত ছিল বলে চিহ্নিত হয়েছে)। তিনি প্রথমে সোনারগাঁয়ে রাজত্ব করেন। 'রিয়াজে'র মতে তিনি সেখান থেকে তাঁর পিতা (পাণ্ডুয়ার শাসক) সিকান্দার শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন কবি হাফিজকে নিশ্চয়ই সোনারগাঁও দরবারে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন (কারণ, হাফিজ ৭৯১ হিজরীতে ইনতেকাল করেন) এবং সিকান্দার শাহের তৎকালীন মুদ্রা থেকে দেখা যায় যে, তিনি তখনো পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করছিলেন (J. A. S., ১৮৭৩, ২৫৮ পৃঃ দ্রঃ)।

২৯. মুদ্রায় তাঁর নাম আজিম শাহের পুত্র 'সায়েফ-উদ-দীন আবুল মোজাহেদ হামজা শাহ' বলে উল্লেখ আছে (J.A.S., ১৮৭৩, ২৫৯ পৃঃ দ্রঃ)। ফেরেশ্‌তা বলেন, "এই দেশের রাজারা আনুগত্যের জোয়াল থেকে নিজেদের মস্তক মুক্ত করার চেষ্টা করতো না এবং রাজস্ব প্রদানে অবহেলা অথবা বিলম্ব করতো না।" 'তবকত' অনুযায়ী তিনি ১০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর যে সকল মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, এগুলো ফিরোজাবাদে (বা পাণ্ডুয়ায়) তৈরী।

৩০. ফেরেশতা বলেন, যেহেতু সুলতান যুবক ও বুদ্ধিতে দুর্বল ছিলেন, সেইহেতু দরবারস্থ রাজা কংস নামক জনৈক বিধর্মী প্রশাসনিক ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা হস্তগত করেন। 'তবকতে' উল্লিখিত আছে যে, সুলতান তিন বৎসর কয়েক মাসকাল শান্তিতে রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অধ্যাপক ব্লকম্যান এই সুলতান ও সুলতান শাহাবুদ্দীন

আবুল মোজাফ্‌ফর বায়াজিদ শাহকে একই ব্যক্তি বলেছেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান শেষোক্ত সুলতানের মুদ্রা সম্বন্ধে J.A.S., ১৮৭৩, ২৬৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে বায়াজিদ শাহ 'পুতুল রাজা—বেনামি মাল' এবং রাজা কংস বাংলা শাসন করতেন বলে উল্লেখ করেছেন।

অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেন (J. A. S. B., ১৮৮৩, ২৬৩ পৃঃ) ঃ " 'আইন' গ্রন্থে ভাতুড়িয়া নামের উল্লেখ নাই ; রেনেলের 'মানচিত্রে'র (১৭৭৮) পূর্বে কোথাও এই নামের উল্লেখ পাই নাই। রেনেলের 'মানচিত্রে' মালদহের পূর্বদিকে ভাতুড়িয়া নামে একটি বৃহৎ জেলার উল্লেখ আছে। এই জেলার (ভাতুড়িয়ার) পশ্চিমে মহানন্দা ও এর শাখা পূর্ণভবা নদী ; দক্ষিণ সীমানায় গঙ্গার তীর ; পূর্বে করতোয়া নদী ; উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট। সুতরাং, ভাতুড়িয়া জেলা আত্রাই নদীর উভয় তীরে অবস্থিত।" অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে (J.A.S.B., ১৮৭৫, ২৮৭ পৃঃ) ভাতুড়িয়া পুরাতন বরেন্দ্রের একাংশ ; বগুড়ার নিকটবর্তী অঞ্চল, রাজশাহী এবং তাহেরপুরসহ উত্তর-রাজশাহীর সমন্বয়ে গঠিত। অধ্যাপক ব্লকম্যান আরো মনে করেন, 'রাজশাহী' নামের সঙ্গে রাজা কংসের নাম সংস্পৃষ্ট ; কারণ কংস ছিলেন রাজা—শাহ, অর্থাৎ হিন্দু রাজা, যিনি মুসলমান-সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন।

৩১. 'তবকত-ই-আকবরী'তে কেবল কংসের সিংহাসন দখল করার উল্লেখ আছে। ফেরেশ্‌তা বলেন, যদিও কংস মুসলমান ছিলেন না তথাপি তিনি মুসলমানদের বন্ধু (?) ছিলেন। সম্ভবতঃ স্থানীয় কাহিনীর ভিত্তিতে 'রিয়াজ'ই সর্বোত্তম বিবরণ দিয়েছেন। মি. ওয়েস্টমেকট ভুলবশতঃ ভাতুড়িয়ার 'রাজা কংস' ও দিনাজপুরের 'রাজা গণেশ'কে একই ব্যক্তি মনে করেছেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান (আমার মনে হয় সঠিকভাবেই) তাহেরপুরের 'রাজা কংস নারায়ণকে' 'রাজা কংস' গণ্য করেছেন ; তাহেরপুর ভাতুড়িয়ার মধ্যে অবস্থিত (J.A.S.B., ১৮৭৫, ২৮৭ পৃঃ দ্রঃ)।

রাজা কংস নিজ নামে কোনো মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে আজম শাহের মৃত্যুর পরবর্তী-কালীন মুদ্রা (মাননীয় স্যার ই. সি. বেইলি, J.A.S., ১৮৭৪, ২৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন) এবং পুতুল ও বেনামি রাজা শাহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহের নামে মুদ্রা প্রচলিত হয়েছে (অধ্যাপক ব্লকম্যান, J.A.S.B., ১৮৭৩ সাল, ২৬৩ পৃঃ)।

তৎকালীন প্রচলিত মুদ্রা থেকে দেখা যায়, রাজা কংস ৮১০ হিজরী (১৪০৭ খ্রীঃ) থেকে ৮১৭ হিজরী (১৪১৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন; কিন্তু তিনি এর পূর্বেই ৮০৮ হিজরীতে ক্ষমতা হস্তগত করেছিলেন।

৩২. জৌনপুরের সুলতান শামসুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ শর্কী ৮০৪-৮৪৫ হিজরী (১৪০১-১৪৪১ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। দিল্লী সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার সুযোগে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের পুত্র সুলতান মুহম্মদ, তৎপুত্র সুলতান আলাউদ্দীন সিকান্দার শাহ, তৎপুত্র সুলতান মাহমুদ কর্তৃক ৭৯৫ হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কনৌজ থেকে বিহার পর্যন্ত শর্কী-রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মাহমুদই প্রথমে 'খাজা-জাহান' উপাধিধারী খোজা মালিক সরওয়ারকে 'সুলতান-উস-শর্কী' উপাধি দেন। নিম্নোক্ত তালিকা উল্লেখযোগ্য হবে:

	হিজরী	খ্রীস্টাব্দ
খাজা জাহান	৮০০	১৩৯৭
মুবারক শাহ	৮০৩	১৪০০
শামসুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ	৮০৪	১৪০১
মাহমুদ শাহ	৮৪৫	১৪৪১
মুহম্মদ শাহ	৮৫৬	১৪৫১
হোসেন	৮৫৬	১৪৫১

শেষোক্ত ব্যক্তি ৯০০ হিজরীতে (১৪৯৭ খ্রীঃ) বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথে বাবর কর্তৃক বহ্‌লুল লোদির পৌত্র ইব্রাহিমের পরাজয় ও নিহত হওয়া পর্যন্ত জৌনপুর লোদিবংশ কর্তৃক শাসিত হয়েছিল। বিহারের গবর্নর বাহাদুর খান স্বল্প-কালের জন্য একটি স্থানীয় রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু হুমায়ুন তা পুনরুদ্ধার করেন। পরে শের শাহ ও তাঁর পুত্র সেলিম শাহের অধীনস্থ হয়। আকবরের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে তিনি আলী কুলী খানের দ্বারা জৌনপুর জয় করেন। সে পর্যন্ত জৌনপুর আফগানদের অধীনস্থ ছিল। ১৫৭৫ সালে ভাইস্‌রয়ের রাজধানী এলাহাবাদে স্থানান্তরিত হয় এবং তৎপর জৌনপুর জনৈক নাজিম কর্তৃক শাসিত হয় (জেরেটের অনুবাদ, 'আইন', ২য় খণ্ড, ১৬৯-১৭০ পৃঃ এবং 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ২৬৪, ২৭২, ২৭৩, ৩০৭, ৩১৬ পৃঃ, ফার্সী সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

৩৩. "কাজী শাহাবুদ্দীন হিন্দুস্তানের অন্যতম পরম বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইব্রাহিম শাহের আমলে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে হাদিস ও ফেকাহ্ সম্বন্ধে বুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তৈমুরের আগমনের সময় তিনি তাঁর ওস্তাদ মওলানা খওয়াজিগির সঙ্গে জৌনপুর চলে যান। মওলানা দিল্লীর নাসিরুদ্দীন চেরাগের উত্তরাধিকারী ছিলেন। শাহাবুদ্দীন তৎপর আরো উন্নতির পথে অগ্রসর হন এবং তৎকালে সকলের ঈর্ষার পাত্র হয়েছিলেন" (আইন-ই-আকবরী—জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ১৬৯-১৭০ পৃঃ)।

৩৪. অর্থাৎ, পাণ্ডুয়া।

৩৫. মুদ্রায় তাঁর নাম এইরূপঃ জালালুদ্দীন আবুল মুজফ্‌ফর মুহম্মদ শাহ (J.A.S.B., ১৮৭৩, ২৬৭ পৃঃ)। তিনি সম্ভবতঃ ৮১৭ থেকে ৮৩৪ হিজরী (১৪১৩ ১৪৩০ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর কিছুসংখ্যক মুদ্রা সোনারগাঁয়ের টাকশালে তৈরী হয়েছিল। তিনি পাণ্ডুয়ায় থাকতেন; কিন্তু ৮২২ হিজরীতে গৌড়ে এক প্রাসাদ তৈরী ক'রে সেখানে বাস করতে থাকেন। তাঁর

আমলে পাণ্ডুয়া অত্যন্ত জনবহুল হয়েছিল।

৩৬. ৮২২ হিজরীর স্থলে ভুলক্রমে এই তারিখ দেয়া হয়েছে।

৩৭. মুদ্রায় তাঁর নাম 'শামস্‌-উদ-দীন আবুল মুজাহেদ আহমদ শাহ'। তিনি ৮৩৪ থেকে ৮৫০ হিজরী (১৪৩০-১৪৪৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

'তবকতে' বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ১৬ বৎসর রাজত্ব করেন ও ৮৩০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। স্টুয়ার্ট বলেন, তিনি ১৮ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। ফেরেশ্‌তা বলেন, তিনি সৎ ও উদার ছিলেন। 'রিয়াজে' বলা হয়েছে, তিনি অত্যাচারী ছিলেন। আহমদ শাহের মৃত্যুর সঙ্গে রাজা কংসের বংশ শেষ হয় এবং ইলিয়াস শাহী বংশ আরম্ভ হয় (J.A.S.B., ১৮৭৩, ২৬৮ পৃঃ)।

৩৮. মুদ্রায় দেখা যায় তাঁর নাম ছিল নাসিরুদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর মাহমুদ শাহ। তাঁর দ্বারা বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের সূত্রপাত হয়। তিনি শান্তিতে ৩২ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন (জৌনপুর ও দিল্লীর মধ্যে যুদ্ধের জন্যই সম্ভবতঃ তিনি শান্তিতে রাজত্ব করে-ছিলেন)। অন্য বিবরণীতে দেখা যায়, তিনি '২৭ বৎসরের অনধিক কাল' রাজত্ব করেন ও ৮৬২ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিহাসে তাঁকে কেবল 'নাসির শাহ' নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মুদ্রা ও অন্তলিখন থেকে তাঁর রাজত্বের যে তারিখ পাওয়া যায় তা হচ্ছে ৮৪৬, ৮৬১, ৮৬৩ (হিঃ)। মাহমুদ শাহের পরবর্তী শাসক বরবক শাহের রাজত্বের সর্বপ্রথম যে তারিখ পাওয়া যায় তা হচ্ছে ৮৬৫ (হিঃ)। সুতরাং মাহমুদ শাহ নিশ্চয়ই ৮৬৪ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। যদি তিনি ২৭ বৎসর রাজত্ব ক'রে থাকেন, তা'হলে ৮৩৬ হিজরীতে তাঁর রাজত্ব আরম্ভ হয়েছিল। এই বৎসরেই মার্সডেনের আহমদ শাহের মুদ্রা তৈরী হয়েছিল। তাতে দেখা যায়, মাহমুদ শাহ চৌদ্দ বৎসরকাল আহমদ শাহের বিরোধী হয়ে রাজত্ব করেছিলেন। এটা সন্দেহজনক। এই সুলতানের সাতগাঁও, ঢাকা ও গৌড় থেকে প্রাপ্ত অন্তলিখন

প্রকাশিত হয়েছে (J.A.S., ১৮৭৩ ; ২৬৯, ২৭১ পৃঃ এবং ১৮৭২-এর ১০৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৩৯. মুদ্রা থেকে তাঁর সম্পূর্ণ নাম পাওয়া যায় না ; কিন্তু শিলালিপি থেকে পাওয়া যায় (J.A.S.B., ১৮৭৩, ২৭২ পৃঃ)। তাতে দেখা যায়, তাঁর নাম ছিল রুকন-উদ-দীন আবুল মুজাহিদ বরবক শাহ। তাঁর রাজত্ব আরম্ভ হয় ৮৬৪ হিজরীতে। ত্রিবেনীতে প্রাপ্ত শিলালিপিতে (অধ্যাপক ব্লকম্যান ১৮৭০ সালের J.A.S.B., ২৭২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছিলেন) দেখা যায়, তৎপূর্বে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার গবর্নর ছিলেন। দিনাজপুরে প্রাপ্ত শিলা-লিপি (মিঃ ওয়েস্টমেকট ১৮৭৩ সালের J.A.S., ২৭২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেছেন) দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বরবক শাহ ৮৬৫ হিজরীতে' (১৪৬০ খ্রীঃ) নিঃসন্দেহে বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন।

৪০. শিলালিপিদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় (J.A-S.B.. ১৮৭৩ ; ২৭৫ পৃঃ) তাঁর নাম ছিল শামসুদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর ইউসুফ শাহ। ৮৭৯ থেকে ৮৮৬ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হয় বলে মনে হয়। পাণ্ডুয়া, হজরত পাণ্ডুয়া ও গৌড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে তাঁর রাজত্বের নিম্নোক্ত তারিখগুলো পাওয়া যায়ঃ ৮৮২, ৮৮৪, ৮৮৫ হিজরী (অর্থাৎ, ১৪৭৭, ১৪৭৯, ১৪৮০ খ্রীঃ)।

ফেরেশতা বলেন, এই সুলতান বিদ্বান ছিলেন এবং আলেমদের নির্দেশ দেন, যেন পয়গম্বরের বিধান প্রতিপালিত হয়। কেউ মদ্যপান করতে সাহস করতো না (ব্লকম্যানের Contributions, J. A.S., ১৮৭৩ ; ২৭৫ পৃঃ)।

৪১. স্টুয়ার্ট তাকে 'রাজবংশীয় যুবক' বলেছেন। অন্যান্য ইতি-হাসে তাঁর আত্মীয় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ নাই। 'আইন-ই-আক-বরী'তে বলা হয়েছে, তিনি অর্ধেক দিন মাত্র রাজত্ব করেছিলেন ; 'তবকতে' আড়াই দিন ; 'ফেরেশতা' কাল নির্দিষ্ট করেন নাই। স্টুয়ার্ট বলেছেন দু'মাস (J.A.S., ১৮৭৩, ২৮১ পৃঃ)।

৪২. মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে দেখা যায়, তাঁর নাম ছিল জালাল-লুদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর ফতেহ শাহ (J.A.S., ১৮৭৩; ২৮১ পৃঃ)। ইতিহাসসমূহে দেখা যায়, তিনি ৮৮৭ থেকে ৮৯৬ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। শিলালিপি ও মুদ্রা থেকে দেখা যায়, তিনি ৮৮৬ হিজরীতে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর কতকগুলো মুদ্রা ফতেহাবাদে (ফরীদপুর শহর) ৮৮৬ ও ৮৯৬ হিজরীতে তৈরী হয়েছিল। এগুলো ও তৎসহ ঢাকার নিকটস্থ বন্দরের বাবা সালেহের মসজিদে ('তারিখ', ৮৮৬ হিঃ বা ১৪৮৪ খ্রীঃ), ঢাকা জেলার বিক্রমপুরস্থ আদম শহিদের মসজিদে ('তারিখ', ৮৮৮ হিঃ বা ১৪৮৩ খ্রীঃ), সোনারগাঁয়ের মুক্কা-বাবুদ-দোলা-দীনের মসজিদে ('তারিখ', ৮৮৯ বা ১৪৮৪ খ্রীঃ) প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে তাঁর রাজত্বকাল নির্ণীত হয় (এগুলো J. A. S. B., ১৮৭৩; ২৮২-২৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে)। ফতেহাবাদ (ফরিদপুর শহর) তাঁরই নামানুসারে নামকরণ হয়েছে।

৪৩. এই ঘটনা থেকে তৎকালীন মুসলমান মহিলাদের বিপুল প্রভাব এবং তাঁদের প্রতি মুসলমানদের শ্রদ্ধার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

৪৪. বরবক শাহ কর্তৃক বাংলায় আনীত যাযাবর আবিসনীয়রা রাজ্যের শাসকদের বংশ-রক্ষক থেকে রাজ্যের প্রভু হয়ে ওঠে এবং খোজারা দেশের প্রকৃত শাসক হয়ে যায়। ...বাংলার তৎকালীন শাসকদের (বা রাজবংশ) সম্বন্ধে আবুল ফজল বলেছেন যে, 'ফতেহ শাহের হত্যার পর নীচ ভাড়াটিয়া লোকেরা প্রভাব-সম্পন্ন হয়', এবং ফেরেশ্‌তা ব্যঙ্গভরে উল্লেখ করেছেন যে, 'যে ব্যক্তি রাজাকে হত্যা ক'রে সিংহাসন দখল করতে পেরেছে, লোকে তারই বশ্যতা স্বীকার করেছে' (J.A.S., ১৮৭৩; ২৮৬ পৃঃ)।

সুলতান শাহাজাদা থেকে হাবসী বা আবিসিনীয় সুলতানদের রাজত্ব আরম্ভ হয়। বাংলায় হোসেনি বংশের উদ্ভবের ফলে উক্ত বংশের রাজত্ব শেষ হয়।

৪৫. মুদ্রা থেকে দেখা যায় (J.A.S.B., ১৮৭৩, ২৮৮ পৃঃ) তাঁর নাম ছিল সয়েফ-উদ-দীন আবুল মুজাফ্ফর ফিরোজ শাহ। তিনি হাবসী বা আবিসিনীয় ছিলেন এবং মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি ৮৯৩ থেকে ৮৯৫ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ইতিহাসে তাঁর মৃত্যুকাল ৮৯৯ হিজরী বলা হয়েছে। 'রিয়াজে'র মতে তিনি ফতেহ শাহের অধীনে প্রধান আমীর ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিজ্ঞ শাসক ছিলেন।

৪৬. সুলতান ইলিয়াস শাহের আমলের (১৩৫৩খ্রীঃ) বাংলার পাইকদের (পদাতিক বাহিনীর) বীরত্ব সম্বন্ধে ব্যঙ্গপূর্ণ বর্ণনার জন্য জিয়া বার্নির 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', ফার্সী সংস্করণ, ৭ম পর্ব, ৫৯৩ পৃঃ দ্রঃ। উক্ত বিবরণীর অনুবাদ দেয়া হ'ল ঃ "বাংলার সুপরিচিত পাইকেরা বহু বৎসর যাবত নিজেদের 'আবু বাঙাল' ব'লে গর্ব করতো এবং নিজেদের যুদ্ধবাজ বলতো এবং ভাং-সেবক ইলিয়াস শাহের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ব'লে ঘোষণা করতো এবং কাল্চে রঙের বাঙালী রাজাদের সাথে উন্মাদ নৃপতির দরবারে উপস্থিত হোত ;—এরাই প্রকৃত যুদ্ধের সময় ভয়ে মুখে আঙ্গুল দিতো, স র্ক থাকতো না, তরবারি ও তীর ফেলে দিয়ে মাটিতে কপাল ঘষ্তো ; এদের সকলেই নিহত হোত (বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলকের সৈন্যদের দ্বারা)।"

৪৭. মুদ্রা ইত্যাদিতে দেখা যায়, তাঁর নাম ছিল নাসিরউদদীন আবুল মুজাহিদ মাহমুদ শাহ (J.A.S., ১৮৭৩, ২৮৯ পৃঃ দ্রঃ)। ঐতিহাসিকেরা তাঁকে সাধারণতঃ ফিরোজ শাহের পুত্র বলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে উল্লিখিত হাজী মুহম্মদ কান্দাহারির বিবরণীতে তিনি বলেছেন. মাহমূদ শাহ ছিলেন ফতেহ শাহের পুত্র এবং এই বিবরণী অধিকতর নির্ভরযোগ্য ব'লে মনে হয়। মাহমূদ শাহ ৮৯৬ হিজরীতে রাজত্ব করেছিলেন।

৪৮. স্পষ্টতঃ দেখা যায়, নকলনবিশ এই বইতে 'হাবাশ খানে'র পরিবর্তে ভুলক্রমে 'জশন খান' লিখেছেন। হাবাশ খান আগে বারবক

শাহের খোজা-গোলাম ছিল। হাজী মুহম্মদ কান্দাহারির বিবরণী থেকে জানা যায়, মাহমুদ শাহের বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাঁর পিতা ফতেহ্ শাহের মৃত্যু হয় ও ফতেহ্ শাহের বেগমের অনুমোদন অনুযায়ী মালিক আন্দিল ফিরোজ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফিরোজ শাহ মাহমুদ শাহকে মানুষ করার ভার দিয়েছিলেন উক্ত হাবাশ খানের উপর।

৪৯. পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে সুলতানের পক্ষ একদিকে এবং আমীরগণের নেতৃত্বে জনসাধারণ অন্যদিকে যে লোকক্ষয়ী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল, সেই ঘটনা ইংলণ্ডের রাজা জন ও তাঁর সামন্তদের মধ্যের সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ থেকে আরো প্রমাণিত হয় যে, বাংলার জনসাধারণ "মূক-পশু" ছিল না। পর', রাজশী নিয়ন্ত্রিত করার মতো পর্যাপ্ত রাজনৈতিক চেতনা, শক্তি ও সংগঠনের ক্ষমতা তাদের ছিল। শরায়া বা মুসলমানী আইনের সীমা অতিক্রম করলেই তারা রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াতো। প্রকৃতপক্ষে, যেখানেই মুসলমানী রাজশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (অবশ্য কয়েক ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ব্যতীত), সেখানেই তা সপ্তম শতাব্দী অর্থাৎ আরবে প্রথম খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সম্পূর্ণরূপে সংবিধানিক সীমার মধ্যে তা কাজ করেছে (স্যার উইলিয়াম ম্যুরের Annals of the Early Caliphate দ্রঃ)।

৫০. শিলালিপি ও মুদ্রায় (১৮৭৩ সালের J.A.S.B-তে ২৮৯-২৯০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত) দেখা যায়, তাঁর নাম ছিল শামস-উদ-দীন আবু-নসর মুজাফফর শাহ। তা থেকে আরো দেখা যায়, তিনি ৮৯৬ থেকে ৮৯৯ হিজরী (১৪৯১-১৪৯৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ইতিহাসে দেখা যায় তিনি তিন বৎসর পাঁচ মাস রাজত্ব করেছিলেন। তিনি আবিসিনীয় ছিলেন ও তাঁর পূর্ব-নাম ছিল সিদি বদর।

৫১. নিজামউদ্দীন আহমদ, বাদশাহ আকবরের অধীনে বখ্‌শি এবং ঐতিহাসিক বদাওনির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'তবকত ই-আকবরী',

নামক ইতিহাস নিজামউদ্দীন ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দে শেষ করেছিলেন। তিনিই তাঁর উক্ত গ্রন্থে ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার স্বাধীন মুসলমান সুলতানদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী সর্বপ্রথম লিখেছিলেন।

৫২. মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে দেখা যায় (১৮৭৩ সালের J. A. S. B., ২৯২-২৯৩ পৃঃ) তাঁর নাম ছিল সৈয়দ আশরাফ-আল-হোসেইনীর পুত্র আলাউদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর হোসেন শাহ। গ্রন্থে যে 'শরীফ মক্কি' নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কোনো মুদ্রা বা শিলালিপিতে তা নেই। 'তককত-ই-আকবরী'তে তাঁকে কেবল আলাউদ্দীন নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ফেরেশতা ভুলক্রমে তাঁকে 'সৈয়দ শরীফ মক্কি' নামে উল্লেখ করেছেন। স্টুয়ার্টও ভুলক্রমে তাঁকে 'শরীফ মক্কা' বলেছেন। ৮৯৯ থেকে ৯২৭ হিজরী পর্যন্ত (মুদ্রা ও শিলালিপি অনুযায়ী) তিনি রাজত্ব করেছিলেন। 'রিয়াজে' (এই গ্রন্থে) বলা হয়েছে, আলাউদ্দীন ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় এসে রাঢ় জেলায় (পশ্চিমবঙ্গে) চাঁদপুর নামক একস্থানে বাস করতে থাকেন। কিন্তু, অধ্যাপক ব্লকম্যান এই চাঁদপুর খুলনার পূর্বদিকে যশোর জেলায় ভৈরব নদীর তীরে 'আলাইপুর' বা আলাউদ্দীনের শহরের নিকটে অবস্থিত ছিল বলে মনে করেছেন এবং এইখানেই বাংলার স্বাধীন হোসেনী বংশীয় সুলতানগণ বাস করতেন। কারণ, হোসেন শাহ প্রথমে ফরিদপুরসংলগ্ন বা ফতেহাবাদ জেলায় (পরবর্তীকালে যে জেলার মধ্যে যশোর বা যশোরের অংশবিশেষ অন্তর্ভূত হয়েছিল) ক্ষমতা লাভ করেছিলেন ও ৮০৯ হিজরীতে সেখানেই তাঁর মুদ্রা প্রথম তৈরী হয়েছিল (Marsden's pl. XXXVIII, No. DCCLXXIX) এবং হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ পিতার জীবিতকালে ৯২২ হিজরীতে খেলাফতাবাদে (বা পূর্বে যশোর জেলার অন্তর্ভূত বাগেরহাটে) একটি টাকশাল তৈরী ক'রে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন (J.A.S.B., ১৮৭৩, ২৯৭ পৃঃ

এবং pl. IX, No. 10 দ্রঃ)। অধ্যাপক ব্লকম্যানের উক্ত মত সমর্থনের অন্য একটি কারণ হচ্ছে এই যে, যশোর (যশর) জেলার (পাবনা, খুলনা ও ফরিদপুর জেলাত্রয়ে বিভক্ত হওয়ার পূর্বে যশোর জেলা যে ভাবে গঠিত ছিল) কয়েকটি পরগণার নামের সঙ্গে হোসেন শাহ, তাঁর ভ্রাতা ইউসুফ শাহ এবং পুত্রদ্বয় নসরত শাহ ও মাহমুদ শাহের নামের সংস্রব দেখা যায়—যথা, পরগণা নসরতশাহী, মাহমুদশাহী, ইউসুফশাহী ও মাহ্মূদাবাদ (এটি একটি সম্পূর্ণ 'সরকার', যার মধ্যে উত্তর-যশোর বা যশর ও বোস্না অন্তর্ভূ'ত ছিল)। আলাউদ্দীন হোসেন শাহ সম্বন্ধে অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেন যে, 'বাংলার কোনো রাজার রাজত্বকালের—সম্ভবতঃ দশম সতাব্দীর পূর্ববর্তী উত্তর-ভারতের কোনো রাজার রাজত্বকালের—এত অধিক সংখ্যক শিলালিপি পাওয়া যায় না। বাংলার অন্য রাজাদের (বা সুলতানদের) নাম কদাচিৎ লোককাহিনীতে পাওয়া যায়; এমন কি দেশের ভৌগলিক নামসমূহের মধ্যে কদাচিৎ তাদের চিহ্ন পাওয়া যায়; কিন্তু, 'মহৎ হোসেন শাহে'র নাম আজও উড়িষ্যার সীমান্ত থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে আছে। এই মহান সুলতান উড়িশ্যা, আসাম, ও চিটাগাং পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেছিলেন; সমগ্র উত্তর-বিহারের উপর রাজত্ব করেছেন; সরকার মুঙ্গেরের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত দক্ষিণ-বিহারের উপর তাঁর আধিপত্য ছিল এবং এখানে তাঁর পুত্র দানিয়েল পীর নাফার মাজারে একটি সমাধিকক্ষ তৈরী ক'রে দিয়েছিলেন (তরকতই-আকবরী, ও বদাওনী, প্রথম খণ্ড, ৩৭১ পৃঃ দ্রঃ)। এই সুলতান অন্যান্য অট্টালিকা ছাড়াও ৯০৭ হিজরীতে ঢাকায় ফরিদপুরের বিপরীত দিকে মাচাইনে একটি জুমা মসজিদ তৈরী করেছিলেন। এই মসজিদের শিলালিপির লেখন ১৮৭৩ সালের J.A.S., ২৯৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। হোসেনশাহী বংশে চারজন সুলতান ছিলেন: (১) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, রাজত্ব-

কাল ৮৯৯-৯২৯ হিজরী; (২) আলাউদ্দীনের পুত্র নাসিরুদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর নসরত শাহ (৯২৯-৯৩৯ হিঃ); (৩) তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ (৯৩৯); (৪) গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ (৯৪০-৯৪৫ হিঃ)। ইনিই বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান। জালাল খান ও খাওয়াস খানের অধীনস্থ শের শাহের সৈন্যবাহিনী ৯৪৪ হিজরী বা ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ে তাঁকে পরাজিত করে। হোসেনী বংশের চারজন সুলতান চুয়াল্লিশ বৎসরকাল বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন (J. A. S. B., ১৮৭২, ৩৩২ পৃঃ)। 'তবকত-ই-আকবরী'তে হোসেনী বংশের দ্বিতীয় সুলতান নসরত শাহের রাজত্বকাল পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, হোসেনী বংশের চতুর্থ সুলতান হচ্ছেন পর্তুগীজদের El Ray Mamud de Bengala; এবং এরা তৎকালীন রাজধানী গৌড়ের বিবরণীতে বলেছে—"দৈর্ঘ্যে তিন লিগ (এক লিগ=প্রায় ৩½ মাইল); সুরক্ষিত; প্রশস্ত সোজা রাস্তাসমূহ; রাস্তার দু'পাশে লোককে ছায়া দেয়ার জন্য গাছের সারি।" এই মাহমুদ শাহ ৯৪৫ হিজরীতে কেলেগং-এ (কাহলগাঁওয়ে) মৃত্যুমুখে পতিত হন ও সেখানেই তিনি সমাধিস্থ আছেন।

৫৩. 'তবকত-ই-আকবরী' ও 'বদাওনি' (১ম খণ্ড, ৩১৭ পৃঃ) তাঁকে কেবল আলাউদ্দীন নামে উল্লেখ করেন (স্পষ্টতঃ এটা 'জলুস' নাম); ফেরেশ্‌তা ভুলক্রমে তাঁকে 'সৈয়দ শরিফ মক্কি' বলেছেন; স্টুয়ার্টও ভুলক্রমে বলেছেন 'শিরেফ মক্কা'। স্টুয়ার্টের ভ্রান্তির কারণ এই যে, 'রিয়াজে'র গ্রন্থকার মনে করেন, হোসেনের পিতা বা তাঁর কোনো পূর্বপুরুষ হয়তো মক্কা শরীফ ছিলেন। 'আলমগীর নামা'য় (৭৩০ পৃঃ) তাঁকে হোসেন শাহ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৪. গৌড়ের কদম-রসুল অট্টালিকায় প্রাপ্ত ৯৩৭ হিজরীর শিলালিপি ১৮৭২ সালের J.A.S.B., ৩৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে। তাতে নসরত শাহকে সৈয়দ আশরাফুল হুসেইনির পুত্র হোসেন শাহের

পুত্ররূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

৫৫. তুর্কীস্থানের একটি শহর।

৫৬. অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল। এই প্রসঙ্গে ৫২ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক ব্লকম্যানের মতে যশোর জেলার ভৈরব নদীর তীরস্থ আলাইপুরের সন্নিকটে চাঁদপুর অবস্থিত।

৫৭. এখানে শাহজাদা দানিয়েলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (ভুলক্রমে যাকে দুলাল গাজী বলা হয়)। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে এই আসাম অভিযান হয়েছিল (J.A.S., ১৮৭২, ৩৩৫ পৃঃ দ্রঃ)। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দ বা ৯০৩-৪ হিজরীতে উক্ত আসাম অক্রমণের বিবরণ 'আলমগীর নামা' (৭৩০-৭৩১ পৃঃ) ও 'আসাম বুরাঞ্জিতে' (J. A.S., ১৮৭৪, ২৮১ পৃঃ) দেয়া হয়েছে। হোসেন শাহের কামরূপ ও কামতা (পশ্চিম আসাম) বিজয়ের বিবরণীও হোসেন শাহ কর্তৃক গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত এক মাদ্রাসার শিলালিপিতে (৯০৭ হিঃ, ১৫০১ খ্রীঃ) বিবৃত হয়েছে। ১৮৭৪ সালের J.A.S., ৩০৩ পৃষ্ঠায় এই শিলালিপির অনুলিখন প্রকাশিত হয়েছে। হোসেন শাহের পুত্র শাহজাদা দানিয়েল পিতার অধীনে পশ্চিম-আসাম বা কামরূপের প্রথম গবর্নর ছিলেন। এই শাহজাদাই ৯০৩ হিজরীতে পিতার পক্ষে বিহারে সুলতান সিকান্দার লোদির নিকট দৌত্যকার্য সমাপনান্তে ফিরবার সময় ও আসাম অভিযানে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে মুঙ্গেরে পীর নাফার মাজারে সমাধিস্তম্ভ তৈরী করিয়েছিলেন (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩১৭ পৃঃ)। মুসুন্দর গাজী আসামের গবর্নররূপে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং এরপর সুলতান গিয়াসউদ্দীন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আসামে এক মুসলমান উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

৫৮. স্টুয়ার্ট লিখেছেন, 'বেতিয়া' (Bateah) ও বলেছেন, এটা একটা নদীর নাম। এই নদীর অন্য নাম 'গণ্ডক'। স্টুয়ার্টের মত

কতটা সত্য আমি জানি না।

৫৯. J.A.S.B., ১৮৭৪, ৩০৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ৯০৭ হিজরীর সমকালীন এক শিলালিপির অন্তর্লিখন থেকে দেখা যায়, তিনি শিক্ষা প্রসারের জন্য অনেক মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। এই অন্তর্লিখন পয়গম্বরের বাণী—"জ্ঞানের সন্ধানে চীন পর্যন্ত যাও"—দিয়ে শুরু হয়েছে।

৬০. পূর্বোল্লিখিত টীকা দ্রষ্টব্য।

৬১. 'বদাওনি,' ১ম খণ্ড, ৩১৬ পৃঃ দ্রঃ।

৬২. মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে দেখা যায়, তাঁর নাম ছিল নাসিরউদ্দীন আবুল মুজাফ্ফর নসরত শাহ (J.A.S.B., ১৮৭৩, ২৯৬-২৯৭ পৃঃ দ্রঃ)। ঐতিহাসিকগণ তাঁকে নাসিব শাহ নামে উল্লেখ করেছেন (বদাউনি' ৩৪৮ পৃঃ)। সম্ভবতঃ শাহজাদা থাকাকালে তাঁর নাম ছিল নাসিব শাহ। মনে হয় তিনি চিটাগাং অঞ্চল পুনরায় জয় করেছিলেন (তারিখ-ই-হামিদি এবং J.A.S., ১৮৭২, ৩৩৬ পৃঃ দ্রঃ) এবং উত্তর-বিহারের তিরহুত ও হাজিপুর অঞ্চল বশীভূত করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আজিমগড়ও অস্থায়ীভাবে তাঁর অধিকারে ছিল (১৮৭৩ সালের J.A.S., ২৯৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সিকন্দরপুর আজিমগড় শিলালিপি দ্রষ্টব্য)। এই শিলালিপিতে উল্লিখিত 'খারিদ' ঘাগর নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

নসরত শাহ ৯২৯ থেকে ৯৩৯ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন (J.A.S., ১৮৭২ খ্রীঃ ; ৩৩২ পৃঃ)।

৬৩. হাজী ইলিয়াসের আমল থেকে হাজীপুরে দীর্ঘকাল বিহারস্থ বাংলা সরকারের গবর্নরদের সদর দফতর ছিল। বাংলার সুলতান হাজী ইলিয়াস ওরফে শামসুদ্দীন ইলিয়াস এই শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বাদশাহ আকবরের আমলে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সদর দফতর পাটনায় স্থানান্তরিত হওয়ার

এই শহরের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল।

৬৪. বহলুল লোদির পৌত্র ও সিকান্দার লোদির পুত্র ইব্রাহিম লোদি ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে বা ৯৩২ হিজরীতে পানিপথের যুদ্ধে বাবর কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এই যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণীর জন্য 'বদাওনি' দ্রষ্টব্য (ফার্সী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ৩৩৪-৩৩৬ পৃঃ)। এই যুদ্ধের ফলে ভারতের রাজত্ব আফগানদের হাত থেকে মুঘলদের হাতে চলে যায়। অদ্ভুত কথা এই যে, ইব্রাহিমের আফগান কর্মচারীগণ ও আমীরগণ বাবরের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ও তাঁকে ভারতে আহ্বান করেছিলেন (বদাওনি, ফার্সী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ৩৩১ পৃঃ)। সুলতান ইব্রাহিম তাঁর ভ্রাতৃগণ, কর্মচারীগণ ও আমীরদের অবিশ্বাস ও অপমান করতেন ও তাদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করতেন। এই জন্যই নিঃসন্দেহে তাঁকে উক্ত মূল্য দিতে হয়েছিল।

৬৫. সুলতান মাহমূদ ছিলেন সুলতান সিকান্দার লোদীর এক পুত্র। হাসান খান মেওয়াতি ও রানা শংক তাঁকে রাজা (বা সুলতান)-রূপে খাড়া করেন এবং তাঁকে বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রবৃদ্ধ করেন; কিন্তু বাবর তাঁকে পরাজিত করেন। পরাজিত হওয়ার পর তিনি চিতোরে বাস করতেন। আফগানরা তাঁকে বিহারে আনে ও সুলতান ঘোষণা করে। শের খান তাঁর সঙ্গে যোগ দেন; কিন্তু পরে তাঁকে ত্যাগ ক'রে মুঘলদের সঙ্গে যোগ দেন এবং মুঘলেরা মাহমূদকে পরাজিত করে। পাটনা থেকে তিনি উড়িষ্যায় পলায়ন করেন ও ৯৪৯ হিজরীতে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৬১ ও ৩৩৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৬৬. সরকার বাহ্‌রাইচ সুবা আউধের অন্তর্গত। 'আইন-ই-আকবরী'তে এর উল্লেখ আছে (জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ৯৩ পৃঃ)। বাংলার মুসলমান সুলতানগণ পশ্চিম দিকে এর বেশী দূর হামলা চালাতে পারেন নাই (অবশ্য শের শাহ ব্যতীত—তিনি বাংলার সুলতান থেকে ভারতের বাদশাহ হয়েছিলেন)।

৬৭. 'আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ দ্রঃ। 'বদাওনি'র বিবরণী (১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃঃ) থেকে দেখা যায়, বাবরের জীবিত-কালে হুমায়ুন জৌনপুর জয় করেছিলেন। 'বদাওনি'তে (১ম খণ্ড, ৩৪৪ পৃঃ) মুহম্মদ জামান মীর্জা।

৬৮. তিনি গুজরাটে ১৫২৬ থেকে ১৫৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে-ছিলেন (আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, ২৬১ পৃঃ এবং 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ৩৪৪-৩৪৭ পৃঃ)।

তিনি নির্বোধের মতো হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে পরা-জিত হন (আইন, ২য় খণ্ড, ২৬৬ পৃঃ, ও বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৪৬ পৃঃ)।

৬৯. ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন গৌড় দেখতে যাই, তখন এই অট্টালিকা মোটামুটি ভাল অবস্থায় ছিল। এটি দুর্গের মধ্যে একটি এক-গম্বুজ-বিশিষ্ট চতুষ্কোণ অট্টালিকা। পূর্ব-পশ্চিমে এর দৈর্ঘ্য ২৪ হাত; উত্তর-দক্ষিণেও সমান প্রস্থ। প্রায় ত্রিশ রশি পশ্চিম দিকে ভাগি-রথী প্রবাহিত। নসরত শাহ ৯৩৭ হিজরীতে (১৫৩০ খ্রীঃ) এই অট্টালিকা তৈরী করিয়েছিলেন। মসজিদের মধ্যে গম্বুজের নিচে একখণ্ড প্রস্তরের উপর আরবীয় পয়গম্বরেব পদচিহ্ন রয়েছে। কথিত হয়, আউলিয়া জালালুদ্দীন তাব্রিজী আরব থেকে এটা এনে-ছিলেন এবং পূর্বে পাণ্ডুয়ায় তাঁর চিল্লাখানায় ছিল।

শিলালিপির প্রতিলিপি J.A.S.B., ১৮৭২, ৩৩৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

৭০. শিলালিপির উপর তারিখ আছে ৯৩৭ হিজরী (J.A.S.B., ১৮৭২, ৩৩৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৭১. রেভেন্স ও ক্রেটনের Ruins of Gaur দ্রষ্টব্য।

৭২. তিনি গৌড়ের একজন আউলিয়া ছিলেন। বাল্যকালে তিনি দিল্লীর নিজামউদ্দীন আউলিয়ার নিকট আসেন ও উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর তাঁকে বাংলায় পাঠানো হয় এবং ৭৫৮ হিজ-রীতে (১৩৫৭ খ্রীঃ) তাঁর মৃত্যু হয়। নিজামউদ্দীনের মৃত্যুর

পর ('হফ্‌তে ইকলিম' অনুসারে) তিনি লখনৌতি গিয়েছিলেন (J.A.S., ১৮৭৩, ২৬০ পৃঃ দ্রঃ)।

নসরত শাহের পক্ষে আউলিয়ার সমাধিস্তম্ভের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তিনি কেবল মেরামত ও সংস্কার করে থাকতে পারেন। কারণ, মাজারের শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে, নসরত শাহের পিতা সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ৯১৬ হিজরী (১৫১০ খ্রীঃ) মাজারের দরজা তৈরী করেছিলেন (J. A. S., ১৮৭৩, ২৯৪ পৃঃ দ্রঃ)।

ইতিহাসের নূরে কুত্‌ব্‌-উল-আলম আউলিয়ার পিতা আউ-লিয়া আলা-উল-হক ছিলেন আখির মুরিদ। আখি বাংলার সুল-তান আবুল মুজফ্‌ফর ইলিয়াস শাহের সমকালীন ছিলেন।

৭৩. মুদ্রা ও শিলালিপিতে দেখা যায়, তাঁর নাম ছিল আলাউদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর ফিরোজ শাহ (J. A. S. B., ১৮৭৩, ২৯৭ পৃঃ দ্রঃ)। তিনি এক বৎসর (৯৩৯ হিঃ) রাজত্ব করেছিলেন। সেইসময় পরবর্তী সুলতান তাঁর চাচা মাহমুদ শাহ তাঁকে হত্যা করেন। এর ফলে নসরত শাহের হত্যার তারিখ ৯৩৮ বা ৯৩৯ হিজরীর প্রথমভাগে হয়। কিন্তু 'বদাওনি'র বিবরণীর (১ম খণ্ড, ৩৪৮ পৃঃ) দরুন এটা সন্দেহজনক মনে হয়।

৭৪. 'তিন বৎসর' স্পষ্টতঃ নকল-নবিশের ভুল। কারণ, স্টুয়ার্ট 'রিয়াজে'র ভিত্তিতে তাঁর ইতিহাসে লিখেছেন 'তিন মাস'। স্টুয়ার্ট নিশ্চয়ই এটা 'রিয়াজে'র পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছিলেন এবং কালানুক্রম হিসেবে এটা ঠিক মনে হয়।

৭৫. মুদ্রা ও শিলালিপি থেকে দেখা যায়, এই সুলতানের নাম গিয়াসউদ্দীন আবুল মুজাফ্‌ফর মাহমুদ শাহ (J. A. S. B., ১৮৭২, ৩৩৯ পৃঃ এবং ১৮৭৩, ২৯৮ পৃঃ)। তিনি বাংলার শেষ স্বাধীন সুলতান ছিলেন এবং ৯৪০-৯৪৪ হিজরী পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তিনিই পর্তুগীজদের El Ray Mamud

de Bengala। পর্তুগীজ আলফন্সো দ্য মেলো তাঁর সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। এই সময় শের খান ও তাঁর ভ্রাতা আদিল খান মুঘলদের পক্ষ ত্যাগ ক'রে বাংলার সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু পরে ফিরোজ শাহের হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার অজুহাতে শের খান মাহমূদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও গৌড়ে তাঁকে অবরোধ করেন। মাহমূদ শাহ কেলেগং (কাহলগাঁওয়ে) পলায়ন করেন এবং যুদ্ধে আহত হওয়ায় সেখানে ৯৪৫ হিজরীতে (১৫৩৮ খ্রীঃ) তাঁর মৃত্যু হয় (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৪৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৭৬. এখানে বিহার শহরের উল্লেখ করা হয়েছে। দেখা যায়, এই সময় দক্ষিণ বিহারের সরকার মুঙ্গের ও সমগ্র উত্তর-বিহার বাংলার সুলতানদের অধীনে ছিল; দীর্ঘকাল হাজীপুরে উত্তর-বিহারের বাংলার গবর্নরের সদর দফতর ছিল। দক্ষিণ-বিহারের সরকার ও মুঙ্গেরের পশ্চিমাঞ্চল জৌনপুরের শর্কী-রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। উক্ত রাজ্যের পতনের পর এই অঞ্চল অর্ধ-স্বাধীন আফগান সরদারদের অধীনস্থ হয়। আফগান সরদারদের মধ্যে ছিলেন দরিয়া খান, তাঁর পুত্র বাহাদুর খান (তিনি সুলতান মুহম্মদ নাম গ্রহণ করেন), সুলতান মাহমূদ ও শের খান। এই প্রশ্নের তথ্য থেকে দেখা যায়, এই সময় মাহমূদ শাহের শ্যালক উত্তর-বিহারের গবর্নর মখদুম আলম (যার সদর দফতর ছিল হাজীপুরে) বিদ্রোহ করেন ও শের খানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন (শের খান পরে শের শাহ); 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ৩৬০, ৩৫৮, ৩৬১ পৃঃ দ্রঃ।

৭৭. শের শাহের দিল্লী সাম্রাজ্য অধিকারের বিবরণী 'তারিখ-ই-শের শাহী', এবং 'বদাওনি' ও 'আকবর নামা'য় বর্ণিত আছে।

৭৮. এই গিরিপথগুলো কেলেগং-এর নিকটবর্তী এবং বর্তমানে ই. আই. রেলপথ এখান দিয়ে গিয়েছে। তৎকালে এই গিরি-

পথগুলো বাংলার প্রবেশদ্বাররূপে গণ্য হোত। শের শাহের আদেশে তাঁর পুত্র কুতুব খান ও গোলাম খাওয়াস খান এগুলো সুরক্ষিত করেছিলেন (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ)।

৭৯. 'আইন-ই-আকবরী'তে এই স্থান (চুনার) এলাহাবাদ সুবার অন্তর্গত ছিল। এটি (চুনার দুর্গ) "পর্বতশিখরে অবস্থিত একটি প্রস্তর-নির্মিত দুর্গ—উচ্চতায় ও দৃঢ়তায় এর সমতুল্য প্রায় নাই" বলে বর্ণিত হয়েছে। এর পদতলে গঙ্গা নদী প্রবাহিত (আইন-ই-আকবরী—জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ১৫৯ পৃঃ)।

৮০. বর্ণিত হয়েছে, বাদশাহ হুমায়ুন এই দুর্গ অবরোধ আরম্ভ করেছিলেন ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে। এই দুর্গ ছয় মাসকাল অবরুদ্ধ ছিল ও শের শাহের সেনাপতি খাওয়াস খানের নিকট গৌড়ের পতনের (৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রীঃ) পূর্বে দুর্গের পতন হয়েছিল। সুতরাং, চুনার অবরোধ ১৫৩৭ সালের অক্টোবর মাসে নিশ্চয়ই আরম্ভ হয়েছিল (তারিখ-ই-শের শাহী দ্রঃ); অথবা, হয়ত গৌড়ের পতন হয়েছিল ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৪৮-৩৪৯ পৃঃ)।

৮১. 'আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৪৪১ পৃঃ এবং 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ৩৪৮ পৃঃ দ্রঃ। ৯৪৩ হিজরীতে হুমায়ুন চুনার দখল করেছিলেন।

৮২. অর্থাৎ, ৬ই এপ্রিল, ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ।

৮৩. পূর্বোক্ত টীকা দ্রষ্টব্য।

৮৪. এটি গৌড়ের একটি মহল্লা। মসজিদের এই শিলালিপির প্রতিলিপি J.A.S.B., ১৮৭২, ৩৩৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছে।

৮৫. 'তারিখ-ই শেরশাহী'তে মাহমুদ শাহের পরিণতি সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হয়েছে। মাননীয় স্যার এডওয়ার্ড ক্লাইভ বেইলিকৃত এর একটি অনুবাদ ডসন সম্পাদিত ইলিয়টের History of India-তে প্রকাশিত হয়েছে (IV—৩৬০-৩৬৪ পৃঃ)।

৮৬. এই স্থানের অবস্থিতি আমি স্থির করতে পারি নাই। কিন্তু নিশ্চয়ই চুনারের সন্নিকটে অবস্থিত।

৮৭. 'বদাওনি'তে (১ম খণ্ড, ৩৪৮ পৃঃ) বর্ণিত হয়েছে যে, যখন বাংলার সুলতান (ভুলক্রমে মাহমুদ শাহের পরিবর্তে নসিব শাহ নাম উল্লিখিত হয়েছে) শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে বাদশাহ হুমায়ুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন বাদশাহ মীর হিন্দু বেগ কুচিনকে জৌনপুর প্রদেশের তত্ত্বাবধানে দিয়ে চুনার থেকে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন এবং কুতুব খান ও খাওয়াস খান (যথাক্রমে শের শাহের পুত্র ও চাকর) কর্তৃক সুরক্ষিত তেলিয়াঘড়ি গিরিপথ বলপূর্বক অধিকার করতঃ অগ্রসর হন।

৮৮. অর্থাৎ, ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ।

৮৯. শের খান বা শের শাহ এই সময় গৌড় অধিকার ক'রে সেখানে ছিলেন (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৪৮-৩৪৯ পৃঃ)। মুঘল ঐতিহাসিকেরা মুঘল বাদশাহদের সন্তুষ্টির জন্য সর্বদা শের শাহকে 'শের খান' নামে উল্লেখ ক'রে তাঁকে ছোট করার চেষ্টা করেছেন। শের শাহ অবশেষে হুমায়ুনকে কনৌজের নিকটে ৯৪৭ হিজরীতে (১৫40 খ্রীঃ) পরাজিত করেন। তখন হুমায়ুন সিন্ধুতে পালিয়ে যান ('আইন'—জেরেটের অনুবাদ, ৪২১ পৃঃ; 'বদাওনি,' ১ম খণ্ড, ৩৫৪, ৩৫৬ পৃঃ)।

৯০. হুমায়ুনের অধীনে বাংলার গবর্নররূপে তাঁর উল্লেখ করা হয় ('আইন-ই আকবরী'—ব্লকম্যানের অনুবাদ এবং মূল গ্রন্থ, ১ম পর্ব, ৩৩১ পৃঃ; 'বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৫২ পৃঃ)।

৯১. এটা তখন নিশ্চয়ই কেলেগং-এর (কাহলগাঁও-এর) নিকটে হয়েছিল।

৯২. বাংলার শেষ স্বাধীন মুসলমান সুলতানের মৃত্যু হয় কেলেগং-এ ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে।

৯৩. হিন্দু রাজাদের আমলে পশ্চিমবঙ্গের এই নাম ছিল।

১৪. ভারতে মুসলিম শাসনকালে ছোটনাগপুরের এই নাম ছিল।

১৫. ১৫৩৮ সালের আন্দাজ জুলাই মাসে হুমায়ুন গৌড় দখল করেন। হুমায়ুন তিন মাসকাল, অর্থাৎ ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গৌড়ে ছিলেন এবং এই স্থানের নাম করেন 'জিন্নতাবাদ' (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ)।

১৬. ৯৪৫ হিজরী বা ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দের আন্দাজ সেপ্টেম্বর মাসে শের শাহ এই গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ কূটকৌশল দ্বারা দখল করেছিলেন (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ)। শের খান তাঁর পরিবার-বর্গকে আশ্রয় দেয়ার জন্য রোটাসের রাজাকে রাজী করান ও তৎপর দু'হাজার সশস্ত্র আফগানকে পাল্কীর মধ্যে দুর্গের অভ্যন্তরে প্রেরণ করেন এবং এরা রাজা ও তাঁর সৈন্যদের হত্যা ক'রে সহজেই দুর্গ অধিকার করে।

১৭. 'ফেরেশতায়' বিবৃত হয়েছে, "এই সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, মীর্জা হিন্দাল আগ্রা ও মেওয়াটে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করেছেন ও নিজের নামে খোতবা প্রচলন করেছেন এবং শেখ বহ্‌লুলকে হত্যা করেছেন (ফার্সী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ৪২৩ পৃঃ)। এই বইতে আগ্রার পরিবর্তে ভুলক্রমে দিল্লী লিখিত হয়েছে (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৫০ পৃঃ)।

১৮. তাঁর রাজকীয় উপাধি ছিল ফরিদউদ্দীন আবুল মুজফ্‌ফর শের শাহ। তিনি ৯৪৪ থেকে ৯৫২ হিজরী (১৫৩৮-১৫৪৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। বিহারের সাহ্‌স্রামে (সাসারামে) তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর আমলে বাংলার প্রথম গবর্নর ছিলেন খিজির খান। ইনি বাংলার সুলতান তৃতীয় মাহমুদ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন শের শাহ এঁকে পরি-বর্তন ক'রে আগ্রায় কাজী ফজিলতকে গবর্নর নিযুক্ত করেন। এই বিশেষ উল্লেখযোগ্য বাদশাহের পূর্ণ জীবনী 'বদাওনি'তে পাওয়া যায় (১ম খণ্ড, ৩৫৬ থেকে ৩৭৪ পৃঃ)। তিনি বিদ্বান, উপায়

উদ্ভাবনে আশ্চর্যরকম দক্ষ, দুঃসাহসী সৈনিক, উঁচুদরের সেনাপতি (যুদ্ধে সর্বদা যে-কোনো কৌশল অবলম্বনে সদাপ্রস্তুত), রাজনীতিতে কূটকৌশলী ছিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর তিনি উচ্চতম পর্যায়ের রাজনীতিবিদের ও কল্যাণকর বাদশাহের গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছিলেন। রাজস্ব নির্ধারণে তিনি পরিমিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন; উপহার ও জায়গীর দানের ক্ষেত্রে তিনি উদার ছিলেন; শিক্ষা ও বিদ্বানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বদান্য ছিলেন; সমর-বাহিনীর সংস্কারে বিজ্ঞজনোচিত ছিলেন (আকবর পরে তাঁরই ব্যবস্থা অনুসরণ করেছিলেন); রাস্তা তৈরী, বৃক্ষ রোপন, কূপ খনন, সরাই প্রতিষ্ঠা, মসজিদ তৈরী. মাদ্রাসা ও খানকা তৈরী, এবং পুল তৈরীর ব্যাপারে ভারতীয় মুসলিম নৃপতিদের মধ্যে খুব কম ব্যক্তি তাঁর সমতুল্য ছিলেন। তিনি এতই বলিষ্ঠভাবে বিচার-প্রথা প্রয়োগ করেন যে, তাঁর ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর সর্বত্র পরিস্ফুট হোত এবং সেইজন্য 'বদাওনি' বলেন (১ম খণ্ড, ৩৬৩ পৃঃ) 'পথের পাশে কোনো বৃদ্ধা সোনার থালা রেখে ঘুমালেও ডাকাত বা দস্যু তা স্পর্শ করতে সাহস করতো না।'

৯৯. চৌসা ও বক্সারের মাঝামাঝি নদীতীরে শের খান শিবির স্থাপন করেছিলেন। এই নদীর নাম থোরা নদী। ৯৪৬ হিজরীর ৯ই সফর বা ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে চৌসার যুদ্ধ হয়েছিল (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৫১-৩৫২ পৃঃ দ্রঃ)।

১০০.| বরঞ্চ হুমায়ুন শান্তির প্রস্তাব করেছিলেন। শের খান তখন চৌসাতে
১০১.| হুমায়ুন মোল্লা মুহম্মদ আজীজকে তাঁর নিকট পাঠিয়েছিলেন। মোল্লা যখন তাঁর নিকট পোঁছান, তখন শের খান আস্তিন গুটিয়ে কোদাল হাতে নিয়ে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে খাদ কেটে স্থানটি সুরক্ষিত করছিলেন। মোল্লাকে দেখে তিনি মাটির উপর বসে তাঁর কথা শুনে উত্তরে বলেন, "বাদশাহকে আমার পক্ষ থেকে এই একটা কথা বলবেন– তিনি যুদ্ধ চান, কিন্তু তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধ চায় না;

আর, আমি যুদ্ধ চাই না, কিন্তু আমার সৈন্যরা যুদ্ধ চায়।" শের শাহ তারপর তাঁর মুর্শিদ শেখ ফরিদ গঞ্জ শকরের বংশধর শেখ খলিলকে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করেন (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৫০-৩৫১ পৃঃ)।

১০২. ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুন (৯ই সফর, ৯৪৬ হিঃ) তারিখে চৌসায় হুমায়ূনকে পরাজিত ক'রে শের খান গৌড়ে যান ও তথায় হুমায়ূনের গবর্নর জাহাঙ্গীর কুলি বেগকে হত্যা করেন এবং সেই বৎসরেই গৌড়ে 'ফরিদউদ্দীন আবুল মুজফ্ফর শের শাহ' রাজকীয় নাম গ্রহণ করেন ও মুদ্রা প্রচলন করেন। ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত শের শাহ গৌড়ে ছিলেন এবং এরপর খিজির খানকে বাংলায় গবর্নররূপে রেখে আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করেন (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৫২ ও ৩৬৪ পৃঃ)।

১০৩. অর্থাৎ, ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ। কনৌজের যুদ্ধের বিবরণীর জন্য 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ৩৫৪ পৃঃ দ্রঃ।

১০৪. তিনি বাংলার পূর্বতন সুলতান তৃতীয় মাহমূদ শাহের এক কন্যাকে বিবাহ ক'রে রাজকীয় সমারোহ দেখাতেন। সেইজন্য শের শাহ ত্বরিত তাঁকে অপসারণ ক'রে কাজী ফজিলতকে গবর্নর পদে নিয়োগ করেন (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৬৫ পৃঃ)।

১০৫. ৯৪৮ হিজরীতে শের শাহ গৌড়ে খিজির খানকে পদচ্যুত করেন। শের শাহের উঁচুদরের রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সরদারকে শাসকরূপে নিযুক্ত ক'রে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা করেছিলেন, তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় 'ভেদসৃষ্টি ক'রে শাসন' নীতি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। কাজী ফজিলতের মতো আগ্রায় একজন আলেম ব্যক্তিকে উক্ত সরদারদের ঊর্ধ্বে নিয়োগ করায় প্রমাণ হয় যে, তিনি বিদ্যার উচ্চমূল্য দিতেন। ৯৫২ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল (৩রা জুন, ১৫৪৫ খ্রীঃ) তারিখে

শের শাহের মৃত্যু হয় এবং দক্ষিণ-বিহারের সাসারামে তিনি সমাধিস্থ আছেন। শের শাহের আকর্ষণীয় জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে 'তারিখ ই-শেরশাহী', এবং 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ৩৬৫ পৃঃ, 'ফেরেশতা' ও 'আকবরনামা' দেখুন।

শের শাহ্‌ই সর্বপ্রথম বাংলার সুলতান থেকে সারা ভারতের বাদশাহ হয়েছিলেন। তাঁর বিজয় বাংলারই বিজয়; এবং বাদশাহ হওয়াব পরেও বাংলার সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মুঘল ঐতিহাসিকেরা (নিঃসন্দেহে তাঁদের বিশেষ দুর্বল অবস্থার জন্য) রাজনীতিবিদ ও সৈনিক হিসেবে শের শাহের যথাযোগ্য মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেন নাই। সামরিক, আর্থিক, কৃষি, অর্থনৈতিক, মুদ্রা ও রাজস্ব সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর রাজত্বকালে বাংলার পক্ষে সুফলদায়ক হয়েছিল। তিনি বাংলায় বহু জনকল্যাণকর কার্য, যথা—রাস্তা, সরাই, পুল, দুর্গ, খান্‌কা, মাদ্রাসা, কূপ ইত্যাদি তৈরী করেছিলেন।

১০৬. "কালিঞ্জর সুবা এলাহাবাদে অবস্থিত একটি প্রস্তর-নির্মিত দুর্গ ও এটি একটি আকাশচুম্বি পাহাড়ের উপর অবস্থিত" (আইন)। ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে এই দুর্গ অবরোধকালে একটি গোলা দুর্গের দেওয়ালে লেগে প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে শের শাহ যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে কামান-শ্রেণীর উপর পড়ে ও বারুদে আগুন লাগে। তাতে তিনি গুরুতররূপে দগ্ধ হন ও পরদিন তাঁর মৃত্যু হয় ('আইন'—জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ১৬০৪ পৃঃ)। 'আইনে' কেবল লিখিত আছে, "দুর্গ থেকে কামান দাগা আরম্ভ হলে তিনি বারুদস্তূপে পড়ে যান" (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৭২ পৃঃ)।

১০৭. জালাল খান ১৫৪৫ খ্রীস্টাব্দে (৯৫২ হিঃ) 'জালাল-উদ-দীন আবুল মুজফ্‌ফর ইসলাম শাহ' রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন। ১৫৪৫ থেকে ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেছিলেন। কাজী ফজিলতকে অপসারণ ক'রে তিনি তাঁর আত্মীয় মুহম্মদ

খান সুরকে বাংলার গবর্নর নিযুক্ত করেন। ইসলাম শাহকে সাসারামে দাফন করা হয়। তিনি একটি ব্যাপক কার্যবিধি তৈরী করেছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত পিতার উন্নত ও বিজ্ঞ নীতি অনুসরণ করতেন (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৭৪ পৃঃ)।

১০৮. "জৌনপুর একটি বৃহৎ নগর। সুলতান ফিরোজ তুঘলক ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন ও তাঁর চাচাতো ভাই ফখরুদ্দীন জুনাইয়ের নামে নামকরণ করেছিলেন" (আইন)।

১০৯. 'আইনে' কাল্পী সুবা আগ্রার অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১০. ইসলাম শাহের পুত্র ফিরোজ খানকে মুবারিজ খান হত্যা করেন এবং (৯৬০ হিঃ বা ১৫৫৩ খ্রীঃ) মুহম্মদ শাহ আদিল উপাধি গ্রহণ করেন। এই অকারণ হত্যার জন্য তিনি সাধারণতঃ আদিল শাহ অথবা কেবল 'আন্ধালি' নামে পরিচিত ছিলেন। হিন্দুস্তানিতে 'আন্ধালি' অর্থ 'অন্ধ'।

'ফেরেশ্‌তা' ও 'স্টুয়ার্টে' উক্ত হয়েছে যে, সলিম শাহের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত মুহম্মদ খান সুর বাংলা ও উত্তর-বিহারে বিজ্ঞ ও কল্যাণকররূপে শাসন করেছিলেন। কিন্তু, ৯৬০ হিজরীতে যখন চরিত্রহীন ও বিলাসী মুহম্মদ আদিল ফিরোজ খানকে হত্যা ক'রে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন মুহম্মদ খান তাঁকে 'নিজ প্রাক্তন প্রভুর হত্যাকারী' হিসেবে গণ্য করেন, বিধায় তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে অসম্মত হন।

শের শাহ কর্তৃক নিয়োজিত কাজী ফজিলতকে অপসারিত ক'রে ইসলাম শাহ বাংলা ও উত্তর-বিহারের গবর্নররূপে ৯৫২ হিজরীতে (১৫৪৫ খ্রীঃ) মুহম্মদ খান সুরকে নিযুক্ত করেন। ইসলাম শাহ একই সময়ে মিয়া সুলায়মান কারারানিকে দক্ষিণ-বিহারের গবর্নররূপে থাকার বিষয় অনুমোদন করেন।

১১১. সলিম শাহ মুদি হিমুকে বাজার-তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত করেন। পরে মুহম্মদ শাহ আদিল তাঁকে সাম্রাজ্যের এডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল পদে নিযুক্ত করেন। ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে

আকবরের সেনাপতি বৈরাম খান তাঁকে পরাজিত করেন।

১১২. ইসলাম শাহ কর্তৃক নিয়োজিত বাংলার গবর্নর মুহম্মদ খান সুর, মুহম্মদ আদিল শাহের আনুগত্য স্বীকার করতে অসম্মত হন এবং নিজে 'শামসুদ্দীন আবুল জফ্‌ফর মুহম্মদ শাহ' রাজকীয় উপাধি ধারণ করেন। তিনি জৌনপুর ও কাল্পী আক্রমণ করেন। ৯৬২ হিজরীতে (১৫৫৫ খ্রীঃ) উভয় পক্ষের মধ্যে চপরঘাটার যুদ্ধ হয়। চপরঘাটা কাল্পীর পূর্বদিকে যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। ৯৫২ থেকে ৯৬০ হিজরী পর্যন্ত তিনি ইসলাম শাহের অধীনে বাংলায় গবর্নররূপে নিয়োজিত ছিলেন এবং ৯৬০-৯৬২ হিজরী পর্যন্ত (১৫৫৩-১৫৫৫ খ্রীঃ) বাংলার সুলতানরূপে রাজত্ব করেছিলেন (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৪৩২ পৃঃ দ্রঃ)।

১১৩. ঝোসি এলাহাবাদের বিপরীত দিকে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। সেখানে চপরঘাটার যুদ্ধে নিহত মুহম্মদ শাহের পুত্র খিজির খান 'জুলুস' অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেছিলেন ও ৯৬২ হিজরীতে (১৫৫৫ খ্রীঃ) 'বাহাদুর শাহ' রাজকীয় উপাধি ধারণ করেছিলেন (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৪৩৩ পৃঃ)।

১১৪. মুহম্মদ খান সুর ওরফে শামসুদ্দীন আবুল মুজফ্‌ফর মুহম্মদ শাহের পুত্র বাহাদুর শাহ বা খিজির খান ঝোসিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। মুহম্মদ শাহের পরাজিত আমীরগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ চপরঘাটার যুদ্ধের পর সেখানে (ঝোসিতে) একত্রিত হয়েছিলেন। বাহাদুর শাহ ৯৬২-৯৬৮ হিজরী (১৫৫৫-১৫৬১ খ্রীঃ) পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন। বদাওনি তাঁকে কেবল মুহম্মদ বাহাদুর নামে অভিহিত করেছেন। আদিল শাহের সঙ্গে যুদ্ধ তাঁর রাজত্বকালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ৯৬৪ হিজরীতে মুঙ্গের জেলার সুরজগড় নামক স্থানে তিনি (বাহাদুর শাহ) আদিল শাহকে চরমভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে সুলায়মান কাররানি (শের শাহের আমল থেকে ইনি দক্ষিণ বিহারের শাসক

ছিলেন) বাহাদুর শাহকে সাহায্য করেছিলেন ('তারিখ-ই-দাউদি' এবং 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ৪৩৩-৪৩৪ পৃঃ দ্রঃ)।

৯৬২-৯৬৮ হিজরী (১৫৫৫-১৫৬১ খ্রীঃ) পর্যন্ত বাহাদুর শাহ বাংলা ও উত্তর-বিহারে রাজত্ব করেছিলেন। এই সময় দক্ষিণ-বিহার পুরাতন গবর্নর মিয়া সুলায়মান কারারানির অধীনস্থ ছিল।

আকবর বাদশাহ ৯৬৩ হিজরী (১৫৫৬ খ্রীঃ) বাদশাহী তক্তে আরোহণ করেছিলেন। সুতরাং উল্লেখযোগ্য যে, বাহাদুর শাহ বাদশাহ আকবরের সমসাময়িক ছিলেন।

১১৫. জাহাঙ্গীরা গ্রাম মুঙ্গের জেলার জামালপুর রেল স্টেশনের সন্নিকটে অবস্থিত। সুরজগড় শহর মুঙ্গের জেলায় মওলা নগরের সন্নিকটে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

১১৬. ৯৬৪ হিজরীতে (১৫৫৭ খ্রীঃ) সংঘটিত এই যুদ্ধে সুলায়মান কারারানির নিকট বাহাদুর শাহ সাহায্য লাভ করেছিলেন। 'তারিখ-ই-দাউদি' অনুসারে এই চূড়ান্ত যুদ্ধ মুঙ্গেরের নিকটে সুরজ-গড়ের নদীতে (নদীর তীরে) হয়েছিল (এই নদীর নাম কেওল নদী)। অধ্যাপক ব্লকম্যান যুদ্ধক্ষেত্রটি সুরজগড় ও কেওল নদীর ৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বলে নির্দিষ্ট করেছেন। 'তারিখ-ই-দাউদি'তে ভুলক্রমে বলা হয়েছে যে, মুঙ্গের থেকে সুরজগড় আন্দাজ এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

১১৭. 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ৩৮৪ পৃঃ দ্রঃ।

১১৮. তাঁর রাজকীয় উপাধি ছিল গিয়াসউদ্দীন আবুল মুজফ্ফর জালাল শাহ। তিনি ৯৬৮ থেকে ৯৭১ হিজরী (১৫৬১-১৫৬৪ খ্রীঃ) পর্যন্ত বাংলা ও উত্তর-বিহারে রাজত্ব করেছিলেন। এই সময় সুলায়মান কারারানি দক্ষিণ-বিহারে অর্ধ-স্বাধীন গবর্নররূপে শাসক ছিলেন। অন্যদিকে, নসরত শাহের আমলে হাজীপুরের গুরুত্ব বৃদ্ধি হওয়ায় এই স্থানে ছিল বাংলার গবর্নরের উত্তর-বিহারের সদর দফতর। ৯৭১ হিজরীতে গৌড়ে জালাল শাহের মৃত্যু হয়। জালাল শাহ ও তাঁর পুত্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় সুর বংশের

রাজত্ব শেষ হয়। 'বদাওনি'তে (১ম খণ্ড, ৪৩০ পৃঃ) উক্ত হয়েছে যে, "বাংলার শাসক মুহম্মদ খান স্থর 'স্থলতান জালালউদ্দীন' উপাধি নিয়েছিলেন এবং জৌনপুর পর্যন্ত বাংলারাজ্য প্রসারিত করেছিলেন।

১১৯. ৯৭১ হিজরীতে (১৫৬৩ খ্রীঃ) দক্ষিণ-বিহারের গবর্নর স্থলায়মান খান কারারানি অবৈধ রাজ্যাধিকারী গিয়াসউদ্দীনকে দমন করার জন্য তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খান কারারানিকে গৌড়ে প্রেরণ করেন। গিয়াসউদ্দীনকে হত্যা ক'রে তাজ খান তাঁর ভ্রাতা স্থলায়মান কারারানির পক্ষে বাংলার গবর্নররূপে ৯৭১-৯৭২ হিজরী (১৫৬৪-১৫৬৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন (J.A.S., ১৮৭৫, ২৯৫ পৃঃ এবং 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ৪০৯, ৪২০ ও ৪২১ পৃঃ)। বদাওনি বলেন, তাজ খান তৎকালীন অতিশয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ৯৭২ হিজরীতে তাজ খানের মৃত্যু হয়।

১২০. 'আইনে' সরকার সম্বল স্থবা দিল্লীর অন্তর্গত বলে উক্ত হয়েছে (জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ১০৪ পৃঃ)।

'আইনে' আরো বিবৃত হয়েছে, "সম্বল নগরে হরিমণ্ডল (বিষ্ণুর মন্দির) নামে হিন্দুদের একটি মন্দির আছে। জনৈক ব্রাহ্মণ এই মন্দিরের মালিক। তাঁরই বংশধরদের মধ্য থেকে এই স্থানে দশম অবতার আবিভূর্ত হবেন" (জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ২৮১ পৃঃ)।

১২১. মুদি বা 'বাকাল' হওয়া সত্ত্বেও মুহম্মদ আদিল শাহের অধীনে হিমু উজীর ও প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত হয়েছিলেন। ৯৬৪ হিজরীতে আকবরের বিরুদ্ধে পানিপথের যুদ্ধে তিনি প্রভূত ব্যক্তিগত সাহস দেখিয়েছিলেন। তিনি দিল্লীতে 'রাজা বিক্রমজিত' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আফগানদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় তারা তাকে অন্তরে ঘৃণা করতো ও সেইজন্য অনেকে আকবরের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল (বদাওনি, ২য় খণ্ড, ১৩-১৬ পৃঃ দ্রঃ)।

১২২. 'বদাওনি', ১ম খণ্ড, ৪২২-৪২৮ পৃঃ দ্রঃ। মুহম্মদ আদিল শাহের দুর্বল রাজত্বের শেষদিকে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হওয়ায় ইব্রাহিম এবং সিকন্দার ওরফে আহমদ খানের মধ্যে চুক্তি হয় যে, ইব্রাহিম দিল্লী থেকে ভারতের পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত শাসন করবেন এবং সিকন্দার পাঞ্জাব, মুলতান ও পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য অংশ শাসন করবেন।

১২৩. 'আকবরনামা', 'বদাওনি' ও 'তবকত-ই-আকবরী' অনুসারে ৯৮০ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল এবং তিনি (সুলায়মান করানি) ৯৭১-৯৮০ হিজরী (১৫৬৩-১৫৭২ খ্রীঃ) পর্যন্ত বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন। তাকে কখনো 'কারারানি', কখনো 'করানি', আবার কখনো 'ক্রানি' বলা হয়। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রত্যহ সকালে ১৫০ জন শেখ ও আলেমের সঙ্গে তিনি প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান করতেন; তৎপর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অন্য কাজ করতেন ('আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১৭১ পৃঃ; 'বদাওনি', ২য় খণ্ড, ৭৬, ১৭৩, ১৭৪ ও ২০০ পৃঃ দ্রঃ)। তাঁর এই কার্যপ্রণালী আকবরের আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ৯৭৫ হিজরীতে (১৫৬৭ খ্রীঃ) প্রধানতঃ বিখ্যাত সেনাপতি কালা-পাহাড়ের চেষ্টায় তাঁর উড়িষ্যা বিজয়ের বিষয় এই পুস্তকের পরবর্তী অংশে এবং 'ফেরেশ্‌তা', 'আকবরনামা' ও 'তারিখ-ই-দাউদি'তে বিবৃত হয়েছে। তাঁর প্রধান আমীর ও কর্মচারী খান জাহান লোদি পাটনার সন্নিকটে আকবরের সেনাপতি মুনিম খান-ই-খানানের সঙ্গে এক সম্মেলনে মিলিত হন এবং সেখানে সাব্যস্ত হয় যে, বাংলায় আকবরের নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রা তৈরী হবে ('আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ৪২৭ পৃঃ; 'বদাওনি', ১৭৪ পৃঃ)। ৯৭২ হিজরীতে সুলায়মান গৌড় থেকে টাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। আকবর তাঁর নিকট রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছিলেন (বদাওনি, ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃঃ)।

১২৪. টাণ্ডা প্রায় গৌড়ের বিপরীত দিকে গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

৯৭২ হিজরীতে (১৫৬৪ খ্রীঃ) বাংলার আফগান সুলতান

সুলায়মান কারারানি মন্দ আবহাওয়ার জন্য গৌড় থেকে টাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই স্থানকে খাওয়াসপুর টাণ্ডা নামেও বলা হোত। ৯৮৩ হিজরীতে (১৫৭৫ খ্রীঃ) আকবরের সিপাহ্সালার মুনিম খান ই-খানান গৌড় পুনর্বাধিকার করেন। সেখানে মহামারীতে তাঁর ও বহুসংখ্যক মুঘল সৈন্যের মৃত্যু হয় (বদাওনি, ২য় খণ্ড; ২১৬-২১৭ পৃঃ দ্রঃ)। আন্দাজ ১২৪২ হিজরীতে (১৮২৬ খ্রীঃ) বন্যায় টাণ্ডা ধ্বংস হয়ে যায় ও নদীগর্ভে বিলীন হয়। বর্তমানে লক্ষ্মীপুর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে বালুকাস্তূপ তার সাক্ষী হয়ে আছে (বেভারিজের Analysis of Khurshid Jahan Nama, J. A. S., ১৮৯৫, ২১৫ পৃঃ দ্রঃ)।

১২৫. শের শাহের অধীনে আফগানদের ও হুমায়ূনের অধীনে মুঘলদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে যে-কুচবিহার বাংলার সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ জয় করেছিলেন ও সুলায়মান কারারানি কর্তৃক আংশিক বিজিত হয়েছিল, সেই অঞ্চল ৯৪৫ হিজরীতে বিশার অধীনে অর্ধ-স্বাধীন হয় এবং তৎপর রাজা নরনারায়ণ (৯৬২ হিঃ) ও বাল গোঁসাইয়ের (৯৮০ হিঃ) অধীনে স্বাধীন হয়। পরে এই অঞ্চল (কুচবিহার) পুনরায় জয় করা হয়েছিল।

১২৬. পূর্ববর্তী টীকা থেকে মনে হয়, তিনি (সুলায়মান) নিজ নামে খোতবা প্রচলন বন্ধ করেছিলেন।

১২৭. পূর্ববর্তী টীকা থেকে দেখা যায়, তিনি বাংলায় দশ বৎসরকাল রাজত্ব করেছিলেন এবং শের শাহের আমল থেকে বিহারের শাসক ছিলেন।

১২৮. তিনি ৯৮০ হিজরীতে (১৫৭২ খ্রীঃ) রাজত্ব করেছিলেন। সুলায়মানের মৃত্যু, বায়াজিদের সিংহাসনে আরোহণ ও হত্যা, এবং প্রধানতঃ বাংলারাজ্যের প্রধান আমীর লোদি খানের চেষ্টায় বায়াজিদের ভ্রাতা দাউদের সিংহাসনে আরোহণ ইত্যাদি সম্পর্কে 'বদাওনি' ও 'সওয়ান-ই-আকবরী' দ্রষ্টব্য (J. A. S., ১৮৭৫, ৩০৪-৩০৫ পৃঃ)।

বদাওনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি বলেন, 'সুলায়মান

বিশ্বাসহীনতার আকর কটক-বেনারস শহর জয় করেছিলেন ও জগন্নাথকে (পুরী) দার-উল-ইসলামে পরিণত করেছিলেন এবং কামরূপ থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন।' উড়িষ্যায় (কটকসহ) সুলায়মানের প্রথম ভাইস্‌রয় ছিলেন লোদি খান ওরফে খান জাহান লোদি এবং জগন্নাথ বা পুরীর প্রথম গবর্নব ছিলেন কতলু খান (বদাওনি, ২য় খণ্ড, ১৭৪ পৃঃ দ্রঃ)।

১২৯. 'সওয়ান-ই-আকবরী' ও 'বদাওনি'তে বিবৃত হয়েছে যে, বায়াজিদ নিজ যৌবনসুলভ নির্বুদ্ধিতার দরুন নিজ নামে খোতবা পাঠ করেছিলেন ও সর্বপ্রকার সৌজন্য পরিহার করেছিলেন এবং পিতার আমীরদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন; সেইজন্য এঁরা তাঁকে ঘৃণা করতেন। তাঁর চাচা ইমাদেব (সোলায়মানের ভ্রাতা) পুত্র ও তাঁর নিজের শ্যালক হানুসো তাঁকে হত্যা করেন। পবে লোদি খান এই হানুসোকে হত্যা ক'রে দাউদকে মসনদে বসান (J. A. S. B., ১৮৭৫ ; ৩০৪-৩০৫ পৃঃ)।

১৩০. ৯৮০ হিজরীতে (১৫৭২ খ্রীঃ) দাউদ খান বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুলতান হন এবং ৯৮০ থেকে ৯৮৪ হিজরী (১৫৭২-১৫৭৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত আবুল মুজফ্‌ফর দাউদ শাহ নাম নিয়ে রাজত্ব করেছিলেন। ৯৮২ হিজরীতে আকবর স্বয়ং পাটনা ও হাজিপুর দুর্গ বলপূর্বক অধিকার করেন ও বিহার দখল করেন। দাউদ উড়িষ্যায় পলায়ন করেন। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে জলেশরের উত্তরে মুঘলমারি বা তুকারয়তে মুনিম খান-ই-খানানের অধীনস্থ মুঘলদের সঙ্গে দাউদের যুদ্ধ হয়। দাউদ পরাজিত হন ও কটকের সন্ধি করেন। এই সন্ধি দ্বারা বাংলা ও বিহার আকবরকে সমর্পণ করা হয় এবং আকবর উড়িষ্যায় দাউদের অধিকার স্বীকার করেন। ৯৮৩ হিজরীতে মুনিম খান-ই-খানানের ও সৈন্যদের অধিকাংশের গৌড়ে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু হওয়ায় দাউদ খান উক্ত অবস্থা দ্বারা উৎসাহিত হ'য়ে বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু, ৯৪৮ হিজরীর ১৫ই রবিউস-সানিতে (১২ই জুলাই, ১৮৭৬) আকবরের

সেনাপতি হোসেন কুলি খান জাহান কর্তৃক আকমহল বা রাজমহলে পরাজিত, ধৃত ও নিহত হন (তারিখ-ই-দাউদি, ফেরেশ্‌তা, বদাওনি ও আকবরনামা দ্রঃ)। দাউদ খানের মৃত্যুর সাথে (১৫৭৬ খ্রীঃ) বাংলায় কাররানি বংশের রাজত্ব শেষ হয়।

১৩১. আকবরের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে যখন তিনি (মুনিম খান) বাংলার সুলতান সুলায়মান কাররানির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন সেই-সময় তাঁকে (মুনিম খানকে) জৌনপুরের জায়গীরে নিযুক্ত করা হয়। উক্ত সন্ধি অনুসারে সুলায়মান কাররানি আকবরের নামে খোতবা পাঠ ও মুদ্রা প্রচলনে স্বীকৃত হন। দাউদের নিকট থেকে হাজিপুর ও পাটনা দখলের পর আকবর ৯৮২ হিজরীতে মুনিমকে বিহারের গবর্নর নিযুক্ত করেন ও দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য তাঁকে আদেশ দেন। রাজনৈতিক বিষয়সমূহ সমাধানের উদ্দেশ্যে মুনিম গৌড়ের বিপরীত দিকে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে টাণ্ডায় যান এবং মুহম্মদ কুলি খান বারলাসকে দাউদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য প্রেরণ করেন। দাউদের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে মুহম্মদ কুলি সাতগাঁও পর্যন্ত যান; কিন্তু দাউদ সেখান থেকে উড়িষ্যায় পশ্চাদপসরণ করেন। সরমদি নামক দাউদের এক বন্ধু বিদ্রোহ করায় মুহম্মদ কুলি খান বারলাস সাতগাঁও থেকে 'যসর' (যশোর) জেলা আক্রমণ করেন; কিন্তু অকৃতকার্য হয়ে সাতগাঁও ফিরে যান। অল্পদিন পরে মুহম্মদ কুলি খান মিদনিপুরে (মেদিনিপুরে) মারা যান। টোডরমলসহ মুনিম খান উড়িষ্যা আক্রমণ করেন এবং মুঘলমারি বা টিকারয়ের যুদ্ধে দাউদকে পরাজিত করেন। অতঃপর, দাউদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সন্ধি অনুসারে দাউদ বাংলা ও বিহার আকবরকে দেন। ৯৮৩ হিজরীতে মুনিম ম্যালেরিয়ায় গৌড়ে মারা যান। জৌনপুরের বৃহৎ পুল তিনি তৈরী করেছিলেন। জ্ঞাতব্য ও উল্লেখযোগ্য যে, মুনিম খান-ই-খানানের অধীনস্থ মুরাদ খান নামক অন্য একজন সেনাপতি ৯৮২ হিজরীতে ফত্‌হাবাদ (ফরিদপুর) আক্রমণ করেন এবং এই

স্থান ও সরকার বোগ্‌লা জয় করেন। ৯৮৮ হিজরীতে ফত্‌হাবাদে (ফরিদপুরে) মুরাদ খানের মৃত্যুর পর ফত্‌হাবাদ ও ভোস্‌নার জমিদার মুকুন্দ তাঁর পুত্রদের এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন ও বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাদের হত্যা করেন ('আইন'— ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড ৩১৮ পৃঃ ; 'বদাওনি', ১৭৮ ও ১৮০ পৃঃ)।

১৩২. এঁর (টোডরমলের) জীবনীর জন্য ব্লকম্যান কর্তৃক 'আইন-ই-আকবরী'র অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩২ পৃঃ দ্রঃ। তিনি জাতিতে ক্ষেত্রি ছিলেন ও চার হাজারি মনসব লাভ করেছিলেন। তিনি আকবরের নায়েব-দেওয়ান বা সহকারী রাজস্ব-সচিব ছিলেন। তিনি তাঁর বাদশাহের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন এবং তাঁর সম্বন্ধে আকবরের উচ্চ ধারণা ছিল। বাদশাহের নির্দেশ অনুসারে তৈরী তাঁর (টোডরমলের) নাম-সংস্পৃষ্ট রাজস্ব-তালিকা সুপরিচিত ও 'আইন-ই-আকবরী'তে সেটা দেয়া আছে (আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড,—জেরেটের অনুবাদ, ৮৮ পৃঃ এবং ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩৬৬ ও ৩৪৮ পৃঃ)। দেখা যায়, যে বৃহৎ রাজস্ব-তালিকা টোডরমলকে বিখ্যাত করেছে সেটি তিনি এবং আকবরের দেওয়ান বা প্রধান রাজস্ব-সচিব মুজফ্‌ফর খান যুক্তভাবে তৈরী করেছিলেন (বদাওনি দ্রঃ)।

১৩৩. তাঁর (খান 'আলিমের) নাম ছিল চালমাহ বেগ। তিনি হুমায়ুনের 'সফরচি' বা বেয়ারা ছিলেন। হুমায়ুন তাঁকে মীর্জা কামরানের সঙ্গে মক্কা প্রেরণ করেন। কামরানের মৃত্যুর পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন ও আকবর তাঁকে সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ ক'রে 'খান 'আলিম' উপাধি দেন। আকবর যখন দাউদ শাহের বিরুদ্ধে পাটনায় যান, সেইসময় খান 'আলিম সৈন্যবাহিনীর একাংশের সেনাপতি ছিলেন এবং নৌকাযোগে গণ্ডকের মোহনার দিকে অগ্রসর হয়ে নদী পার হতে সক্ষম হন ('আইন'— ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩৭৮-৩৭৯ পৃঃ)।

১৩৪. মোকাসা রেলওয়ে ঘাট স্টেশনের দু'মাইল দক্ষিণে দরিয়াপুর নামক একটি স্থান আছে। বাংলার সুলতান দাউদ শাহের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে আকবর নৌকাযোগে পাটনা থেকে সম্ভবতঃ এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। পাটনা ও হাজীপুর দুর্গদ্বয়ের পতনের পর বিহার কার্যতঃ দাউদের হস্তচ্যুত হয়ে যায় (বদাওনি, ২য় খণ্ড, ১৮০-১৮১ পৃঃ) এবং কটকের সন্ধি অনুসারে দাউদ বাংলাও দিয়ে দেন।

১৩৫. বর্ধমানের ভেতর দিয়ে মাদারন ও মিদনিপুর অতিক্রম ক'রে উড়িষ্যার পরগণা চিত্তুয়া পর্যন্ত টোডরমল অগ্রসর হয়েছিলেন ব'লে মনে হয়, এবং পরে মুনিম খান এখানে টোডরমলের সঙ্গে যোগদান করেন। এই সময় দাউদ খান বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হরিপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন (আকবর-নামা দ্রঃ)।

১৩৬. এই সময় খান-ই-খানান রাজনৈতিক বিষয়সমূহের ব্যবস্থা করার জন্য টাণ্ডায় ছিলেন। টোডরমলের নিকট থেকে সাহায্যের আবেদন পেয়ে খান-ই-খানান অনতিবিলম্বে টাণ্ডা ত্যাগ করেন এবং বীর-ভূম, বর্ধমান ও মিদনিপুর অতিক্রম ক'রে দ্রুত উড়িষ্যার চিত্তুয়া পরগণায় (যেখানে টোডরমল ছিলেন) যান।

১৩৭. এই যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণীর জন্য 'আকবরনামা', 'তবকত-ই-আক-বরী' ও 'বদাওনি' দেখুন। 'আকবরনামা' অনুসারে টাকাধি বা টাক্‌রয় নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয়েছিল (সুবর্ণরেখা নদী থেকে দুই মাইল দূরে জলেশরের নিকটে)। অধ্যাপক ব্লকম্যান টাক্‌রয় বা টুকারয়ের সন্নিকটে মুঘলমারি নামক একটি স্থানের সন্ধান পেয়েছেন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩৭৫ পৃঃ এবং 'বদাওনি', ২য় খণ্ড, ১৯৩ পৃঃ)।

অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেন, "টোডরমল বর্ধমান থেকে মাদারন অতিক্রম ক'রে চিত্তুয়া পরগণায় পৌঁছান। সেখানে মুনিম খান পরে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। বাংলা ও উড়িষ্যার মাঝখানে

হরিপুর নামক স্থানে দাউদ সুরক্ষিত ঘাঁটি করেছিলেন। ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর টোডমল বিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবনে নেতৃত্ব করেন ও ভদ্রক শহরে পৌঁছান। অব্যবহিত পরে তিনি মুনিমকে তাঁর সঙ্গে যোগদানের জন্য সংবাদ দেন। কারণ, দাউদ কটকের সন্নিকটে সৈন্য সংগ্রহ করেছিলেন। সমগ্র বাদশাহী বাহিনী কটকে অগ্রসর হয় এবং সেখানে শান্তি-চুক্তি সম্পাদিত হয়।"

১৩৮. 'সওয়ান-ই-আকবরী'তে বিবৃত হয়েছে যে, যখন হান্সো কর্তৃক বায়াজিদ নিহত হন, সেইসময় গুজরা খান বিহারে বায়াজিদের পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার চেষ্টা করেন। উল্লেখযোগ্য যে, কটকের পাঁচ মাইল দূরে গুজারপুর নামক একটি গ্রাম আছে এবং সেখানকার একটি পরিবার গুজরা খানকে তাদের পূর্বপুরুষ ব'লে দাবী করে।

১৩৯. 'আকবরনামা'য় দেখা যায়, টাক্‌রয়ের যুদ্ধের পর টোডরমল ভদ্রক পর্যন্ত দাউদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তখন মুনিম খান আহত অবস্থায় পিছনে থেকে যান। এই সময় দাউদ কটকে তাঁর সৈন্যবাহিনী একত্রিত করায় টোডরমল মুনিম খানকে যোগ দিতে সংবাদ দেন। সংবাদ পেয়ে আহতাবস্থাতেই মুনিম খান সমগ্র বাদশাহী বাহিনীসহ কটক অগ্রসর হন ও সেখানে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী দাউদ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা ও বিহারের অধিকার আকবরকে দেন ও নিজের জন্য উড়িষ্যা রাখেন। টাক্‌রয়ের যুদ্ধকে (৩রা মার্চ, ১৫৭৫ খ্রীঃ) বদাওনি 'বিচওয়া' ব'লে উল্লেখ করেছেন—কার্যতঃ চরম নিষ্পত্তি-মূলক ঘটনা; কারণ, এই যুদ্ধের ফলে বাংলা ও বিহারের রাজত্ব মূলতঃ আফগানদের পরিবর্তে মুঘলদের হাতে চলে যায়।

১৪০. স্পষ্টতঃ নকলনবিশ 'মহানদী'র পরিবর্তে 'চিন' লিখেছেন। শিকস্তা লিখনে 'চিন' ও ফার্সীতে 'মহানদী' একই রকম মনে হতে পারে।

১৪১. কটকের সন্ধি অনুযায়ী বাংলার আফগান সুলতান দাউদ শাহ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা ও বিহার মুঘল বাদশাহ আকবরকে সমর্পণ করেন এবং নিজে উড়িষ্যা রাখেন। এই সময় কটক দুর্গের বিপরীত দিকে মহানদীর তীরে মুনিম খান-ই-খানান অনুষ্ঠিত দরবারের আকর্ষণীয় বিবরণী 'বদাওনি' দিয়েছেন। মুনিম ও দাউদ উভয়েই এই রাজকীয় অনুষ্ঠানে মার্জিত বীরত্ব ও ঔদার্য দেখিয়েছিলেন।

১৪২. অর্থাৎ, ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ।

অধ্যাপক ব্লকম্যান তাঁর 'আইন-ই-আকবরী'র অনুবাদে (১ম খণ্ড, ৩৭৬ পৃঃ) ৯৮৩ হিজরী বা ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ে ম্যালেরিয়ায় মৃত চৌদ্দজন প্রধান মুঘল কর্মচারীর তালিকা দিয়েছেন ('আকবরনামা' থেকে সংগৃহীত)। বদাওনিও একটি তালিকা দিয়েছেন।

১৪৩. মুনিম খান খান-ই-খানানের মৃত্যুর পর খান জাহান বাংলায় আকবরের সামরিক শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত হন। তাঁর অব্যবহিত অধীনস্থ সেনাপতি ছিলেন রাজা টোডরমল। তিনি (খান জাহান) বৈরাম খান খান ই-খানানের এক ভাইয়ের পুত্র ছিলেন। তাঁর জীবনবৃত্তান্তের জন্য ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী', ১ম খণ্ড, ৩২৯ পৃঃ ও 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রষ্টব্য।

ভাগলপুরে আমীরগণ খান জাহানের দরবারে হাজির হয়েছিলেন।

এই সময় থেকে সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ-বিহার একজন স্বতন্ত্র মুঘল গবর্নরের অধীনে দেয়া হয়। অনুরূপভাবে বাংলাতেও একজন স্বতন্ত্র গবর্নর নিয়োগ করা হয়। বিহারের গবর্নর পদ সাধারণতঃ এর পর থেকে অধিকতর দায়িত্বসম্পন্ন ও আর্থিক লাভজনক বাংলার গবর্নরির প্রথম পদক্ষেপরূপে গণ্য হোত।

১৪৪. নকলনবিশ ভুলক্রমে 'তুরবতীর' স্থলে 'তিরহুতি' লিখেছেন। তিনি (খাজা মুজফ্‌ফর আলী তুরবতী) আকবরের অধীনে চৌসা

থেকে তেলিয়াগড়ি পর্যন্ত বিহারের গবর্নর ছিলেন। দাউদ খানের অধীনে আফগানেরা যখন আকমহলে (পরে রাজমহল বা আকবর-নগরে) সুরক্ষিত ঘাঁটিতে অবস্থান করছিল, সেইসময় বাংলার মুঘল-গবর্নর খান জাহান তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। খান জাহানকে এই অভিযানে সাহায্য করার জন্য আকবর তুরবতীকে আদেশ দেন। তিনি এক সময় আকবরের অধীনে রাজস্ব-সচিব ছিলেন এবং টোডরমল তাঁর অধীনে ছিলেন। তিনি ও তাঁর সহকারী টোডরমল 'জামি-হাসিলি-হাল' নামক আকবরের রাজস্ব-তালিকা তৈরী করেছিলেন ও তদ্বারা বৈরাম খানের আমল থেকে প্রচলিত 'জামি-রকমি' পরিবর্তিত হয়। তুরবতী পূর্বে বৈরামেরও দেওয়ান ছিলেন। বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত আগ্রার পুরাতন জামে মসজিদ তিনি তৈরী করেছিলেন। বিদ্রোহী মাসুম খান টাণ্ডায় তাঁকে হত্যা করেন (তাঁর পূর্ণ জীবনীর জন্য ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী', ১ম খণ্ড, ৩৪৬ পৃঃ এবং 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রষ্টব্য।

১৪৫. নকলনবীশ ভুলক্রমে 'বৈরাম'-এর স্থলে 'বাহ্‌রাম' লিখেছেন।

১৪৬. অর্থাৎ, রাজমহল বা আকবর নগর—মানসিংহের পূর্বে শের শাহ এই স্থান নির্বাচন করেছিলেন।

১৪৭. 'খান-ই-খানান' উপাধির পরেই গুরুত্বপূর্ণ উপাধি 'খান জাহান'।

১৪৮. ৯৮৪ হিজরীর ১৫ই রবিউস-সানির অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে আকমহল বা আগমহলে (পরে রাজমহল বা আকবর নগরে) এই চূড়ান্ত নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ শাহ বা দাউদ খান সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যান এবং এই প্রদেশগুলোর উপর মুঘল-প্রভুত্বের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় ও বাংলা বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবায় পরিণত হয় ও বাংলার স্বাধীন মুসলিম সালতানাত নির্মূল হয়।

এই যুদ্ধের পূর্ণ বিবরণীর জন্য সমকালীন ইতিহাস 'আকবর-নামা' ও 'বদাওনি' দেখুন।

১৪৯. এতদ্বারা এই মুঘল সেনাপতি খান জাহানের বীরধর্মের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষ্য না ক'রে পারা যায় না। তাঁর অব্যবহিত পূর্বসূরী খান-ই-খানানের এক-চতুর্থাংশ বীরধর্মবোধ যদি এঁর থাকতো, তা'হলে তিনি এরূপ হিংস্র ও কাপুরুষোচিত নৃশংসতা করতে পারতেন না। দাউদ শাহের মতো যোগ্য ও বীর প্রতিদ্বন্দ্বীর এতদপেক্ষা মহৎ ব্যবহার প্রাপ্য ছিল। খান জাহানের প্রভু মহান আকবর এই প্রকার দুষ্কার্যের প্রতিরোধের ব্যবস্থা আগে থেকে না করায় তাঁর স্মৃতিও কলঙ্কিত হয়।

১৫০. দক্ষিণ-বিহারের এই প্রসিদ্ধ দুর্গ (রোটাস দুর্গ) ৯৪৫ হিজরীতে শের শাহ অধিকার করেন। আকবরের আমলে এই দুর্গের অবস্থার বিবরণীর জন্য 'বদাওনি' দ্রষ্টব্য। তাঁর (শের শাহের) ও তাঁর পুত্র সলিম শাহের রাজত্বকালে ফতেহ খান বাতনি এই দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। পরে এটা সুলায়মান কাররানি ও জুনায়েদ কারা-রানির অধিকারে আসে। জুনায়েদ কাররানি সৈয়দ মুহম্মদকে দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। বিহারের মুঘল-গবর্নর মুজফফর খান কর্তৃক কঠোর অবরোধের ফলে তিনি (সৈয়দ মুহম্মদ) শাহবাজ খানের নিকট পলায়ন করেন। এই সময় আকবর শাহবাজ খানকে পাঠিয়েছিলেন রাজা গজপতিকে শাস্তি দেয়ার জন্য (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী', ১ম খণ্ড, ৩৯৯ পৃঃ)। সৈয়দ মুহম্মদ এই ব্যক্তির নিকট দুর্গ সমর্পণ করেন (৯৮৪ হিঃ)। সেই বৎসরেই আকবর রোটাসের গবর্নররূপে মাহবুব আলী খান রাহুতারিকে নিয়োগ করেন এবং শাহবাজ খান তাঁর নিকট দুর্গ সমর্পণ করেন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইনে'র ১ম খণ্ড, ৪২২ পৃঃ দ্রঃ)।

১৫১. তিনি (মাসুম খান) কালাপাহাড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এঁর কর্মজীবন সম্পর্কে ব্লকম্যান অনূদিত 'আইনে'র ১ম খণ্ড, ৪৩১ পৃঃ; 'বদাওনি' ও 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রঃ।

১৫২. ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৩৯ পৃঃ।

১৫৩. আকমহল বা রাজমহলের যুদ্ধে (১৫৭৬ খ্রীঃ) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন সুলতান দাউদ শাহ পরাজিত ও নিহত হওয়ার পর খান জাহান সাতগাঁও যান। সেখানে দাউদের পরাজিত সৈন্যদলের অবশিষ্টাংশ জামশেদ ও মিটির অধীনে ছিল; খান জাহান তাদের পরাজিত ক'রে সাতগাঁও মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দাউদের মাতা খান জাহানের নিকট আবেদন পেশ করতে আসেন। ...... দাউদের পরাজয় ও মৃত্যুর পরেও বাংলা সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয় নাই। কারণ ভাটিতে (সুন্দরবন ও মেঘনার তীরবর্তী অঞ্চলে) গোলযোগ আরম্ভ হয়। আফগানরা এখানে করিমদাদ, ইব্রাহিম ও ইশা খানের অধীনে একত্রিত হয়েছিল। আবুল ফজল ইশা খানকে 'মরজবান-ই-ভাটি' আখ্যা দিয়েছেন (ব্লকম্যান অনূদিন 'আইন-ই-আকবরী', ১ম খণ্ড, ৩৩০ ও ৩৪৬ পৃঃ)।

১৫৪. তাঁর (খান জাহানের) টাণ্ডার নিকটবর্তী স্বপ্রতিষ্ঠিত 'সিহাতপুর' (স্বাস্থ্যনিবাস) শহরে মৃত্যু হয়।

১৫৫. ৯৮৮ হিজরীতে অকবর কর্তৃক আজীজ (খান আজিম মীর্জা কোকাহ্) পাঁচ হাজার সৈন্যের সেনাপতি পদ লাভ করেন এবং 'আজম খান' উপাধি পান। ৯৮৮ হিজরীতে বাংলা ও বিহারে বিদ্রোহ দমনের জন্য এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ তাঁকে প্রেরণ করা হয়। ৯৯০ হিজরীতে তাঁকে আবার সেখানে পাঠানো হয়েছিল। এবারে তিনি বাংলার প্রবেশদ্বার তেলিয়াগড়ি দখল করেন। তিনি বিদ্রোহী মাসুম-ই-কাবুলী ও মজনু খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আফগান কতলু উড়িষ্যা ও বাংলার একাংশ জয় করায় তিনি তাঁর বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করেছিলেন। অসুস্থ হয়ে তিনি বিহারে ফিরে যান এবং বাংলার সৈনাপত্যের ভার শাহবাজ খান কাম্বাকে দিয়ে যান। তাঁর সম্বন্ধে আকবর বলতেন, "আমার ও আজীজের

মধ্যে একটি ক্ষুদ্র-নদী প্রবাহিত, যেটি আমি কখনো অতিক্রম করতে পারি না" (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩২৫ পৃঃ ও 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রঃ)।

১৫৬. শাহবাজ খানের আকর্ষণীয় জীবনীর জন্য ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী', ১ম খণ্ড, ৩৯৯ পৃঃ ও 'মা'সির-উল-উমারা' দেখুন।
মাসুম খান কাবুলী বিদ্রোহী হয়ে ভাটি পলায়ন করেন ও মরজবান-ই-ভাটি ইশা খাঁর আশ্রয় গ্রহণ করেন। শাহবাজ খান তাঁর অনুসরণ করেন, নারায়ণগঞ্জের নিকটে খিজিরপুরে গঙ্গা অতিক্রম করেন, ও ইশা খানের বাসস্থান বখতিয়ারপুর লুঠ করেন; এবং সোনারগাঁও দখল ক'রে ব্রহ্মপুত্রের তীরে শিবির স্থাপন করেন। ইশা খান শান্তির প্রস্তাব করেন ও তা গৃহীত হয়। এই চুক্তি অনুসারে সাব্যস্ত হয় যে, সোনারগাঁয়ে বাদশাহের একজন প্রতি-নিধি থাকবে, মাসুম মক্কা যাবেন ও শাহবাজ ফিরে যাবেন। কিন্তু অধীনস্থ সৈন্যাধ্যক্ষগণ অবাধ্য হওয়ায় এই সন্ধি কার্যকরী হয় নাই ও শাহবাজ খানকে টাণ্ডা ফিরে যেতে হয়।

১৫৭. অর্থাৎ, মুঘল বাদশাহগণ। পূর্বোক্ত টীকা দেখুন।

চতুর্থ পর্ব : তৃতীয় পরিচ্ছেদ (ক)

১. এই প্রথম আমরা 'নাজিম' ও 'দেওয়ান' এই দুই পদের কথা শুনতে পাই। এতদ্বত মুঘল সম্রাটগণ 'সিপাহ্সালার' অথবা 'সির-লস্কর' অথবা 'হাকিম' আখ্যা দিয়ে সামরিক গবর্নর নিযুক্ত করতেন। স্পষ্ট বুঝা যায়, এতদ্বত বাংলায় মুঘলদের অধীনে সামরিক গবর্নরের অধীনে এক প্রকার সামরিক শাসন প্রচলিত ছিল। বিরোধী আফগানদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাওয়ার পর, মুঘল শাসন-কালে সর্বপ্রথম বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলায় বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। তিনি দু'টি স্বতন্ত্র পদ সৃষ্টি করেছিলেন —একটি 'নাজিম' (প্রশাসনিক ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত), অপরটি দেও-য়ান (রাজস্ব ও অর্থ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত)। যদিও এই ব্যবস্থা জাহাঙ্গীরের আমলে কার্যকরী করা হয়েছিল, তথাপি তা আক-বরের রাজত্বকালেই স্থির করা হয়েছিল।

২. রাজা মানসিংহ ছিলেন ভগবান দাসের এক পুত্র। আকবর তাঁকে 'ফরজন্দ' বা 'পুত্র' উপাধি দিয়ে সাত-হাজারি মন্সবে উন্নীত করেন। তাঁর সম্পূর্ণ জীবনীর জন্য ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩৪০ পৃঃ, এবং 'মা'সির-উল-উমারা' ও 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি' দ্রষ্টব্য।

৩. কুতবউদ্দীন কোকলতাশের নাম ছিল শেখ খুবা (কুতবউদ্দীন খান-ই-চিশতি; তাঁর পিতা ছিলেন বদাওনের শেখজাদা; মাতা ছিলেন ফতেহ্পুর সিক্রির শেখ সলিমের এক কন্যা)। তিনি জাহাঙ্গীরের পালক-ভ্রাতা এবং শাহজাদা থাকাকালে খুবাকে 'কুতবউদ্দীন খান' উপাধি দিয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের

পর জাহাঙ্গীর তাকে বাংলার সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন (১০১৫ হিঃ)। সেইসময় শের আফগান আলী কুলী ইস্তাজলু বর্ধমানের জায়গীদার ছিলেন ;এবং বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর তাঁর স্ত্রী মেহেরুন্নিসার (পরে সম্রাজ্ঞী নূরজাহান) প্রতি আসক্ত ছিলেন। শের আফগানকে দিল্লী দরবারে প্রেরণের জন্য কুতবউদ্দীনকে আদেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু, শের আফগান যেতে অস্বীকার করায় কুতব বর্ধমানে যান ও শের আফগান সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। শের আফগান এগিয়ে আসার সময় কুতব ঘোড়ার চাবুক তোলেন। শের আফগান তখন বেগে অগ্রসর হয়ে কুতবের পেটে তরবারি দ্বারা আঘাত করেন। তাতেই কুতবের মৃত্যু হয়। আম্বা খান নামক কুতবের জনৈক অনুচর শের আফগানের মস্তকে তরবারি দ্বারা আঘাত করে ; তাতে শের আফগান নিহত হন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৯৬ পৃঃ ; 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি', ১৯ পৃঃ)।

৪. শের আফগান পারস্যের রাজা দ্বিতীয় ইসমাইলের সফরচি (বাটলার) ছিলেন। ইসমাইলের মৃত্যুর পর তিনি ভারতে আসেন এবং মুলতানে আবদুর রহিম খান-ই-খানানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ও তাঁর নিকট মনসব লাভ করেন। দরবারে হাজির হওয়ার পর মীর্জা গিয়াস তেহরানির কন্যা মেহেরুন্নিসার (পরে নূরজাহান) সাথে শের আফগানের বিবাহ দেন। শাহাজাদা সেলিম মেহেরুন্নিসার প্রেমে পড়েছিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণের পর শের আফগানের মৃত্যু ঘটান। জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের সময় শের আফগান বর্ধমান জায়গীর পেয়েছিলেন। তাঁকে বর্ধমানের আউলিয়া বাহ্রাম সাক্কার মাজারে দাফন করা হয় (ইকবালনামা, ২২ পৃঃ দ্রঃ)।

৫. এঁরা পারস্যের রাজা ছিলেন (নামা-ই-খসরুয়ান, ৯৭ পৃঃ দ্রঃ)।

৬. তিনি (আবদুর রহিম খান-ই খানান) আকবরের অধীনে সিপাহ্সালার বা প্রধান সেনাপতি ছিলেন। সিন্ধু ও গুজরাট বিজয়

তাঁর প্রধান সামরিক কার্য। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং বাবরের আত্মজীবনী ফার্সীতে অনুবাদ করেছিলেন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ ও 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি', ২৮৭ পৃঃ)।

৭. তাঁর প্রকৃত নাম ছিল মীর্জা গিয়াসউদ্দীন মুহম্মদ। তাঁর পিতা খাজা মুহম্মদ শরিফ তাতার সুলতান ও তাঁর পুত্র কাজাক খানের উজীর ছিলেন ও পরে শাহ তাহ্মাস্প তাঁকে (শরিফকে) ইয়াজদের উজীব নিযুক্ত করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর গিয়াস বেগ দুই পুত্র ও এক কন্যাসহ পারস্য থেকে পলায়ন করেন। কান্দাহার অভিমুখে তাঁর স্ত্রীর আর একটি কন্যা হয়—মেহেরুন্নিসা, পরে পৃথিবী বিখ্যাত নূর জাহান ও জাহাঙ্গীরের বেগম। ফতেহ্-পুর সিক্রি পৌঁছানর পর আকবর তাঁকে কাবুলের দেওয়ান ও পরে 'দেওয়ানে বায়ুতাত' পদে নিযুক্ত করেন। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে তিনি 'ইতিমদ-উদ্-দৌলা' উপাধি প্রাপ্ত হন। জাহাঙ্গীরের বাংলার গবর্নর কুতবউদ্দীন খানের সঙ্গে যুদ্ধে বর্ধমানে মেহেরের প্রথম স্বামী শের আফগানের মৃত্যুর পর তাঁকে দিল্লী আনা হয় ও ১০২০ হিজরীতে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বিবাহ হয়। জাহাঙ্গীর প্রথমে তাঁকে নূরমহল ও পরে নূরজাহান উপাধি দেন এবং সেইসঙ্গে তাঁর পিতা গিয়াস বেগ 'উকিলে কুল্' বা প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত হন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫০৮ পৃঃ ও 'ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীরি', ৩, ৫৪ ও ৫৫ পৃঃ দ্রঃ)।

৮. আবুল ফজল উল্লেখ করেছেন যে, উদয়পুর সুবা আজমীরের সরকার চিতোবের অন্তর্ভূ'ত (জেরেট অনূদিত 'আইন', ২য় খণ্ড, ২৭৩ পৃঃ)। বর্ণিত হয়েছে যে, কনস্টান্টিনোপলের মরিসের এক কন্যার সাথে পারস্যের রাজা নওশেরওয়াঁর বিবাহ হয়েছিল এবং এই রানীর গর্ভজাত এক কন্যার উদয়পুর রাজপরিবারে বিবাহ হয়েছিল।

৯. কুতবউদ্দীন খান মোটা মানুষ ছিলেন। সুতরাং এই সময় (পেটে

আঘাত পাওয়ার পর) তাঁর অবস্থা কিরূপ দুঃখজনক হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

১০. 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি'তে (২৪ পৃঃ) আয়না খানকে 'পীর খান', 'বায়বা খান' ও 'দাইবা খান' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. বিখ্যাত সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেকালে ভারতেও ইসলাম নারীকে কী বিপুল মর্যাদা দিয়েছে তা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়। বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর বলতেন, "তাঁকে বিবাহ করার পূর্বে বিবাহের অর্থ আমি জানতাম না। আমি তাঁকে কার্যের ভার দিয়েছি ; যদি আমি প্রত্যহ এক সের মদ ও আধ সের গোশ্‌ত পাই, তাতেই আমি স ষ্ট থাকবো।" একমাত্র খোত্‌বা ব্যতীত অন্য সমস্ত রাজকীয় মর্যাদা নূরজাহান পেয়েছিলেন। রাজ-কার্য নির্বাহের সময় তিনি স্বামীর পাশে থাকতেন ; বাদশাহী ফর-মান ও মুদ্রায় জাহাঙ্গীরের নামের সঙ্গে তাঁর নামও যুক্ত থাকতো। তিনি অনাথ মেয়েদের বিশেষ যত্ন নিতেন ; সেকালে ফ্যাশন প্রবর্তন করতেন ; কক্ষসজ্জা ও ভোজের ব্যবস্থায় তিনি শিল্পীর রুচি প্রকাশ করতেন। তিনি কবি ছিলেন। মহবত খানের হাত থেকে জাহাঙ্গীরকে উদ্ধার করাব সময় তিনি বিপুল সাহস ও তৎপরতার পরিচয় দিয়েছিলেন। লাহোরে তাঁর স্বামীর সমাধিসৌধের নিকটে তাঁর সমাধিসৌধ রয়েছে।

চারটি বাঘ ধরা হয়েছিল। এই বাঘগুলো গুলি ক'রে মারার জন্য নূরজাহান জাহাঙ্গীরের অনুমতি চেয়েছিলেন (তুজুখ, ১৮৬ পৃঃ)। একটি গুলি দ্বারা তিনি দু'টি বাঘ ও আর দু'টি গুলি দ্বারা অন্য দু'টি বাঘকে বধ করেন। তাতেই একজন দরবারী বইতে উল্লি-খিত কবিতাটি বলেছিলেন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫২৪ পৃঃ দ্রঃ)।

১২. ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫০১ পৃঃ এবং 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি', ২৪ পৃঃ দ্রঃ।

১৩. আকবরের বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী আবুল ফজলের ভগ্নী লাডলী

বেগমের সঙ্গে ইসলাম খানের বিবাহ হয়েছিল। ১০২২ হিজরীতে (তুজুখ, ১২৬ পৃঃ) বাংলার গবর্নর থাকাকালে ইসলাম খানের মৃত্যু হয়। তাঁর আসল নাম ছিল শেখ আলাউদ্দীন চিশতি; তিনি ফতেহ্‌পুর সিক্রির আউলিয়া শেখ সলিম চিশতির পৌত্র ছিলেন। তিনি ইসলাম খান উপাধি লাভ করেন এবং ১০১৫ থেকে ১০২২ হিজরী পর্যন্ত বাংলার গবর্নর ছিলেন। ১০১৫ হিজরীতে তিনি বাংলার মুঘল ভাইস্‌রয়ের রাজধানী টাণ্ডা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ৩৩ পৃঃ; মা'সির-উল-উমারা দ্রঃ)।

১৪. আকবরের বন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী শেখ আবুল ফজল আল্লামী ১৫৫১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে (৬ই মুহররম, ৯৫৮ হিঃ) ইসলাম শাহের রাজত্বকালে আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শেখ মুবারকের এক পুত্র। আকবরের অধীনে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং বিভিন্ন জাতি অধ্যুষিত ভারতে মুসলিম শাসন আমলে উদার ও সহনশীল নীতি প্রচলনে আকবরকে সাহায্য করেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং 'আকবরনামা', 'আইন-ই-আকবরী' ও আরো কয়েকটি পুস্তকের গ্রন্থকার। শাহজাদা সেলিমের (পরে বাদশাহ জাহাঙ্গীর) প্ররোচণায় ১৬০২ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে বীরসিংহ তাঁকে হত্যা করে (তাঁর জীবনীর জন্য 'আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, এবং 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রঃ)।

১৫. আবুল ফজল আল্লামীর পুত্র আবদুর রহমান 'আফজাল খান' উপাধি লাভ করেন এবং জাহাঙ্গীর কর্তৃক তাঁর রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে ইসলাম খান বাংলার গবর্নর নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর স্থলে বিহারের গবর্নর নিযুক্ত হন (ইকবালনামা, ৩৩ পৃঃ ও মা'সির-উল-উমারা দ্রঃ)।

১৬. ১০১৫ হিজরীতে বাংলার রাজধানী টাণ্ডা থেকে ঢাকা বা জাহাঙ্গীর নগরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের নামানুসারে ঢাকার নাম জাহাঙ্গীর নগর রাখা হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের ভাইস্‌রয়

ইসলাম খান এই নাম রেখেছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীকাল ঢাকা মুঘলদের অধীনে বাংলার রাজধানী ছিল (মাঝে মাত্র কয়েক বৎসরের জন্য রাজমহলে স্থানান্তরিত হয়েছিল)।

১৭. শেখ কবীর শুজাইত খানের আসল নাম ছিল 'শেখ কবীর চিশতি' এবং তাঁর উপাধি ছিল 'শুজাইত খান রুস্তমে জমান'। মুদ্রিত ফার্সী সংস্করণে 'শেখ কবীর' ও 'শুজাইত খানের' মধ্যে ভুলক্রমে ফার্সী 'ওয়াও' (و) অক্ষর মুদ্রিত হওয়ায় দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি ব'লে ভ্রা ' ধারণা হোতে পারে (পূর্বতন টীকা দ্রঃ)। তিনি বাংলার গবর্নব ইসলাম খান চিশতির আত্মীয় ছিলেন। তিনি প্রথমে 'শুজাইত খান' উপাধি লাভ করেন এবং শাহজাদা সেলিম সিংহাসনে আরোহণের পব বাংলায় ওসমান খানের অধীনস্থ আফগানদের দমন করার ব্যাপারে বিশেষ কার্য করায় তাঁকে 'রুস্তমে জমান' উপাধি দেন ('ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি', ৬৪ পৃঃ এবং 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রঃ)।

১৮. এঁর উপাধি ছিল 'কিশওয়ার খান'; পুস্তকে ভুলক্রমে 'কির খান' মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর আসল নাম ছিল শেখ ইব্রাহিম। তিনি বাংলার গবর্নর শেখ খুবার (কুতবউদ্দীন খান-ই-চিশতির) পুত্র। ১০১৫ হিজরীতে তিনি ১০০০ পদাতিক ও ৩০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক হন এবং বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট 'কিশওয়ার খান' উপাধি লাভ করেন। তিনি কিছুকাল রোটাসের গবর্নর ছিলেন এবং ১০২১ হিজরীতে বাংলায় শুজাইত খানের (শেখ কবীর চিশতির) অধীনে আফগান ওসমান খান লোহানির বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন (ইকবালনামা, ৬১ ও ৬৮ পৃঃ; 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রঃ)।

১৯. ৩ নম্বর টীকা দ্রষ্টব্য।

২০. আহমদ খান কাবুলির দুই পুত্র—মকবুল্লা খান ও আবদুল বাকার। এঁদের উপাধি ছিল 'ইফতিখার খান'। এদের কারো কথা উল্লেখ

করা হয়ে থাকতে পারে (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৬৫-৪৬৬ পৃঃ দ্রঃ)।

২১. সৈয়দ আদম বাড়্হা বাড়হের সৈয়দ মাহমুদের (যিনি আকবরের অধীনে কাজ করেছিলেন) পৌত্র। বাড়্হা সৈয়দদের অনেকে মুঘল বাদশাহদের নিকট মর্যাদাজনক 'খান' উপাধি লাভ করেছিলেন। সেকালে ভারতীয় মুসলমান আমীরদের এটাই ছিল সর্বোচ্চ উপাধি। মর্যাদায় এর উপরে ছিলেন শাহজাদাগণ, খান-ই-খানান ও আমীর-উল-উমারা (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩৯২ পৃঃ ও 'আলমগীরনামা' দ্রঃ)।

২২. শেখ আচ্ছা ছিলেন শেখ হাসান বা হাসনু ওরফে মুকর্‌রব খানের ভ্রাতুষ্পুত্র। হাসান ১০২৭ হিজরীতে বিহারের গবর্নর ছিলেন (ব্লকম্যান অ দিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫২১ ও ৫৪৩ পৃঃ)।

২৩. শেখ বায়াজিদ (মোয়াজ্জম খান) ফতেহপুর সিক্রির শেখ সলিম চিশতির পৌত্র ছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁকে দিল্লীর সুবাদার নিযুক্ত করেন। তাঁর পুত্র মুকররম খান বাংলার ভাইস্‌রয় ইসলাম খানের জামাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। তিনি ইসলাম খানের অধীনে কোচ-হাজো ও খুর্দা জয় করেন। তিনি উড়িষ্যার ও পরে বাংলার গবর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন (মা'সির-উল-উমারা দ্রঃ)।

২৪. ভাটি, অর্থাৎ সুন্দরবন এবং ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার তীরবর্তী অঞ্চল। প্রকৃতপক্ষে ঘোড়াঘাট (রংপুর) থেকে দক্ষিণ দিকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত অঞ্চল ওসমানের অধীনস্থ ছিল ব'লে মনে হয়। 'কোহিস্তানে ঢাকা', ও 'বেলায়েতে ঢাকা'য় তাঁর বাসস্থান ছিল ব'লে ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫২০ পৃঃ)। কিন্তু তাঁর পিতা ইশা খানের বাসস্থান খিজিরপুরের সন্নি-কটে বখতারপুরে ছিল ব'লে উল্লিখিত হয়েছে (ঐ, ৩৪৩ পৃঃ)। বর্তমান নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তরে খিজিরপুর অবস্থিত ব'লে চিহ্নিত হয়েছে। এরই সন্নিকটে সপ্তদশ শতাব্দীতে ঢাকার মুঘল ভাইস্‌রয় মীর জুমলার তৈরী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এখানে

এখনো একটি 'মকবেরা' আছে ; জাহাঙ্গীরের এক কন্যা এখানে বিশ্রাম করতেন মনে করা হয়। এখানে মুসলমান সরকারের প্রধান নৌঘাঁটি ছিল। স্থানটি গঙ্গা, লক্ষ্যা ও ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। খিজিরপুরের প্রায় ত্রিশ মাইল উত্তরে এক মাইলের মধ্যে 'বখতারপুর' ও 'ঈশ্বরপুর' নামে দু'টি গ্রাম আছে ; কিন্তু এখানে কোনো ধ্বংসাবশেষ নাই (J. A. S., ১৮৭৪, ২১১-২১৩ পৃঃ দ্রঃ)। দুর্গম স্থান বিধায় আফগানরা এই স্থানটিকে তাদের শেষ ঘাঁটি হিসেবে নির্বাচিত করেছিল। এখানকার অরণ্য ও অসংখ্য নদীনালার আশ্রয়ে তারা বহুদিন মুঘলশক্তি প্রতিরোধ করেছিল। আকবরের আমলের মুঘল সামরিক বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদের প্রধান মাসুম খান কাবুলী (তিনি তুরবতি সৈয়দ ছিলেন ও তাঁর চাচা হুমায়ূনের অধীনে উজীর ছিলেন) ভাটি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুজফ্‌ফর ও শাহবাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অবশেষে ১০০৭ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয় (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৩১ পৃঃ)।

২৫. সম্ভবতঃ ক্ষুদ্র লক্ষ্যা নদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই নদীর তীরে বর্তমান নারায়ণগঞ্জ অবস্থিত এবং এর নিকটে খিজিরপুর ও বখতারপুর অবস্থিত (ইকবালনামা, ৬১ ও ৬৪ পৃঃ)।

২৬. 'তুজুখে' (১০২ পৃঃ) উল্লিখিত হয়েছে যে, কিশওয়ার খান (বাংলার প্রাক্তন গবর্নর কুতবউদ্দীন খানের পুত্র), ইফতিখার খান, সৈয়দ আদম বার্‌হা, মুকররব খানের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ আচ্ছা, মুতামিদ খান ও ইহ্‌তিমাম খান সকলে ওসমান খানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় শুজাইতের নেতৃত্বাধীনে ছিলেন। সৈয়দ আদম, ইফতিখার ও শেখ আচ্ছা নিহত হন ('তুজুখ', ১৩২ পৃঃ)। বাংলার পূর্বতন গবর্নর মোয়াজ্জম খানের এক পুত্র আবদুস সালাম খান বাদশাহের দলে যোগদান করেন ও ওসমানের পশ্চাদ্ধাবন করেন (ইকবালনামা, ৬১ ও ৬৪ পৃঃ দ্রঃ)।

২৭. গ্রন্থকারের এই মন্তব্য অন্যায় ও অসৌজন্যমূলক। ওসমানের অধীনস্থ আফগানরা নিজেদের বাসস্থান বা আশ্রয়স্থলের জন্য যুদ্ধ করছিল ও সেই কারণে তাদের প্রতি এই প্রকার অপমানকর মন্তব্য অশোভন।

২৮. 'তুজুখে' হাতীর নাম 'গজপতি'; 'ইকবালনামা'য় (৬২ পৃঃ) 'বখ্‌তা'।

২৯. শুজাইত খানের নাম ছিল 'শেখ কবীর চিশ্‌তি' এবং তাঁর উপাধি ছিল 'শেখ শুজাইত খান রুস্তমে জমান'। তিনি বাংলার গবর্নর ইসলাম খানের আত্মীয় ছিলেন ও তাঁর অধীনে কার্য করেছিলেন। লোহানি আফগান ওসমান খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাদশাহী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন'. ১ম খণ্ড, ৫২০ পৃঃ ; 'তুজুখ' ; 'মা'সির-উল-উমারা', ৬৪ পৃঃ দ্রঃ)। পরে তিনি বিহারের গবর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

৩০. 'মখজানি-আফগানি'র বিবরণী অনুযায়ী দেখা যায়, খাজা ওসমান ছিলেন মিয়া ইশা খান লোহানির পুত্র। কুতব খানের মৃত্যুর পর ইশা খান উড়িষ্যা ও দক্ষিণ-বঙ্গের আফগানদের নেতা ছিলেন। ওসমান তাঁর ভ্রাতা সুলায়মানের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। সুলায়মান কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন ও এক যুদ্ধে রাজা মানসিংহের পুত্র হিম্মত সিংকে নিহত করেন। তিনি (সুলায়মান) ব্রহ্মপুত্র নদের নিকটবর্তী অঞ্চল অধিকার করেছিলেন ও সংলগ্ন অঞ্চলসমূহের রাজাদের দমন করেছিলেন। ওসমান তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে রাজা মানসিংহের নিকট থেকে ৫/৬ লক্ষ টাকা পরিমাণ রাজস্বের জমি উড়িষ্যা, সাতগাঁও ও পরে পূর্ববঙ্গে পেয়েছিলেন। তাঁর বাসস্থান 'কোহিস্তানে ঢাকা', 'বেলায়েতে ঢাকা' ও 'ঢাকা' নামে উল্লিখিত হয়েছে। ওসমানের সঙ্গে বাদশাহী সেনাপতি শুজাইত খানের যুদ্ধ ঢাকা থেকে ১০০ ক্রোশ দূরে ১০২১ হিজরীর ৯ই মুহররম তারিখে (২রা মার্চ, ১৬১২ খ্রীঃ) হয়েছিল। স্টুয়ার্টের মতে, এই যুদ্ধ উড়িষ্যার সুবর্ণরেখা নদীর তীরে

হয়েছিল—এটা অসম্ভব। ওসমানের ভ্রাতা ওয়ালি বশ্যতা স্বীকার করার পর উপাধি ও জায়গীর লাভ করেছিলেন এবং এক হাজার সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষের পদ পেয়েছিলেন। 'মা'সিরে'র বিবৃতি অনুসারে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫২০ পৃঃ; 'মখজান-ই-আফগানী', ও 'ইকবালনামা', ৬১ পৃঃ দ্রঃ)।

৩১. আবুল মোয়াজ্জম খান দিল্লীর সুবাদার ছিলেন ('আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৪৯৩ পৃঃ)।

৩২. তিনি (সৈয়দ আবু বকর) জাহাঙ্গীরের অধীনে আসাম সীমান্তে জামধাড়াস্থ মুঘল ঘাঁটির সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

৩৩. তিনি (ইব্রাহিম খান ফতেহ্ জং) মীর্জা গিয়াস বেগের কনিষ্ঠ পুত্র ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতা ছিলেন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫১২ পৃঃ)।

৩৪. ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫১২ পৃঃ দ্রঃ। তিনি (আহমদ বেগ খান) সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের পিতা গিয়াস বেগের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ শরিফের এক পুত্র ছিলেন।

৩৫. জাহাঙ্গীরের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে যখন পারস্য কান্দাহার আক্রমণের উদ্যোগ করে, সেইসময় তিনি খান জাহানকে মুলতানের গবর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর (জাহাঙ্গীরের) রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে পারস্যের রাজা শাহ আকবর চল্লিশ দিন কান্দাহার অবরোধের পর ঐ নগর দখল করেন। পরামর্শের জন্য খান জাহানকে দরবারে আহ্বান করা হয় এবং শাহজাদা খুর্‌রমকে (শাহজাহানকে) সৈন্যবাহিনীসহ কান্দাহার পুনরায় জয়ের জন্য প্রেরণ করা সাব্যস্ত হয়। ইতিমধ্যে শাহজাহান বিদ্রোহ করেন এবং কান্দাহার অভিযানে প্রেরণ করা হয় নাই (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫০৩-৫০৪ পৃঃ দ্রঃ)।

৩৬. এরা (আহাদি সৈন্যরা) নিয়মিত, অনিয়মিত ও সাহায্যকারী (ভাড়াটে) সৈন্যদের মাঝামাঝি এক সৈন্যদল। আকবরের অধীনে

এই সৈন্যদল তৈরী হয়েছিল (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ২৪৯ পৃঃ দ্রঃ)। জয়নুল আবেদিন ছিলেন (তৃতীয়) আসফ খানের এক পুত্র (ঐ ৪১২ পৃঃ দ্রঃ)।

৩৭. বুরহানপুর দক্ষিণের একটি শহর। দক্ষিণে সামরিক অভিযানের সময় কিছুকাল বুরহানপুরে মুঘলদের সদর দফতর ছিল।

৩৮. মাণ্ডো একটি সরকার বা জেলার নাম; সরকার মাণ্ডোর একটি শহরের নামও মাণ্ডো। এটি সুবা মালোয়ার অন্তর্গত (জেরেট অনূদিত 'আইন', ২য় খণ্ড, ২০৬ পৃঃ দ্রঃ)।

৩৯. ঢোলপুর চম্বল নদীর বাম তীরে আগ্রা থেকে ২০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত (ব্লকম্যান অনূদিত আইন, ১ম খণ্ড, ৩৫৭ পৃঃ)।

৪০. দরিয়া খান রোহিলা দক্ষিণে শাহজাহানের অধীনে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫০৪-৫০৫ পৃঃ)।

৪১. নূরমহল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের বেগম সুপ্রসিদ্ধ নূরজাহানের আর এক নাম।

৪২. শের আফগান ছিলেন নূরজাহানের প্রথম স্বামী। তাঁর ঔরসে নূরজাহানের লাড্‌লী বেগম নাম্নী এক কন্যা ছিল। জাহাঙ্গীরের পঞ্চম পুত্র শাহজাদা শহরিয়ারের সাথে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। শাহজাহান বা শাহজাদা খুররম ছিলেন জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র। জাহাঙ্গীরের ঔরসে নূরজাহানের কোনো সন্তান হয় নাই।

৪৩. অর্থাৎ, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান।

৪৪. পারস্যের রাজা শাহ তাহ্‌মাস্পের (৯৩০-৯৮৪ হিঃ) ভ্রাতুষ্পুত্র সুলতান হোসেন মীর্জার তৃতীয় পুত্র মীর্জা রুস্তম সাফাভী। তিনি ৯০৫ হিজরীতে শাহ তাহ্‌মাস্পের অধীনে কান্দাহারের গবর্নর ছিলেন। মীর্জা রুস্তমের কন্যার সঙ্গে জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা পারভেজের বিবাহ হয়েছিল। তিনি কান্দাহার আক্রমণ করেন; কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছিল। ১০২১ হিজরীতে জাহাঙ্গীর তাঁকে থাট্টার গবর্নর নিযুক্ত করেন; পরে শশ্‌হাজরীতে

উন্নীত হ'য়ে এলাহাবাদের গবর্ন'র হন এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বের একবিংশব ৎসবে বিহারের গবর্ন'র হন। ১০৫১ হিজরীতে আগ্রায় তাঁর ়ত্যু হয়। তাঁর তৃতীয় পুত্র মীর্জা হাসান-ই-সাফাভী জাহাঙ্গীরের অধীনে কোচের গবর্নর ছিলেন এবং ১০৫৯ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। মীর্জা হাসানের পৌত্র মীর্জা শাফ্‌সেকান বাংলায় যশোরের ফৌজদার ছিলেন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড. ৩১৪-৩১৫ পৃঃ এবং 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রঃ)। যশোর শহরের সন্নিকটে মীর্জা নগর নামক স্থানটি সম্ভবতঃ মীর্জা শাফ্‌-সেকানেব ফৌজদারি সদর দফতর ছিল এবং তাঁরই নামানুসারে এই স্থানেব নামকরণ হয়েছে। ১০৭৩ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। মীর্জা শাফসেকানের পুত্র মীর্জা সায়েফ - উদ - দীন সাফাভী আওঙ্গরজেবের অধীনে 'খান' উপাধির মর্যাদা লাভ করেন।

৪৫. 'আইন-ই আকবরী'তে 'হিসার' সরকার (আন্দাজ ১৩৫৪ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ ফিরোজ শাহ তুঘলক 'হিসার' শহর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও তাঁর নামানুসাবে শহরের নাম িল 'হিসারে ফিরোজ শাহ') দিল্লী সুবার অধীনে একটি সরকাররূপে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, এই সরকারে ২৭টি মহল ছিল ও রাজস্ব ছিল ৫,২৫,৫৪,৯০৫ দাম (জেরেট অনূদিত 'আইন', ২য় খণ্ড, ২৯৩ পৃঃ দ্রঃ)।

৪৬. লাহোর সুবার অধীনে (জেরেট অনূদিত 'আইন', ২য় খণ্ড, ৩১৫ পৃঃ) পাঁচটি 'দোয়াব' সরকারের উল্লেখ আছে। এই পাঁচটি সরকার হচ্ছেঃ (১) বেট জলন্ধর দোয়াব সরকার; (২) বারি দোয়াব সরকার; (৩) বেচ্‌নান দোয়াব সরকার; (৪) চেনবত (জেক) দোয়াব এবং (৫) সিন্ধু সাগর দোয়াব।

৪৭. 'আইন-ই-আকবরী'—জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ২৩৮ পৃঃ দ্রঃ।

৪৮. 'আইন-ই-আকবরী'—জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ১৯৫ পৃঃ।

৪৯. আসফ খানের পুরা নাম মীর্জা আবুল হাসান আসফ খান (৪র্থ)। তিনি মীর্জা গিয়াস বেগের দ্বিতীয় পুত্র ও সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের

ভ্রাতা। তিনি শাহজাহানের বেগম মোমতাজ মহল বা তাজ বিবির পিতা। মোমতাজের সমাধিসৌধ 'তাজমহল' আগ্রায় অবস্থিত। তিনি শাহজাহানের নিকট 'ইয়ামিন-উদ-দৌলা' ও 'খান-ই-খানান সিপাহ্সালার' উপাধি এবং ন'হাজারি সৈনাপত্য লাভ করেছিলেন। তিনি মীর্জা গিয়াসউদ্দীন আলী আসফ খানের (২য়) কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫১১ ও ৩৬৮ পৃঃ এবং 'মা'সির-উল-উমারা দ্রঃ)।

৫০. ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫১৭ পৃঃ ও 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রঃ। শরিফ খান 'আমীর-উল-উমারা' ও 'উকীল' উপাধি লাভ করেছিলেন এবং জাহাঙ্গীরের বন্ধু ছিলেন।

৫১. এখানে সতলেজ নদীর উল্লেখ করা হয়েছে। লুধিয়ানা শহর এই নদীর তীরে অবস্থিত ('আইন-ই-আকবরী'— জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ৩১০ পৃঃ দ্রঃ)।

৫২. আবুল ফজল তাঁর 'আইন' গ্রন্থে সরকার 'সিরহিন্দ' সুবা দিল্লীর অন্তর্গত বলেছেন (জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ১০৫ পৃঃ)। সিরহিন্দ দীর্ঘকাল ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ছিল; সেই কারণে এই নাম।

৫৩. আবদুল্লা খান, বাঢ়্হা সৈয়দ ছিলেন। একমাত্র বাঢ়্হা সৈয়দদের সৈন্যবাহিনীর সর্বাগ্রভাগে যুদ্ধ করার মর্যাদা (বা অধিকার) ছিল।

৫৪. এই খান-ই-খানান ছিলেন বৈরাম খানের পুত্র খান-ই-খানান মীর্জা আবদুর রহিম ('আইন'— ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ এবং 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রঃ)। বিদ্রোহী শাহজাহানকে তিনি সাহায্য করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম দরাব খান। ইনি শাহজাদা পারভেজ ও মহবত খানের হাতে ধরা পড়েছিলেন; এঁরা তাঁকে হত্যা করেন এবং টেবিল-আচ্ছাদনী কাপড় দ্বারা তাঁর মস্তক আবরিত ক'রে তরমুজ ব'লে তাঁর পিতা মীর্জা আবদুর রহিমের নিকট পাঠিয়েছিলেন।

৫৫. রাজা বিক্রমজিতের নাম ছিল রায় পতি দাস; তিনি জাতিতে

ক্ষত্রিয় ছিলেন। আকবর তাঁকে 'রাজা বিক্রমজিত' উপাধি দিয়েছিলেন। আকবরের অধীনে তিনি বাংলার যুগ্ম-দেওয়ান ছিলেন এবং পাঁচ-হাজারী হয়েছিলেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁকে 'মীর-আতশ' বা গোলন্দাজ বাহিনীর তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। গুজরাটে বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁকে আহ্‌মদাবাদ পাঠানো হয়েছিল ('আইন-ই-আকবরী'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৪৬৯ পৃঃ এবং 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রঃ)।

৫৬. মুদ্রক অথবা সম্পাদক এখানে আসফ খান ও খাজা আবুল হোসেনের নামের মধ্যে ভুলক্রমে 'ওয়াও' (و) যোগ করেছেন।

৫৭. আকবরের আমলে খুরাসানের মুহম্মদ হোসেন, জাহাঙ্গীরের আমলে আবুল হাসান মশহাদি এবং শাহজাহানের আমলে জান নিসার খান ইয়াদগার বেগ 'লস্কর খান' উপাধি লাভ করেছিলন। এখানে দ্বিতীয় জন—অর্থাৎ আবুল হাসান মশহাদিকে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫৮. মীর্জা রুস্তমের তখল্লুস ছিল 'ফেদাই'। এখানে তাঁরই কথা উল্লেখ করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।

৫৯. বাংলার গবর্নর সইদ খানের পুত্র সা'দুল্লার উপাধি ছিল 'নওয়াজেশ খান' ('আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩৬৩, ৩৩১ পৃঃ দ্রঃ)।

৬০. আবদুল্লা খান উজবেককে আকবর পাঁচ-হাজারি ক'রে অসীম ক্ষমতা দিয়ে মালোয়া পাঠিয়েছিলেন। তিনি মাণ্ডোতে রাজার মতো রাজত্ব করতেন ('আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩২১ পৃঃ ও 'মা'সির-উল-উমারা' দ্রঃ)। তাঁর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।

৬১. চান্দা গিরিপথ সুবা বেরারের অন্তর্গত ব'লে 'আইন-ই-আকবরী'তে উল্লিখিত হয়েছে ('আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ২৩০ পৃঃ)। এর নিকটে মানিকদুর্গ কেল্লা অবস্থিত।

৬২. সঠিকভাবে এই নামের কোনো বেলায়েত নাই। কেবল সুবা

মালোয়ায় সরকার মাণ্ডো আছে।

৬৩. 'আইনে' রুস্তম খান-ই-দক্ষিণাকে সামোগড়ের জায়গীরদাররূপে উল্লেখ করা হয়েছে ('আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৪৭৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৬৪. মুদ্রিত গ্রন্থে 'সিহাস্প'-এর স্থলে ভুলক্রমে 'সেহ্‌বস্তি' মুদ্রিত হয়েছে বলে মনে হয় ('আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ২৪৫ পৃঃ দ্রঃ; এখানে মুঘল সৈন্যবাহিনীর সংগঠন সম্পর্কে বিবরণী আছে)।

৬৫. শাহজাহানের গতিবিধি সম্পর্কে ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন' থেকে নিম্নোক্ত অথচ পরিষ্কার বর্ণনা উদ্ধৃত হ'ল:

"শাহজাহান বিদ্রোহী হয়ে মীর্জা আবদুর রহিম খান ই-খানানের সাথে মাণ্ডো প্রত্যাবর্তন করেন ও সেখান থেকে বুরহানপুর যান। সেখানে পৌঁছাবার পর মহবত খানের নিকট মীর্জা আবদুর রহিম কর্তৃক লিখিত এক গোপন পত্র শাহজাহানের হস্তগত হয়। তাতে শাহজাহান উক্ত মীর্জা ও তাঁর পুত্র দরাব খানকে আসির দুর্গে বন্দী করেন; কিন্তু অল্পদিন পরে তাঁদের প্রহরাধীনে মুক্তি দেন। ইতিমধ্যে শাহজাহানকে বন্দী করার জন্য পারভেজ ও মহবত খান নর্মদা নদীর তীরে পৌঁছেন। শাহজাহানের একজন সেনাপতি বৈরাম বেগ সমস্ত নৌকা বাম তীরে সরিয়ে দিয়েছিলেন; সেইজন্য বাদশাহী সৈন্যরা নদী পার হোতে পারে নাই। মীর্জা আবদুর রহিমের পরামর্শ অনুযায়ী এই সময় শাহজাহান যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করেন। মীর্জা আবদুর রহিম কুরআন স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করার পর শাহজাহান তাঁকে শাহজাদা পারভেজের নিকট প্রেরণ করেন। এই সময় নদীতীরস্থ প্রহরার কঠোর সতর্কতা থাকবে না জেনে মহবত খান নদী পার হন এবং মীর্জা আবদুর রহিম তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে পারভেজের সঙ্গে যোগদান করেন ও শাহজাহানের নিকট ফিরে যান নাই। শাহজাহান বুরহানপুর থেকে তেলেঙ্গানার মধ্য দিয়ে উড়িষ্যা ও বাংলা অভিমুখে পলায়ন করেন।

মহব্বত ও মীর্জা আবদুর রহিম তাপ্তি পর্যন্ত তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। অতঃপর শাহজাহান বাংলা ও বিহারে চলে যান এবং দরাব খানকে সেখানকার গবর্নর পদে নিয়োগ করেন" ('আইন' —ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩৩৭ পৃঃ)।

৬৬. 'আইনে' বর্ণিত হয়েছে যে, তেলেঙ্গানা কুতব-উল-মুল্‌কের অধীনে ছিল; কিন্তু কিছুদিন যাবত বেরারের শাসনকর্তার অধীনে ছিল ('আইন'—জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ২৩০ পৃঃ দ্রঃ)। ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে কুলি কুতব শাহ কুতবশাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন; গোলকুণ্ডা তাঁর রাজধানী ছিল। ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা জয় করেন (ঐ, ২৩৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৬৭. 'আইনে' বেহুলি (বা পিপ্‌লি) সরকার জলোসরের অন্তর্গত বলে উল্লেখ আছে।

৬৮. 'পাদশাহনামা'য় আমীরদের বর্ণনাকালে মাহমুদ শাহকে (বা সালেহ বেগকে) মীর্জা শাহির পুত্র ও মীর্জা জাফর বেগ আসফ খানের (তৃতীয়) ভ্রাতুষ্পুত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪১১-৪১২ পৃঃ)। আসফ খান জাফর বেগকে একজন অত্যন্ত প্রতিভাশালী ব্যক্তি, আর্থিক ব্যাপারে সুদক্ষ ও উত্তম হিসাব-রক্ষকরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। একটা পৃষ্ঠা এক নজর দেখলেই তিনি স্মরণ রাখতে পারতেন, এতই বুদ্ধিমান ছিলেন তিনি। তাঁর বাগানের সখ ছিল খুবই বেশী এবং তিনি নিজ হাতে গাছের ডালপালা কাটতেন। তিনি একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অধীনে তিনি উকীল-উল-মুল্‌ক ও পাঁচ-হাজারী ছিলেন। 'আইন' গ্রন্থে তাঁর পুত্র মীর্জা জয়নুল আবেদীন সম্পর্কে উল্লিখিত আছে যে, তিনি ১৫০০ পদাতিক ও ৫০০ অশ্বারোহীর সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

৬৯. অনুমিত হয় যে, এই সময় তিনি বাংলার তৎকালীন মুঘল রাজধানী ঢাকা থেকে অস্থায়ীভাবে রাজমহলে গিয়েছিলেন।

৭০. অর্থাৎ, দক্ষিণ-পশ্চিম বিহার। 'মঘা অঞ্চল' বা দক্ষিণ-পশ্চিম বিহারের সঙ্গে 'মগ অঞ্চল' বা আরাকান একই অঞ্চল গণ্য করা ঠিক হবে না।

৭১. আমাকে বলতেই হবে যে, এই গ্রন্থানুযায়ী তৎকালে বিশ্বাসঘাতক-দের ভিড়ের মধ্যে ইব্রাহিম খান অসাধারণ আনুগত্যসম্পন্ন ছিলেন।

৭২. ইব্রাহিম খান ফতেহ্ জং ছিলেন মীর্জা গিয়াস বেগের তৃতীয় পুত্র। তিনি (গিয়াস বেগ) সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতা ছিলেন এবং তাঁরই প্রভাবে জাহাঙ্গীরের অধীনে বাংলা ও বিহারের গবর্নর হয়েছিলেন। শাহজাহানের বিদ্রোহের সময় তিনি (ইব্রাহিম খান) রাজমহলে তাঁর পুত্রের সমাধিস্থলের নিকটে নিহত হন। ইব্রাহিম খানের পুত্রের অল্পবয়সে মৃত্যু হওয়ায় তাকে গঙ্গাতীরে রাজমহলের নিকটে দাফন করা হয় (তুজুখ, ৩৮৩ পৃঃ)। ইব্রাহিম খানের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বেগ খান ঢাকায় পশ্চাদপসরণ করেন এবং সেখানে শাহজাহানকে ৫০০ হাতী ও ৪৫ লক্ষ টাকা দেন ('তুজুখ', ৩৮৪ পৃঃ; 'পাদশাহনামা', ২য় খণ্ড, ৭২৭ পৃঃ; ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৫১১ পৃঃ; 'ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীরি' ও 'মা'সির উল-উমারা' দ্রষ্টব্য)।

৭৩. শাহজাহানের অধীনে দরিয়া খান একজন রোহিলা সেনাপতি ছিলেন। প্রথমে তিনি শেখ ফরিদ ও শরিফ-উল-মুল্‌কের অধীনে ছিলেন এবং ঢোলপুরের যুদ্ধে দক্ষতা প্রকাশ করেছিলেন। বানারসের যুদ্ধের পর তিনি শাহজাহানের পক্ষ ত্যাগ করেন ('মা'সির-উল-উমারা' ২য় খণ্ড, ১৮ পৃঃ)।

৭৪. শাহজাহানের রাজত্বের দশম বর্ষে ভোজপুর বা উজ্জয়িনির রাজ প্রতাপ বিদ্রোহ করেন; তখন আবদুল্লা খান ফিরোজ জং ভোজপুর অবরোধ ও দখল করেন (১০৪৬ হিঃ)। প্রতাপ আত্মসমর্পণ করেন ও তাঁর প্রাণদণ্ড দেয়া হয়। তাঁর স্ত্রী মুসলমান হন ও আবদুল্লার পৌত্রের সঙ্গে বিবাহ হয় (পাদশাহনামা—১; ২৭১-২৭৪ পৃঃ; 'মা'সির-উল-উমারা', ২য় খণ্ড, ৭৭৭ পৃঃ)। যদিও

আবদুল্লা খান বানারসের যুদ্ধে শাহজাদা শাহজাহানের সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন, তথাপি পরে খান জাহানের মধ্যস্থতায় জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেন (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ৩য় পর্ব, ২৪৮ পৃঃ)।

৭৫. 'আইনে' আকবরের আমলের আলেমদের মধ্যে মীর নূরুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। স্পষ্টতঃ এই পুস্তকে উল্লিখিত নূরুল্লাহ্ বাঢ়্হার সৈয়দদের একজন। কারণ, আকবরের আমল থেকে বাঢ়্হার সৈয়দগণ সামরিক বিভাগে যোগদান করতে থাকেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা 'হারাওল' বা সর্বাগ্রবাহিনীর নেতৃত্ব করার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। উক্ত সৈয়দদের মধ্যে অনেকে সামরিক ও রাজনৈতিক কার্যের জন্য মুঘল বাদশাহগণ কর্তৃক 'খান' উপাধির মর্যাদা লাভ করতেন। এর ফলে এঁদের 'সৈয়দ' উপাধির চিহ্ন বিলুপ্ত হয়েছিল। যথা: বাঢ়্হার সৈয়দ মুহম্মদের পুত্র সৈয়দ আলী আসগর জাহাঙ্গীরের আমলে 'সইফ খান' উপাধি পেয়েছিলেন; তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ জাফর 'শুজাইত খান'; সৈয়দ জাফরের ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ সুলতান 'সালাবত খান' ওরফে 'ইখতিসাস খান'; সৈয়দ সুলতানের চাচাতো ভাই 'হিম্মত খান' উপাধি লাভ করেছিলেন। আবার, সৈয়দ আহমদ পেয়েছিলেন 'দিলের খান'; সৈয়দ খান জাহান-ই-শাহজাহান-এর পুত্র সৈয়দ শের জমান পেয়েছিলেন 'মুজাফ্ফর খান' ও তাঁর অন্য এক পুত্র সৈয়দ মুনাওয়াব পেয়েছিলেন 'লশকর খান' ও তাঁর পৌত্র সৈয়দ ফিরোজ পেয়েছিলেন 'ইখতিসাস খান' উপাধি। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সৈয়দ কাসেম 'শাহামত খান' উপাধিতে (বা নামে) সুপরিচিত ছিলেন; তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ নসরত মুহম্মদ শাহের আমলে 'ইয়ার খান' উপাধি পেয়েছিলেন ('তুজুখ', 'বাদশাহনামা', 'মা'সির-উল -উমারা', 'আলমগীরনামা', 'মা'সিরি আলমগীরি' এবং বাঢ়্হার সৈয়দদের সম্বন্ধে ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী', ১ম খণ্ড, ৩৯০-৩৯২ পৃঃ দ্রঃ)। 'মা'সির-উল-উমারা'তে মীর খলিলুল্লার

পুত্র মীর নূরুল্লাহ নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে (মা'সির, ৩য় খণ্ড, ৩৩৭ পৃঃ)।

৭৬. এই যুদ্ধের সমকালীন পূর্ণ বিবরণীর জন্য 'ইকবালনামা-ই জাহাঙ্গীরি' (ফার্সী সংস্করণ, ৩য় পর্ব, ২১৮ ২২১ পৃঃ) ও 'তুজুখ' (৩৮৩ পৃঃ) দেখুন। ইব্রাহীম খান রাজমহলে যমুনাতীরে তাঁর পুত্রের কবরের নিকট নিহত হয়েছিলেন। আমাদের গ্রন্থকার এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণী কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রমসহ 'ইকবালনামা' থেকে নিয়েছেন। এই পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে যে, 'যুদ্ধে ইব্রাহীম খানের সঙ্গে বহু সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল।' কিন্তু 'ইকবালনামা'য় উল্লিখিত হয়েছে যে, ইব্রাহীম খানের সঙ্গে মাত্র এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল।

৭৭. ইব্রাহীম খান ফতেহ্ জং ছিলেন ইতিমাদ-উদ-দৌলা গিয়াস বেগের এক পুত্র। তার আসল নাম মীর্জা ইব্রাহীম।

কর্মজীবনের গোড়ায় তিনি গুজরাট অঞ্চলে আহমদাবাদে বখ্‌শী ও ওয়াকেয়া-নবিশ ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের নবম বৎসরে তিনি 'খান' উপাধি ও দেড়-হাজারী মনসবদারের মর্যাদা লাভ করেন। ক্রমশঃ তিনি পাঁচ-হাজারির মর্যাদায় উন্নীত হন এবং বাংলা ও বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি 'ইব্রাহিম খান ফতেহ্ জং' উপাধি লাভ করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের উনবিংশ বৎসরে শাহজাহান তেলেঙ্গানার মধ্য দিয়ে উড়িষ্যা ও বাংলা আক্রমণ করেন। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর ইব্রাহীম খান বাংলার তৎকালীন সুবাদারী রাজধানী ঢাকা (যেখানে তাঁর পরিবারবর্গ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিল) থেকে আকবরনগর বা রাজমহলে অগ্রসর হন। তাঁকে স্বদলভুক্ত করার জন্য শাহজাহান তাঁর নিকট দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু ইব্রাহীম খান সম্রাটের প্রতি আনুগত্যে অটল থাকেন এবং রাজমহলে তাঁর পুত্রের সমাধিসৌধের নিকটে বীরের মতো যুদ্ধ ক'রে মৃত্যুবরণ করেন। ইব্রাহীম খানের উত্তর—

ফার্সী ভাষার উচ্চতম মর্যাদাপূর্ণ ও কূটনৈতিক প্রতিবাদের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ (মা'সির-উল-উমারা, ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃঃ)।

৭৮. এই সময় ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগর ছিল বাংলার মুসলমান সুবাদারের রাজধানী (মা'সির, ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃঃ)। ১০২১ হিজরীর ৯ই মুহররম বা ১৬১২ খ্রীস্টাব্দের ২রা মার্চ তারিখে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সপ্তম বর্ষে খাজা ওসমান লোহানির অধীনে আফগানদের এবং শুজাইত খান রুস্তমে জমানের (শেখ কবীর চিশ্‌তীর) অধীনে মুঘলদের মধ্যে যুদ্ধে বাংলা ও উড়িষ্যায় আফগানদের প্রতিরোধ চরমভাবে ধ্বংস হওয়ার ও মুঘল প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথম ইসলাম খান ঢাকার নাম জাহাঙ্গীর নগর রেখেছিলেন ('ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি', ফার্সী সংস্করণ, ১ম পর্ব, ৬০-৬৪ পৃষ্ঠায় সমকালীন বিবরণী আছে ; এবং ঢাকার সন্নিকটে রক্তক্ষয়ী চরম নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধের আকর্ষণীয় বিবরণীর জন্য 'তুজুখ' দ্রষ্টব্য)। স্টুয়ার্ট ভুলক্রমে লিখেছেন যে, এই যুদ্ধ সুবর্ণ-রেখা নদীর তীরে হয়েছিল। ওসমান মোটা মানুষ ছিলেন ও বখতা নামক এক পাগলা হাতীর উপর তিনি ছিলেন। বাদশাহী পক্ষের সৈয়দ আহমদ বাড়্‌হা, শেখ আচ্চা, ইফতিখার খান ও কিশোয়ার খান এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন এবং ওসমানের বিজয় প্রায় অর্ধ-সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু, দৈবক্রমে তাঁর কপালে একটি তীর আঘাত করায় এবং মুতাকিদ খান ও আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে মুঘল সাহায্যবাহিনী উপস্থিত হওয়ায় মুঘলদের বিপর্যয় বিজয়ে পরিণত হয়।

দেখা যায় যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের উনবিংশ বৎসরে, অর্থাৎ ১০৩৩ হিজরীতে যখন শাহজাদা শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বাংলা আক্রমণ করেন, তখন ইব্রাহীম খান ফতেহ্‌ জং (সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আত্মীয়) রাজধানী ঢাকা বা জাহাঙ্গীর-নগর থেকে রাজমহল বা আকবরনগরে অগ্রসর হন। সমকালীন ইতিহাস 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরিতে' (৩য় পর্ব, ২১৮ পৃঃ, মুদ্রিত

সংস্করণ) বর্ণিত হয়েছে যে, সেইসময় ইব্রাহীমের সৈন্যগণ মঘা (অর্থাৎ, বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে) অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতার জন্য (মা'সির অবশ্য অনুরূপ বর্ণনা দিয়েছেন) ইব্রাহীম রাজমহলের বৃহৎ দুর্গ সুরক্ষিত করার বিষয় চিন্তা না ক'রে দুর্গের মধ্যে গঙ্গার তীরে তাঁর পুত্রের সমাধিসৌধে ঘাঁটি স্থাপন করেন। শাহজাহান দক্ষিণ থেকে তেলেঙ্গানার মধ্য দিয়ে উড়িষ্যায় প্রবেশ ক'রে পিপলি ও কটক অধিকার করার পর সরকার মাদারন হয়ে বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হন। বর্ধমান দখল করার পর (সালেহ্ এখানে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন) শাহজাহান রাজমহল যান ও সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ইব্রাহীমকে পরাজিত ক'রে শাহজাহান ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হন।

৭৯. ইব্রাহীম ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্র আহমদ বেগ খান ইতিপূর্বে ইব্রাহীমের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ঢাকা চলে গিয়েছিলেন। আহমদ বেগ ঢাকায় ('তুজুখ' ও মা'সির' অনুযায়ী) শাহজাহানকে ৪৫ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ ও ৫০০ হস্তী সমর্পণ করেন। শাহজাহান বাংলার গবর্নররূপে মীর্জা আবদুর রহিম খান-ই-খানানের অন্যতম পুত্র দরাব খানকে রেখে বাংলা, বিহার ও জৌনপুর গিয়ে পশ্চিমদিকে বানারস পর্যন্ত অগ্রসর হন। সেখানে মহবত খান তাঁকে বাধা দেন (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ফার্সী সংস্করণ, ৩য় পর্ব, ২১৫-২১৬, ২১৭, ২২২, ২২৩, ২২৮, ২৩৮, ২৩৯ পৃঃ)। শাহ নওয়াজ খান ছিলেন আবদুর রহিম খান-ই-খানানের জ্যেষ্ঠ পুত্র (শাহ নওয়াজের জীবনীও 'মা'সির-উল-উমারা'তে বিবৃত আছে)।

৮০. এই গ্রন্থের বিবরণীতে কিছু ভুল আছে। এতে বলা হয়েছে, যখন আবদুর রহিম খান-ই-খানানের দ্বিতীয় পুত্র দরাব খানকে বাংলার গবর্নর নিযুক্ত করা হয়, শাহজাহান তখন দরাব খানের স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা এবং খান-ই-খানানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ নওয়াজ খানকে জামিনস্বরূপ আটক রাখেন (মা'সির-উল-

উমারা দ্রঃ)। অথচ, প্রকৃতপক্ষে শাহ নওয়াজকে জামিনস্বরূপ আটক করা হয় নাই। জাহাঙ্গীরের প্ররোচণায় মহবত খান পরে দরাব খানকে হত্যা করেছিলেন। 'মা'সির-উল-উমারা'য় দেখা যায়, ১০৩৮ হিজরীতে দরাবের মৃত্যু হয়েছিল।

৮১. রাম দাশ জাতিতে কচোয়া রাজপুত ছিলেন। প্রথমে তিনি টোডরমলের অধীনে রাজস্ব বিভাগের নায়েব ছিলেন। নিয়মানুগতা ও পরিশ্রমের দরুন তিনি শীঘ্রই আকবরের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁকে 'রাজা করন' উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু দক্ষিণের যুদ্ধে অপমানজনক পলায়নের জন্য তিনি জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হন। জাহাঙ্গীর তাঁকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, "তুমি যখন রায় সালের অধীনে চাকরী করতে, তখন দৈনিক এক টংকা পারিশ্রমিক পেতে ; কিন্তু আমার পিতা তোমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ক'রে তোমাকে আমীর করেছিলেন। পলায়ন করা কি রাজপুতরা অপমানজনক গণ্য করে না ? 'রাজা করন' উপাধি তোমাকে আরো ভালো শিক্ষা দেয়ার কথা। ধর্মের সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত হয়ে যেন তোমার মৃত্যু হয়।" তাঁর পুত্রদের নাম নমন দাশ ও দলপ দাশ—তাঁর পুত্রদের মধ্যে ভীম দাসের নাম উল্লেখ নাই (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪৮৩ পৃঃ)। কিন্তু রাজা ভগবান দাশের পুত্র মধু সিংহের পৌত্রদের মধ্যে ভীম সিংহ নামক একজনের নাম উল্লেখ আছে (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৪১৮ পৃঃ)। শাহজাহানের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে দক্ষিণে এই ভীম সিংহ নিহত হন। অন্য এক রানা করনের (কর্ন ?) উল্লেখ 'মা'সির-উল-উমারা'য় আছে (২য় খণ্ড, ২০১ পৃঃ)।

৮২. মুখালিস খান প্রথমে শাহজাদা পারভেজের অধীনে কাজ করতেন এবং গুণ ও যোগ্যতার দরুন ক্রমে শাহজাদার অধীনে দেওয়ানের পদ লাভ করেন। পরে তিনি পাটনার সুবাদার পদে উন্নীত হন (তখন পাটনা শাহজাদা পারভেজের জায়গীর ছিল)। জাহাঙ্গীরের

রাজত্বের উনবিংশ বৎসরে শাহজাদা শাহজাহান যখন রানা অমর সিংহের পুত্র রাজা ভীমকে (এই বইতে রাজা করন) সঙ্গে নিয়ে তেলেঙ্গানা ও উড়িষ্যা অতিক্রম ক'রে বাংলা আক্রমণ করেন এবং ইব্রাহীম খান ফতেহ্ জং-এর পতনের পর পাটনা আক্রমণ করেন, তখন মুখালিস খান (যদিও তখন ইফতিখার খানের পুত্র আল্লাইয়ার খান ও শের খান আফগান তাঁর সহযোগী ছিলেন) পাটনা দুর্গ রক্ষার চেষ্টা না করেই এলাহাবাদ পলায়ন করেন। শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের পর তিনি মুখালিস খানকে গোরখপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করেন এবং রাজত্বের সপ্তম বৎসরে তাকে (মুখালিসকে) তিন-হাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করেন ও তেলেঙ্গানার সুবাদার নিযুক্ত করেন। শাহজাহানের রাজত্বের দশম বৎসরে তাঁর মৃত্যু হয় ('মা'সির-উল-উমারা, ৩য় খণ্ড, ৪২৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৮৩. জাহাঙ্গীর কুলি খানের আসল নাম মীর্জা শামসী এবং তিনি খান-ই-আজম মীর্জা আজীজ কোকার জ্যেষ্ঠ পুত্র। আকবরের রাজত্বের শেষদিকে শামসী দু'হাজার সৈন্যের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে বিহারের গবর্নর জাহাঙ্গীর কুলি খান লালা বেগের মৃত্যুতে উক্ত উপাধি (জাহাঙ্গীর কুলি খান) শামসীকে দেয়া হয় এবং তাঁকে গুজরাটের গবর্নর তাঁর পিতার প্রতিনিধি (ডেপুটি)-রূপে গুজরাট পাঠানো হয়। পরে শামসীকে জৌনপুরের গবর্নর নিযুক্ত করা হয়। যখন শাহজাদা শাহজাহান বাংলা থেকে বিহার আক্রমণ করেন এবং আবদুল্লা খান ফিরোজ জং ও রাজা ভীমের নেতৃত্বে শাহজাদার অগ্রগামী বাহিনী চৌসা নদী অতিক্রম ক'রে এলাহাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন জাহাঙ্গীর কুলি খান জৌনপুর থেকে পালিয়ে এলাহাবাদ গিয়ে মীর্জা রুস্তম সাফাভীর সঙ্গে যোগ দেন। অতঃপর তিনি এলাহাবাদের গবর্নর হন এবং শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের পর সুরাট ও

জুনাগড়ের গবর্নর নিযুক্ত হন (মা'সির-উল-উমারা, ফার্সী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ৫২৪ পৃঃ দ্রঃ)।

৮৪. মীর্জা রুস্তম সাফাভী পারস্যের রাজা শাহ ইসমাঈলের পৌত্র সুলতান হোসেন মীর্জার এক পুত্র। আকবর তাঁকে মুলতানের গবর্নর নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁকে পাঁচ-হাজারি মনসব দিয়েছিলেন ও জায়গীরস্বরূপ মুলতান দিয়েছিলেন। তাঁর এক কন্যার সাথে শাহজাদা পারভেজের ও আর এক কন্যার সাথে শাহ শুজার বিবাহ হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের উপর তাঁর বিপুল প্রভাব ছিল। জাহাঙ্গীর তাঁকে ছয়-হাজারী ও এলাহাবাদের গবর্নর নিয়োগ করেছিলেন। এখানে তিনি শাহজাহানের সেনাপতি আবদুল্লা খানকে সাফল্যের সাথে প্রতিরোধ করেন ও তাঁকে ঝোশিতে পশ্চাদগমন করতে বাধ্য করেন। পরে তিনি বিহারের গবর্নর হয়েছিলেন। শাহজাহান তাঁকে পেন্সন দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন। ১০৫১ হিজরীতে আগ্রায় তাঁর মৃত্যু হয়। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর পৌত্র মীর্জা সফশিকান (মীর্জা হাসান সাফাভীর পুত্র) বাংলায় যশোরের ফৌজদার ছিলেন এবং ১০৭৩ হিজরীতে এখানে তাঁর মৃত্যু হয় (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩১৪ পৃঃ দ্রঃ)। আমার মনে হয়, তাঁরই নামানুসারে মীর্জানগর (যশোরের পুরাতন মুসলমান ফৌজদারদের বাসস্থান) নামকরণ হয়েছিল। উক্ত পরিবার এখনো দরিদ্র অবস্থায় সেখানে আছে। সফশিকানের পুত্র মীর্জা সয়েফউদ্দীন সাফাভী বাদশাহ আওরঙ্গজেব প্রদত্ত 'খান' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন (মা'সির-উল-উমারা, ফার্সী সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, ৪৭৮ পৃঃ দ্রঃ)। 'মা'সিরে'র মুদ্রিত সংস্করণে বিবৃত হয়েছে যে, পিতা মীর্জা হাসান সাফাভীর মৃত্যুর পর মীর্জা সফশিকানকে বাংলায় 'হসরের' ফৌজদার পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। স্পষ্টতঃ 'যসর' (যশোর) ভুলক্রমে 'হসর' মুদ্রিত হয়েছে।

৮৫. জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা পারভেজ পিতার অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র ছিলেন। পারভেজ 'পোশাকে, মদ্য পানে, আহারে ও রাত্রি জাগরণে' প্রত্যেক বিষয়ে পিতার অনুকরণ করতেন (ইকবালনামা-ই জাহাঙ্গীরি, ৩য় পর্ব, ২৭৯ পৃঃ) এবং 'কখনো পিতার আদেশের অবাধ্য হতেন না।' ৩৮ বৎসর বয়সে দক্ষিণে পারভেজের মৃত্যু হয়। তখন তিনি সেখানে (১০৩৫ হিঃ) অর্থাৎ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের একবিংশ বৎসরে মালিক অম্বরের বিদ্রোহ দমন ও উক্ত অঞ্চল বশীভূত করায় লিপ্ত ছিলেন। শাহজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা আক্রমণ করেন, তখনো পারভেজ প্রধান সেনাপতি মহবত খানের সহায়তায় বানারসের যুদ্ধে শাহজাহানকে পরাজিত ও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ত্যাগ ক'রে দক্ষিণে দ্রুত পশ্চাদগমন করতে বাধ্য করেন (ইকবালনামা-ই জাহাঙ্গীরি, ফার্সী সংস্করণের ৩য় পর্ব, ২৩৩, ২৩৯, ২৪০, ২৭৩, ২৭৯ পৃঃ দ্রঃ)। এতেই সমকালীন বিবরণী লিখিত হয়েছে।

৮৬. শাহজাদা পারভেজ ও মহবত খানের অধীনস্থ বাদশাহী সৈন্য এবং শাহজাহানের সৈন্যদের মধ্যে বানারসের যুদ্ধের সমকালীন বিবরণীর জন্য 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি', ফার্সী সংস্করণ, ২৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রিয় সেনাপতি রাজা ভীমের হঠকারিতার জন্য শাহজাহান সম্পূর্ণ পরাজিত হন ; রাজা ভীমও এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন এবং বাদশাহী সৈন্যরা তাঁকে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করেছিল। 'মা'সির-উল-উমারা'য় বিবৃত হয়েছে যে, এই যুদ্ধ বানারসের উপকণ্ঠে 'নহরে তুনাসে' হয়েছিল।

৮৭. শাহজাহানের চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম মুরাদ বখ্‌শ। শাহজাহানের অন্য পুত্রদের নাম ঃ (১) দারা শোকাহ্; (২) শাহ শুজা ; (৩) আওরঙ্গজেব (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ফার্সী সংস্করণ ৩য় পর্ব, ৩০৬ পৃঃ দ্রঃ)।

জুনাগড়ের গবর্নর নিযুক্ত হন (মা'সির-উল-উমারা, ফার্সী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ৫২৪ পৃঃ দ্রঃ)।

৮৪. মীর্জা রুস্তম সাফাভী পারস্যের রাজা শাহ ইসমাঈলের পৌত্র সুলতান হোসেন মীর্জার এক পুত্র। আকবর তাঁকে মুলতানের গবর্নর নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁকে পাঁচ-হাজারি মনসব দিয়েছিলেন ও জায়গীরস্বরূপ মুলতান দিয়েছিলেন। তাঁর এক কন্যার সাথে শাহজাদা পারভেজের ও আর এক কন্যার সাথে শাহ শুজার বিবাহ হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের উপর তাঁর বিপুল প্রভাব ছিল। জাহাঙ্গীর তাঁকে ছয়-হাজারী ও এলাহাবাদের গবর্নর নিয়োগ করেছিলেন। এখানে তিনি শাহজাহানের সেনাপতি আবদুল্লা খানকে সাফল্যের সাথে প্রতিরোধ করেন ও তাঁকে ঝোশিতে পশ্চাদগমন করতে বাধ্য করেন। পরে তিনি বিহারের গবর্নর হয়েছিলেন। শাহজাহান তাঁকে পেন্সন দিয়ে বিদায় দিয়েছিলেন। ১০৫১ হিজরীতে আগ্রায় তাঁর মৃত্যু হয়। উল্লেখযোগ্য যে, তাঁর পৌত্র মীর্জা সফশিকান (মীর্জা হাসান সাফাভীর পুত্র) বাংলায় যশোরের ফৌজদার ছিলেন এবং ১০৭৩ হিজরীতে এখানে তাঁর মৃত্যু হয় (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন', ১ম খণ্ড, ৩১৪ পৃঃ দ্রঃ)। আমার মনে হয়, তাঁরই নামানুসারে মীর্জানগর (যশোরের পুরাতন মুসলমান ফৌজদারদের বাসস্থান) নামকরণ হয়েছিল। উক্ত পরিবার এখনো দরিদ্র অবস্থায় সেখানে আছে। সফশিকানের পুত্র মীর্জা সয়েফউদ্দীন সাফাভী বাদশাহ আওরঙ্গজেব প্রদত্ত 'খান' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন (মা'সির-উল-উমারা, ফার্সী সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, ৪৭৮ পৃঃ দ্রঃ)। 'মা'সিরে'র মুদ্রিত সংস্করণে বিবৃত হয়েছে যে, পিতা মীর্জা হাসান সাফাভীর মৃত্যুর পর মীর্জা সফশিকানকে বাংলায় 'হসরের' ফৌজদার পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। স্পষ্টতঃ 'যসর' (যশোর) ভুলক্রমে 'হসর' মুদ্রিত হয়েছে।

৮৫. জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা পারভেজ পিতার অত্যন্ত প্রিয়-পাত্র ছিলেন। পারভেজ 'পোশাকে, মস্ত পানে, আহারে ও রাত্রি জাগরণে' প্রত্যেক বিষয়ে পিতার অনুকরণ করতেন (ইকবালনামা-ই জাহাঙ্গীরি, ৩য় পর্ব, ২৭৯ পৃঃ) এবং 'কখনো পিতার আদেশের অবাধ্য হতেন না।' ৩৮ বৎসর বয়সে দক্ষিণে পারভেজের মৃত্যু হয়। তখন তিনি সেখানে (১০৩৫ হিঃ) অর্থাৎ বাদশাহ জাহাঙ্গীবের সিংহাসনে আরোহণের একবিংশ বৎসরে মালিক অম্বরেব বিদ্রোহ দমন ও উক্ত অঞ্চল বশীভূত করায় লিপ্ত ছিলেন। শাহজাহান যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা আক্রমণ করেন, তখনো পারভেজ প্রধান সেনা-পতি মহবত খানের সহায়তায় বানারসেব যুদ্ধে শাহজাহানকে পরাজিত ও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা ত্যাগ ক'রে দক্ষিণে দ্রুত পশ্চাদগমন করতে বাধ্য করেন (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ফার্সী সংস্করণের ৩য় পর্ব, ২৩৩, ২৩৯, ২৪০, ২৭৩, ২৭৯ পৃঃ দ্রঃ)। এতেই সমকালীন বিবরণী লিখিত হয়েছে।

৮৬. শাহজাদা পারভেজ ও মহবত খানের অধীনস্থ বাদশাহী সৈন্য এবং শাহজাহানের সৈন্যদের মধ্যে বানারসের যুদ্ধের সমকালীন বিবরণীর জন্য 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি', ফার্সী সংস্করণ, ২৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। প্রিয় সেনাপতি রাজা ভীমের হঠকারিতার জন্য শাহজাহান সম্পূর্ণ পরাজিত হন ; রাজা ভীমও এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন এবং বাদ-শাহী সৈন্যরা তাঁকে কেটে খণ্ড-বিখণ্ড করেছিল। 'মা'সির-উল-উমারা'য় বিবৃত হয়েছে যে, এই যুদ্ধ বানারসের উপকণ্ঠে 'নহরে তুনাসে' হয়েছিল।

৮৭. শাহজাহানের চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম মুরাদ বখ্‌শ। শাহ-জাহানের অন্য পুত্রদের নাম : (১) দারা শোকাহ্ ; (২) শাহ শুজা ; (৩) আওরঙ্গজেব (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ফার্সী সংস্করণ ৩য় পর্ব, ৩০৬ পৃঃ দ্রঃ)।

৮৮. তিনি (মালিক অম্বর) জাহাঙ্গীরকে অশেষ কষ্ট দিয়েছিলেন। সমকালীন ইতিহাস 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি'র ৩য় পর্বে ২৩৪-২৩৮ পৃষ্ঠায় মালিক অম্বরের বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণী দেয়া আছে। 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি'র লেখক শাহজাহানের সামরিক প্রতিভা ও নেতৃত্ব-ক্ষমতা, দক্ষিণে তাঁর প্রশাসনিক দক্ষতা ও শাসনের উচ্চপ্রশংসা করেছেন (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ফার্সী সংস্করণ, ৩য় পর্ব, ২৭১ পৃঃ)। পরিণত ৮০ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয় এবং বরাবর তিনি বাদশাহী শক্তি প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবিসিনীয় মালিক অম্বরের মৃত্যুর পর আবিসিনীয় ইয়াকুত খান মালিক অম্বরের পুত্র ফতেহ খান ও নিজাম-উল-মুলকের অন্য কর্মচারীদের সহযোগীতায় জাহাঙ্গীরের রাজত্বের একবিংশ বৎসরে দক্ষিণের মুঘল সুবাদার খান জাহানের বশ্যতা স্বীকার করেন (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ফার্সী সংস্করণ, ৩য় পর্ব, ২৮০ পৃঃ দ্রঃ)।

'মা'সির-উল-উমারা'য় (৩য় খণ্ড, ৭ পৃষ্ঠা) তার সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাতে বিবৃত হয়েছে যে, মালিক অম্বর বিজাপুরের সুলতান নিজাম শাহের হাবসী গোলাম ছিলেন। ১০০৯ হিজরীতে রানী চাঁদসুলতানা বা চাঁদবিবি নিহত হওয়ার পর আহমদনগর দুর্গ আকবরের সেনাপতিদের হস্তগত হয় ও বাহাদুর নিজাম শাহকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী ক'রে রাখা হয়। তখন মালিক অম্বর ও রাজু মিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মালিক অম্বর তেলেঙ্গানা সীমান্তের দিকে আহমদ নগরের ৪ ক্রোশ দূরবর্তী স্থান থেকে দৌলতাবাদের ৮ ক্রোশ দূরবর্তী সীমা পর্যন্ত নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। ১০১০ হিজরীতে নন্দিরার নিকটে মালিক অম্বরের সৈন্যদের সঙ্গে আবদুর রহিম খান ই-খানানের পুত্র মীর্জা ইরাজের সৈন্যদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মালিক অম্বর আহত হন; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়ে খান-ই-খানান সন্ধি স্থাপন করেন। আকবরের মৃত্যুর পর যখন জাহাঙ্গীর ও

শাহজাহানের মধ্যে বিরোধ আরম্ভ হয়, তখন মালিক অম্বর এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ ক'রে বাদশাহী এলাকা আক্রমণ করেন। ফলে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাদশাহী সৈন্যবাহিনী মালিক অম্বরের সাথে প্রায়ই যুদ্ধ-লিপ্ত থাকতো। ১০৩৫ হিজরীতে মালিক অম্বরের স্বাভাবিক মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। দওলতাবাদে শাহ মুন্তাজব-উদ-দীন জরবখ্‌শ ও শাহ রিজভী কাত্তালের মাজারদ্বয়ের মধ্যস্থলে মালিক অম্বরের সমাধিসৌধ রয়েছে। 'মা'সির-উল-উমারা'র গ্রন্থকর্তা মালিক অম্বরের সৈনাপত্য, নেতৃত্ব ও প্রশাসনের উচ্চপ্রশংসা করেছেন। তাঁর শাসন ছিল বলিষ্ঠ; সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলাসৃষ্টিকারী ও গুণ্ডা-বদমায়েশদের তিনি নির্মূল করেছিলেন; তাঁর রাজ্যে পূর্ণ শান্তি ছিল; প্রজাদের সুখ ও কল্যাণের জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন। খারকী গ্রামে (পরে আহমদাবাদ নাম রাখা হয়েছিল) তিনি পুকুর, উদ্যান ও বিরাট অট্টালিকাসমূহ তৈরী করেছিলেন। তিনি দানশীল, ন্যায়পরায়ণ ও ধার্মিক ছিলেন। জনৈক কবি (তাঁর সম্বন্ধে) লিখেছেন:

"রসুলে খোদার খেদমতে ছিলেন বেলাল,
হাজার বৎসর পর মালিক অম্বর এসেছিলেন।"

৮৯. বানারসের যুদ্ধে পরাজয়ের পর শাহজাহান রোটাস দুর্গে পশ্চাদ-গমন করেন (ইতিমধ্যে বাদশাহী সৈন্যদের সঙ্গে শাহজাহানের সৈন্যদের বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ চলছিল)। সেখান (রোটাস) থেকে তিনি পাটনা ও বিহার শহরে যান ও তারপর গড়ি বা তেলিয়াগড়ি দুর্গে যান। 'গড়ি' থেকে শাহজাহান বাংলার গবর্নর দরাব খানকে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে আদেশ করেন। কিন্তু দরাব খান ওজর দেখান। তাতে নিরুৎসাহ হয়ে শাহজাহান রাজমহল যান ও দক্ষিণে পশ্চাদগমন করেন। পারভেজ ও মহবত খান সরকার মাদারন, মিদনিপুর, উড়িষ্যা ও তেলেঙ্গানার মধ্য দিয়ে অবিরাম তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ৩য় পর্ব, ২৩৯-২৪০ পৃঃ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (খ)

১. দক্ষিণের দীর্ঘকালীন যুদ্ধে জাহাঙ্গীরের অধীনে মহবত খান দক্ষতা প্রকাশ করেন। গোড়ার দিকে দক্ষিণের বিদ্রোহ দমনের জন্য জাহাঙ্গীর তাঁকে পারভেজের অধীনে আতালিক ও প্রধান সেনাপতিরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে তেলেঙ্গানা অতিক্রম করতঃ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। তখন জাহাঙ্গীর তাকে বাধা দেয়ার জন্য মহবত খান ও শাহজাদা পারভেজকে আদেশ দেন। মহবত খান ও পারভেজ এতে সম্পূর্ণ সফলকাম হন এবং বানারসের যুদ্ধে শাহজাহানকে চরমভাবে পরাজিত করেন, যার দরুন শাহজাহানকে বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যা অতিক্রম ক'রে দ্রুত দক্ষিণে পশ্চাদগমন করতে বাধ্য হন। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সাফল্যের জন্য (নিশ্চয়ই বাদশাহের পূর্ব-অনুমোদনসহ) পারভেজ মহবত খানকে বাংলা জায়গীর দেন। কিন্তু শীঘ্রই মহবত খানের মাথা গরম হয় এবং বাংলায় যে সকল হাতী দখল করেছিলেন সেগুলো ও রাজস্ব প্রেরণ করেন নাই। এই কারণে তাঁকে তিরস্কার করার (বা শাস্তি দেয়ার) জন্য বাদশাহ তাঁকে দরবারে ডেকে পাঠান, কিন্তু তিনি অসাধারণ ধৃষ্টতার সাথে বাদশাহকে হস্তগত করেন ও প্রহরাধীন রাখেন। সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের কৌশলে বাদশাহকে উদ্ধার করা হয়। মহবতকে তখন অপমান ক'রে থাটা পাঠানো হয়; সেখান থেকে তিনি গুজরাট যান ও বিদ্রোহী শাহজাদা শাহজাহানের সঙ্গে যোগদান করেন (সমকালীন ইতিহাস 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি', ফার্সী সংস্করণ, ৩য় পর্ব, ২২৮, ২৩৩, ২৩৫, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৮,

২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৭৬, ২৭৭, এবং 'মা'সির-উল-উমারা', ৩য় খণ্ড, ৩৮৫ পৃঃ দ্রঃ)।

'মা'সির-উল-উমারা' থেকে (৩য় খণ্ড, ৩৮৫ পৃঃ) মহবত সম্পর্কে নিম্নোক্ত অতিরিক্ত তথ্য জানা যায়ঃ তাঁর প্রকৃত নাম ছিল জামানাহ্ বেগ; পিতার নাম ঘিওয়ার বেগ কাবুলি। তিনি রিজভি সৈয়দ ছিলেন। ঘিওয়ার বেগ শিরাজ থেকে কাবুল ও সেখান থেকে ভারতে এসে আকবরের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। চিতোরের যুদ্ধে তিনি বীরত্ব দেখিয়েছিলেন। জামানাহ্ বেগ যৌবনে যুবরাজ সেলিমের অধীনে 'আহাদি'র চাকরী নেন এবং তাঁর অধীনে দ্রুত বখশীর পদে উন্নীত হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের গোড়ায় জামানাহ্ বেগকে 'মহবত খান' উপাধি দিয়ে তিন-হাজারী মনসব দেয়া হয়। শাহজাদা শাহজাহানের অধীনে কাজ করার জন্য তাঁকে দক্ষিণে পাঠানো হয় এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে কাবুলের সুবাদার পদে নিযুক্ত করা হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে শাহজাহানের সঙ্গে বিরোধ আরম্ভ হওয়ায় মহবত খানকে কাবুল থেকে ডেকে পাঠানো হয়। সিংহাসনে আরোহণের পর শাহজাহান তাঁকে সাত হাজারীর মনসবে উন্নীত করেন এবং 'খান-ই-খানান সিপাহ্সালার' উপাধি দিয়ে প্রথমে আজমীরের ও পরে দক্ষিণের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ১০৪৪ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

২. দেখা যায়, বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁকে (আরাবদস্ত ঘায়েবকে) এইরূপে শাহজাদা দানিয়েলের পুত্র হোসঙ্গ, আবদুর রহিম খান-ই-খানান ও মহবত খানের মতো বিদ্রোহী শাহজাদাদের ও কর্মচারীদের দমন করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরনামা, ফার্সী সংস্করণ, ৩য় পর্ব, ২৪৪ পৃঃ এবং 'মা'সির-উল-উমারা, ৩য় খণ্ড, ৩৯২ পৃঃ দ্রঃ)।

৩. ‘ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি’র ৩য় পর্বে, ২৫৩ পৃষ্ঠায় “খাজা উমর নক্‌শাবন্দী।”

৪. মুদ্রিত সংস্করণে “শাহানশাহের অনুমতি অনুসারে” ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে। হবে “শাহানশাহের বিনা অনুমতিতে” (ইকবালনামা ই-জাহাঙ্গীরি, ৩য় পর্ব, ২৫৩ পৃঃ দ্রঃ)।

৫. মুদ্রিত ফার্সী সংস্করণে এখানে ভুল আছে। ‘গোসলখানা’ শব্দটি (ইকবালনামা, ৩য় পর্ব, ২৫৩ পৃঃ) ‘রিয়াজে’ ভুলক্রমে গোলাব-বাড়ী’ মুদ্রিত হয়েছে। মুঘল আমলে ‘গোসলখানা’ বিলাসের স্থান ছিল। এই কক্ষটি উত্তমরূপে সজ্জিত হোত ও ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা করা হোত। মুঘল বাদশাহ ও আমীরগণ গীষ্মকালে এই কক্ষে অনেক সময় অতিবাহিত করতেন ও এখানে কাজ করতেন। এই কারণে ক্রমে ‘গোসলখানা’ নাম ‘খাসখানা’ নামে পরিণত হয়।

৬. এই বিবরণী ‘রিয়াজে’র গ্রন্থকার ‘ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরি’ থেকে নিয়েছেন (তৃতীয় পর্ব; ২৫৬-২৫৭ পৃঃ দ্রঃ), কিন্তু সংক্ষেপ করতে গিয়ে তিনি সবটা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। ‘ইকবাল নামা’তে উল্লিখিত হয়েছে যে, মু’তামিদ খান তখন জাহাঙ্গীরের বখ্‌শী ছিলেন। দেখা যায়, বাদশাহ তখন কাবুল থেকে হিন্দুস্তানে প্রত্যাবর্তনের পথে বিহাত (ঝিলাম) নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। তখন আরাবদস্তে ঘায়েব, মীর মনসুর বখ্‌শি, খোজা জওয়াহের খান, ফিরোজ খান, খোজা খিদমত খান, বলন্দ খান, খিদমতপরস্ত খান, ফসিহ্ খান ও আরো তিন-চার জন সভাসদসহ জাহাঙ্গীর শিবিরে একা ছিলেন। প্রধান উজীর আসিক খান সহ অন্য সকল বাদশাহী কর্মচারী ও অনুচরগণ নদীর পূর্বতীরে পার হয়ে গিয়েছিলেন। সুযোগ দেখে কয়েকজন রাজপুত সৈন্যকে পুল পাহারা দেয়ার জন্য রেখে মহবত খান বহু-সংখ্যক রাজপুত অশ্বারোহী সৈন্যসহ বাদশাহের শিবির অভিমুখে যান। বাদশাহ তখন খাসখানায় বিশ্রাম করছিলেন। মহবত

খান নির্ভীকভাবে দরজা খোলেন ও ৫০০ রাজপুত অশ্বারোহী সৈন্যসহ প্রবেশ ক'রে বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন করেন। বাদশাহ শিবির থেকে বেরিয়ে শিবির-সন্নিকটস্থ বাদশাহী পাল্কীতে উপবেশন করেন। মহবত খান পাল্কীর নিকটবর্তী হয়ে বাদশাহকে বলেন, "আসফ খানের হিংসা ও বিদ্বেষের দরুন আমাকে অপমান, আমার উপর অত্যাচার ও আমাকে হত্যা করা হবে এই ভয়ে আমি এই দুঃসাহসিক পন্থা অবলম্বন ক'রে বাদশাহের আশ্রয় নিয়েছি। শাহানশাহ, যদি আমি শাস্তি পাওয়ার ও নিহত হওয়ার যোগ্য হই, তা'হলে আমাকে বাদশাহের সামনে শাস্তি দেয়া ও হত্যা করা হউক" (ইকবালনামা, ৩য় পর্ব, ২৫৬ পৃঃ)। ইতিমধ্যে মহবত খানের রাজপুত অশ্বারোহী সৈন্যগণ চতুর্দিক থেকে বাদশাহের শিবির ঘিরে ফেলেছিল। অতঃপর মহবত খান বাদশাহকে বলেন যে, এটা তাঁর (বাদশাহের) শিকারে যাওয়ার নিয়মিত সময় এবং তাঁকে ঘোড়ায় চড়তে বলেন। বাদশাহ একটি ঘোড়ায় চড়েন ও কিছুদূর যাওয়ার পর ঘোড়া ছেড়ে একটি হাতীতে আরোহণ করেন। শিকারের পোশাকে মহবত খান বাদশাহের সঙ্গে যান ও তাঁকে নিজ শিবিরে নিয়ে যান। নূরজাহান বেগমকে পিছনে ফেলে আসা হয়েছে দেখে মহবত খান বাদশাহকে নিয়ে আবার বাদশাহী শিবিরে ফিরে যান। কিন্তু, ইতিমধ্যে নূরজাহান নদী পার হ'য়ে ভ্রাতা আসফ খানের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাদশাহকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা অবলম্বনে ব্যস্ত ছিলেন। বাদশাহী কর্মচারীগণ কর্তৃক তাঁকে উদ্ধার করার সমস্ত ব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ায় কয়েকদিন পরে কৌশল ও সাহসিকতাপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন দ্বারা নূরজাহান বাদশাহকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং মহবত খানকে অপমানজনকভাবে থাটায় বহিষ্কার করা হয় (ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ৩য় পব, ২৭৬ পৃঃ)। মহবত খান পরে শাহজাহানের সঙ্গে দক্ষিণে যোগ দিয়েছিলেন।

৭. 'ইকবালনামা'য় "শরিফ খানের" পরিবর্তে "শরিফ-উল-মুলক"। দেখা যায়, শাহজাহান দক্ষিণ থেকে থাটা প্রদেশ আক্রমণ করতে গিয়েছিলেন। তখন শাহজাদা শহরিয়ারের পক্ষে শরিফ-উল-মুলক ৪০০০ অশ্বারোহী ও দশ হাজার পদাতিক সৈন্যসহ থাটা দুর্গ রক্ষা করেছিলেন। অবরোধের সংবাদ পেয়ে জাহাঙ্গীর এক বাদশাহী সৈন্যদলসহ শাহজাহানকে প্রতিরোধ করার জন্য মহবত খানকে পাঠান। শাহজাহান তখন অবরোধ তুলে নিয়ে গুজরাট হয়ে দক্ষিণে ফিরে যান (ইকবালনামা এবং মা'সির-উল-উমারা, ৩য় পর্ব ২৮১-২৮২ পৃঃ দ্রঃ)।

৮. মুকররম খান ছিলেন শেখ বায়াজিদ (মোয়াজ্জম) খানের এক পুত্র ফতেহপুর সিক্রির শাহ সলিম চিশতির পৌত্র। জাহাঙ্গীর শেখ বায়াজিদকে 'মোয়াজ্জম খান' উপাধি দেন ও দিল্লীর সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। জাহাঙ্গীরের অধীনে বাংলার প্রথম ভাইসরয় ছিলেন ইসলাম খানের (১ম) জামাতা বা মোয়াজ্জম খানের পুত্র মুকররম খান। তিনি বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি কোচ-হাজো (কুচবিহারের একাংশ) ও তথাকার জমিদার বা রাজা পরিচিতকে বন্দী করেন (পাদশাহনামা, ২য় খণ্ড, ৩৪ পৃঃ) এবং কিছুকাল কোচ-হাজোর গবর্নর ছিলেন। পরে তিনি উড়িষ্যার গবর্নর হয়েছিলেন এবং খুরদা (দক্ষিণ-উড়িষ্যা) জয় ক'রে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ষোড়শ বর্ষে তিনি দিল্লী আসেন ও দিল্লীর সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের একবিংশ বর্ষে তাঁকে বাংলায় মহবত খানের পুত্র খানাহ্জাদের স্থলে গবর্নর নিযুক্ত করা হয় (ইকবাল-নামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ৩য় পর্ব, ২৮৬, ২৮৭, ২৯১ পৃঃ এবং মা'সির-উল-উমারা দ্রঃ)। তাঁর সঙ্গীগণসহ ঝড়ে নৌকাডুবি হয়ে মৃত্যু হয়।

৯. পূর্বতন টীকা দ্রষ্টব্য।

'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি'র গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন যে, জাহাঙ্গীর তাঁর রাজত্বের একবিংশ বৎসরে মীর্জা রুস্তম সাফাভীকে

ভেলায়েতে-বিহার ও পাটনার সুবাদার নিযুক্ত করেছিলেন (ইকবাল নামা-ই-জাহাঙ্গীরি, ফার্সী সংস্করণ, ৩য় পর্ব, ২৮০ পৃঃ এবং মা'সির-উল-উমারা দ্রঃ)।

১০. এই পুস্তকে পরে তাঁকে একজন আউলিয়ারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর উপর শাহ শুজার অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল।

১১. এই ঘটনা থেকে তৎকালীন 'মহান মুঘলের' বিরাট ব্যক্তিত্বের ও তাঁদের কর্মচারীগণ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্য প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মুঘল আমলের সকল সময়েই বাদশাহী ফরমান গ্রহণ করার জন্য কয়েক মাইল অগ্রসর হওয়ার রীতি বজায় ছিল।

১২. অনুরূপ বিবরণীর জন্য 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি', ৩য় পর্ব, ফার্সী সংস্করণ, ২৮৭ পৃঃ দ্রঃ।

১৩. ফেদাই খানের প্রকৃত নাম ছিল মীর্জা হেদায়েত উল্লা। 'ফেদাই খান', 'জান নিসার খান' ও 'জানবাজ খান' ছিল তাঁর উপাধি। 'ফেদাই খান' উপাধিধারী মীর জরিফের সঙ্গে এই 'ফেদাই খানকে' যেন একই ব্যক্তি গণ্য না করা হয়। মীর জরিফ খানকে যখন 'ফেদাই খান' উপাধি দেয়া হয়, তখন আগে থেকে এই একই উপাধি-ধারী (ফেদাই খান) মীর্জা হেদায়েত উল্লাকে বাদশাহ শাহজাহান 'জান নিসার খান' উপাধি দেন। প্রথমদিকে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মীর্জা হেদায়েত উল্লা 'মীর বহর-ই-নওয়ারা' (প্রধান নৌ-সেনাপতি) ছিলেন এবং মহবত খানের পৃষ্ঠপোষকতার দরুন তাঁর উন্নতি দ্রুত হয়। মহবত খান ও বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মধ্যে বিবাদের সময় তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক মহবত খানের পক্ষ অবলম্বন করেন ও পরে রোটাসে পলায়ন করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বাবিংশতি বৎসরের সময় তাঁকে মুকররম খানের (যিনি নৌকাডুবিতে মারা গিয়েছিলেন) স্থলে বাংলার ভাইসরয় নিযুক্ত করা হয়। তবে শর্ত ছিল যে, প্রত্যেক বৎসর নিয়মিত বাদশাহী রাজস্ব ছাড়াও তাঁকে উপহারস্বরূপ বাদশাহকে পাঁচ লক্ষ টাকা ও

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে হবে। শাহজাহানের আমলে তাঁকে বাংলা থেকে ফিরিয়ে এনে জায়গীরস্বরূপ জৌনপুর দেয়া হয় এবং পরে গোরখপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর তিনি ভোজপুর বা উজ্জয়িনি বিজয়ে বিহারের গবর্নর আবদুল্লা খানকে সাহায্য করেন (মা'সির-উল-উমারা, ৩য় খণ্ড, ১২ পৃঃ দ্রঃ)।

১৪. ফেদাই খানের সঙ্গে প্রাদেশিক আর্থিক চুক্তির বিষয় 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি', ফার্সী সংস্করণ, ৩য় পর্ব, ২৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

১৫. 'ইকবালনামা'য় বিবৃত হয়েছে, "রাজত্বের দ্বাবিংশতি বৎসরে কাশ্মীর থেকে লাহোরে ফিরবার পথে ২৮শে সফর রবিবার দিন জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।" তাঁর প্রিয়তমা বেগম সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কর্তৃক পরিকল্পিত এক উদ্যানে তাঁকে (জাহাঙ্গীরকে) কবরস্থ করা হয় (ইকবালনামা, ৩য় পর্ব, ২৯৪ পৃঃ)।

১৬. তাঁর (আসফজাহ্ আসফ খানের) আসল নাম ছিল মীর্জা আবুল হোসেন এবং তাঁর উপাধি ছিল 'আসফজাহ্ আসফ খান'। তিনি ছিলেন 'ইতিমাদ-উদ-দৌলার অন্যতম পুত্র ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বাদশাহ শাহজাহানের প্রিয়তমা বেগম আরজুমান্দ বানু বেগম ওরফে মোমতাজ মহল (যাঁর স্মৃতি আগ্রার তাজমহলে মর্মরে রক্ষিত হয়েছে) ছিলেন তাঁর কন্যা। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের নবম বর্ষে তাঁকে দু'-হাজারি মনসব ও পরে সাত-হাজারী মনসবে উন্নীত করা হয়। সেইসঙ্গে তাঁকে পাঞ্জাবের সুবাদার ও উকিল বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ১০৩৭ হিজরীতে কাশ্মীর থেকে ফেরবার পথে যখন জাহাঙ্গীরের রাজৌরে মৃত্যু হয়, তখন শাহজাদা শহরিয়ারের সমর্থক নূরজাহান তাঁকে কারারুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কারণ, আসফ খান ছিলেন শাহজাহানের সমর্থক। কিন্তু, আসফ খানকে গ্রেফতার ক'রে আনা সম্ভব হয় নাই।

শাহজাহান তখন গুজরাটে ছিলেন। আসফ খান বেনারসী নামক একজন হিন্দুকে শাহজাহানের নিকট পাঠান। শাহজাহান দ্রুত আগ্রায় আসেন ও তাঁকে সিংহাসনে বসানো হয়। শাহজাদা শহরিয়ার ও অন্য শাহজাদাদের বন্দী ও হত্যা করা হয়। সিংহাসনে আরোহণের পর শাহজাহান আসফ খানকে 'আমিন-উদ-দৌলা' উপাধি দিয়ে ন'-হাজারি মনসবে উন্নীত করেন। ১০৫১ হিজরীতে লাহোরে আসফ খানের মৃত্যু হয় (মা'সির-উল-উমারা, ১ম খণ্ড, ১৫১ পৃঃ দ্রঃ)।

১৭. আশ্চর্যের বিষয় যে, বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক নিয়োজিত বাংলার প্রথম ভাইস্‌রয় নওয়াব কাসিম খানের বিবরণী 'রিয়াজে' অতি অল্প পরিমাণে বিবৃত হয়েছে। অথচ বর্তমানের প্রেক্ষিতে তাঁর শাসনকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই সময়ের ঘটনাবলীর বিবৃতিতে বাংলায় খ্রীস্টান ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে মুসলমান ভাইস্‌রয়দের বিরোধের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় (যদিও তৎকালে এই বিরোধ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না)। সুতরাং এই মুসলমান ভাইস্‌রয়ের (নওয়াব কাসিম খান) শাসনকালের অতিরিক্ত বিবরণী 'মা'সির-উল-উমারা' থেকে দেয়া হল ও তা আকর্ষণীয় হবে।

"কাসিম খান ছিলেন জুয়াইনের (বৈহাক ভেলায়েতের অন্তর্গত) মীর মুরাদের পুত্র। মীর মুরাদ সেই স্থানের একজন নেতৃস্থানীয় সৈয়দ ছিলেন। তিনি জুয়াইন ত্যাগ ক'রে দক্ষিণে চলে যান। তিনি সাহসী ও পাকা তীরন্দাজ ছিলেন। শাহজাদা খুররমকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বাদশাহ আকবর তাঁকে নিযুক্ত করেন। আকবরের রাজত্বের ৪৬ বৎসরের সময় তাঁকে লাহোরের বখ্‌শী নিযুক্ত করা হয়। তাঁর পুত্র কাসিম খান (স্পষ্টতঃ এটা এঁর উপাধি ছিল; 'মা'সিরে' তাঁর আসল নামের উল্লেখ নাই) মার্জিত ও সাহিত্যসেবী ছিলেন। বাংলায় জাহাঙ্গীরের ভাইস্‌রয় ইসলাম খান চিশতি ফারুকীর অধীনে কাসিম খান বাংলার প্রধান খাজাঞ্চি ছিলেন। তাঁকে সকল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ইসলাম খান বিশেষ ব্যবস্থা

অবলম্বন করেছিলেন। কিছুদিন পর কাসিম খান সৌভাগ্যক্রমে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভগ্নি মনিজা বেগমকে বিবাহ করেন। এই বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে কাসিম খানের ভাগ্য পরিবর্তিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর পদ ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রসিক দরবারীগণ তখন তাঁকে 'কাসিম খান মনিজা' বলতেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের সহচর হন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ-দিকে তিনি আগ্রার সুবাদার নিযুক্ত হন। শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম বৎসরে বাদশাহ্ তাঁকে পাঁচ-হাজারি মনসবে উন্নীত ক'রে ফেদাই খানের স্থলে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শাহজাহান যখন বাংলায় ছিলেন, তখন তিনি হুগলী বন্দরস্থ খ্রীস্টানদের (স্পষ্টতঃ পর্তুগীজদের) সীমাতিরিক্ত কার্যাদি সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে অবহিত ছিলেন। যথা, শাহজাহান অবগত হয়েছিলেন যে, এরা সংলগ্ন পরগণাসমূহ অবৈধ বন্দোবস্ত নিয়ে প্রজাদের উপর অত্যাচার করতো এবং সময় সময় লোভ দেখিয়ে তাঁদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করতো—এমন কি 'ফারাঙ' (বাইউরোপে) পাঠাতো। উপরন্তু এই সকল খ্রীস্টান (স্পষ্টতঃ পর্তুগীজরা) তাদের সঙ্গে যে সকল পরগণার সংস্রব নাই, সেখানেও এই প্রকার অপকর্ম করতো। এতদ্ব্যতীত তারা গোড়ায় ব্যবসায়ের অজুহাতে স্থানে স্থানে গুদাম তৈরী করে ও পরে স্থানীয় কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে এগুলোকে সুরক্ষিত বৃহৎ অট্টালিকায় পরিণত করে। ফলে, পূর্বে সাতগাঁয়ের বাদশাহী গুদামে অধিকাংশ বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি সংগৃহীত হোত, সেগুলো নতুন হুগলী বন্দরে চালান হোতে থাকে। এই কারণে কাসিম খানকে বাংলায় সুবাদাররূপে প্রেরণের সময় বিদেশী খ্রীস্টান (পর্তুগীজ) বণিকদের বাংলা থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে কাসিম খান তাঁর পুত্র ইনায়েত উল্লা খানের সঙ্গে আল্লাইয়ার খান ও অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষদের হুগলী প্রেরণ করেন এবং পর্তুগীজরা যাতে জলপথে পলায়ন করতে না পারে সেইজন্য ঢাকাস্থ বাদশাহী

নৌবহরের একাংশ চট্টগ্রাম পাঠান। অবশ্য প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হয় যে, হিজলী এই অভিযানের লক্ষ্য। তিন মাসকাল অবরোধের পর হুগলী দুর্গ দখল ও খ্রীস্টান (পর্তুগীজদের) বণিকদের বহিষ্কার করা হয়। যুদ্ধে দু'হাজার খ্রীস্টান নিহত ও ৪৪০০ জন বন্দী হয়। পর্তুগীজদের হাতে বন্দী দশ হাজার ভারতীয় বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। এই যুদ্ধে এক হাজার মুসলমান সৈন্য নিহত হয়েছিল। যুদ্ধ জয়ের তিন দিন পরে ১০৪১ হিজরীতে রোগে কাসিম আলী খানের মৃত্যু হয়। আগ্রায় আঙ্গা খানের বাজারে তিনি একটি জুমআ' মসজিদ তৈরী করেছিলেন" (মা'সির-উল-উমারা, ৩য় খণ্ড, ৭৮ পৃঃ দ্রঃ)।

১৮. আজম খানের আসল নাম ছিল মীর মুহম্মদ বাকের। তাঁর উপাধি ছিল 'ইবাদত খান' ও পরে 'আজম খান'। তিনি ইরাকের সাভা অঞ্চলের সৈয়দ ছিলেন। ভারতে আসার পর তাঁকে শিয়ালকোট ও গুজরাটের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। তাঁর সঙ্গে আসফ খানের এক কন্যার বিবাহ হয় এবং আসফ খান তাঁর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। পরে তাঁকে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং আমিন-উদ-দৌলা আসফ খানের সোপারেশে তাঁকে একটি ভাল মনসব ও বাদশাহী খানসামানের পদে নিযুক্ত করা হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে তাঁকে কাশ্মীরের সুবাদার ও তারপর বাদশাহের প্রত্যক্ষ অধীনে মীর বখশির পদে নিযুক্ত করা হয়। সিংহাসনে আরোহণের পর শাহজাহান তাঁকে পাঁচ-হাজারি মনসবদারের মর্যাদা দেন এবং সর্বোচ্চ দেওয়ানের উজীর (রাজস্ব-সচিব) পদে নিযুক্ত হন। শাহজাহানের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে দক্ষিণের প্রদেশ-সমূহের রাজস্ব বিভাগসমূহ সুনিয়ন্ত্রণের জন্য তাঁকে সেখানে পাঠানো হয়। তৃতীয় বৎসরে তাঁকে 'আজম খান' উপাধি দেয়া হয় এবং খান জাহান লোদিকে দমন করার ও নিজামশাহী রাজ্য জয় করার জন্য তাঁকে দক্ষিণে প্রেরণ করা হয়। যদিও তিনি খান জাহানের

বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ ও ধারোয়ার দুর্গ জয় করেছিলেন, তথাপি বাদশাহ তাঁর কার্যে সন্তুষ্ট হোতে পারেন নাই এবং সেই কারণে শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে কাসিম খানের মৃত্যুর পর তাঁকে বাংলার ভাইস্‌রয় ক'রে পাঠানো হয়। বাংলায় তিনি মাত্র তিন বৎসর শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন এবং তৎপর শাহ-জাহানের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে তাঁকে এলাহাবাদ ও পরে গুজরাট বদলী করা হয়। সর্বশেষে তাঁকে জৌনপুর পাঠানো হয় ও সেখানে তিনি জৌনপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ছিলেন। ৭৬ বৎসব বয়সে ১০৫৯ হিজরীতে জৌনপুবে তাঁর মৃত্যু হয় এবং জৌনপুরে নদীর তীরে তিনি নিজে যে উদ্যান তৈবী করেছিলেন সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। শাহজাদা শাহ শুজার প্রথম স্ত্রীর (মীর্জা রুস্তম সাফাভীর কন্যা) মৃত্যুর পর শাহজাদার সঙ্গে আজম খানের এক কন্যার বিবাহ হয়। তাঁর বহু সদ্‌গুণ ছিল এবং আমিলদের হিসাব পরীক্ষার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন ('মা'সির-উল-উমারা, ১ম খণ্ড, ১৭৪ পৃঃ দ্রঃ)।

১৯. এই আবদুস সালাম মনে হয় দিল্লীর সুবাদার মুয়াজ্জম খানের পুত্র। তিনি (আবদুস সালাম), ঢাকার সন্নিকটে আফগান নেতা ওসমান খান লোহানির সঙ্গে শুজাইত খানের যে যুদ্ধ হয়, তাতে সঠিক সময়ে শেষোক্তকে সাহায্য করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয়, তিনি ছিলেন মুয়াজ্জম খানের অন্য পুত্র বাংলার গবর্নর মুকররম খানের ভ্রাতা। তিনি এতদ্ব্যতীত কোচ-হাজো (বা কুচবিহার) ও খুর্দা জয় করেছিলেন। আরো মনে হয়, আবদুস সালাম তাঁর ভ্রাতা মুকররম খানের স্থলে কোচ-হাজোর গবর্নররূপে স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন ও আসাম আক্রমণ করেছিলেন (পূর্বোক্ত টীকা দেখুন)। 'আলমগীরনামা'য় (ফার্সী সংস্করণ, সপ্তম পর্ব, ৬৮০ পৃঃ) তাঁকে "শেখ আবদুস সালাম" নামে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিবৃত হয়েছে যে, শাহজাহানের রাজত্বের গোড়ার দিকে তিনি হাজোর (অর্থাৎ কোচ-হাজো বা কুচবিহারের পশ্চিমাংশ) ফৌজদার

ছিলেন ও বহুসংখ্যক লোকসহ (সৈন্যসহ) গৌহাটিতে তিনি বন্দী হয়েছিলেন। অল্পদিন পরে ইসলাম খানের (২য়) (ওরফে মীর আবদুস সালাম) সুবাদারী আমলে অসমীয়াদেব শায়েস্তা করার জন্য ইসলাম খানের ভ্রাতা সিয়াদত খানের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরিত হয় এবং এই বাহিনী আসাম সীমান্তের 'কাজল' পর্যন্ত পৌঁছায় ; কিন্তু এই অভিযান সম্পূর্ণ সফল হওয়ার পূর্বেই বাদশাহ প্রধান উজীরের পদ গ্রহণের জন্য ইসলাম খানকে দিল্লী ফিরে যাওয়ার হুকুম দেন।

২০. ইসলাম খান মশহাদীর আসল নাম মীর আবদুস সালাম। প্রথমে তাঁর উপাধি ছিল 'ইখতিসাস খান' ও পরে 'ইসলাম খান'। তাঁকে ও ইসলাম খান চিশ্‌তি কারুকীকে যেন একই ব্যক্তি মনে করা না হয়। শেষোক্ত ইসলাম খানের আসল নাম ছিল শেখ আলাউদ্দীন ও তিনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাংলার ভাইস্‌রয় ছিলেন।

মীর আবদুস সালাম প্রথমে শাহজাদা শাহজাহানেব অধীনে মুন্‌শি ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১০৩০ হিজরীতে শাহ-জাহান দক্ষিণে কর্মব্যস্ত থাকায় দিল্লীর বাদশাহী দরবারে মীর আবদুস সালাম তাঁর 'উকীলে দরবার' বা রাজনৈতিক প্রতিনিধি ছিলেন ও সেইসময় তাঁকে 'ইখ্‌তিসাস খান' উপাধি দেয়া হয়। শাহজাহান ও বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মধ্যে বিরোধের সময় মীর আবদুস সালাম শাহজাহানের পক্ষ অবলম্বন করেন। সিংহাসনে আরোহণের পর শাহজাহান তাঁকে চার-হাজারির মর্যাদা ও 'ইসলাম খান' উপাধি দেন। তাঁকে প্রথমে বখ্‌শী ও পরে পাঁচ-হাজারীর মর্যাদা দিয়ে গুজরাটের গবর্নর নিযুক্ত করেন। শাহ-জাহানের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে বাংলার ভাইস্‌রয় আজম খানের স্থলে মীর আবদুস সালাম ওরফে ইসলাম খান মশহাদীকে নিযুক্ত করা হয়। শাহজাহানের রাজত্বের একাদশ বর্ষে তিনি (ইসলাম খান মশহাদী) কতকগুলো উল্লেখযোগ্য স্থান জয় করেছিলেন।

যথা : (১) অসমীয়াদের শাস্তিদান ; (২) আসামের রাজার জামাতাকে বন্দী করা ; (৩) আসামের পনেরটি দুর্গ অধিকার ; (৪) শ্রীঘাট ও মাণ্ডো দখল ; (৫) কোচ-হাজোর (কুচবিহারের পশ্চিমাঞ্চল) সকল মহলে বাদশাহী সামরিক ঘাঁটি বা থানা প্রতিষ্ঠা ; (৬) কোচ যুদ্ধ-নৌবহরের ৫০০ নৌযান দখল। এই সময় আরাকানের রাজার ভ্রাতা মাণিক রায় ঢাকায় এসে ইসলাম খানের আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে (এই পুস্তকে একাদশ বর্ষ উল্লেখ করা হয়েছে ও সেটাই ঠিক) শাহজাহান বাংলা থেকে ইসলাম খানকে দিল্লী আহ্বান করেন ও বাদশাহের উজীর পদে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তাঁকে দক্ষিণের ভাইস্‌রয়ের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং সেখানে ১০৫৭ হিজরীতে শাহজাহানের রাজত্বের একবিংশ বৎসরে আওরঙ্গাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। আওরঙ্গাবাদে এক সমাধিসৌধে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি একজন সুপণ্ডিত, সাহসী সেনাপতি ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা ছিলেন ('মা'সির-উল-উমারা, ১ম খণ্ড, ১৬২ পৃঃ দ্রঃ)।

২১. সয়েফ খান মীর্জা সাফির পিতার নাম আমানত খান। তিনি (সয়েফ খান) আসফ খান আমিন-উদ-দৌলার কন্যা ও সম্রাজ্ঞী মোমতাজ মহলের ভগ্নি মালিকা বানুকে বিবাহ করেছিলেন এবং সেই সূত্রে শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন। প্রথমে তিনি সুবা গুজরাটের দেওয়ান ছিলেন। দুঃসাহসিক অভিযানে আবদুল্লা খানকে পরাজিত করার পর তাঁকে গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত করা হয় এবং সেইসঙ্গে 'সয়েক খান' উপাধি দেয়া হয়। অতঃপর সম্রাট শাহজাহান তাঁকে বিহারের গবর্নর নিযুক্ত করেন। এখানে তিনি কয়েকটি বৃহৎ সরকারী ভবন তৈরী করেছিলেন। আমার মনে হয় জামালপুরের নিকটবর্তী সয়েফাবাদ শহর তিনিই তৈরী করেছিলেন এবং তাঁরই নামানুসারে শহরের নামকরণ হয়েছিল। এখনো এখানে 'সফি সরাই' নামক একটি স্থান আছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, মুঙ্গেরে ক্লাবের সন্নিকটে একটি বৃহৎ ইঁদারায়

একটি শিলালিপি দেখেছিলাম, তাতে উৎকীর্ণ আছে যে, এই ইঁদারা সয়েফ খান কর্তৃক তৈরী হয়েছিল। শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে তিনি এলাহাবাদের গবর্নর, অষ্টম বর্ষে গুজরাটের গবর্নর ও পরে আগ্রার সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে ইসলাম খানকে বাংলা থেকে ডেকে নিয়ে বাদশাহের উজীর পদে নিযুক্ত করা হয় এবং শাহজাদা শাহ শুজাকে বাংলার ভার দেয়া হয়। শাহজাদা শুজা তখন কাবুলে থাকায় তাঁর অনুপস্থিতকালে সয়েফ খানকে বাংলার শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ১০৪৯ হিজরী, অর্থাৎ শাহজাহানের রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে সয়েফ খান মীর্জা সাফির বাংলায় মৃত্যু হয় এবং তাঁর বেগম মালিকা বানুর পরের বৎসর মৃত্যু হয় (মা'সির-উল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৪১৬ পৃঃ দ্রঃ)।

২২. শাহজাদা শাহ শুজা বাদশাহ শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র। শাহজাহানের অন্য পুত্রদের নাম (১) দারা শোবহ্; (২) আওরঙ্গজেব; (৩) মুরাদ। মীর্জা রুস্তম সাফাভীর এক কন্যার সঙ্গে শুজার বিবাহ হয়েছিল এবং এই বেগমের মৃত্যুর পর বাংলার পূর্বতম ভাইসরয় নওয়াব আজম খানের এক কন্যাকে শুজা বিবাহ করেছিলেন। বাংলায় নিযুক্ত হওয়ার পর শাহ শুজা অস্থায়ীভাবে সুবাদারি-রাজধানী ঢাকা থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। তিনি দু'বার বাংলা শাসন করেছিলেন—একবার আট বৎসরকাল এবং মাঝে দু'বৎসর বাদে আবো আট বৎসরকাল। বাংলায় শাহ শুজার শাসনকালে রাজস্ব বিভাগের সংস্কার প্রবর্তিত হয় ও রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। আন্দাজ ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাংলায় একটি নূতন রাজস্ব-তালিকা তৈরী করেন। তাতে দেখা যায়, বাংলার ৩৪টি সরকার, ১৩৫০টি মহল এবং আবোয়াব বাদে খালসা ও জায়গীর জমির রাজস্বের মোট পরিমাণ ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা ছিল (ব্লকম্যানের Contributions to History of Bengal ও পাদশাহনামা দ্রষ্টব্য)। শাহ শুজা স্থাপত্য শিল্পের অনুরাগী

ছিলেন এবং তিনি রাজমহল, মুঙ্গের ও ঢাকায় বহুসংখ্যক মার্বেল-নির্মিত ভবন তৈরী করেছিলেন। মুঙ্গের সরকার ও বিহার অন্তর্ভূক্ত ক'রে তিনি স্বীয় শাসনাধীন প্রদেশের আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন (আলমগীরনামা দ্রঃ)। কিন্তু অত্যল্পকাল পরে চতুর ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় তাঁর অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। অবশেষে তিনি আরাকান পলায়ন করেন ও সেখানে তিনি ধ্বংস হন।

২৩. পূর্বোক্ত টীকা দ্রষ্টব্য।

২৪. পুস্তকে 'বিশতম' (বিংশতি) স্থলে ভুলক্রমে 'হশতম' (সপ্তম) মুদ্রিত হয়েছে।

২৫. ইতিকাদ খান মীর্জা শাপুর ছিলেন ইতিমাদ-উদ-দৌলার পুত্র ও আসফ খান মীর্জা আবুল হোসেনের ভ্রাতা এবং সেই সূত্রে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানেরও ভ্রাতা (মা'সির-উল-উমারা, ফার্সী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব, ১৮০ পৃঃ দ্রঃ)।

অধ্যাপক ব্লকম্যানের তালিকায় তাঁর নাম নাই ('আইনে'র অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৫১১ পৃঃ)। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে তাঁকে কাশ্মীরের গবর্নর পদে নিযুক্ত করা হয় এবং দীর্ঘকাল তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁকে পাঁচ-হাজারীর মর্যাদায় উন্নীত করেছিলেন। শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে তাঁকে কাশ্মীর থেকে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ষোড়শ বর্ষে তাঁকে বিহারের গবর্নর করা হয়। এখানে থাকাকালে তিনি জবরদস্ত খানের নেতৃত্বে পালাউঁয়ের (পালামৌয়ের) জমিদার বা রাজা প্রতাপের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন ও বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হন। শাহজাহানের রাজত্বের ত্রয়োবিংশতি বৎসরের সময় যখন শাহ শুজাকে বাংলা থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়, তখন ইতিকাদ খানকে বিহারের গবর্নরির সাথে বাংলার সুবাদারির অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়া হয় এবং তিনি দুই বৎসরকাল এই পদে অধিষ্ঠিত

ছিলেন। ১০৬০ হিজরীতে, অর্থাৎ শাহজাহানের রাজত্বের ত্রয়োবিংশতি বৎসরে আগ্রায় ইতিকাদ খানের মৃত্যু হয়। তিনি অত্যন্ত মার্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর শিল্প-রুচির দরুন তিনি নতুন স্থাপত্যশিল্প প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি নতুন ধরনের পরিকল্পনায় আগ্রায় একটি জমকালো অট্টালিকা তৈরী করেছিলেন।

'আলমগীরনামা'য় (১১১ পৃঃ) ইতিকাদ খানকে আমিন-উদ-দৌলা আসফ খানের পুত্ররূপে উল্লেখ করা হয়েছে (মা'সির-উল-উমারা, ফার্সী সংস্করণ, ১ম খণ্ড, ২য় পর্ব, ১৮০ পৃঃ দ্রঃ)।

২৬. ১০৬৭ হিজরীর ৭ই জিলহজ তারিখে বাদশাহ শাহ্‌জাহান দিল্লীতে অসুস্থ হন (আলমগীরনামা, ২৭ পৃঃ)। বাদশাহের অসুখের সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা-শেকোহ্‌ দিল্লীতে ছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র শাহজাদা শুজা বাংলায়, তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব দক্ষিণে ও চতুর্থ পুত্র মুরাদ গুজরাটে ছিলেন। বাদশাহের অসুখের জন্য জনসাধারণ, কিম্বা তাঁর মন্ত্রীগণ ও কর্মচারীগণ তাঁকে দেখতে পেতো না। এই জন্য রাজকার্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। দারা-শেকোহ্‌ বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাত করার পর রাজকার্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। সামগ্রিক পরিস্থিতি স্বীয় আয়ত্তাধীনে আনয়নের জন্য ও বাদশাহকে সম্পূর্ণরূপে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীন রাখার উদ্দেশ্যে দারা বলপূর্বক সমগ্র রাজকীয় সম্পদসহ ১০৬৮ হিজরীর (ফার্সী সংস্করণে ১০৮৬হিঃ ভুলে মুদ্রিত হয়েছে) ২০শে মুহররম তারিখে দিল্লী থেকে বাদশাহকে আগ্রায় অপসারিত করেন। ১০৬৮ হিজরীর ১৯শে সফর তিনি আগ্রা পৌঁছান। ইতিমধ্যে মুরাদ গুজরাটে নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করেন; অনুরূপভাবে শুজাও বাংলায় নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করতঃ পাটনা ও বানারস আক্রমণ করেন (আলমগীরনামা, ২৯ পৃঃ)। দারা-শেকোহ্‌ প্রথমে শুজা, তৎপর মুরাদ ও সর্বশেষে আওরঙ্গজেবকে চরম আঘাত হানবার পরিকল্পনা করেছিলেন। আওরঙ্গজেবকেই তিনি সবচাইতে বেশী ভয় করতেন। এই পরিকল্পনা মোতাবেক তিনি তাঁর পুত্র সুলায়মান শেকোর নেতৃত্বে ও

রাজা জয়সিংহের সৈনাপত্যে এক বৃহৎ বাহিনী শাহ শুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১০৬৮ হিজরীর ৪ঠা রবিউল-আউয়াল তারিখে সুলায়মানের সৈন্যবাহিনী বানারস থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে বাহাদুরপুর গ্রামে পৌঁছায়। শাহ শুজার সৈন্যবাহিনী তখন দেড় ক্রোশ দূরে ছাউনি করেছিল। শাহ শুজা বহুসংখ্যক 'নওয়ারা' বা যুদ্ধ-জাহাজ বাংলা থেকে এনেছিল। সেইজন্য তিনি সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন ও বিপক্ষ দলকে হেয়জ্ঞান করেছিলেন এবং যুদ্ধকালীন প্রয়োজনীয় সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। সুলায়মান শেকোহ্ পশ্চাদ্গমনের ভান করেন ও তাতে শুজা বিভ্রান্ত হন। অতঃপর সুলায়মান সহসা ফিরে আক্রমণ করায় শুজা হতভম্ব হয়ে সমস্ত তাঁবু, সম্পদ, কামান ও ঘোড়া ফেলে দ্রুত নৌকাযোগে প্রথমে পাটনা ও পরে মুঙ্গের চলে যান এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। সুলায়মান শেকোর সৈন্যরা মুঙ্গের পর্যন্ত শুজার পশ্চাদ্ধাবন করে। তখন শুজা মুঙ্গের ত্যাগ ক'রে বাংলা অভিমুখে অগ্রসর হন (আলমগীরনামা, ৩১ পৃঃ)। যখন বাংলায় এই সকল ঘটনা হচ্ছিলো, তখন দারা-শেকোর মতলব আগে থেকেই ব্যর্থ করার জন্য তীক্ষ্ণ দূরদর্শী আওরঙ্গজেব ১০৬৮ হিজরীর ১২ই রবিউল-আউয়াল তারিখে আওরঙ্গাবাদ থেকে বুরহানপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। আগ্রার পরিস্থিতির সংবাদ জানার জন্য বুরহানপুর এক মাস অপেক্ষা করার পর তিনি জানতে পারেন যে, দারা-শেকোর এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনী রাজা যশবন্ত সিংহের নেতৃত্বে মালোয়ার উজ্জয়িনিতে পৌঁছেছে। এর ফলে আওরঙ্গজেব নিজের পরিকল্পনা স্থির করেন। জমাদিউল-আখিরার ২৫শে তারিখ শনিবার দিন বুরহানপুর থেকে যাত্রা ক'রে নর্মদা নদী অতিক্রম করেন ও ২০শে রজব তারিখে দেবলপুরে শিবির স্থাপন করেন। ২১শে রজব তারিখে দেবলপুর থেকে যাত্রা করেন ও পথে মুরাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তাঁকে নিজ দলভুক্ত করেন (আলমগীরনামা, ৫৫ পৃঃ)। অতঃপর তিনি উজ্জয়িনি

থেকে ৭ ক্রোশ দূরে ধরমতপুর পৌঁছান। এই সময় যশোবন্ত সিংহের সৈন্যবাহিনী চরনারায়ণিয়া নামক এক ক্ষুদ্র নদীতীরে শিবির স্থাপন করেছিল (আলমগীরনামা, ৫৬ পৃঃ)। মুরাদের সঙ্গে যোগদান করার ফলে আওরঙ্গজেবের কৌশলে যশোবন্ত সিংহ সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। অতঃপর আওরঙ্গজেব ধরমতপুরে যশোবন্ত সিংহকে শোচনীয়রূপে পরাস্ত করেন (এই যুদ্ধের আকর্ষণীয় বিবরণীর জন্য আলমগীরনামা, ফার্সী সংস্করণ, ৬১ পৃঃ ও ৬৬-৭৪ পৃঃ দ্রঃ)। ধরমতপুর থেকে দ্রুত অগ্রসর হয়ে আওরঙ্গজেব গোয়ালিয়র অতিক্রম করেন। ইতিমধ্যে দারা-শেকোহ্ আওরঙ্গজেবকে বাধা দেয়ার জন্য ও তাঁর চম্বল নদী অতিক্রম বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ঢোলপুরে অগ্রসর হয়েছিলেন (আলমগীরনামা, ৮৫ পৃঃ)। কিন্তু, রমজানের ১লা তারিখে আওরঙ্গজেব দ্রুতগতিতে ঢোলপুর থেকে ২০ ক্রোশ দূরে ভাদুরিয়ার পারঘাটায় চম্বল নদী অতিক্রম করেন। ৭ই রমজান তারিখে ঢোলপুরের যুদ্ধে দারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন (ঢোলপুরের যুদ্ধের বিবরণীর জন্য 'আলমগীরনামা', ১০০-১০৪ পৃঃ দ্রঃ)। দারা-শেকোহ্ আগ্রায় এবং সেখান থেকে পাঞ্জাব ও অন্যান্য স্থানে পলায়ন করেন। পরে ধৃত ও নিহত হন। সিংহাসন দখল করার অব্যবহিত পরে আওরঙ্গজেব শাহ শুজার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে শুজা রোটাস, চুনার, জৌনপুর, বানারস ও এলাহাবাদ অধিকার করেছিলেন। কোরার সন্নিকটে কাচোয়ায় আওরঙ্গজেব ও শুজার মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে শুজা পরাজিত হন (বিবরণীর জন্য 'আলমগীরনামা', ২৪৩ পৃঃ দ্রঃ)। পরাজয়ের পর শুজা বাহাদুরপুর ও সেখান থেকে পাটনা ও তৎপর মুঙ্গের পলায়ন করেন। শুজা মুঙ্গের সুরক্ষিত করেছিলেন। এরপর খড়কপুরের জমিদার রাজা বাহ্‌রোজের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন রাঙামাটি পলায়ন করেন। আবার সেখানে বীরভূমের জমিদার খাজা কামাল-উদ-দীনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রাজমহল চলে যান। অতঃপর তিনি ঢাকায় যান। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি সেনাপতি

মোয়াজ্জম খান ওরফে মীর জুমলার নেতৃত্বাধীন আওরঙ্গজেবের বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য বীরের মতো লড়াই করেছিলেন; কিন্তু প্রত্যেকবার অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন ব্যর্থ হয়েছিলেন। কেবল মহান বাঢ়্হা সৈয়দ গোষ্ঠী শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুগত ছিলেন (আলমগীরনামা, ফার্সী সংস্করণ, ৪৯৫-৫৬১ পৃঃ দ্রঃ)।

২৭. 'আলমগীরনামা'র ৩১ পৃষ্ঠায় (যা থেকে এই বিবরণী নেয়া হয়েছে) বলা হয়েছে, "মুঙ্গের থেকে পাটনা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চল দারা শেকোর ইক্‌তাভুক্ত হয়।"

২৮. ১০৬৮ হিজরীতে আওরঙ্গজেব দক্ষিণ থেকে অগ্রসর হয়ে উজ্জয়িনিতে মহারাজা যশোবন্ত সিংহের নেতৃত্বাধীন দারা শেকোর সৈন্যবাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন এবং তৎপর আগ্রার সন্নিকটে দারা-শেকোহ্‌কে পরাজিত করেন। অতঃপর ১০৬৯ হিজরীতে তিনি কোনো অনুষ্ঠান না করেই নিজেকে বাদশাহ ঘোষণা করেন (আলমগীরনামা; ৫৯-৮৬ এবং ৬৭-১০৮ পৃঃ দ্রঃ)।

২৯. আগ্রার সন্নিকটে আওরঙ্গজেবের নিকট পরাজিত হয়ে দারা দিল্লী ও সেখান থেকে লাহোর পলায়ন করেন। পাঞ্জাব, গুজরাট ও কাবুলে কয়েকটি অভিযান পরিচালনার চেষ্টার পর দাদরের জমিদার জিওন কর্তৃক তিনি ধৃত হন। জিওন তাঁকে আওরঙ্গজেবের নিকট সমর্পণ করেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে প্রথমে বন্দী ও পরে হত্যা করেন। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধিসৌধে তাঁকে দাফন করা হয় (আলমগীরনামা, ৪৩৩ ও ৪০৮ পৃঃ)। দারার পলায়নের পরবর্তী বিবরণী জানতে যারা উৎসুক তারা 'আলমগীরনামা'য় এর পূর্ণ বিবরণী পাবেন। দারা মুক্তচিন্তাশীল ও হিন্দু-সমর্থক ছিলেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলে হিন্দু-সমর্থনের নীতিতে আকবরকেও ছাড়িয়ে যেতেন। আওরঙ্গজেব ছিলেন দারার বিপরীত। তিনি ছিলেন ইসলামের সমর্থক এবং গজনীর মাহমুদ অথবা শাহাবউদ্দীন ঘোরীর মতো প্রতিমা-চূর্ণকারী।

৩০. 'আলমগীরনামা'য় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, শাহ শুজা মুঙ্গের সুরক্ষিত করার জন্য এই সময় তথায় অবস্থান করছিলেন। খড়কপুরের রাজা বাহ্রোজ বাহ্যতঃ শাহ শুজার প্রতি আনুগত্য দেখাতেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তিনি আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা ওরফে মোয়াজ্জম খানকে মুঙ্গেরের পূর্বদিকে যাওয়ার একটি পার্বত্য-পথ দেখিয়ে দেন। এই পথ অতিক্রম করার জন্য মীর জুমলাকে কয়েক মাইল ঘুরে যেতে হয়েছিল। পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা দেখে শাহ শুজা অনতিবিলম্বে নৌবহর-যোগে মুঙ্গের দুর্গ থেকে রাঙ্গামাটি ও রাজমহল যান এবং পথিমধ্যে বাংলার প্রবেশদ্বার তেলিয়াগড়ি ও শকরিগলি গিরিপথদ্বয় সুরক্ষিত করেন।

৩১. এঁর (খান-ই-খানানের) পূর্ণ জীবনী 'মা'সির-উল-উমারা', ফার্সী সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তাতে দেখা যায়, তাঁর আসল নাম ছিল মীর মুহম্মদ সইদ মীর জুম্‌লা। তাঁর উপাধি ছিল 'মোয়াজ্জম খান খান-ই-খানান সিপাহ্সালার'। তিনি আদাস্তান থেকে এসেছিলেন। প্রথমে গোলকুণ্ডার শাসনকর্তা সুলতান আবদুল্লা কুতব শাহের অধীনে কাজ ক'রে খ্যাতি ও উন্নতি লাভ করেন। কুতব শাহের সঙ্গে মতদ্বৈধ হওয়ায় তিনি আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগ দেন (আওরঙ্গজেব তখন দক্ষিণে ছিলেন)। তাঁর প্রধান কার্যাবলী হচ্ছে ঃ (১) বিজাপুর জয় ; (২) শাহ শুজাকে নির্মূল করা ; (৩) কুচবিহার ও আসাম জয়। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। সেনাপতি হিসেবে তৎকালে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না ('মা'সির-উল-উমারা, ফার্সী সংস্করণ, ৩য় খণ্ড, ৫৫৫ পৃঃ দ্রঃ)।

৩২. সুলতান মুহম্মদের শাহ শুজার সঙ্গে যোগদান ও পরে তাঁকে ত্যাগ করার বিবরণ 'আলমগীরনামা'য় বিবৃত হয়েছে।

৩৩. শাহ শুজার যুদ্ধ ও অভিযান সম্পর্কে বিবরণ 'আলমগীরনামা'য় পাওয়া যায়। পূর্বের টীকা দ্রষ্টব্য।

৩৪. 'আলমগীরনামা'য় ৫৫৭ থেকে ৫৬২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রদত্ত বিবরণী থেকে দেখা যায়, আরাকানের শাসনকর্তা সৈয়দ বা মুসলমান ছিলেন না। তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। 'আলমগীরনামা' থেকে আরো দেখা যায়, সুলতান শুজা নৌকাযোগে টাণ্ডা থেকে রওয়ানা হয়ে ঢাকায় পৌঁছান। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়েনউদ্দীন আগে থেকেই সেখানে ছিলেন। ঢাকায় পৌঁছাবার পর আরাকান যাওয়ার জন্য তথাকার রাজার সঙ্গে জয়েনউদ্দীন আগে থেকেই বন্দোবস্ত করেছিলেন। এই সময় মনোয়ার খান নামক জাহাঙ্গীর-নগরের জনৈক জমিদার বাধা সৃষ্টি করেন। সেইজন্য প্রথমে তাকে আরাকানীদের সাহায্যে দমন করা হয়। আরাকানীদের প্রহরা-ধীনে নৌকাযোগে ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে শাহ্ শুজা ধাপা (ঢাকা থেকে ৪ ক্রোশ দূরবর্তী), শ্রীপুর (ঢাকার উত্তরে ১২ ক্রোশ দূরে), ভালুয়া (তখন এই স্থান মুঘল এলাকার দক্ষিণ সীমানা ছিল) অতিক্রম ক'রে আরাকান অভিমুখে যান। বাংলার পুরাতন শহর-গুলোর নাম যারা জানতে উৎসুক তারা 'আলমগীরনামা'র এই অংশ পড়তে পারেন।

৩৫. 'আলমগীরনামা'য় 'ভীমনারায়ণ'কে 'বিমনারায়ণ' বলা হয়েছে (৬৭৬ পৃঃ)। তিনি কুচবিহারের জমিদার ছিলেন। উক্ত গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে যে, এতদ্বত তিনি নিয়মিতভাবে বাদশাহী কর দিতেন; কিন্তু শাহজাহানের ব্যাধি ও বাদশাহী মসনদ দাবী করার উদ্দেশ্যে শুজার পাটনা যাওয়ার দরুন বিশৃঙ্খলার সুযোগে বিমনারায়ণ কর দেয়া বন্ধ করেন এবং ঘোড়াঘাট বা রংপুর ও পরে কামরূপ আক্রমণ করেন। 'ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরি' অনু-সারে (১১০ পৃঃ) "কুচবিহারের জমিদার লছমিনারায়ণ বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে কর দিতেন।"

৩৬. 'আলমগীরনামা'য় 'শাহুয়া' নামের স্থলে 'ভোলানাথ'।

৩৭. আসামের এই রাজার নাম জী-ধ্বজ সিং (আলমগীরনামা, ৬৭৮ পৃঃ)।

৩৮. সমকালীন ইতিহাস 'আলমগীরনামা', ৬৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কাম-রূপের ফৌজদার লুতফুল্লা শিরাজী নৌবহরযোগে কামরূপ থেকে জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকা) পশ্চাদ্গমন করেন। অসমীয়ারা কামরূপ আক্রমণ করায় কোচরাও পশ্চাদ্গমন করেছিল। ঢাকা থেকে পাঁচ মঞ্জিল দূরবর্তী কারিবাড়ী পর্যন্ত অসমীয়াবা অগ্রসর হয়েছিল এবং কারিবাড়ীর সন্নিকটে মন্তসালা নামক স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল (আলমগীরনামা, ৬৭৯ পৃঃ)।

৩৯. খান-ই-খানান (মোয়াজ্জম খান) ১০৭২ হিজরীর ১৭ই রবিউল-আউয়াল তারিখে নৌবহরসহ খিজিরপুর (স্থানটি নারায়ণগঞ্জের সন্নিকটে বলে চিহ্নিত হয়েছে) থেকে কুচবিহার বিজয়ের জন্য যাত্রা করেন। মুখলেস খানকে আকবরনগরের (রাজমহলের) গবর্নর ও ইহ্তিশাম খানকে জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকার) গবর্নররূপে নিযুক্ত ক'রে যান। ইহ্তিশাম খানের অধীনে ভগবতীদাসকে দেওয়ানরূপে রেখে যান। অতঃপর তিনি বাদশাহী সীমান্ত-ঘাঁটি বারিতলায় পৌঁছান। 'আলমগীরনামা'য় বর্ণিত হয়েছে যে, তৎকালে কুচবিহার যাওয়াব তিনটি স্থলপথ ছিল: (১) মুরাঙ্গের পথে; (২) ডুয়ার্সের পথে; (৩) ঘোড়াঘাটের বা রংপুরের পথে। সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক পথ নির্ধারণের জন্য খান-ই-খানান গুপ্তচর প্রেরণ করেন এবং অবশেষে ঘোড়াঘাটের পথে যাওয়া সাব্যস্ত করেন। সৈন্যবাহিনীসহ তিনি স্থলপথে অগ্রসর হন এবং নদী-পথেও নৌকাযোগে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন; নির্দেশ দেয়া হয় যে, উভয় দল প্রত্যহ সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে ও পরস্পরকে সাহায্য দেবে (কুচবিহার ও আসাম অভিযানের পূর্ণ বিবরণীর জন্য আলমগীরনামা, ৬৮৩ পৃঃ দ্রঃ)। যুদ্ধজাহাজগুলো নদীপথে ঘোড়াঘাট ও ব্রহ্মপুত্রনদের সঙ্গমস্থলে পৌঁছায় এবং বাদশাহী বাহিনী কুচবিহার শহরে পৌঁছায়। রাজা বিমনারায়ণ ভুটানে পলায়ন করেন; তাঁর মন্ত্রী ভোলানাথ মুরাং-এ পালিয়ে যান; বাদশাহী সৈন্যরা বলপূর্বক কুচবিহার শহর দখল করে ও 'আলম-

গীরনগর' নামকরণ করে। রাজার প্রসাদের অলিন্দ থেকে বাংলার প্রধান বিচারপতি (সদর) সৈয়দ সাদিক আজান দেন। রাজার পুত্র বিষণনাথ ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসফন্দিয়ার বেগকে 'ইস-ফন্দিয়ার খান' উপাধি দিয়ে খান-ই-খানান তাঁকে কুচবিহারের ফৌজদার নিযুক্ত করেন এবং শাহ্ শুজার পূর্বতন কর্মচারী কাজী সামুকে তথাকার দেওয়ান নিযুক্ত করেন (আলমগীরনামা, ফার্সী সংস্করণ, ৬৯৪ পৃঃ দ্রঃ)।

৪০. কুচবিহার বিজয়ের পর খান-ই-খানান (মোয়াজ্জম খান) তাঁর স্থল ও নৌবাহিনীসহ ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ধ'রে রাঙ্গামাটি অতিক্রম করেন। দিলের খান অগ্রগামী বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন এবং মীর মতু'জা গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। খান-ই-খানান যোগীখাপা অধিকার ক'রে আতাউল্লাকে তথাকার ফৌজ-দার নিযুক্ত করেন। এরপর শ্রীঘাট দখল করেন ও বলপূর্বক গৌহাটি অধিকার ক'রে মুহম্মদ বেগকে গৌহাটির ফৌজদার নিযুক্ত করেন। কিছুদিন গৌহাটি অবস্থানের পর খান-ই-খানান পুনরায় যাত্রা করেন। সেইসময় মক্‌রুপঞ্জ নামক দারং ও দাবো মারিয়ার রাজা বশ্যতা স্বীকার করেন ও কর দেন। অতঃপর খান-ই-খানান জামধাড়ার দুর্গ প্রচণ্ড আক্রমণ দ্বারা অধিকার করেন এবং সৈয়দ মীর্জাই শাহ্‌জোয়ারিকে (সৈয়দ তাতার ও রাজা কিষন সিং সহ) তথাকার থানাদার নিযুক্ত করেন। সৈয়দ নাসির-উদ-দীন খানকে (অন্যান্য বাদশাহী কর্মচারীসহ) কালিয়াবাড়ীর থানাদার ও সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। ৪০০ অসমীয়া যুদ্ধজাহাজ, কামান, অস্ত্রশস্ত্র ও মালমাত্তা দখল করেন। তিনি সোলগড়, লাখো-কাড়, দেওয়ালপুর, কাজপুর, আসামের রাজধানী কার্গন বা গরগাঁও অধিকার করেন এবং ২০৫টি প্রাকার-ধ্বংসকারী কামান, ১০০ হস্তী, সোনা-রুপায় তিন লক্ষ টাকা, ৬৭৫টি অনুরূপ কামান, ১০০০ যুদ্ধজাহাজ, অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও মালমাত্তা দখল করেন (আসামের পুররাতন রাজধানী গরগাঁওয়ের বিবরণীর জন্য 'আলম-

গীরনামা', ৭২৮ পৃঃ দেখুন)। বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় খান-ই-খানান মথুরাপুরে শিবির স্থাপন করেন। স্থানটি উচ্চভূমি—গরগাঁও থেকে তিন ক্রোশ দূরে। মীর মর্তুজা, রাজা অমর সিং ও অন্যান্যকে গরগাঁওয়ের ভার দেন ও সৈয়দ মুহম্মদকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। রাজা কামরূপের পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করায় মুহম্মদ আবিদকে রাজার সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করার জন্য নিযুক্ত করা হয়। খান-ই-খানান এরপর মিয়ানা খানকে শালপনীর ভার, গাজী খানকে দেওপনির ভার এবং জাল্লালকে ঢাঁক নদীর তীর রক্ষার ভার দেন। বাদশাহী বাহিনী সমগ্র দক্ষিণকূল ও উত্তরকুলের অংশ দখল করে (আলমগীরনামা, ৭৩৬ পৃঃ)।

৪১. বর্ষা আরম্ভ হওয়ার পর আসামের রাজা সৈন্যসহ কামরূপের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে বাদশাহী সৈন্যদের কিছুটা অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল। বাদশাহী সৈন্যদের মধ্যেও জ্বর ও উদরাময়ের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। অবশেষে রাজা শান্তিব প্রস্তাব করেন। খান-ই-খানান তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিম্নোক্ত শর্তে শান্তি-প্রস্তাব মঞ্জুর করেন ঃ

(১) রাজা তাঁর ভগ্নি ও রাজা পতমের এক কন্যাকে ২০,০০০ তোলা সোনা, ২০,০০০ তোলা রূপা, ২০টি হস্তী করস্বরূপ দেবেন ; তা ছাড়া খান-ই-খানানকে ১৫টি হাতী ও দিলের খানকে ৫টি হাতী দেবেন।

(২) পরবর্তী বারো মাসের মধ্যে আসামের রাজা তিন লক্ষ তোলা রৌপ্য ও ৯০টি হস্তী বাদশাহকে পাঠাবেন এবং তৎপর প্রত্যেক বৎসর ২০টি হাতী বাদশাহকে পাঠাবেন। উক্ত খেসারত শোধ না হওয়া পর্যন্ত ৪ জন নেতৃস্থানীয় অসমীয়া-প্রধানকে জামিন-স্বরূপ দিতে হবে।

(৩) উত্তরকূলেব দারং এবং দক্ষিণকুলের বিলতলি ও ডোমারিয়া বাদশাহের অধীনে থাকবে। আসাম ও বাদশাহী এলাকার মধ্যে দক্ষিণকূলে কালং নদী এবং উত্তরকুলে আলিয়াবাড়ী সীমানা

নির্দিষ্ট থাকবে। রহমত-বানু নাম্নী আসামের রাজার এক কন্যার সঙ্গে শাহজাদা মুহম্মদ আজমের বিবাহ দেয়া হয়। মোহরানা ছিল এক লক্ষ আশি হাজার টাকা (মা'সির-উল-উমারা, ৭৩ পৃঃ)।

৪২. 'আলমগীরনামা', ৮১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। খান-ই-খানান ১৬৫৮ থেকে ১৬৬৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ভাইসরয় ছিলেন। ১৬৬৩ সালের ৩০শে মার্চ তারিখে ঢাকার সন্নিকটে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংরেজ বণিকদের হুগলী থেকে বহিষ্কার করার ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন। ইংরেজ বণিকেরা বুদ্ধিমানের মতো বশ্যতা স্বীকার করায় তাদের ক্ষমা করা হয়েছিল। এরা তাদের হুগলীস্থ প্রতিনিধি ত্রিভিসার মারফতে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বাৎসরিক তিন হাজার টাকা দিতে স্বীকার করে (উইলসনের Early Annals of the English in Bengal, ২য় খণ্ড. ৩৫ পৃঃ দ্রঃ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (গ)

১. শায়েস্তা খান ছিলেন আমিন-উদ-দৌলা আসফ খানের পুত্র এবং শাহজাহানের বেগম মমতাজ মহলের ভ্রাতা। তাঁর আসল নাম 'মীর্জা আবু তালেব'; উপাধি ছিল 'আমির-উল-উমারা শায়েস্তা খান'। শাহজাহানের রাজত্বকালে তিনি পাঁচ-হাজারির মর্যাদা লাভ করেন এবং দক্ষিণে বালাঘাটের নাজিম এবং পরে বিহার ও পাটনার সুবাদার নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি পালাওঁ (পালামৌ) আক্রমণ ক'রে তথাকার জমিদার পরতাবকে (প্রতাপকে) বশীভূত করেন। অতঃপর তিনি মালোয়া (মালব) ও গুজরাটের সুবাদার এবং এরপর দক্ষিণের সমস্ত সুবার ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হন। দারা-শেকোহ্ ও সুলায়মান-শেকোর সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি আওরঙ্গজেবকে বিশেষ সাহায্য করেন। মীর জুমলার মৃত্যুর পর ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাংলার ভাইস্‌রয় হন। এই সময় মগ-জলদস্যুরা বাংলার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে লুঠপাঠ ও অত্যাচার করতো। তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করেন এবং প্রধানতঃ তাঁর পুত্র বুজুর্গ উম্মেদ খানের চেষ্টায় চিটাগাং বলপূর্বক দখল করেন ও শহরের নাম রাখেন ইসলামাবাদ (আলমগীরনামা, ৯৪০ পৃঃ)। পরে তিনি সাত-হাজারি হয়েছিলেন ও ১১০৫ হিজরীতে আগ্রায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সম্বন্ধে আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত উচ্চ ধারণা ছিল এবং তাঁকে সর্বপ্রকার সম্মান ও অর্ধ-রাজকীয় মর্যাদা দিতেন। বিরাট ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও শায়েস্তা খান বিনয়ী, নম্র, ন্যায়পরায়ণ, উদার, সাহসী, মহৎ ও শিক্ষিত ছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক মাদ্রাসাসহ মসজিদ, সরাই, পুল ও রাস্তা সারা ভারতে তৈরী করে-

ছিলেন ও তাঁর দান ছিল ব্যাপক। আবদুর রহিম খান-ই-খানানের পুত্র শাহ নওয়াজ খানের এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাথমিক যুগের বাণিজ্যিক ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বর্ণ (উইলসনের Early Annals of the English in Bengal, ১ম খণ্ড, ৪৮-৯৯ ও ১১১ পৃঃ এবং হাণ্টারের History of British India, ২য় খণ্ড, ২৩৮-২৬৬ পৃঃ দ্রঃ)। বাংলায় নওয়াব শায়েস্তা খানের শাসনকাল মুঘল আমলের এক গৌরবজ্জ্বল অধ্যায়। কারণ, এই সময় সরাই, পুল, রাস্তা প্রভৃতি বহু জনকল্যাণকর কার্য সম্পন্ন হয়েছিল এবং জনগণের অর্থনৈতিক ও কৃষি সম্পর্কিত উন্নতি অতুলনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কারণ, তাঁর আমলে দু'আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যেতো (মা'সির-ই-আলমগীরি, ১৬৭ ও ৩৬৮ পৃঃ এবং মা'সির-উল-উমারা ২য় খণ্ড, ৬৯০ পৃঃ দ্রঃ)।

২. মধ্যে কিছুদিন বিরতি ব্যতীত শায়েস্তা খান ১৬৬৪ থেকে ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পঁচিশ বৎসরকাল আওরঙ্গজেবের অধীনে বাংলার ভাইস্‌রয় ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ৯৩ চান্দ্র-বৎসর তখন তাঁর মৃত্যু হয়। ১৬৯৪ সালে ইংরেজদের ক্ষমা ক'রে তিনি যে পরোয়ানা দিয়েছিলেন তজ্জন্য হাণ্টারের 'ইতিহাস', ২য় খণ্ড, ২৬০ পৃঃ দ্রঃ)।

৩. এক 'দাম' = এক টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ এবং এক 'দাম্‌ড়ি' = এক 'দামের' আট ভাগের এক ভাগ (আইন-ই-আকবরী, ১ম ভাগ, ৩১ পৃঃ), অর্থাৎ ৩২০ 'দাম্‌ড়ি'তে, এক টাকা। সুতরাং শায়েস্তা খানের আমলে এক টাকায় আট মণ, অর্থাৎ দু'আনায় এক মণ চাউল পাওয়া যেতো।

৪. 'মা'সির-ই আলমগীরি'তে (৩৬৮ পৃঃ) শায়েস্তা খানের অতি উচ্চ-প্রশংসা করা হয়েছে। এতে বিবৃত হয়েছে যে, তিনি সারা ভারতে বহুসংখ্যক সরাই ও পুল তৈরী করেছিলেন। বাংলায় তাঁর প্রধান সাফল্য হচ্ছে : (১) চিটাগাং জয় ও এর 'ইসলামাবাদ' নামকরণ

(বিশদ বিবরণীর জন্য 'আলমগীরনামা', ৯৪০ পৃঃ দ্রঃ) ; (২) মগ-জলদস্যুদের নির্মূলকরণ ; (৩) বাংলার আর্থিক ও কৃষি-বিষয়ক উন্নতি সাধন ; (৪) অসংখ্য জনকল্যাণকর ভবন তৈরী (মা'সির-উল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৬৯০ পৃঃ)। শায়েস্তা খানের ভাইসরয়ী আমলে কাশ্মীরের সুবাদার সইফ খান, তিব্বতে-খুর্দের জমিদার মুরাদ খান ও দূত মুহম্মদ শাফির চেষ্টায় তিব্বতের রাজা দুল্‌দান নামজল আওরঙ্গজেবের বশ্যতা স্বীকার করেন (আলমগীরনামা, ৯২১-৯২২ পৃঃ)।

৫. আশ্চর্যের বিষয় যে, 'রিয়াজে'র গ্রন্থকার নওয়াব শায়েস্তা খানের শাসনকালে বাংলায় তাঁর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সাফল্যের বিষয়ের (অর্থাৎ মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন ও চিটাগাং পুনর্জয়ের) এত অল্প উল্লেখ করেছেন। সেই কারণে আমি সমকালীন ইতিহাস 'আলমগীরনামা' (ফার্সী সংস্করণ, ৯৪৩ পৃঃ) থেকে নিম্নলিখিত অনুবাদিত উদ্ধৃতি দিলাম ঃ

"আওরঙ্গজেব ও শাহ্ শুজার মধ্যে প্রাধান্যের দ্বন্দ্বের সুযোগে মগেরা যুদ্ধ-জাহাজ (নওয়ারা)-যোগে আরাকান থেকে এসে বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলসমূহে পীড়ন ও অত্যাচার করতে থাকায় বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাদের দমন করার জন্য বাংলার ভাইসরয় শায়েস্তা খানকে নির্দেশ দেন। এই উদ্দেশ্যে নওয়াব শায়েস্তা খান প্রথমে দক্ষিণাঞ্চলের সীমান্ত-ঘাঁটিগুলো সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা করেন। তিনি সইদ নামক জনৈক আফগানকে ৫০০ রকেট ও বন্দুকধারী সৈন্যসহ নোয়াখালীর ঘাঁটির ভার দেন। হুগলীর ফৌজদার মুহম্মদ শরিফকে ৫০০ রকেটধারী, ১০০০ পদাতিক সৈন্য ও ২০টি কামান দিয়ে সংগ্রাম-কাদার ঘাঁটি রক্ষার ভার দেন। মুহম্মদ বেগ আরাকান ও আবুল হোসেনকে বাদশাহী নৌবহর দিয়ে (এই নৌবহর তখন শ্রীপুর ছিল) নদী পাহারায় নিযুক্ত করেন। শ্রীপুর থেকে আলমগীরনগর পর্যন্ত একুশ ক্রোশ দীর্ঘ একটি বাঁধ সামরিক প্রয়োজনে তৈরী করান ; এই বাঁধ বর্ষার সময় যাতে

বন্যায় ডুবে না যায় সেইভাবে তৈরী করা হয়। অতঃপর নওয়াব সন্দ্বীপের জমিদার পর্তুগীজদের সাহায্যকারী দিলাওয়ারকে বন্দী ক'রে আনার অথবা শাস্তি দেয়ার জন্য আবুল হোসেনকে আদেশ দেন। আবুল হোসেন সন্দ্বীপ আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দিলাওয়ার তীরের আঘাতে আহত হয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যান। ইতিমধ্যে আরাকানী নৌবহর দিলাওয়ারকে সাহায্য করার জন্য সন্দ্বীপে পৌঁছায়। আবুল হোসেন আরাকানী নৌবহর আক্রমণ করার উদ্যোগ করায় তারা পশ্চাদগমন করে। তখন আবুল হোসেন তাদের পশ্চাদ্ধাবন না ক'রে নোয়াখালি ফিরে যান। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর নওয়াব শায়েস্তা খান নৌবহর-প্রধান ইবনে হোসেনের অধীনে জামাল খান, সরন্দাজ খান, কারামল খান ও মুহম্মদ বেগকে আবুল হোসেনের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। তাঁদের ১৫০০ কামানধারী ও ৬০০ অশ্বারোহী সৈন্য দেয়া হয়। সন্দ্বীপ জয় ও দিলাওয়ারকে ধ্বংস করার হুকুম দেন। এই সাহায্যকারী বাহিনীসহ ইবনে হোসেন নোয়াখালি যান। নোয়াখালি সন্দ্বীপের বিপরীত দিকে অবস্থিত। আরাকানী নৌবহরকে বাধা দেয়ার জন্য মুহম্মদ বেগসহ ইবনে হোসেন সেখানে থাকেন। অন্যদের নিয়ে আবুল হোসেন সন্দ্বীপ আক্রমণ করেন; যুদ্ধে দিলা-ওয়ারের পুত্র শরিফকে আহত ও বন্দী করেন। গুরুতর যুদ্ধের পর দিলাওয়ার ও তাঁর অনুচরদের বন্দী করেন, এবং জাহাঙ্গীরনগরের জমিদার মনোয়ারের হেফাজতে তাদের জাহাঙ্গীরনগর প্রেরণ করেন। সন্দ্বীপ দখলের সংবাদ পেয়ে নওয়াব শায়েস্তা খান রশিদ খানের ভ্রাতা আবদুল করিমকে ২০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিক সৈন্য দিয়ে সন্দ্বীপের ভার দেন। এই সময় ফিরিঙ্গিরা (পর্তুগীজরা) আরাকানীদের সমর্থন করছিল। সেইজন্য শায়েস্তা খান প্রথমে ফিরিঙ্গিদের পৃথক করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ফিরিঙ্গিকে পত্র দেন। করমকিরি নামক জনৈক মগ এই সময় এক নৌবহরসহ সন্দ্বীপের নিকটেই ছিল। উক্ত পত্রাবলীর কয়েকটি তাঁর হস্তগত

হওয়ায় সে আরাকানের রাজাকে এই সংবাদ দেয়। ফিরিঙ্গিদের উপর রাজার অবিশ্বাস হওয়ায় তিনি তাদের চিটাগাং থেকে আরাকানে বহিষ্কারের আদেশ দেন। চিটাগাং-এর ফিরিঙ্গিরা এই সংবাদ শুনে আরাকানী নৌবহরের অনেকগুলো জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নোয়াখালির মুঘল এলাকায় পলায়ন করে। ভালুয়া সীমান্তঘাঁটির সৈন্যাধ্যক্ষ ফারহাদ খান কয়েকজন ফিরিঙ্গিকে নিজের কাছে রেখে তাদের নেতাদের ঢাকায় (জাহাঙ্গীরনগরে) শায়েস্তা খানের নিকট পাঠিয়ে দেন। শায়েস্তা খান তাদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করেন। এরপর নওয়াব তাঁর পুত্র বুজুর্গ উম্মেদ খানের নেতৃত্বে ২০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ চিটাগাং আক্রমণ করার জন্য প্রেরণ করেন; সঙ্গে সাহায্যকারীরূপে দিয়েছিলেন ইখতিসাস খান বাঢ়্‌হা, সবাক সিং সিন্‌সুদিয়া, মিয়ানা খান ও করন খাজিকে। ভালুয়ার থানাদার ফারহাদ খানকে ইবনে হোসেন ও মনোয়ার জমিদারসহ নৌবহর নিয়ে অগ্রসর হওয়ার হুকুম দেয়া হয় এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান মীর মর্তুজাকে ফারহাদ খানের সঙ্গে যোগ দিয়ে সম্মুখ ভাগ রক্ষার আদেশ দেয়া হয়। চট্টগ্রামস্থ পর্তুগীজদের প্রধান কাপ্তেন মুরকে আনুগত্যের সাথে কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়। আরাকানের পূর্বতন রাজার পুত্র কামাল, বাদশাহ শাহজাহানের রাজত্বকালে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁকেও মীর মর্তুজার সঙ্গে গিয়ে চিটাগাং-এর মগ-সেনাপতির নিকট আপোষমূলক সংবাদ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। ফারহাদ খান ও মীর মর্তুজা স্থলপথে এবং ইবনে হোসেন, মুহম্মদ বেগ ও মনোয়ার নদীপথে অগ্রসর হন। নোয়াখালি থেকে রওয়ানা হয়ে এরা ১৬ই রজব তারিখে জগদিয়া থানায় পৌঁছান। ১৮ই রজব তারিখে ফারহাদ খান সসৈন্যে ফিনি (ফানি) নদী অতিক্রম করেন এবং ২৪শে রজব তারিখে চিটাগাং থেকে এক দিনের পথ দূরে একটি পুষ্করিণীর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রধান সেনাপতি বুজুর্গ উম্মেদ খানের জন্য অপেক্ষা করেন। বুজুর্গ উম্মেদ খান ২১শে রজব

ফিমি নদী পার হন এবং ২৫শে রজব তারিখে চিটাগাং থেকে দশ ক্রোশ ও ফারহাদ খানের শিবির থেকে ৮ ক্রোশ দূরবর্তী একটি স্থানে পৌঁছান। বুজুর্গ উম্মেদ খানের শিবির থেকে ২০ মাইল দূরে ডোমারিয়া গ্রামে বাদশাহী নৌবহর অপেক্ষা করছিল। ২৭শে রজব তারিখে দু'টি নৌযুদ্ধে আরাকানীরা পরাজিত হয়। আরাকানী নৌবহর কর্ণফুলি নদীর উজান দিকে চলে যায়। বুজুর্গ উম্মেদ খানের হুকুমে মীর মর্তুজা জঙ্গল কেটে পথ তৈরী ক'রে বাদশাহী নৌবহরকে সাহায্য করার জন্য কর্ণফুলীর নিকটবর্তী হন। বুজুর্গ উম্মেদ খানও এইভাবে অগ্রসর হন। কর্ণফুলী নদীতে এক প্রচণ্ড নৌযুদ্ধে মগেরা শোচনীয়রূপে পরাজিত হয় এবং বুজুর্গ উম্মেদ খান চিটাগাং দুর্গ বলপূর্বক অধিকার করেন ও আরাকানী নৌবহর দখল করেন। এইরূপে তিনি সমগ্র চিটাগাং দখল করেন। ১৩২টি আরাকানী যুদ্ধজাহাজ, বহু কামান, অস্ত্রশস্ত্র ও হস্তী তিনি দখল করেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেব চিটাগাং-এর নাম ইসলাবাদ রাখার আদেশ দেন; নওয়াব শায়েস্তা খানকে পুরস্কার দেন; তাঁর পুত্র বুজুর্গ উম্মেদ খানকে ও ফারহাদ খানকে দেড় হাজারী মনসব দেন এবং মীর মর্তুজাকে 'মুজাহিদ খান' ও ইবনে হাসানকে 'মুজাফ্‌ফর খান' উপাধি দেন। মনোয়ার জমিদারকে দেড়-হাজারীতে উন্নীত করেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে চিটাগাং বিজিত হয়েছিল" (আলমগীরনামা, ৯৫৬ পৃঃ)।

৬. আমীর-উল-উমারা আলী মর্দান খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইব্রাহীম খান। পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে চার-হাজারী ও পরে পাঁচ-হাজারী করা হয়। তিনি পরপর কাশ্মীর, লাহোর, বিহার ও বাংলার সুবাদার হয়েছিলেন। তাঁর এক পুত্র জবরদস্ত খান বিদ্রোহী আফগান রহিম খানকে দমন করেছিলেন। অন্য পুত্র ইয়াকুব খান লাহোরের সুবাদার হয়েছিলেন। ১১০৯ হিজরী (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের একচল্লিশতম বৎসরে) শাহজাদা মুহম্মদ আজিম ওরফে আজিম-উশ-শানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্তির পর তাঁকে বাংলা

থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয় (মা'সিরি-আলমগীরি, ৭১, ১৬৩ ও ৩৮৭ পৃঃ এবং মা'সির-উল-উমারা, ১ম খণ্ড, ২৯৫ পৃঃ দ্রঃ)। ইংরেজ বণিকেরা তাঁকে (ইব্রাহীম খানকে) "অত্যন্ত বিখ্যাত ন্যায়পরায়ণ ও সৎ নওয়াব" আখ্যা দিয়েছিল (উইলসনের Early Annals of the English in Bengal, ১ম খণ্ড, ১২৪ পৃঃ)। কারণ, তিনি সুবাদারির প্রথম বৎসরে তাদের মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে সুতানুটিতে (ভাবী ক'লকাতা) বাস করার অনুমতি দিয়েছিলেন (১৬৯০ খ্রীঃ)। ইংরেজ বণিকগণ অত্যন্ত বিনীত ও বশ্যতাপূর্ণ দরখাস্ত করায় এবং দেড়লক্ষ টাকা জরিমানা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ায় বাদশাহ্ আওরঙ্গজেব তাদের ক্ষমা করার পর ইব্রাহীম খান উক্ত সুবিধা ইংরেজ বণিকদের দিয়েছিলেন (হান্টারের India, ২য় খণ্ড, ২৬৫-২৬৬ পৃঃ)।

৭. 'মা'সিরি-আলমগীরি', ২৫৯, ১৪৪, ১৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৬৯, ২৮৫ ও ৩০৯ পৃঃ দ্রঃ।

৮-৯. 'মা'সিরি-আলমগীরি', ১৪২, ২১১, ৩১৯, ৩৩২, ৩০৮ পৃঃ দ্রঃ।

এরও পূর্বে, আসাম সীমান্তে আর একটি গোলমাল হয়েছিল। এই বইতে তার উলেখ নাই। অসমীয়ারা গৌহাটির বাদশাহী ঘাঁটি আক্রমণ করে ও সৈয়দ ফিরোজ খান নামক ফৌজদারকে হত্যা করে। অসমীয়াদের দমন করার উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব আসামে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন (মা'সির-ই-আলমগীরি, ৬৪ পৃঃ)।

১০. 'আইন-ই-আকবরী'তে (জেরেটের অনুবাদ, ২য় খণ্ড, ১৪১ পৃঃ) সরকার মাদারনের অন্তর্গত চিতোয়া বা চাতোয়া নামক একটি পরগণা বা মহলের উল্লেখ আছে। এই একই সরকারের অন্তর্গত বার্ধা নামক অন্য একটি মহলের (সম্ভবতঃ বলগাড়ি নামক স্থানের নাম ভুলে বার্ধা মুদ্রিত হয়েছে) অথবা সরকার শরিফাবাদের অন্তর্গত ভারকোন্দা (ভারগোদা) নামক মহলের কোনো চিহ্ন আমি পাই নাই ('আইন, ২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ)।

১১. 'আইনে' (২য় খণ্ড, ১৩৯ পৃঃ) বর্ধমানকে সরকার শরিফাবাদের অন্তর্গত একটি মহল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২·১৩. পরে আওরঙ্গজেব এই নূরুল্লাহ্ খানকে উড়িষ্যার ডেপুটি সুবাদার পদে উন্নীত করেছিলেন (মা'সির-ই-আলমগীরি, ১৬৯ পৃঃ)।

'আইনে' উল্লিখিত হয়েছে, "এইরূপে মহামান্য বাদশাহ (আকবর) সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একজন সেনাপতি নিযুক্ত করতেন; এইরূপে তিনি বিজ্ঞতা ইত্যাদির সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসী, ন্যায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ কর্মচারীকে ফৌজদার পদে নিযুক্ত করতেন (আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড, ৪০ পৃঃ)।

১৪. স্পষ্টতঃ, যশোর, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা নিয়ে গঠিত চাক্‌লা বা বিভাগের মুঘল ফৌজদারের সদর দফতর ছিল 'যশোর' বা 'যসরে'।

১৫. আক্ষরিকভাবে "চীনা হরিন"।

১৬. এই সুযোগে ইংরেজরা তাদের কলকাতাস্থ নতুন বাসস্থান সুরক্ষিত করেছিল (উইলসনের Annals, ২য় খণ্ড, ১৪৭ পৃঃ)।

১৭. পরিষ্কার বুঝা যায়, ভীরুতার জন্য নূরুল্লাহ্ খানকে পদচ্যুত ক'রে তাঁর স্থলে যশোর, হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুর চাক্‌লার ফৌজদার পদে জবরদস্ত খানকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

১৮. প্রতীয়মান হয় যে, নূরুল্লার মতো নওয়াব ইব্রাহীম খানকেও ভীরুতা দেখানোর জন্য প্রত্যাহার করা হয়। ইব্রাহীম খান সর্বদা অধ্যয়নরত ও শান্তিবাদী ছিলেন।

১৯. ভগবান গোলার নিকটে এই যুদ্ধ হয়েছিল (স্টুয়ার্টের Bengal এবং উইলসনের Annals, ১ম খণ্ড, ১৪৯ পৃঃ)।

২০. অর্থাৎ, সূর্য।

২১. অর্থাৎ, আকাশ।

২২. আলী-মর্দান খানের পুত্র ইব্রাহীম খানের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন জবরদস্ত খান। জবরদস্ত খান পরে আউধ ও আজমীরের সুবাদার এবং চার-হাজারীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিলেন। বাংলায় তাঁর পিতা

ইব্রাহীম খানের আমলে রহিম খানের নেতৃত্বে পরিচালিত আফগানদের পরাস্ত করাই তাঁর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য (মা'সির-উল-উমারা, ৩য় খণ্ড, ৩০০ পৃঃ এবং মা'সিরি-আলমগীরি, ৩০৭ ও ৪৯৭ পৃঃ)।

২৩. মুদ্রিত ফার্সী সংস্করণে 'রহিম খান'-এর স্থলে ভুলক্রমে 'ইব্রাহীম খান' ছাপা হয়েছে।

২৪. আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ মুয়াজ্জম বাহাদুর শাহের ঔরসে ও রূপ সিং রাঠোরের কন্যার গর্ভে শাহজাদা মুহম্মদ আজিম ওরফে আজিম-উশ-শানের ১০৭৪ হিজরীর ৬ই জমাদিউল-আউয়াল (অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে) তারিখে জন্ম হয়েছিল (মা'সিরি-আলমগীরি, ৪৯ পৃঃ দ্রঃ)। ১০৮৯ হিজরীতে (আওরঙ্গজেবের রাজত্বের একুশতম বৎসরে) তিনি কেরাত সিং-এর এক কন্যাকে ৬৩,০০০ টাকা দেনমোহর, অলংকার, একটি পাল্কী, ৫টি ডুলি, জরীর কাজ-করা মণিমুক্তাখচিত বালিশ উপহারসহ বিবাহ করেন (মা'সিরি-আলমগীরি, ১৬৭ পৃঃ দ্রঃ)। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ৩৬তম বৎসরে (১১০৩ হিজরীতে) তিনি রুহ-আল্লাহ খানের এক কন্যাকে বিবাহ করেন (মা'সিরি-আলমগীরি, ৩৪৭ পৃঃ দ্রঃ)। ১১০৮ হিজরীতে (আওরঙ্গজেবের রাজত্বের একচল্লিশতম বৎসরে তিনি কুচবিহারসহ বাংলার ভাইসরয়ের পদে ইব্রাহীম খানের স্থলাভিষিক্ত হন (মা'সিরি-আলমগীরি, ৩৮৭ পৃঃ দ্রঃ)। ১১১৪ হিজরীতে বিহারকে বাংলা সুবার সঙ্গে যোগ ক'রে দেয়া হয় (মা'সিরি-আলমগীরি, ৪৭০ পৃঃ)।

২৫. ভারতে মুঘল আমলে 'মাহী' পদবী অন্যতম সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন উপাধি ছিল।

২৬. শাহজাহানের রাজত্বকালে আলী মর্দান খান আমির-উল-উমারা রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি কাশ্মীর ও পাঞ্জাবের সুবাদার হয়েছিলেন এবং সাত-হাজারীর মর্যাদা পেয়েছিলেন। ১০৫০ হিজরীতে তিনি কাবুলের সুবাদার হন ও পরে

'আমীর-উল-উমারা' উপাধি পেয়েছিলেন। ১০৫৬ হিজরীতে তিনি বল্খ ও বদখ্শান আক্রমণ করেন ও ঐ সকল অঞ্চলের অংশ দখল করেছিলেন। পরে আবার তিনি লাহোরের সুবাদার হয়েছিলেন। ১০৬৭ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁকে লাহোরে দাফন করা হয়। সদুদ্দেশ্য, খোলাখুলি আচরণ, একনিষ্ঠ আনুগত্য ও আন্তরিকতা ও সাহসিকতার জন্য তিনি তৎকালীন বাদশাহী কর্মচারীদের মধ্যে অদ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন এবং বাদশাহের পূর্ণ আস্থা অর্জন করেছিলেন। বাদশাহ তাকে "ইয়ার ওফাদার" বা "বিশ্বস্ত বন্ধু" বলতেন।

তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কার্য হচ্ছেঃ (১) একটি বৃহৎ খাল খনন দ্বারা রাবি নদীর সঙ্গে লাহোর নগরীর সংযোগ সাধন; (২) লাহোরের সন্নিবটে উক্ত খালের পাড়ে কৃত্রিম জল-প্রণালী, হাউজ, ফোয়ারাদিসহ 'শালামার' নামক একটি জমকালো সাধারণ উদ্যান প্রতিষ্ঠা (মা'সির-উল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৮০৭ পৃঃ)।

২৭. খাজা আসম বদখ্শান থেকে আগ্রা এসেছিলেন ও পরে তিনি 'সম্সম্-উদ-দৌলা খান দওরান আমীর-উল-উমারা' উপাধি লাভ করেন। 'মা'সির-উল-উমারা'য় (১ম খণ্ড, ৮১৯ পৃঃ) উল্লিখিত হয়েছে যে, তার বড় ভাইয়ের নাম ছিল "খাজা মুহম্মদ জাফর খান"। নাদির শাহের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয় তাতে দওরান আহত হন ও ১১৫১ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

২৮. পারস্যের (ইরানের) প্রাচীনকালের কায়েনীয় বাদশাহগণ উৎকৃষ্ট তীরন্দাজ ছিলেন। তাঁদের ধনুক দূরত্ব অতিক্রম করার ও সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল (প্রাচীন কায়েনীয় বাদশাহদের বিবরণীর জন্য 'নামায়ে-খসরুয়ান', ৪৪ পৃঃ দ্রঃ)।

২৯. হামিদ খান কোরায়শীর পিতার নাম দাউদ খান কোরায়শী (মা'সির-উল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৩৭ পৃঃ দ্রঃ)।

৩০. 'খাদাং' এক প্রকার সাদা ঝাউ-জাতীর গাছ। এর থেকে তীর ও ধনুক তৈরী করা হয়।

৩১. 'স্টুয়ার্টে' 'ইব্রাহীমের' স্থলে 'বাহ্‌রাম'। তিনি একজন আউলিয়া ছিলেন; বর্ধমানে থাকতেন। আমি তাঁর বিশদ জীবনবৃত্তান্ত সন্ধান ক'রে পাই নাই।

৩২. 'তিউল', 'তুয়ুল' ও 'জায়গীর' একই অর্থবাহক এবং একই শ্রেণীর বন্দোবস্তি জমি। বেতনের বদলে মনসবদারদের এবং অন্যদের জীবিতকালের জন্য অথবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই প্রকার জমি বন্দোবস্ত দেয়া হোত। মুঘল আমলের প্রথম দিকে 'তিউল' শব্দের উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায়; কিন্তু আকবরের আমলে প্রায়ই এর পরিবর্তে 'জায়গীর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আফগান বাদশাহ শের শাহের আমলেও প্রায়ই 'জায়গীর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ঘোরি, খালজী ও তুঘলকদের আমলে 'জায়গীরে'র স্থলে 'ইক্‌তা' শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে (তবকত-ই-নাসিরি, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী এবং আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড ২৭০ পৃঃ দ্রঃ)।

'জায়গীর' বা 'ইক্‌তা' বা 'তিউল' ছাড়া আর এক প্রকার জমি বন্দোবস্ত দেয়া হোত। পরোপকার ছিল এর উদ্দেশ্য। বংশ পরম্পরায় এই প্রকার বন্দোবস্তি জমি ভোগ করা যেতো (জায়গীর দেয়া হোত নির্দিষ্ট কালের জন্য); এজন্য রাজস্ব ও কর দিতে হোত না; অথবা, সামরিক বা অন্য কোনো প্রকার সরকারী কাজ করার বাধ্যবাধকতা ছিল না। মুঘল আমলের পূর্বে এই প্রকার বন্দোবস্তিকে বলা হোত 'মিল্ক', 'মদদ-ই-মাশ', 'আয়মা' ও 'আল-তমগাহ্'; কিন্তু মুঘল আমলে এইগুলোর জন্য চুঘতাই শব্দ 'সায়ুরঘল' ব্যবহৃত হোত। 'সায়ুরঘল'-সমূহের তদারকের দায়িত্ব ছিল 'সদর-ই-জাহান' (এডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেল) নামক এক-জন কর্মচারীর উপর। নিম্নোক্ত চার শ্রেণীর ব্যক্তিকে এই প্রকার জমি বন্দোবস্ত দেয়া হোত—(১) সংসারত্যাগী জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তিদের—যারা দিবারাত্র কেবল জ্ঞানলাভের সন্ধানে থাকতেন; (২) মানুষের সংসর্গত্যাগী আত্মকৃচ্ছ্র-পরায়ণ ব্যক্তিদের; (৩) দুর্বল

ও দরিদ্র—যাদের জ্ঞান সন্ধানের শক্তি নাই; (৪) যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জ্ঞানের অভাবে কোনো পেশা অবলম্বনে অক্ষম (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ৩৫৩, ৩৮২, ৩৫৮ পৃঃ এবং আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, ২৬৮, ২৭০, ২৭১ ,২৭২ পৃঃ দ্রঃ)।

আয়মা ও আলতমগাহ্ দানের ক্ষেত্রে শের শাহ্ অত্যন্ত উদার ছিলেন। কিন্তু, আকবর ইহার অনেকগুলো খাস ক'রে নিয়েছিলেন। আলেমদের প্রতি ঘৃণার দরুন তিনি তাঁদের মদদ-ই-মাশ জমি খাস ক'রে নেন ও তাঁদের বাংলায় নির্বাসিত করেন (আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠার টীকা এবং বদাওনি, ২য় খণ্ড, ২৭৪, ২৭৬ ও ২৭৯ পৃঃ দ্রঃ)।

'আলতমগাহ্' একটি তুর্কী শব্দ; অর্থ—'লাল রাজকীয় ছাপ' এবং এর জন্য খাজনা দিতে হোত না; এগুলো চিরস্থায়ী এবং উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগদখল ও হস্তান্তরযোগ্য। তিন শ্রেণীর আভিজাত্য—যথা, জন্মগত, চারিত্রিক ও বুদ্ধিগত অভিজাত্য স্থায়ী করার উদ্দেশ্যে মুসলমান শাসকগণ সাযুরঘল বা আল-তমগাহ্ বন্দোবস্তির প্রবর্তন করেছিলেন। মুঘল বাদশাহদের আমলে জমিদারগণ স্থায়ী অথবা আধা-স্থায়ী রাকজীয় কর্মচারীর শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। মুঘল বাদশাহগণ ধন-দৌলত সংক্রান্ত আভি-জাত্য কম-বেশী স্থায়ীভাবে বজায় রাখতেন।

৩৩. বাঁশবেড়িয়া ও হুগলী শহরের মধ্যবর্তী স্থানে শাহগঞ্জ অবস্থিত। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে আমি যখন হুগলীতে ছিলাম, তখন শাহগঞ্জে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মসজিদ দেখেছিলাম। কথিত হয়, এটি শাহজাদা আজিম-উশ-শান তৈরী করেছিলেন।

৩৪. শুল্ক-কর আদায়ে মুসলমান ও অমুসলমানদের বৈষম্য থাকায় বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে অন্য একটি ইউরোপীয় খ্রীস্টান জাতি এই প্রকার বৈষম্যমূলক কর আদায় করতো। "সকল প্রকার পণ্যের জন্য মুসলমানদের কর দিতে হোত; পর্তুগীজদের দিতে হোত না" (হাণ্টারের History

of British India, ১ম খণ্ড, ১৫৫ পৃঃ দ্রঃ)। প্রত্যেক রাজ্যে সরকার ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও যে-কর আদায় করে, তাকে 'তমঘা' বলা হোত (আইন, ২য় খণ্ড, ৫৭ পৃঃ)।

৩৫. মওলানা রুম পারস্যের বিখ্যাত সুফী কবি। তাঁর নাম মওলানা জালালউদ্দীন। ৬০৫ হিজরীতে বল্‌খে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন; ৬৭২ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি একজন মহান আউলিয়া ছিলেন। তাঁর 'মসনবী' আধ্যাত্মিক সম্পদের আকর। তাঁর শিক্ষার মূল বিষয় ছিল নিঃস্বার্থপরতা (অথবা নিজেকে বা অহং বিস্মৃত হওয়া) এবং মানুষের সকল কার্যে আল্লার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা।

৩৬. সুফি বায়াজিদ ছিলেন বর্ধমানের আর একজন আউলিয়া। তাঁর জীবনবৃত্তান্ত আমি অবগত নই।

৩৭. আওরঙ্গজেবের কলম তাঁর তলোয়ারের মতই ভীতিপ্রদ ছিল। সংক্ষিপ্ত তীব্রদহনকারী ব্যঙ্গাত্মক পত্র লেখার ক্ষেত্রে অত্যল্পসংখ্যক ফার্সী লেখক আওরঙ্গজেবকে অতিক্রম করতে পারেন। কর্মচারীদের সঠিক পথে রাখবার জন্য তিনি প্রায়ই আধা-সরকারী পত্র তাদের নিকট লিখতেন। এক্ষেত্রেও মূল ফার্সী পত্র পড়লে আমার উক্ত মন্তব্য বুঝতে পারা যাবে।

৩৮. আওরঙ্গজেবের পত্রে 'সওদায়ে আম' ও 'সওদায়ে খাস' বাক্য দু'টিতে 'সওদা' শব্দটির ভিন্ন অর্থ বোধগম্য হয়। ফার্সীতে 'সওদা' শব্দের এক অর্থ—'ব্যবসা'; অন্য অর্থ—'পাগলামি'। অর্থাৎ, 'সাধারণ ব্যবসা' ও 'খাস ব্যবসা'; আবার 'সাধারণ পাগলামি' ও 'খাস পাগলামি'।

৩৯. "আজিম-উশ-শান অলস ও লোভী ছিলেন। পর্যাপ্ত ঘুষ পেলে তিনি সবকিছু দিতে প্রস্তুত ছিলেন।" ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ষোল হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের ইজারা বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন।

৪০. সকল রাজস্ব ও প্রশাসনিক বিষয়ের বিধান-পুস্তককে ফার্সীতে 'দস্তুর-উল-আমল' বলা হোত। বাদশাহ কর্তৃক ব্যক্তিগতভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর এই সকল বিধান প্রাদেশিক গবর্নরদের, প্রশাসকদের ও কর্মচারীদের নিকট প্রেরিত হোত। এর কোনো সংশোধনী হলে তাও অনুরূপভাবে সকলের নিকট পাঠানো হোত। দস্তুর-উল-আমলের কোনো বিধি থেকে বিচ্যুত হওয়ার বা অন্যরূপ কাজ করার ক্ষমতা নাজিম অথবা দেওয়ান কারো ছিল না (বদাওনি, ১ম খণ্ড, ৩৮৪-৩৮৫ পৃঃ)। এতে বলা হয়েছে যে, শের শাহের পুত্র সলিম শাহের আমলে এই বিধান-পুস্তক এতই ব্যাপক ও পরিষ্কার ছিল যে, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদি ছাড়াও ধর্মীয় প্রশ্নেও কাজী অথবা মুফ্তীদের নিকট মত নেওয়ার প্রয়োজন হোত না।

৪১. মনসবদারেরা মুঘল বাদশাহদের অধীনে উচ্চতর শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন। শের শাহের আমলেও কিন্তু এই শব্দ ব্যবহৃত হোত। নেতৃস্থানীয় মনসবদারেরা হয় প্রাদেশিক গবর্নর অথবা সেনাপতি থাকতেন। অন্য মনসবদারগণ জায়গীর ভোগ করতেন। কোনো কোনো সময় মনসবদারগণ চাকরী করতেন এক প্রদেশে, আর তাদের জায়গীর থাকতো অন্য প্রদেশে (ব্লকম্যান অনূদিত 'আইন-ই-আকবরী', ১ম খণ্ড, ২৪১-২৪২ পৃঃ)।

৪২. ভূমি-রাজস্বকে বলা হোত 'খিরাজ'। অমুসলমান প্রজাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য তাদের নিকট জিজিয়া-কর আদায় করা হোত। জিজিয়ার হার ছিল ঃ "অবস্থাপন্ন লোকের নিকট থেকে ৪৮ দেরহাম ; মধ্য-অবস্থার লোকের নিকট থেকে ২৪ দেরহাম ও নিম্নশ্রেণীর লোকের নিকট থেকে ১২ দেরহাম আদায় কার হোত।" জমির খাজনা ছাড়া সম্পত্তির উপর যে কর ধার্য করা হোত তাকে বলা হোত 'তমঘা'। উত্তম প্রস্তুত-দ্রব্যের আমদানির উপর করকে বলা হোত 'জিহাত' ও অন্য আমদানির করকে বলা হোত 'সয়ের জিহাত'। 'সয়ের' শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে—'হাঁটা', 'নড়াচড়া করা',

অথবা 'অস্থায়ী' ; এবং সেই কারণে সমস্ত অস্থায়ী রাজস্বকে এই আখ্যা দেয়া হোত। বাদশাহ আকবর কর্তৃক বিলুপ্ত 'সয়ের ট্যাক্সের' তালিকার জন্য 'আইন-ই-আকবরী', ২য় খণ্ড, ৫৭, ৫৮ ও ৬৬ পৃঃ দ্রঃ)।

৪৩ সামরিক কার্যের জন্য মনসবদারদের জায়গীর দেয়া হোত; আবার, সামরিক কার্য ছাড়াও অন্যদের জায়গীর দেয়া হোত। 'তবকত-ই-নাসিরি' ও 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে দেখা যায়, প্রাক্-মুঘল আমলে 'জায়গীরে'র সম-অর্থবোধক 'ইক্তা' শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হোত। মুঘল আমলের ইতিহাসে 'ইক্তা' শব্দের ব্যবহার প্রায় দেখা যায় না ; তৎপরিবর্তে 'জায়গীর' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। আকবরের আমলে 'দেওয়ানে জায়গীর' পদবীধারী কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায় (আইন, ১ম খণ্ড, ২৬১ পৃঃ)।

৪৪. এই 'নগদী' সৈন্যরা একপ্রকার 'আহাদি' সৈন্যশ্রেণীভুক্ত। বাদশাহী খাজাঞ্চীখানা থেকে এদের নগদ বেতন দেয়া হোত এবং এরা বাদশাহের প্রত্যক্ষ অধীন চাকুরে ছিল। প্রাদেশিক রাজধানীসমূহে বাদশাহের এই নিজস্ব সৈন্যদল থাকতো ও এরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীন ছিল না এবং এই স্বাধীনতার জন্য এদের মর্যাদা অধিক ছিল।

৪৫. শব্দগুলো হচ্ছে "ওয়াকিয়া" ও "সওয়ানিহ্"। মুঘল বাদশাহদের একটি বিশেষ গোয়েন্দা বিভাগ ছিল। প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বাদশাহগণ দু'টি বিশেষ কর্মচারীশ্রেণী রাখতেন—একটি ছিল 'সওয়ানী-নবিশ' ও অন্যটি হচ্ছে 'ওয়াকেয়া-নবিশ'। এরা বাদশাহের অধীন কর্মচারী ; স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাবেদারির বাইরে। স্থানীয় ঘটনা ও অবস্থা সম্পর্কে বাদশাহকে সংবাদ দেয়াই ছিল এদের কাজ। এরা স্বতন্ত্রভাবে রিপোর্ট দিতো এবং বাদশাহের দফতরে এদের স্বতন্ত্র রিপোর্ট মিলিয়ে দেখা হোত। 'ওয়াকেয়া-নবিশ' স্থানীয় দরবারের হালচালের সরকারী রিপোর্টার এবং 'সওয়ানিহ্-নবিশ' সাধারণ সংবাদ-

দাতা (আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, ২৫৮, ২৫৯ পৃঃ দ্রঃ)। এই দুই শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, "এদের মারফতে বাদশাহ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং বিজ্ঞ বা দক্ষ কর্মচারীরা নির্ভয়ে কাজ করতে পারবে ও অলস নিষ্ক্রিয় কর্মচারীদের সংযত করা সম্ভব হবে।"

৪৬. 'পরে ১৭০৯ খ্রীস্টাব্দে সরবুলন্দ খান যখন অস্থায়ীভাবে বাংলার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তখন তিনি ৪৫,০০০ টাকা ঘুষ নিয়ে ইংরেজ বণিকদের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ব্যবসা করার স্বাধীনতা দেন (উইলসনের Annals, ১ম খণ্ড, ১৮৩ পৃঃ)।

৪৭. ১৮৯৩, ১৮৯৪ ও পরে যখন আমি মুঙ্গেরে ছিলাম তখন মার্বেল-নির্মিত এই সকল অট্টালিকার কোনো চিহ্ন দেখি নাই।

৪৮. বাদশাহ আওরঙ্গজেব এই সময় দক্ষিণে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা ও আহমদ নগর এই তিনটি মুসলমান রাজ্যের ও মারাঠা দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। সমস্ত রাজনৈতিক বিজ্ঞতা সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব এই তিনটি মুসলমান রাজ্য বিনষ্ট ক'রে মারাত্মক ভুল করেছিলেন। কারণ, এই তিনটি রাজ্যই মারাঠাদের ও অন্যদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমন ক'রে রেখেছিল এবং সেই দক্ষিণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের সংযত ক'রে রেখেছিল। এই রাজ্যত্রয়ের বিলুপ্তির ফলে মারাঠা দস্যুরা ও অন্য দুঃসাহসিক অভিযাত্রীরা সুযোগ পায়। এর পূর্বে মারাঠাদের রাজনৈতিক অস্তিত্বই ছিল না ; কিন্তু এর ফলে মারাঠাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ ত্বরান্বিত হয় এবং পরে অন্যান্য শক্তির সঙ্গে এরাও বৃহৎ মুঘল-সাম্রাজ্য ভঙ্গ করার সুযোগ লাভ করে। উদার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করলে আওরঙ্গজেব এই তিনটি রাজ্যের সাথে তাঁর সাম্রাজ্যের মৈত্রী স্থাপন করতে পারতেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের অনুগত রক্ষামূলক প্রতিরোধ-ব্যবস্থারূপে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু ধর্মান্ধতা এই মহান মুঘল বাদশাহের স্বচ্ছ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছিল, যার ফলে ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রমণ্ডলের স্থায়ী ক্ষতি হয়েছিল।

'মা'সির-ই-আলমগীরি'তে বলা হয়েছে যে, এই সকল রাজ্যে কতক-গুলো নতুন ধর্মীয়বিধান প্রবর্তনের ফলে আওরঙ্গজেব এই নীতি অবলম্বন করেছিলেন ।

৪৯. প্রত্যেক জেলায় এই কর্মচারী স্থানীয় প্রথা ও জমি-বন্দোবস্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং সাধারণতঃ এদের নিয়োগ পুরুষানুক্রমিক ছিল। জমির শিকস্তি-পয়স্তি, বিক্রি, লীজ ও দান সম্বন্ধে কানুনগো পাটোয়ারিদের নিকট থেকে রিপোর্ট পেতেন (আইন-ই-আকবরি, ২য় খণ্ড, ৪৭ পৃঃ)।

এই পুস্তকের বিবরণীতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জেলা-কানুনগোর উপরে একজন প্রাদেশিক কানুনগো থাকতেন (পাটোয়ারি, কানুনগো, শিকদার, কারকুন ও আমিনদের কার্য ও বেতন সম্বন্ধে বিবরণীর জন্য আইন-ই আকবরী, ২য় খণ্ড, ৬৬ পৃঃ দ্রঃ)।

'আইন-ই আকবরী'তে (২য় খণ্ড, ৪৯ পৃঃ) বিবৃত হয়েছে যে, " 'বেটিক্‌চি' বা একাউনটেণ্ট প্রত্যেক বৎসরের শেষে রাজস্ব আদায় শেষ হওয়ার পর বকেয়া হিসাব ক'রে কালেক্টরের নিকট পাঠাতেন ও এর একটি কপি রাজদরবারে পাঠাতেন।" এই বইয়ের বিবরণী থেকে মনে হয়, প্রাদেশিক দেওয়ান ও প্রাদেশিক কানুনগো সমগ্র সুবার বাবদ এই একই কার্য সম্পন্ন করতেন।

৫০. 'মুস্তৌফি', 'দেওয়ান-ই-কুল' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো 'আইন-ই-আকবরী'তে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এদের কর্তব্য ছিল হিসাব মিলিয়ে দেখা এবং বাদশাহী ফরমান, সনদ, হিসাব প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পরীক্ষা করা এবং তৎপরে স্বাক্ষর ও মোহর দেয়া (আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, ২৬২-২৬৪ পৃঃ দ্রঃ)।

৫১. বাদশাহের প্রধান দেওয়ানকে বলা হোত 'দেওয়ানে-কুল'। দেখা যায়, ভারতের মুঘল শাসকগণ তাঁদের তীক্ষ্ণ প্রশাসনিক প্রতিভার দ্বারা হিসাব-রক্ষণ ও হিসাব-পরীক্ষার একটা সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরী করেছিলেন। পাটোয়ারিরা একটা হিসাব রাখতেন; বিটিক্‌চি বা একাউণ্টেণ্টরা আর এক ফর্দ হিসাব রাখতেন। পাটোয়ারিরা

তাদের হিসাব স্থানীয় বা জেলা কানুনগোর নিকট পাঠাতেন। কানুনগো পাটোয়ারিদের হিসাব একত্রিত ক'রে প্রাদেশিক কানুনগোর নিকট পাঠাতেন। বিটিক্‌চিরা এক ফর্দ হিসাব পাঠাতেন জেলা কালেক্টরের নিকট ও আর এক ফর্দ পাঠাতেন রাজদরবারে। জেলা কালেক্টরগণ তাদের হিসাব পাঠাতেন প্রাদেশিক দেওয়ানের নিকট। প্রাদেশিক দেওয়ান কালেক্টরদের হিসাব একত্রিত ক'রে স্বতন্ত্রভাবে প্রস্তুত প্রাদেশিক কানুনগোর হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। অতঃপর প্রাদেশিক দেওয়ান ও প্রাদেশিক কানুনগো উভয় হিসাব পরীক্ষার পর একটা মিলিত হিসাব তৈরী করতেন ও উভয়ে স্বাক্ষর ক'রে বাদশাহের দরবারে পাঠাতেন। সেখানে প্রথমে কেন্দ্রীয় মুস্তৌফি ও পরে দেওয়ানে-কুল, পূর্বে বিটিক্‌চিগণ প্রেরিত হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে ও পরীক্ষা ক'রে বাদশাহের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করতেন। এইরূপে তহবিল তছরূপের সুযোগ খুবই কম থাকতো (এই বইয়ের বিবরণী ও 'আইন-ই-আকবরী' দ্রঃ)।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (ঘ)

১. মুরশিদ কুলি খান ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন। তিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন। হাজী শফি ইসফাহানি তাঁকে খরিদ করেন ও তাঁর নাম রাখেন মুহম্মদ হাদি। তিনি তাঁকে পুত্রতুল্য গণ্য করতেন ও পারস্যে নিয়ে যান। শফির মৃত্যুর পর মুহম্মদ হাদি দক্ষিণে এসে বেরার সুবার দেওয়ান হাজী আবদুল্লা খোরাসানির অধীনে চাকরী নেন। পরে তিনি বাদশাহের চাকরীতে যোগ দেন ও 'কর-তলব খান' উপাধি লাভ করেন। দক্ষিণে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়। সেখানে তিনি হায়দ্রাবাদের দেওয়ান পদে উন্নীত হন এবং পরে জিয়াউল্লাহ খানের বদলীর পর 'মুরশিদ কুলি খান' উপাধিসহ বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন। এর পূর্বে আওরঙ্গজেবের রাজত্বের ৪৮ বৎসরের সময় তিনি উড়িষ্যার দেওয়ান ছিলেন (মা'সির-ই-আলমগীরি, ৪৮০ পৃঃ)। ফররুখ শিয়রের সিংহাসনে আরোহণের পর বাদশাহকে বিপুল অর্থ দিয়ে বাংলার সুবাদার হন ও সাত-হাজারী মনসব লাভ করেন। বহু-নিন্দিত আওরঙ্গজেবের আমলেও রাজকার্যে জন্মগতভাবে মুসলমান ও ধর্মান্তরিত মুসলমানের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য করা হোত না, মুরশিদ কুলি খানের উন্নতি এর জলন্ত দৃষ্টান্ত। ১১৩৮ হিজরীতে মুর্শিদাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরের পরিবর্তে তিনি মুর্শিদাবাদে বাংলার ভাইসরয়ের রাজধানী করেছিলেন। তিনি আর্থিক ব্যাপারে সুপণ্ডিত, দক্ষ-হিসাবপরীক্ষক, শক্তিশালী ও বিজ্ঞ প্রশাসক ছিলেন। তিনি একটি গর্ত বিষ্ঠা দ্বারা ভরাট ক'রে কিস্তি-খেলাপি জমিদারদের সেখানে আট্‌কে রাখতেন। এই গর্তের নাম

দিয়েছিলেন 'বৈকুণ্ঠ' বা 'স্বর্গ'। বাংলা পুনরায় জরীপ ক'রে নতুন রাজস্ব ধার্য করেন; সমগ্র সুবাকে কতকগুলো চাক্‌লায় বিভক্ত ক'রে একটি সম্পূর্ণ রাজস্ব-তালিকা তৈরী করেছিলেন (মা'সির-ই-আলমগীরি, ৪৮৩ পৃঃ; মা'সির-উল-উমারা, ৩য় খণ্ড, ফার্সী সংস্করণ, ৭৫১ পৃঃ)।

২. হিন্দুস্তানের যে সকল শহরে টাকশাল ছিল তার ফর্দ 'আইন-ই-আকবরী', ১ম খণ্ড, ৩১ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়। দেখা যায়, বাংলায় কেবল প্রাদেশিক রাজধানীতে স্বর্ণমুদ্রা তৈরী হোত (আকবরের আমলে কিছু সময় গৌড় ও কিছু সময় টাণ্ডায় রাজধানী ছিল)। বাংলায় রৌপ্য ও টাণ্ডায় তাম্রমুদ্রা তৈরী হোত।

৩. আকবরের রাজস্ব-তালিকায় মিদনিপুর (মেদিনীপুর) উড়িষ্যা সুবার অন্তর্গত জলেসর সরকারের অধীন দেখানো হয়েছে। মুরশিদ কুলি খান মিদনিপুরকে উড়িষ্যা সুবা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাংলার অন্তর্ভূক্ত করেন।

৪. 'নান্‌কর' শব্দটি আজও বাংলা ও বিহারের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কোনো কাজ করার জন্য বেতনের বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিনা-খাজনায় এদের জমি বন্দোবস্তি দেয়া হোত। সেকালে জমিদারগণকে অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে পুলিশের কাজ করতে হোত; তাঁদের মহলে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হোত; গ্রামের চৌকিদাররা তাঁদের অধীন ছিল। তাঁদের মহালের মধ্যের গ্রাম্য-পারঘাটা, খোঁয়াড় ও রাস্তা তাঁদের হেফাজতে থাকতো এবং অনেকটা শান্তিরক্ষক ও বিচারকের কাজ করতে হোত। তাঁরা কম-বেশী আধা-সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং গুরুতর অসদাচরণের জন্য তাঁদের পদচ্যুত করার নিয়ম ছিল। তাঁদের মহাল বকেয়া রাজস্বের জন্য নীলাম করার বিধান ছিল না; কিন্তু রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকার তাঁদের মহাল ক্রোক করতেন এবং খেলাফি জমিদারগণ শাস্তিযোগ্য ছিলেন।

এরা (জমিদারগণ) আধা-সরকারী কর্মচারী বা আধা-সরকারী ভূস্বামী শ্রেণীর অভিজাত ছিলেন। মুসলমান শাসকগণ রাজকীয় বা রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্যে এই শ্রেণী রক্ষা করতেন। এই শ্রেণী বর্তমান কালের জমিদারদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর ছিলেন (আলমগীর-নামা, মা'সির-ই-আলমগীরি, আইন-ই-আকবরী ও এই পুস্তকের বিবরণী দ্রষ্টব্য)।

৫. পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুরশিদ কুলী খান রাজস্বের ব্যাপারে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি বাংলার সকল মহলের জমি জরীপ করেন; সঠিক মাপ দ্বারা জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হলে ও উৎপাদনের সঠিক পরিমাণ বৃদ্ধি মোতাবেক রাজস্ব বৃদ্ধি করেন; এবং এইরূপে তিনি বাংলার সম্পূর্ণ ও সঠিক রাজস্ব-তালিকা প্রস্তুত করেন। এই কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি প্রত্যেক গ্রামে জমি জরীপ করার জন্য আমিন পাঠাতেন; আমিনদের কার্য তত্ত্বাবধান করার জন্য শিকদার (রাজস্ব-তত্ত্বাবধায়ক) পাঠাতেন এবং সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের জন্য সৎ, অভিজ্ঞ ও দক্ষ আমিল বা রাজস্ব-কালেক্টরগণ থাকতেন। দরিদ্র প্রজাদের কৃষি-ঋণ বা তকাভি-ঋণ দিতেন ও এদের জমি আবাদ ও কৃষি-উন্নয়নে উৎসাহ দিতেন। মুরশিদ কুলি খান চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি রায়তওয়ারি প্রথায় অধিকতর বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামী রাজস্ব-প্রথায় জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি ও প্রকৃত আবাদকারী (বা কৃষক) উৎপাদনের লাভের অথবা ফসলের একাংশ পাওয়ার হকদার।

মুঘল আমলে নির্দিষ্ট বিভাগে রাজস্ব আদায়কারীকে 'শিকদার' বলা হোত।

আমিনদের দলগঠন-প্রণালী, তাঁদের বেতন, তাঁদের দায়িত্ব ও জরীপের পন্থা সম্পর্কে বিবরণী 'আইন-ই-আকবরী', ২য় খণ্ড, ৪৫ পৃষ্ঠায় বিবৃত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, জমি জরীপ ও রাজস্বের হার নির্ধারণ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হোত এবং উক্ত বিধি-বিধান বর্তমান ভারতের রাজস্ব-পদ্ধতির তুল্য।

৬. মূল বইতে [illegible] (নিষিদ্ধ) শব্দটি ভুলক্রমে বাদ পড়েছে।

৭. আত্মীয়তা বা পারিবারিক সম্পর্ক নির্বিশেষে মুরশিদ কুলি খানের সুবিচার বিশেষ উল্লেখ্য। কিন্তু, কিস্তি-খেলাফি জমিদারদের উপর পীড়ন ও অত্যাচার তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে কিছুটা ম্লান করেছে।

৮. এই বই থেকে দেখা যায়, বাংলার কেবল দু'জন হিন্দুকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। এঁরা দু'জনেই প্রথমে হিন্দু ছিলেন ও পরে ইসলাম অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা হচ্ছেন: (১) রাজা কংশের পুত্র যদু ওরফে সুলতান জালালুদ্দীন এবং (২) মুরশিদ কুলী খান—যিনি নিজে ব্রাহ্মণ ছিলেন। জন্মগতভাবে কোনো মুসলমান শাসক অথবা সুলতান বাংলায় হিন্দুদের বলপূর্বক ইসলাম-ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছেন, এরূপ কোনো প্রমাণ আমি বাংলার ইতিহাসে পাই নাই। পৃথিবীর সকল ধর্মেই নবদীক্ষিত ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ অত্যুৎসাহী ও গোঁড়া হয়ে থাকে। সুতরাং বাংলার মুসলমান শাসকগণ ও সুলতানগণ বলপূর্বক হিন্দুদের মুসলমান করেছেন বলে যে অভিযোগ করা হয়, তা যেমন ভিত্তিহীন, তেমনি অনুদার। অবশ্য সন্দেহ নাই যে, নূরে কুত্ব-উল-আলম ও অন্যান্য মুসলমান আউলিয়াদের উন্নততর নৈতিক প্রভাব পুরাতন বৈদান্তিক বিশুদ্ধতা-বর্জিত বর্ণাশ্রমের জন্য নৈতিক অধঃপতিত ও বিচ্ছিন্ন হিন্দুসমাজের উপর আপতিত হয়েছিল এবং তজ্জন্য হিন্দুসমাজের সাধারণ মানুষ সাদাসিদে একেশ্বরবাদী মুসলিম ধর্মমত গ্রহণ করেছিল।

৯. সম্ভবতঃ এই রাজবাড়ী দ্বারা গোয়ালন্দ স্টেশনের নিকটবর্তী ই. বি. রেলওয়ের রাজবাড়ীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. আমার বিশ্বাস, এই রামজীবন বর্তমান নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কালীকুনওয়ার কোন্ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আমি জানি না।

১১. 'আইন-ই-আকবরী'তে (২য় খণ্ড, ৪৯ পৃঃ) ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আরবীতে 'ফোতাদার' বা 'খাজাঞ্চি' শব্দের 'ফোতা' (পোতা নয়) অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু বাঁধবার জন্য যে বাজে কাপড় ব্যবহার করা হয়। 'পোদ্দার' অর্থ 'খাজাঞ্চি', অথবা "যে ব্যক্তি সরকারী প্রতিষ্ঠানে টাকা অথবা সোনা-রূপা ওজন করে।" সুতরাং পুস্তকের 'পোতা কর্দা' অর্থ 'মুদ্রা ওজন করা' অথবা 'মুদ্রা গুণতি ও পরীক্ষা করা' অথবা সেগুলো 'কাপড়ের থলিয়ায় ভর্তি করা'।

১২. এখানে আমরা সেকালের বাংলার শিল্পাদির কিছুটা ইঙ্গিত পাই।

১৩. 'গঙ্গাজল' একপ্রকার সুতি কাপড়। মুঘলদের আমলে বাংলায় তৈরী হোত ('আইন-ই-আকবরী'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃঃ)।

১৪. নওয়াব সইফ খান পুর্নিয়ার ফৌজদারের পদ ও সাত-হাজারী মর্যাদা পেয়েছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন কাবুলের সুবাদার উমদাত-উল-মুলক আমীর খান ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৫৭৪ পৃঃ)।

১৫. নওয়াব আলীবর্দী খানের অন্যতম উপাধি ছিল 'মহবত জং'। তাঁর আসল নাম মীর্জা মুহম্মদ আলী ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ দ্রঃ)।

১৬. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে'র ২য় খণ্ডে, ৫৫২ পৃষ্ঠায় সইফ খানের পুত্রের নাম 'ফখরউদ্দীন হোসেন খান' ব'লে উল্লিখিত হয়েছে।

১৭. এতাবৎ হুগলীর ফৌজদার বাদশাহের সরাসরি অধীন ছিলেন; বাংলার সুবাদারের অধীন ছিলেন না। মুরশিদ কুলি খান হুগলীর ফৌজদারকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনার ব্যবস্থা করেন। ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে মুরশিদ কুলির সম্পর্কের জন্য উইলসনের Annals, ১ম খণ্ড, ৩০১, ২৯৯, ২৯৮, ২৯৭, ২৯০, ২৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৭১০ খ্রীস্টাব্দে শাহ আলম হুগলীর ফৌজদার পদে ও সেইসঙ্গে সমগ্র কোরমণ্ডল উপকূলের সমস্ত বন্দরের নৌ-সেনাপতির পদে জিয়াউদ্দীনকে নিযুক্ত করেন। ইংরেজ বণিকগণ তাঁকে একজন

বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষকরূপে পেয়েছিল (উইলসনের Annals, ১ম খণ্ড, ১৮৫, ৩৩২, ৩২৯, ৪৪১ পৃঃ দ্রঃ)। ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে মুরশিদ কুলি ত্বরিত জিয়াউদ্দীনকে পদচ্যুত করান (উইলসনের Annals, ২২ ও ১২৩ পৃঃ এবং ২য় খণ্ড, ২৮ পৃঃ দ্রঃ)।

১৮. ১৮৮৭ থেকে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আমি যখন হুগলী ছিলাম, তখন এই ঈদ্‌গাহ্ ছিল। যেখানে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়, সেই স্থানকে ঈদ্‌গাহ্ বলে।

১৯. দেখা যায়, ফরাসী, ডাচ ও ইংরেজরা সকলে একযোগে নতুন ফৌজদার ওয়ালি বেগের পরিবর্তে পদচ্যুত ফৌজদার জিয়াউদ্দীন খানকে সমর্থন করছিল (উইলসনের Annals, ২য় খণ্ড, ৬৬, ৭২, ৭৫, ৭৯, ৮১, ৮২ পৃঃ দ্রঃ)। ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে জিয়াউদ্দীন খান ও ওয়ালী বেগের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছিল।

২০. 'কংকর'—পাথরের নুড়ি বা ইটের টুকরা। মুরশিদ কুলি খান হিন্দু নায়েবকে 'কংকর' নাম দিয়ে ব্যঙ্গ করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয়, কঠোর লৌহ-মানব মুরশিদ কুলি খান কখনো কখনো ব্যঙ্গ বা রহস্য করতে পারতেন।

২১. বইয়ের এই অংশটি ঠিক স্পষ্ট নয়; সম্ভবতঃ এখানে মুরশিদ কুলি খানকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

২২. যশোর জেলার বরষিয়া ও মধুমতী নদীর সঙ্গমস্থলে মুহম্মদপুর বা মাহমুদপুরে সীতারামের বাসস্থান ছিল। ওয়েস্টল্যাণ্ডের History of Jessore দ্রষ্টব্য। বর্তমান মুহম্মদপুর একটি পুলিশ-থানা বা বিভাগ। সীতারামের পুষ্করিণীসমূহের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান। বনমালদিয়ার সন্নিকটে ভুসনা অবস্থিত। বনমালদিয়া পূর্বে যশোর জেলার ও বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চন্দনা নদীর তীরে অবস্থিত; এখানে একটি পুরাতন মুসলমান উপনিবেশ আছে। ভুসনায় একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষের অস্তিত্ব আছে। মুহম্মদপুর বা মাহমুদপুরের সন্নিকটে বরষিয়া নদীর তীরে শিরগাঁওয়ে একটি পুরাতন মুসলমান বসতি আছে (উইলসনের Annals, ২য় খণ্ড,

১৬৬, ১৬৭, ১৬৮ পৃঃ দ্রঃ)। নরহত্যা ও বিদ্রোহ করার অপরাধে মুরশিদ কুলি খানের আদেশে সীতারামের প্রাণদণ্ড দেয়া হয়েছিল। সীতারামের পরিবারবর্গ ও সন্তানসন্ততি কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। মুরশিদ কুলি খানের হাতে সমর্পণ করার জন্য ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা তাদের হুগলীর ফৌজদার মীর নেসারের নিকট সমর্পণ করেছিল।

২৩. ভূসনা পূর্বে যশোর জেলার অন্তর্গত ছিল; বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত। ভূসনার নিকটে চন্দনা নদীর তীরে বনমালদিয়া, দক্ষিণবাড়ী প্রভৃতি স্থানে সৈয়দ ও মীরদের কতকগুলো পুরাতন বসতি আছে।

২৪. ১১১৮ হিজরী বা ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে রাজত্বের ৫২তম বর্ষে ৯১ বৎসর বয়সে আহমদনগরে আওরংজেবের মৃত্যু হয় এবং আওরংগাবাদে তাঁকে দাফন করা হয় ('সিয়ার' ২য় খণ্ড, ৩৭৫ পৃঃ এবং 'খাফি খান' দ্রঃ)। তাঁর পুত্রদের নাম: (১) মুহম্মদ মুয়াজ্জম (কাবুলে); (২) মুহম্মদ আজম (মালোয়ায়); (৩) কাম বখ্‌শ (বিজাপুরে)।

২৫. আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ মুয়াজ্জম ওরফে শাহ আলম তাঁর ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজিত ও হত্যা ক'রে বাহাদুর শাহ উপাধি নিয়ে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৩৭৮-৩৭৯ পৃঃ এবং খাফি খানের লেখা ইতিহাস দ্রঃ)।

২৬. মহান তৈমুরীয় বংশ এই সময় অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। অর্থগৃধ্নু উজীরগণ ও কর্মচারীরা সর্বদা তাদের ক্ষতিসাধন করেছে। সৈয়দ-ভ্রাতৃগণ একটি দলের প্রধান ছিলেন। এদের স্বার্থপর নীতি 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হয়েছে।

২৭. 'সিয়ার' এবং আইরভিনের Later Mughals, J. A. S., ১৮৯৬ দ্রষ্টব্য।

২৮. অর্থাৎ, জাহান শাহ বা রফিউশ্‌-শান।

২৯. ফররুখ শিয়রের মাতা সাহেব-উন-নিসা একজন সাহসী ও তৎপর

মহিলা ছিলেন। ফররুখ-শিয়র যখন সমুদ্রপথে পলায়নের চিন্তা করছিলেন, সেইসময় তাঁর মাতা তাঁকে এই মহান আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন : "যদি তোমাকে সমুদ্র পার হয়ে পালাতেই হয়, তা হ'লে সেই সমুদ্র পানির না হয়ে রক্তের সমুদ্র হউক।" মহান মাতার অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হয়ে ফররুখ শিয়র অবশেষে জাঁহাদর শাহকে পরাজিত ক'রে ১৭১২ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে সিংহাসন অধিকার করেন।

৩০. 'সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃঃ দ্রঃ।

৩১. উইলসনের Annals, ২য় খণ্ড, ৯০ পৃঃ দ্রঃ। এই ঘটনা (মুরশিদ কুলি খানের স্থলে রশিদ খানের নিয়োগ) ১৭১২ খ্রীস্টাব্দে ঘটেছিল।

৩২. মালিক-ময়দানের 'মালিক' উপাধি দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় তিনি একজন তুর্কী ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিশদ পরিচয় আমি খুঁজে পাই নাই।

৩৩. এই দোয়া বা প্রার্থনার (দোয়ায়ে সইফি) আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'তলোয়ারের জন্য দোয়া'। কথিত হয়, বদরের যুদ্ধে পয়গম্বর (দঃ)-কে যখন বলা হয় যে, ফেরেশ্‌তাগণ তাঁর পক্ষে যোগদান করায় পরাজয় বিজয়ে পর্যবসিত হয়েছে, তখন তিনি এই দোয়া উচ্চারণ করেছিলেন।

৩৪. ১৭১২ খ্রীস্টাব্দের 'আকবরাবাদ (বা আগ্রার) যুদ্ধের' বিবরণীর জন্য 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৩৯২ পৃঃ দ্রঃ।

৩৫. বাঢ়্‌হার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম- পাটনা সুবার নাজিম সৈয়দ হোসেন আলী খান এবং এলাহাবাদ সুবার নাজিম সৈয়দ আবদুল্লা খান। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক ফররুখ শিয়রকে সাহায্যের বিশদ বিবরণী 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' প্রদত্ত হয়েছে (২য় খণ্ড, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯১, ৩৯২ পৃঃ)। পরে ফররুখ শিয়রের সঙ্গে বিরোধ হওয়ায় তারা তাঁকে কারারুদ্ধ ও হত্যা করেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৪১৯ পৃঃ)। সৈয়দ হোসেন

আলী খানের জীবনীর জন্য 'মা'সির-উল-উমারা', ১ম খণ্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৬. আমীর-উল-উমারা জুলফিকার খানের পিতা আসাদ খান ছিলেন আওরঙ্গজেবের প্রধানমন্ত্রী। জুলফিকার খানের আসল নাম ছিল মুহম্মদ ইসমাঈল এবং উপাধি ছিল 'জুলফিকার খান আমীর-উল-উমারা নসরত জং' (এঁর জীবনীর জন্য 'মা'সির-উল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৯৩ পৃঃ দ্রঃ)।

৩৭. আসাদ খানের আসল নাম ছিল মুহম্মদ ইব্রাহীম। উপাধি ছিল 'আসিফ-উদ-দৌলা জুমলাত-উল-মুলক আসাদ খান'। বিবাহসূত্রে আমিন-উদ-দৌলার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। তিনি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন (তাঁর জীবনীর জন্য 'মা'সির -উল-উমারা', ১ম খণ্ড, ৩১০ পৃঃ এবং 'সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৪০৬ পৃঃ দ্রঃ)। তিনি একজন উঁচুদরের বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তাঁর পুত্র জুলফিকার খানের হত্যার পর তিনি একটি বেদনাদায়ক কবিতা রচনা করেছিলেন।

৩৮. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৩৯৫ পৃঃ, ফার্সী সংস্করণ দ্রঃ। জাঁহাদর শাহের মৃতদেহ হস্তীপৃষ্ঠে ও জুলফিকার খানের মৃতদেহ হাতীর ল্যাজে বেঁধে শহর ঘোরানো হয়েছিল।

৩৯. 'নিজামত' ও 'দেওয়ানি' দু'টিকে একত্রিত ক'রে এই পদ দু'টি পৃথক রাখার পূর্বতম মুঘল নীতির অভিজ্ঞজনোচিত ব্যতিক্রম করা হয়। কারণ, এর ফলে দিল্লীর কেন্দ্রীয়শক্তি-বিরোধী ষড়যন্ত্র করার সুযোগ হয়।

৪০. ফররুখ শিয়র যখন ঢাকায় ডেপুটি নাজিম ছিলেন, তখন মীর জুমলা কাজী ছিলেন ও সেইসূত্রে মীর জুমলা তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন। মীর জুমলার প্ররোচণায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে ফররুখ শিয়রের বিরোধ হয়। সৈয়দ হোসেন আলী খানের ভ্রাতা উজীর কুতব-উল-মুল্‌ক সৈয়দ আবদুল্লার ধূর্ত

দেওয়ান রতনচাঁদ তাতে (উক্ত বিরোধে) ইন্ধন জুগিয়েছিল। এই মতানৈক্য ও বিরোধের দরুন সমগ্র শাসনব্যবস্থা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং সুবিখ্যাত তৈমুর বংশের মর্যাদা চিরকালের জন্য ক্ষুণ্ণ করে। এর বিশদ বিবরণীর জন্য 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৪০৭, ৪০৯, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সৈয়দ ভ্রাতৃগণ নিজেদের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা সিদ্ধির জন্য দিল্লীর মুঘল বাদশাহী সিংহাসনকে চিরকালের জন্য কলংকিত করেছিলেন ও সাম্রাজ্যের ক্ষতি করেছিলেন ('সিয়ারে'র দ্বিতীয় খণ্ডে ৪২০ পৃষ্ঠায় খাফি খানের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃত অংশগুলো দ্রষ্টব্য)।

৪১. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে'র ২য় খণ্ডের ৪১৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, সৈয়দ ভ্রাতৃগণ ১১৩১ হিজরীতে বাহাদুর শাহের পৌত্র, রফিউল কাদেরের পুত্র ২০ বৎসর বয়স্ক শামস-উদ-দীন আবুল বরকত রফিউদ-দরাজাতকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

৪২. 'সিরার-উল মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৪২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। উচ্চাকাঙ্ক্ষী সৈয়দ ভ্রাতৃগণ এই সময় প্রকৃতপক্ষে ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করছিলেন।

৪৩. 'সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৪২২, ৪২৩ পৃঃ দ্রঃ। এই সময় রতনচাঁদ, উজীর কুতব-উল-মুল্‌ক সৈয়দ আবদুল্লার উপর অশুভ প্রভাব বিস্তার করছিলেন। কাজীর পদে নিয়াগ করার মতো ধৃষ্টতা তার ছিল এবং সেইজন্য একবার তার প্রভু তাকে তিরস্কার করেছিলেন।

৪৪. উইলসনের Annals-এর ১ম খণ্ড, ১৩০ পৃষ্ঠায় এই স্থানটি ইছাপুর ও চংকের মাঝামাঝি চিহ্নিত হয়েছে।

৪৫. 'মশজর' গাছের পাতা ও ডাল অঙ্কিত (বা কাজ-করা) এক-প্রকার রেশমি কাপড়। 'আইন-ই-আকবরী'তে (ব্লকম্যানের অনুবাদ, ৯২-৯৬ পৃঃ) আকবরের আমলে ভারতে প্রচলিত সোনার কাজ-করা কাপড়, সুতি-কাপড় ও পশমি-কাপড়ের একটি তালিকা দেয়া আছে। তাতে দেখা যায়, উক্ত ২৮ রকম সোনার কাজ-করা কাপড়ের মধ্যে মাত্র দুই প্রকার দ্রব্য ইউরোপ থেকে আমদানি করা

হোত ; ৩৯ প্রকার রেশমি কাপড়ের মধ্যে ৭ রকম ইউরোপ থেকে আমদানী করা হোত ; ২৯ প্রকার সুতি-কাপড়ের মধ্যে কিছুই আমদানী করা হোত না ; এবং ২৬ প্রকার পশমি-কাপড়ের মধ্যে মাত্র একটা আমদানী করা হোত। অবশিষ্ট সমস্ত ভারতে তৈরী হোত ; অথবা আরব, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশসমূহ থেকে আমদানী করা হোত।

৪৬. রিচার্ডসনের অভিধানে 'পলাস' (پلاس) শব্দটি নাই ; কিন্তু ওমর খৈয়ামের একটি কবিতায় এই শব্দটি আছে।

৪৭. বোধ হয় এই দিনেমার প্রধানের নাম ছিল মি. আত্রূপ (উইলসনের Annals, ২য় খণ্ড, ২০০ পৃঃ দ্রঃ)। ১৭১৪ খ্রীস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটেছিল।

৪৮. যশোর সদর থেকে টংকি স্বরূপপুর প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

৪৯. এখনো স্বরূপপুরে একটি পাঠান পরিবার আছে—যদিও তারা দুরবস্থাগ্রস্ত।

৫০. কুরআনের এই ছেঁড়া কপি এখনো সেখানে আছে কিনা আমি জানি না।

৫১. এ থেকে মুরশিদ কুলি খানের আমলে বাংলার বিস্ময়কর অর্থনৈতিক ও কৃষি-উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়। পোলাও ও কালিয়া অত্যন্ত মশ্‌লাদার হিন্দুস্তানী খাদ্য। আকবরের আমলের হিন্দুস্তানী খাদ্য ও কতকগুলো দ্রব্যের মূল্য-তালিকার জন্য 'আইন-ই-আকবরী'— ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৫৯ ও ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫২. আকবরের আমলের ভারতীয় ফলের বিবরণীর জন্য 'আইন-ই-আকবরী'— ব্লকম্যানের অনুবাদ, ৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫৩. অর্থাৎ, যখন এই ইতিহাস লিখিত হয়েছিল (১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে)।

৫৪. অর্থাৎ, মীর জাফর আলী খান।

৫৫. মুরশিদ কুলি খান মুর্শিদাবাদে আমদরবার-ভবনরূপে 'চেহেল সেতুন' তৈরী করেছিলেন।

৫৬. এই কঠোর ও অন্ধ সুবিচার (পুত্রের প্রাণদণ্ড দেয়া) ঘটনা থেকে

সুদূর পশ্চিমের আর একজন মুসলমান বাদশাহের গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়ে দেয়—তিনি হচ্ছেন স্পেনের খলিফা আবদুর রহমান (আমীর আলীর History of Saracens, ৫১০ পৃঃ দ্রঃ)।

৫৭. কাজী মুহম্মদ শরীফ নিশ্চয়ই একজন আশ্চর্য রকমের নির্ভীক বিচারক ছিলেন।

৫৮. পুস্তকে 'আজিম' শব্দটি লক্ষ্য করুন। 'আজিম' অর্থ 'গুরুতর', 'মহান'; আবার এই শব্দ দ্বারা আজিম-উশ-শানের কথাও ইঙ্গিত করা হোতে পারে। সুতরাং, বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়—"এটা একটা গুরুতর লজ্জাকর বদনাম"; অথবা 'আজিমের (আজিম-উশ-শানের) পক্ষ থেকে এই বদনাম করা হচ্ছে'। আওরঙ্গজেব ক্রুদ্ধ হলেও পত্রে কখনো কখনো ব্যঙ্গোক্তির অভাব হোত না।

৫৯. যদিও বাদশাহ আওরঙ্গজেব কোনো কোনো ক্ষেত্রে গোঁড়া ছিলেন, তথাপি শরার (শরিয়তের বিধানের) মর্যাদার প্রতি যথাযথ সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিশিষ্ট আলেমদের মধ্য থেকে কাজী ও বিচারক নিযুক্ত করা হোত এবং তাঁরা আইন ভিন্ন অন্য কিছুর অধীন ছিলেন না ও তাঁদের পদের মর্যাদা ছিল অত্যধিক।

৬০. আমার মনে হয় এই কবিতাটি শিরাজের সুপ্রসিদ্ধ কবি সা'দীর।

৬১. বুরহানপুর থেকে এসেছিলেন ব'লে নওয়াব শুজাউদ্দীনকে মীর্জা দখ্‌নি বলা হোত। তাঁর পিতা নূর-উদ-দীন খোরাসান থেকে এসেছিলেন। তিনি (শুজাউদ্দীন) মুরশিদ কুলি খানের জামাতা ছিলেন। যখন মুরশিদ কুলি খান বাংলার সুবাদার তখন তিনি উড়িষ্যার নাজিম ছিলেন। তিনি 'মুতামন-উল-মুল্‌ক্‌ শুজা-উদ-দৌলা আসাদ খান' উপাধি পেয়েছিলেন ('মা'সির', ৩য় খণ্ড, ৯৫৩ পৃঃ এবং 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৪৬৯ পৃঃ দ্রঃ)।

৬২. সরফরাজ খানের আসল নাম ছিল মীর্জা আসাদ-উদ-দীন এবং তাঁর উপাধি ছিল 'আলা-উদ-দৌলা সরফরাজ খান হায়দর জং'। তিনি শুজাউদ্দীন খানের পুত্র ও মুরশিদ কুলি খানের দৌহিত্র ছিলেন (মা'সির-উল-উমারা, ৩য় খণ্ড, ৭৫৪ পৃঃ এবং সিয়ার-উল-

মুতাক্ষেরীন, ২য় খণ্ড, ৪০৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৬৩. কমর-উদ দীন হোসেন খানের আসল নাম ছিল মীর মুহম্মদ ফাজিল। তাঁর উপাধি ছিল "ইতিমাদ-উদ-দৌলা কমর-উদ দীন খান বাহাদুর"। তিনি ইতিমাদ-উদ-দৌলা মুহম্মদ আমিন খানের অন্যতম পুত্র। নিজাম-উল-মুল্‌ক আসফজাহ্ উজীরের পদ ত্যাগ করার পর ১১৩৭ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ মুহম্মদ শাহ তাঁকে (কমর-উদ-দীন খানকে) উজীর নিযুক্ত করেন। তিনি উদার, অমায়িক ও মার্জিত ব্যক্তি ছিলেন (মা'সির-উল-উমারা, ১ম খণ্ড, ৩৫৮ পৃঃ এবং সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন, ২য় খণ্ড, ৪৫৭ পঃ দ্রঃ)।

৬৪. সৈয়দ ভ্রাতৃগণ ১১৩১ হিজরীতে মুহম্মদ শাহকে দিল্লীর বাদশাহী সিংহাসনে বসান (মা'সির-উল-উমারা, ২য় খণ্ড, ৪২২ পৃঃ দ্রঃ)।

৬৫. খান-ই-দওরানের আসল নাম খাজা আসম। তাঁর পূর্বপুরুষেরা বদখ্‌শান থেকে ভারতে এসে আগ্রায় বসতি স্থাপন করেন। গোড়ায় তিনি শাহজাদা আজিম-উশ-শানের সঙ্গে ঢাকায় ছিলেন ও একটি ক্ষুদ্র মনসবের অধিকারী ছিলেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন শাহজাদা আজিম-উশ-শান তাঁর পিতা মুহম্মদ মুয়াজ্জমের (পরে বাদশাহ বাহাদুর শাহ) আহ্বানে আগ্রা যান তখন তিনি পুত্র ফররুখ শিয়রকে নিজ প্রতিনিধিরূপে বাংলায় রেখে যান এবং খাজা আসমকে ফররুখ শিয়রের সঙ্গীরূপে রাখেন। খাজা আসম শীঘ্রই ফররুখ শিয়রের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং তাঁর আচরণ ও নীতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন। ফররুখ শিয়র তাঁকে 'আশরফ খান' উপাধি দেন এবং সিংহাসনে আরোহণের পর 'সমসম-উদ-দৌলা খান-ই-দওরান' উপাধি দেন ও তাঁকে সাত-হাজারী মনসবদার করেন ও দ্বিতীয় বখশিরূপে নিয়োগ করেন। মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে সৈয়দ হোসেন আলী খানের পতনের পর তিনি 'আমীর-উল-উমারা' উপাধি লাভ করেন এবং সামরিক বিভাগের প্রধান বখশির পদে নিয়োজিত হন। ১১৫১ হিজরীতে নাদির শাহ যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন খান-ই-

দওরান যুদ্ধে নিহত হন (মা'সির-উল-উমারা, ১ম খণ্ড, ৮১৯ পৃঃ)।

৬৬. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে'র লেখকও নওয়াব শুজাউদ্দীন খানের প্রভূত প্রশংসা করেছেন এবং বিচারে ও ঔদার্যে তাঁকে নওশের্ঁায়ার তুল্য বলেছেন। নওয়াব শুজাউদ্দীন উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর কর্মচারী, সৈন্যগণ ও পারিবারিক চাকরদের সঙ্গে অমায়িক ও সদয় ব্যবহার করতেন; মৃত্যুর পূর্বে তিনি সকলের নিকট ক্ষমা চান ও সকলকে দু'মাসের বেতন অগ্রিম দেন। বিচারের সময় তিনি অত্যন্ত নিরপেক্ষ ছিলেন এবং নিজ পুত্র ও নিম্নতম প্রজার মধ্যে কোনো পার্থক্য করতেন না। তিনি মেধার স্বীকৃতি দিতেন এবং তাঁর শাসনকালে সামান্যতম মেধাবী ব্যক্তিও সারা হিন্দুস্তান থেকে বাংলায় আসে ও তাঁর নিকট সদয় ব্যবহার লাভ করে। বাংলাকে যে 'জিন্নাতুল-বিলাদ' (প্রদেশসমূহের মধ্যে স্বর্গ) আখ্যা দেয়া হোত শুজাউদ্দীন খানের বিজ্ঞ ও দক্ষ শাসনে সেই আখ্যা বাস্তবে পরিণত হয়। তিনি লোক-দেখানো দান করতেন না ও তাতে সংকীর্ণতা ছিল না। তাঁর শাসনকালে প্রজাগণ শান্তি ও সুখে বাস করতো (সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন, ২য় খণ্ড, ৪৭২ ও ৪৮৮ পৃঃ, ফার্সী সংস্করণ দ্রষ্টব্য)।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, যখন উত্তর-ভারত ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব ও বহিরাক্রমণে বিপর্যস্ত, সেইসময় মুরশিদ কুলি খান ও তাঁর উত্তরাধিকারী শুজাউদ্দীন খানের বলিষ্ঠ শাসনের ফলে এই অঞ্চলে শান্তি বিরাজ করায় উত্তর-ভারতের তুলনায় বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ফলে, বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে কাল্পনিক ও প্রমাণবিহীন মতবাদের আশ্রয় নেয়ার প্রয়োজন হয় না।

৬৭. 'আইনে' (২য় খণ্ড, ২২৩ পৃঃ) বুরহানপুরের নিম্নরূপ বর্ণনা দেয়া হয়েছে: "বুরহানপুর সুবা ডাণ্ডেস বা খান্দেশের অন্তর্গত তাপ্তি নদী থেকে তিন ক্রোশ দূরবর্তী একটি বৃহৎ নগর। নগরটি বহুসংখ্যক উদ্যান দ্বারা শোভিত; সকল দেশের লোক এখানে বাস করে এবং কারিগরগণ সমৃদ্ধ ব্যবসায় পরিচালনা করে।"

৬৮. ভারতে প্রস্তুত সুতি কাপড়ের তালিকায় 'খাসা' (কাপড়ের) উল্লেখ আছে। আকবরের আমলের ভারতীয় সুতি, রেশমি ও পশমি কাপড়ের তালিকার জন্য 'আইন', ১ম খণ্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন। আকবর সকল স্থানীয় বা দেশজ শিল্পে উৎসাহ দিতেন। "সুদক্ষ ওস্তাদ ও কারিগরদের ভারতে বসবাস করিয়ে লোককে শিল্পোন্নয়নের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। বাদশাহী কারখানাসমূহে, লাহোরে, আগ্রায়, ফতেহ্পুরে, আহমদাবাদে ও গুজরাটে নানাপ্রকার অতি উন্নতমানের দ্রব্যাদি তৈরী হোত। বর্তমানে প্রচলিত নমুনা, গ্রন্থি ও ফ্যাশন অভিজ্ঞ ভ্রমণকারীদের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। বাদশাহ নিজেও সব রকম ব্যবসায়ের ক্রিয়াপদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং যত্নসহকারে কাজ করায় বুদ্ধিমান কারিগরগণের কর্মপন্থা উন্নত হয়। সর্বপ্রকার চুল ও রেশম বুনুনির চরম উন্নতি লাভ করে এবং অন্য দেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বাদশাহী কারখানা থেকে সরবরাহ করা হোত..." ('আইন ই-আকবরী'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৮৭, ৮৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৬৯. قوش অর্থ "শীর্ণকায় (ব্যক্তি)"। 'কওশখানার' অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সম্ভবতঃ এতদ্বারা বাংলায় তৈরী মানুষের আকৃতির ছাপ দেয়া কোনো প্রকার সুতি বা রেশমি কাপড় হবে।

৭০. দেওয়ান বা অর্থসচিবের কার্যালয়কে 'দেওয়ানখানা' বলা হোত।

৭১. 'চেহেল সেতুনের' আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে 'চল্লিশ স্তম্ভবিশিষ্ট'। এটা আম-দরবারের বৃহৎ কক্ষ।

৭২. 'খিলওয়াতখানা' অর্থ—খাস-কামরা।

৭৩. 'জুলুসখানা' অর্থ—অফিস-কক্ষ বা ভবন।

৭৪. 'খালিসা কাছারি' অর্থ—সরকারী জমি সংক্রান্ত রাজস্ব-আদালত ভবন।

৭৫. 'ফরমানবাড়ী' অর্থ—বিচারালয়।

৭৬. শাদ-বিন-আদ বা ইরাম-বিন-ওমাদ নামক রাজা আরবে যে বিখ্যাত উদ্যান তৈরী করেছিলেন বলে কল্পকাহিনীতে বলা হয়,

সেই উদ্যানকে 'ইরাম' আখ্যা দেয়া হয়েছে। প্রাচ্যের কবিগণ প্রায়ই এই উদ্যানের উল্লেখ ক'রে থাকেন ও বলেন যে, এটা ঠিক বেহেশ্‌তের নমুনায় তৈরী।

৭৭. উল্লেখযোগ্য যে, মুঘল আমলের এই ক্ষয়িষ্ণুকালেও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুঘল রাজপুরুষগণের মধ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধিবৃত্তির কদর ছিল।

৭৮-৭৮ক. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' প্রদত্ত কিঞ্চিত স্বতন্ত্র বিবরণী দ্রষ্টব্য। তাতে দেখা যায়, মীর্জা আলীবর্দী খান নওয়াব শুজাউদ্দীনের পরামর্শ-সভার বা ক্যাবিনেটের প্রধান পরিচালক ছিলেন ('সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৪৭৩ পৃঃ দ্রঃ)। নিজামতের গদিতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর সুজাউদ্দীন খান একটি মন্ত্রণা-সভা গঠন করে-ছিলেন। তাতে ছিলেন: (১) মীর্জা মুহম্মদ আলীবর্দী খান ওরফে মীর্জা বন্দী; (২) আলীবর্দীর ভ্রাতা হাজী আহ্‌মদ; (৩) রায়-রায়ান আলমচাঁদ (পূর্বে ইনি উড়িষ্যায় শুজাউদ্দীনের দেওয়ান ছিলেন); ও (৪) ব্যাঙ্কার বা মহাজন জগৎশেঠ ফতেহ্‌চাঁদ। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হুকুম দেয়ার পূর্বে শুজাউদ্দীন এঁদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। জাফর খান যে সকল জমিদারকে বন্দী করে-ছিলেন, প্রথমেই শুজাউদ্দীন তাদের মুক্তিদান করেন। এর ফলে, একদিকে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং অন্যদিকে তাদের নিকট নজর আদায়ের দরুন রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়। সেইসঙ্গে জিম্মাত-উল-বেলাদ বা বাংলার উৎপাদন বৃদ্ধি হয় (সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন, ২য় খণ্ড, ৪৭৩ পৃঃ)। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পুত্র সরফরাজ খানকে নামে মাত্র বাংলার দেওয়ানের পদ দেন; অন্য এক স্ত্রীর পুত্র মুহম্মদ তকি খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন; জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকার ডেপুটি নাজিমের পদে তাঁর জামাতা মুরশিদ কুলি খানকে (২য়) নিযুক্ত করেন; আলীবর্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র সৈয়দ আহমদ খানকে রংপুরের ফৌজদার, আলীবর্দীর আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জয়েন-উদ-দীন আহমদকে রাজ-

মহল বা আকবরনগরের ফৌজদার, আলীবর্দীর অন্য এক ভ্রাতুষ্পুত্র নওয়াজেশ মুহম্মদ খানকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন (সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন, ২য় খণ্ড, ৪৭২ পৃঃ দ্রঃ)।

পরবর্তীকালে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল আমীরদের, বাদশাহ ও শাসকবর্গের রাজকার্যের পরিবর্তে ব্যক্তিগত বিলাসপ্রিয়তা তৎকালীন নৈতিক অধঃপতনের বেদনাদায়ক অধ্যায় এবং ভারতের বিরাট মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ ও বিলাসপ্রিয়তার দরুন এই সময় মুঘল শাসকশ্রেণী ও বাদশাহগণ মন্ত্রীদের হাতে সমস্ত রাজকার্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। অথচ, এই মন্ত্রীবর্গ প্রায়ই আন্তরিকতাহীন, অর্থলোভী ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন এবং নিজেদের স্বার্থে ষড়যন্ত্র করতে এরা কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ ছিলেন না। এদের কার্য বাবর, শের শাহ, আকবর ও আওরঙ্গজেবের মহান ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এই বাদশাহগণ আমোদ-প্রমোদ ঘৃণা করতেন ও সর্বদা পরিশ্রম করতেন। এই প্রসঙ্গে বার্নিয়ারের Travels (১২৯-১৩০ পৃঃ) থেকে আওরঙ্গজেবের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি। বাদশাহের অপরিসীম পরিশ্রমের ফলে স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা সম্পর্কে জনৈক আমীর আওরঙ্গজেবের নিকট আশংকা প্রকাশ করায় তিনি উত্তরে উক্ত আমীরকে তিরস্কার ক'রে বলেছিলেনঃ "বাদশাহের কর্তব্য সম্বন্ধে বিদ্বজ্জনের একটিমাত্র মত থাকতে পারে এবং সেটা হচ্ছে, অসুবিধা ও বিপদের সময় (বাদশাহের) নিজ জীবন বিপন্ন করা ও প্রয়োজনবোধে তাঁর হেফাজতস্থ প্রজাবৃন্দের রক্ষার জন্য তলোয়ার হাতে মৃত্যুবরণ করা। তথাপি এই বিজ্ঞ ভালমানুষ আমাকে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, সাধারণের মঙ্গলের জন্য আমার উদ্বেগ থাকার প্রয়োজন নাই ; তাদের (প্রজাদের) উন্নতির পন্থা উদ্ভাবনের জন্য আমার পক্ষে বিনিদ্ররজনী যাপনের প্রয়োজন নাই ; এবং নীচ জৈবিক আনন্দ উপভোগ করা থেকে একটি দিনও ত্যাগ করা আমার প্রয়োজন নাই। তার মতে, আমার নিজের স্বাস্থ্যের

চিন্তা ও ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশে প্রধানতঃ কালাতিপাত করাই আমার উচিৎ। নিশ্চয়ই তিনি চান যে, এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার আমি কোনো উজীরের উপর দিই। তিনি ভাবছেন না যে, রাজার সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে সিংহাসনে আরোহণ করায় বিধাতা আমাকে নিজের জন্য নয়, পরন্তু অন্যদের জন্য বাঁচার ও পরিশ্রম করার দায়িত্ব দিয়েছেন। আমার কর্তব্য হচ্ছে, জনসাধারণের কল্যাণের সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগত কল্যাণের কথা ব্যতীত অন্য কোনোরূপ ব্যক্তিগত কল্যাণের কথা চিন্তা না করা। প্রজাবৃন্দের শান্তি ও সমৃদ্ধির সমস্যাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়; সুবিচার, রাজকীয় কর্তৃত্ব সংরক্ষণ ও রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান ব্যতীত প্রজাদের কল্যাণ সাধনের প্রশ্নে আমার সর্বাত্মক চেষ্টা থাকা প্রয়োজন। নির্জীব জীবন যাপন এবং ক্ষমতা অন্যকে অর্পণ করার প্রস্তাবকারী এই ব্যক্তিটি ইহার অশুভ ফল সম্বন্ধে অজ্ঞ। আমাদের মহান কবি সা'দী অকারণে স্পষ্টতঃ একথা বলেন নাই যে, 'রাজা হয়ো না, রাজা হয়ো না; আর যদি রাজা হও, তা'হলে নিজে রাজ্য শাসনে সংকল্পবদ্ধ হও…'। দুঃখের বিষয়, আরাম আয়েশের দিকে আমাদের (মানুষের) স্বাভাবিক ঝোঁক আছে; আমাদের এই ধরনের উপর-পড়া পরামর্শদাতার প্রয়োজন নাই। আমাদের বেগমগণও এই প্রকার আরাম ও বিলাসের পুষ্প-পথে চলায় নিশ্চয়ই সাহায্য করতে চায়।" রাজকীয় কর্তব্যের কী মহান আদর্শ! এর পরবর্তীকালের মুঘলদের কী শোচনীয় অধঃপতন!

৭৯. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' বর্ণিত হয়েছে যে, শুজাউদ্দীন খান যখন উড়িষ্যার নাজিম ছিলেন, তখন আলমচাঁদ তাঁর দেওয়ান ছিলেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৪৭৩ পৃঃ, ফার্সী সংস্করণ দ্রঃ)। উল্লেখযোগ্য যে, কটক শহরে এখনো আলমচাঁদ বাজার নামক একটি মহল্লা আছে।

৮০. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন' ও স্টুয়ার্টের History of Bengal-এ উক্ত হয়েছে যে, মীর্জা মুহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন হাজী আহমদ ও

দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন মীর্জা মুহম্মদ আলী। পরে শুজা-উদ-দীন যখন উড়িষ্যার নাজিম ছিলেন, তখন তাঁরই অনুগ্রহে ইনি 'মীর্জা মুহম্মদ আলীবর্দী খান' উপাধি পেয়েছিলেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৪৭০ পৃঃ)।

৮১. আযম শাহ বা শাহজাদা মুহম্মদ আযম, বাদশাহ আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন শাহজাদা মুহম্মদ মুয়াজ্জম—পরে বাদশাহ বাহাদুর শাহ। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্য নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ হয়। ১১১৯ হিজরীতে আগ্রার নিকটে জাজোরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আযম শাহ বা শাহজাদা মুহম্মদ আযম নিহত হন ও বাহাদুর শাহ জয়ী হন। এই যুদ্ধ ও আরো কয়েক-জন শাহজাদার হত্যার বিবরণীর জন্য 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা কামবখশ অনুরূপ ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে ১১২০ হিজরীতে হায়দরাবাদের নিকটে এক যুদ্ধে নিহত হন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৩৭৯ পৃঃ দ্রঃ)। এখানে লক্ষণীয় যে, মারাঠা দস্যুদের অথবা নাদির শাহ ও আহমদ শাহ দুরানীর আক্রমণ অপেক্ষা উক্তরূপ ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব মহান তৈমুরীয় বংশের দুর্বলতার প্রধান কারণ হয়েছিল।

৮২. মীর্জা মুহম্মদ আলীর (পরে মুহম্মদ আলীবর্দী খান) আর এক নাম ছিল মীর্জা বন্দি। 'সিয়ারে' উক্ত হয়েছে যে, নওয়াব শুজাউদ্দীন খানের মন্ত্রণা-সভার তিনিই ছিলেন প্রধান পরিচালক। শুজাউদ্দীন খান আকবরনগর বা রাজমহলের ফৌজদারের পদ আলীবর্দী খানের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা জয়েন-উদ-দীন আহমদকে দিয়েছিলেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৪৭২ পৃঃ)।

৮৩. আলীবর্দী খানের নিজামতের আমলে মুহম্মদ রেজা 'নওয়াজেশ মুহম্মদ খান' উপাধি পেয়েছিলেন এবং বাংলার দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। পুস্তকে ব্যবহৃত 'বাজুত্রা' শব্দের অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারি না; সম্ভবতঃ 'বিবিধ আদায়' উল্লেখ করা হয়েছে।

৮৪. ফখর-উদ-দৌলা ১১৪০ হিজরী থেকে প্রায় পাঁচ বৎসর বিহারের

সুবাদার ছিলেন। তিনি আরাম ও বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তিনি তাঁর উজীর জনসাধারণের আস্থাশীল শেখ আবদুল্লার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করতেন এবং আমির-উল্-উমারা সম্সম্-উদ-দৌলা খান দওরান খাজা আজমের ভ্রাতা খাজা মু'তাসমকে অপমান করেছিলেন। ফলে খাজা মু'তাসম পাট্না ত্যাগ করেন ও দিল্লী গিয়ে তাঁর ভ্রাতার নিকট অভিযোগ করেন। বাদশাহ মুহম্মদ শাহের দরবারে তাঁর ভ্রাতার অত্যন্ত প্রভাব ছিল। ফখর-উদ-দৌলাকে অবিলম্বে পদচ্যুত ক'রে দিল্লী ডেকে পাঠানো হয় এবং বিহার নওয়াব শুজাউদ্দীন খানের সুবাভুক্ত করা হয়। নওয়াব শুজাউদ্দীন বিহারের ডেপুটি নাজিমরূপে মুহম্মদ আলীবর্দী খানকে নিযুক্ত করেন এবং বাদশাহের অনুমোদন নিয়ে 'মহবত জং' উপাধি ও পাঁচ-হাজারীর মর্যাদা দেন। আলীবর্দী বিহারে বলিষ্ঠভাবে শাসন পরিচালনা করেন ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৪৬১, ৪৭২ পৃঃ দ্রঃ; রওশন-উদ-দৌলার বিবরণীর জন্য 'সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৪৬২ পৃঃ দ্রঃ)।

৮৫. আবদুল করিম খান একজন রোহিলা-আফগান ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন। তাঁর অধীনে আফগানদের এক বৃহৎ দল ছিল।

৮৬. 'আইন-ই-আকবরী'তে সুবা বেরারের অন্তর্গত ১০০ অশ্বারোহী ও ১০০০ পদাতিক সৈন্যসহ একটি জমিদারীকে 'বান্জারা' বলা হয়েছে ('আইন', ২য় খণ্ড, ২৩০ পৃঃ)। বান্জারাগোষ্ঠী জাতিতে রাজপুত।

৮৭. ভাউরা বা ভাওয়ারা সুবা বিহারের তিরহুত সরকারের অধীনে একটি মহলরূপে বর্ণিত হয়েছে ('আইন', ২য় খণ্ড, ১৫৬ পৃঃ দ্রঃ)। স্টুয়ার্ট ভুলক্রমে এটাকে 'ফুল্ওয়ারা' বলেছেন। ফুলওয়ারি সরকার বিহারের অধীনে একটি মহল।

৮৮. ভোজপুর বিহারের সরকার রোটাসের অধীন একটি পরগণা—আরার পশ্চিমে ও সাসারামের উত্তরে অবস্থিত। ভোজপুরের

রাজারা মালোয়ার উজ্জয়িনীয় প্রাচীন রাজাদের বংশধর বলে দাবী করতেন ; তাদের উজ্জয়িনীয় রাজা বলা হোত ('আইন'—ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৫১৩ পৃঃ)।

৮৯. নামদার খান মুইন, বিহারের কোন্ অঞ্চলের স্থানীয় সরদার ছিলেন আমি তার সন্ধান পাই নাই।

৯০. ইসহাক খানের বৃত্তান্তের জন্য 'সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তিনি বাদশাহ মুহম্মদ শাহের আস্থাভাজন ছিলেন।

৯১. নিজাম-উল-মুল্‌ক আসফজাহ্ বাদশাহের ওজারতি ত্যাগ করার পর মুহম্মদ আমিন খানের পুত্র ইতিমাদ-উদ-দৌলা কমর-উদ-দীন খান বাদশাহ মুহম্মদ শাহের উজীর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

৯২. কিন্তু 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' উল্লিখিত হয়েছে যে, শুজাউদ্দীন খান বাদশাহ মুহম্মদ শাহের অনুমোদন নিয়ে তাঁর প্রিয়পাত্র আলীবর্দী খানকে 'মহবত জং' উপাধি দিয়েছিলেন।

৯৩. রুস্তম—পারস্যের হারকিউলিস। পারস্যের হোমার—কবি ফেরদৌসি শাহনামা মহাকাব্যে রুস্তমের নির্ভীক সাহসিকতা ও সমুজ্জ্বল বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করেছেন।

৯৪. 'মা'সির-উল-উমারা'য় (২য় খণ্ড, ৮৪৪ পৃঃ) "মখ্‌মুর"—এটাই ঠিক মনে হয়।

৯৫. নওয়াব শুজাউদ্দীন খানের পুত্র মুহম্মদ তকি খানকে কটকের কদম-রসুল ভবনে দাফন করা হয়েছিল। উড়িষ্যার নাজিম থাকাকালে নওয়াব শুজাউদ্দীন খান এই ভবন তৈরী করেছিলেন। মুহম্মদ তকি খানের কবর বর্তমানে ধ্বংসাবস্থায় আছে। শিলালিপিতে তাঁর মৃত্যুর তারিখ আমি দেখেছি। 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরী'নে (ফার্সী সংস্করণ, ৫৩৪ পৃঃ) কটকের কদম-রসুল ভবন এবং তথায় আবদুর রসুল খান নামক উড়িষ্যার অন্য একজন ডেপুটি গবর্নরের পুত্র আবদুল নবি খানের কবরের কথা উল্লেখ আছে। কদম-রসুল ভবনের শিলালিপিতে লিখিত তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ব্যতিক্রমের বিষয় উল্লেখ্য। তাতে লিখিত আছে "দ্বিতীয় আলমগীরের

সময় শুজাউদ্দীন খান এটি তৈরী করেছিলেন"। শুজাউদ্দীন মোটেই দ্বিতীয় আলমগীরের সমসাময়িক ছিলেন না। পরন্তু, কটকে থাকাকালে তিনি প্রথম আলমগীরের ও বাংলার নাজিম থাকাকালে বাদশাহ মুহম্মদ শাহের সমসাময়িক ছিলেন।

৯৬. পাঠক যেন এই মুরশিদ কুলি খান (যিনি শুজা-উদ-দৌলার জামাতা ও যাঁর আসল নাম মীর্জা লুত্‌ফুল্লাহ্) এবং নওয়াব জাফর খানকে (যাঁর পূর্বের উপাধি ছিল মুরশিদ কুলি খান) একই ব্যক্তি মনে করে ভুল না করেন। এই বই থেকে দেখা যায়, জাফর খান পরপর কয়েকটি উপাধি পেয়েছিলেন; প্রথমে 'করতলব খান', তারপর 'মুরশিদ কুলি খান' ও সবশেষে 'মুতামান-উল-মুল্‌ক আলা-উদ-দৌলা জাফর খান নাসির জং' উপাধি পেয়েছিলেন। তাঁর আসল নাম ছিল মীর্জা হাদি।

৯৭. 'আইন-ই-আকবরী'তে (২য় খণ্ড, ১৩২-১৩৩ পৃঃ) আমি দু'টি অনুচ্ছেদে 'জাল্লাপুর' নাম দেখতে পাই। একটি হচ্ছে 'সোয়াইল' (স্পষ্টই সরাইল, সাধারণতঃ বলা হয় জাল্লাপুর; রাজস্ব ১৮,৫৭,২৩০ দাম); এটি সরকার ফতেহাবাদের অন্তর্গত। আর একটি হচ্ছে সরকার মাহমুদাবাদের অন্তর্গত 'দাহুলাত জাল্লাপুর' (রাজস্ব ১২০০ দাম)। প্রথমোক্ত জাল্লাপুর বা সরাইল ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত। ১৮৯৬ সালে যখন আমি এই মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ছিলাম তখন এখানকার একটি মুসলমান পরিবার-প্রধানের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল (এখনো তাঁকে 'দেওয়ান' বলা হয়); কিন্তু এরা দরিদ্র। দ্বিতীয় জাল্লাপুর পরগণা বর্তমান ফরিদপুর জেলার মধ্যে এবং আমার বিশ্বাস উক্ত জেলার হবিবগঞ্জের মুসলমান জমিদারগণ এর মালিক। হয়ত মীর হবিবের নামানুসারে হবিবগঞ্জ নাম হয়েছে—বিশেষতঃ পূর্বে এখানে "চাক্‌লা হবিবগঞ্জ" ছিল।

৯৮. 'আইন-ই-আকবরী'তে 'পাটপসার' নামক কোনো স্থানের নাম দেখতে পাই নাই। এই স্থানের কোনো সন্ধান আমি পাই নাই;

অথবা উক্ত জমিদার পরিবারের কোনো বংশধরের সন্ধানও পাই নাই। তবে ত্রিপুরায় প্রচলিত কাহিনী অনুসারে জানা যায় হরিশপুরের দেওয়ানদের (আর একটি পুরাতন মুসলমান জমিদার পরিবার, তবে বর্তমানে দরিদ্র) তিপ্‌রা রাজাদের ও মুঘল কর্তৃক তিপ্‌রা বিজয়ে কিছু সম্পর্ক ছিল। এই পুস্তকে উল্লিখিত আকা বা আগা সাদেকের সঙ্গে উক্ত পরিবারের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই।

৯৯. পার্বত্য ত্রিপুরার বর্তমান রাজার বাসস্থান আগরতলায়। চণ্ডিগড় কোথায় আমি জানি না, তবে আগরতলা থেকে দূরে নিশ্চয়ই নয়। তিপ্‌রা বা কুমিল্লার উল্লেখ আকবরের বাংলার 'রাজস্ব তালিকা'য় নাই।

১০০. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৫৯৩, ৫৯১, ৫৯০, প্রভৃতি পৃষ্ঠায় ও 'মা'সির-উল-উমারা' ২য় খণ্ড, ৮৪৪ পৃষ্ঠায় মীর হবিবের পূর্ণ বিবরণী দেয়া আছে। তাঁর (মীর হবিবের) পুরাতন উপকারী মনিব শুজাউদ্দীন খানের জামাতা মুরশিদ কুলি খানকে উড়িষ্যার গবর্নর থেকে অপসারিত করায় এর প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে মীর হবিব আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে বাংলা আক্রমণের জন্য মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দেন ও তাদের প্ররোচিত করেন। মীর হবিব আশ্চর্যজনকরূপে কর্মিষ্ঠ, সাহসী ও কৌশলী ছিলেন এবং আলীবর্দী খানকে অশেষ অসুবিধায় ফেলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত আলীবর্দী খান বাধ্য হয়ে মীর হবিব ও মারাঠাদের সঙ্গে আপোস করেন। আপোসের চুক্তি অনুযায়ী মীর হবিবকে উড়িষ্যার ডেপুটি নাজিম পদে নিয়োগ করা হয়; উড়িষ্যার রাজস্ব থেকে মারাঠা সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন করার শর্ত স্বীকার করতে হয় এবং তদুপরি বাৎসরিক বারো লক্ষ টাকা বিশেষ কর মারাঠাদের দিতে আলীবর্দীকে স্বীকার করতে হয়। মীর হবিব কর্তৃক মারাঠাদের বিরাট সাহায্যের স্বীকৃতির পরিবর্তে মারাঠা রঘুজী ভোঁসলার পুত্র জানোজী তাঁকে কটকে

ভোজে আমন্ত্রণ করেন ও বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হত্যা করেন ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ফার্সী সংস্করণ, ৫৯২ পৃঃ)। অবশ্য মারাঠারা তাদের অভ্যুত্থানের পর্যায়ে আক্রমণ, ও আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদাই বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়েছে এবং যে ব্যক্তি সম-জাতি ও সম-ধর্মী না হয়েও উড়িষ্যা প্রদেশ তাদের কার্যতঃ অধীন ক'রে দিয়েছিল সেই ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবহারেও মারাঠা দস্যুরা বিশ্বাসঘাতকতার নীতি ত্যাগ করতে পারে নাই।

১০১ স্পষ্ট বুঝা যায়, (ত্রিপুরার) রাজা আর স্বাধীন ছিলেন না, পরন্তু মোটামুটি সামন্ত রাজারূপে ছিলেন।

১০২ ১৮৯৬ সালে আমি যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছিলাম, তখন আদালতের পিওনদের চাপরাশে 'চাক্‌লা রওশনাবাদ' লেখা দেখেছি। বর্তমানে তা পরিবর্তিত হয়েছে কিনা জানি না।

১০৩ মুরশিদ কুলি খান (২য়) রুস্তম জং নওয়াব শুজাউদ্দীন খানের অন্যতম জামাতা ছিলেন। তিনি সরফরাজ খানের সৎ-বোন দুর্দানা বেগমকে বিবাহ করেছিলেন। সরফরাজ খানের আপন ভগ্নী নফিসা বেগমের সঙ্গে সৈয়দ রাজী খানের বিবাহ হওয়ায় তিনিও শুজাউদ্দীন খানের আর এক জামাতা ছিলেন।

১০৪ এ পর্যন্ত এঁর নাম ছিল কেবল 'মীর হবিব'। ত্রিপুরা বিজয়ে বিশেষ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বাদশাহ মুহম্মদ শাহ তাঁকে 'খান' উপাধি দেওয়ায় তাঁর নাম হয় 'মীর হবিবউল্লাহ খান'। ভারতের মুসলমান বাদশাহদের আমলে 'খান' উপাধির অর্থ সম্পর্কে পূর্বের টীকা দেখুন।

১০৫. পুরীর আর এক নাম পুরুষোত্তম (হাণ্টারের Orissa দ্রঃ)।

১০৬. এখানে লক্ষণীয় যে, বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষদিকে বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটা মৌলিক পরিবর্তন হয়েছিল। এতদ্বত নাজিম ও দেওয়ানের পদ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখা হয়েছিল; কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁর প্রিয়পাত্র মুরশিদ কুলি খানকে (১ম) (পরে নওয়াব জাফর খান) বাংলা ও উড়িষ্যায় দেওয়ান ও

ডেপুটি নাজিম পদে নিযুক্ত ক'রে উভয় পদ এক করেন ও তদ্দ্বারা একটা পশ্চাদমুখী পন্থা অবলম্বন করেন। মুরশিদ কুলি খান (১ম) নিজে ব্যক্তিগতভাবে উভয় পদের কার্য সম্পন্ন করতে পারতেন না। সেইজন্য বাংলার ডেপুটি নিজামতের দফতর (তখনো শাহজাদা আজিম-উশ-শান প্রধান নাজিম ছিলেন) তিনি নিজ হাতে রাখেন; সৈয়দ আকরম খানকে বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত ও আকরম খানের মৃত্যুর পর শুজাউদ্দীন খানের জামাতা সৈয়দ রাজি খানকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন; শুজাউদ্দীনকে (মুরশিদ কুলি খানের জামাতা) উড়িষ্যার ডেপুটি নাজিম ও দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। ফররুখ শিয়র দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পর উক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুমোদন করেন এবং নওয়াব জাফর খানকে বাংলা ও উড়িষ্যার নাজিম ও দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এই-রূপে দেওয়ান ও নাজিমের পদে একই ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। ফলে এই অঞ্চলে বাদশাহী ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বাংলার মসনদের মর্যাদা প্রায় আধা-রাজকীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়। নওয়াব শুজাউদ্দীন যখন বাংলার ভাইসরয় তখন বাদশাহ মুহম্মদ শাহ বাংলার সুবাদারির সঙ্গে বিহার যোগ ক'রে এই মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করেন। প্রশাসনিক কার্যনির্বাহের জন্য শুজাউদ্দীন তিন-সদস্য বিশিষ্ট একটি মন্ত্রীসভা গঠন ক'রে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমগ্র সুবাদারী এলাকাকে কয়েকটি রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করেন; যথা: (১) পশ্চিম ও মধ্য এবং উত্তর-বঙ্গের অংশ নিয়ে খাস বাংলা; (২) পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের অংশ ও সিলহট এবং চট্টগ্রামের সমন্বয়ে জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকা বিভাগ; (৩) বিহার বিভাগ; (৪) উড়িষ্যা বিভাগ। প্রথমোক্ত বিভাগ (অথাৎ খাস বাংলা) শুজাউদ্দীন নিজের হাতে রেখেছিলেন এবং অন্য তিনটি বিভাগ নিজ তত্ত্বাবধানে তিনজন ডেপুটি নাজিমকে প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

১০৭. মুরাদ আলী খান ছিলেন সরফরাজ খানের আপন ভগ্নী নফিসা বেগমের পুত্র। নফিসা বেগম শুজাউদ্দীন খানের কন্যা ছিলেন। নওয়াব জাফর খানের আমলে সৈয়দ আকরম খানের মৃত্যুর পর বাংলার দেওয়ান সৈয়দ রাজি খানের সঙ্গে নফিসা বেগমের বিবাহ হয়। বাদশাহ ফররুখ শিয়রের রাজত্বকালে সৈয়দ রাজি খানের মৃত্যুর পর মাতামহ নওয়াব জাফর খানের সোপারেশে মীর্জা আসাদ-উদ-দৌলা 'সরফরাজ খান' উপাধি লাভ করেন ও বাংলার দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। নওয়াব জাফর খানের মৃত্যুর পর শুজাউদ্দীন খান বাংলার নাজিম হন ও তাঁর পুত্র সরফরাজ খান নামে মাত্র ডেপুটি নাজিম হয়ে থাকেন। কিন্তু সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা হাজী আহমদ (আলীবর্দী খানের ভ্রাতা), দেওয়ান আলমচাঁদ ও ফতেহ্চাঁদ জগৎশেঠের সমন্বয়ে গঠিত স্টেট কাউন্সিলের অধীন থাকায় সরফরাজ খানের সত্যিকার ক্ষমতা ছিল না।

১০৮. মীর্জা লুত্‌ফুল্লাহ্ (২য় মুরশিদ কুলি খান) শুজাউদ্দীন খানের জামাতা। তিনি প্রথমে জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকার) ডেপুটি গবর্নর ছিলেন ও পরে উড়িষ্যায় এই পদে বদলী হয়েছিলেন। নওয়াব জাফর খানেরও উপাধি ছিল মুরশিদ কুলি খান; তাঁকে ও এই মুরশিদ কুলি খানকে যেন একই ব্যক্তি মনে না করা হয়।

১০৯. পূর্বের টীকা ও এই বইতে নওয়াব শায়েস্তা খান সম্পর্কে বিবরণী দ্রষ্টব্য।

১১০. পূর্বের টীকা দেখুন।

১১১. নফিসা বেগম ছিলেন সরফরাজ খানের ভগ্নী; এবং সরফরাজ খানের পূর্ববর্তী বাংলার দেওয়ান সৈয়দ রাজি খানের ঔরসে ও নফিসা বেগমের গর্ভে মুরাদ আলী খানের জন্ম হয়। সুতরাং, মুরাদ আলী খান সরফরাজ খানের ভগ্নীর পুত্র। মুরাদ আলী খান প্রথমে ঢাকাস্থ নওয়ারার (যুদ্ধ-নৌবহরের) তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। সরফরাজ খানের কন্যার সঙ্গে বিবাহের পর গালিব আলী খানের স্থলে মুরাদ আলী জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকার) ডেপুটি গবর্নর

নিযুক্ত হন। উল্লেখযোগ্য যে, কুমিল্লায় দাউদকান্দির সন্নিকটে মুরাদনগর নামক একটি স্থান আছে এবং এই স্থানের সঙ্গে ঢাকার পূর্ববর্তী নওয়াবদের সংশ্রব আছে বলা হয়। কথিত হয় যে, পাটনার ভিকনপাহাড়ি নওয়াবগণ ঢাকার অধুনালুপ্ত পুরাতন কোনো নওয়াব পরিবারের বংশধর এবং আমার বিশ্বাস মুরাদনগর অঞ্চলে এখনো এই নওয়াবদের কিছু সম্পত্তি আছে। আমার ধারণা, মুরাদ আলী খানের নামে মুরাদনগর নাম হয়েছিল।

১১২. নওয়াব সিরাজ-উদ দৌলার আমলে রাজবল্লভের পুত্র কিষন (কৃষ্ণ) বল্লভ ঢাকা থেকে কলকাতা পালিয়ে যান এবং তারই ষড়যন্ত্রে সিরাজ-উদ-দৌলা ও ইংরেজদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৬২১ পৃঃ দ্রঃ)। আলম-চাঁদ যেমন শুজাউদ্দীনের ও রতনচাঁদ যেমন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের, তেমনি রাজবল্লভও মুরাদ আলী খানের শনিগ্রহ ছিলেন (পূর্বের টীকা দ্রষ্টব্য)। রাজবল্লভ পরে মীর জাফরের কুখ্যাত পুত্র মীরনের অনুগ্রহভাজন হয়েছিলেন।

১১৩. সেইসময় বীরভূমের বদি-উজ-জমান ও বর্ধমানের করতচাঁদ (কীর্তি-চাঁদ) পশ্চিমবঙ্গের দু'জন প্রধান জমিদার ছিলেন মনে হয়। শুনেছি বদি-উজ-জমানের বংশধরগণ এখনো বীরভূমে দরিদ্র অবস্থায় বাস করছেন।

১১৪. নাদির শাহের আক্রমণের পূর্ণ বিবরণী ভারতের সকল ইতিহাসে এবং 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৪৮২ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

১১৫. এই যুদ্ধ ১১৫১ হিজরীতে শাহজাহানাবাদ বা দিল্লী থেকে ৪ মঞ্জিল দূরে কর্নালে হয়েছিল ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৪৮২ পৃঃ দ্রঃ)।

১১৬. অর্থাৎ, রায় আলমচাঁদ—শুজাউদ্দীনের প্রকৃতপ্রস্তাবে 'দেওয়ান'। তাঁর মনিব নওয়াব শুজাউদ্দীন খানের সোপারেশে তিনি বাদশাহের নিকট 'রায় রায়ান' উপাধি পেয়েছিলেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৪৭১ পৃঃ দ্রঃ)।

১১৭. লক্ষণীয় যে, 'শুজাউদ্দীন খান' ও 'শুজা-উদ-দৌলা' একই ব্যক্তি। এগুলো ছিল তাঁর উপাধি। এই 'শুজাউদ্দীন খান' ও পরবর্তীকালে নওয়াব উজীর শুজা-উদ-দৌলাকে যেন একই ব্যক্তি গণ্য না করা হয়।

১১৮. 'মা'সির-উল-উমারা'র গ্রন্থকার বলেন যে, কঠোর মিতব্যয়িতা ও ব্যয়সঙ্কোচের নীতি অবলম্বন ও সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করায় সরফরাজ খান জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন এবং আলীবর্দী খান তাঁর ভ্রাতা হাজী আহমদের (সরফরাজ খানের প্রধান পরামর্শদাতা) সহ-যোগীতায় ষড়যন্ত্র করার সুযোগ লাভ করেছিলেন ('মা'সির-উল-উমারা', ২য় খণ্ড, ৮৪৪ পৃঃ)। সরফরাজ খানের স্মৃতির প্রতি সুবিচারের জন্য এখানে উল্লেখ্য যে, পিতার মৃত্যুকালীন উপদেশ অনুযায়ী তিনি এই তিন-সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শদাতাদের উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন; অথচ, এঁরা তাঁদের উপকারীর পুত্রের ধ্বংস সাধনের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। এঁদের হীন বিশ্বাসঘাত-কতার কাহিনী বর্ণনা করতেও মন বিষাক্ত হয়ে উঠে; কারণ, সকল বিবরণী থেকে দেখা যায় সরফরাজ খান একজন অত্যন্ত মহৎ ও শান্তপ্রকৃতির নওয়াব ছিলেন।

১১৯. নাদির শাহ ছিলেন একজন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। পারস্যের রাজা শাহ তাহ্‌মাস্পকে বন্দী করার পর তিনি একটি কাউন্সিল অব স্টেট (বা প্রধান আমীরগণের সভা) আহ্বান করেন ও নিজেকে পারস্যের রাজা নির্বাচিত করেন ('নামা-ই-খসরুয়াঁ', ১৫৩ পৃঃ; তাঁর জীবনী ও চিত্র দ্রষ্টব্য)।

১২০. বিশদ বিবরণীর জন্য 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ফার্সী সংস্করণ, ৪৮২ পৃঃ দ্রঃ। দেখা যাচ্ছে যে, সাম্রাজ্যের এই সংকটকালেও বাদশাহ মুহম্মদ শাহের অর্থগৃধ্নু মন্ত্রীগণ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও দলগত ঈর্ষা-পরায়ণতা ত্যাগ করতে পারেন নাই; অথচ এই বিষ সমগ্র মুসলিম জাতির ও বহু মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। এমনকি, এরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যেও ঐক্যবদ্ধ হোতে

পারেন নাই। এদিক দিয়ে বুরহান-উল-মুল্কই ছিলেন সর্বাপেক্ষা দোষী। কেবল নিজাম-উল-মুল্‌ক ও কমর-উদ-দীন খানকে ভাল দেখা যায়। এঁরা নিজেদের পদের উচ্চ ঐতিহ্য বজায় রেখেছিলেন বলে মনে হয় (নিজাম-উল-মুল্‌ক আসিফজাহ্‌ ও কমর-উদ-দীন খানের জীবনীর জন্য 'মা'সির-উল-উমারা', ৩য় খণ্ড, ৮৩৭ পৃঃ ও ১ম খণ্ড, ৩৫৮ পৃঃ দ্রঃ)।

১২১. দিল্লী ধ্বংসের ও সেখানকার জনসাধারণের নির্বিচারে হত্যার বিশদ বিবরণ সম্পর্কে 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৪৮৫ পৃঃ দ্রঃ।

১২২. নাদির শাহের আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম গুরুতর কারণ।

১২৩. দিল্লীর সমস্ত মসজিদ থেকে নাদির শাহের নামে খোতবা পঠিত হয়েছিল ('সিয়ার' দ্রঃ)।

১২৪. কমর-উদ-দীন খান এই সময় বাদশাহ মুহম্মদ শাহের প্রধান উজীর ছিলেন।

১২৫. হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খানের ষড়যন্ত্রে বাদশাহী উজীর মু'তাম-উদ-দৌলা ইসহাক খান প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাদশাহ মুহম্মদ শাহের উপর এই সময় ইসহাক খানের অত্যন্ত প্রভাব ছিল ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ৪৮৯ পৃঃ)।

১২৬. সরফরাজ খানের ত্রয়ী-মন্ত্রিসভা এই রাজদ্রোহিতার জন্য দায়ী ছিল। বাদশাহ মুহম্মদ শাহের নিকট অভিযোগ পেশ ক'রে সরফরাজ খানকে অপসারণের কৌশলপূর্ণ পরিকল্পনা এঁরা তৈরী করেছিলেন। দুঃখের বিষয়, সারল্য, সদাশয়তা ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব ইত্যাদি কারণে সরফরাজ খান এদের হীন কৌশল বুঝতে পারেন নাই।

১২৭. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' (৪৮৯ পৃঃ) প্রদত্ত কিঞ্চিৎ অন্যরূপ বিবরণ দ্রষ্টব্য। 'সিয়ারে' বলা হয়েছে, হাজী আহমদের স্থানে মীর মর্তুজাকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং রাজমহলের ফৌজদার পদে আতাউল্লাহ খানের স্থলে নিজ জামাতা হাসান মুহম্মদ খানকে নিযুক্ত করার চিন্তা করেছিলেন।

১২৮. এও কালক্ষেপের সেই পুরাতন কৌশল। বিশ্বাসঘাতক পরামর্শ-দাতাদের আবেদন গ্রাহ্য ক'রে সরফরাজ খান দুঃখজনক বিচার-বুদ্ধির অভাবের প্রমাণ দিয়েছিলেন। সরল বিশ্বাস, দ্বিধাগ্রস্ততা ও উদার ভাবাবেগের দরুন তাঁর মসনদ ও জীবন দিতে হয়েছিল এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মসনদের রাজকীয় মর্যাদা লুপ্ত হয় ও এই প্রাচীন মসনদের মৃত্যুর পদধ্বনির ক্ষীণ অথচ নিশ্চিত আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়।

১২৯. এই রায় রায়ান দেওয়ান আলমচাঁদ, সরফরাজ খানের পিতার আশ্রিত ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। আনুগত্যের মুখোশ প'রে তিনি আলীবর্দী খান ও এঁর ভ্রাতা হাজী আহমদ অপেক্ষাও সরফরাজ খানের অধিক ক্ষতি করেছিলেন। তবে তার পক্ষে এই পর্যন্ত বলা যায়, দেওয়ান আলমচাঁদ বিশ্বাসঘাতকদের দলের মধ্যে 'একজন বিশ্বাসঘাতক মাত্র'।

১৩০. সরফরাজ খান অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ছিলেন। সারল্য ও আলীবর্দীর উপর আস্থা স্থাপনের জন্য তিনি সিংহাসন হারিয়েছিলেন। মানবপ্রকৃতি সঠিভাবে উপলব্ধি, বিজ্ঞ শাসকের অপরিহার্য গুণ; সরফরাজ খানের এই গুণের অভাব ছিল। সরফরাজ খানের এই ত্রুটি সত্ত্বেও আলীবর্দী খান, দেওয়ান আলমচাঁদ, হাজী আহমদ ও জগৎশেঠের (পরামর্শদাতাদের ত্রয়ী) নিদারুণ অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতা কোনো মতেই ক্ষমা করা যায় না।

১৩১. যদিও সরফরাজ খান অসাধারণ দয়াশীল ও ক্ষমাশীল ছিলেন, তথাপি লক্ষণীয় যে, বীরের মত যুদ্ধ ক'রে মৃত্যুবরণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল।

১৩২. 'মিখা দম্বর' শব্দের অর্থ—রাজার হাওদা (বা পাল্কী), যা হস্তীপৃষ্ঠে বহন করা হোত। 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' (৩৭৮ পৃঃ) একে 'মিক দম্বর' বলা হয়েছে। সম্ভবতঃ এটি একটি তুর্কী শব্দ।

১৩৩. রথ এক প্রকার চারি-চক্র যান। 'চাক্‌রা' হচ্ছে দ্বি-চক্র যান।

১৩৪. গওস খান এবং তাঁর পুত্র কুতব ও বাবরের বীরত্ব দেখে মনে হয়

মুসলিম-বাংলা তখনো বীর-শূন্য হয় নাই।

১৩৫. সেকালের আনুগত্যহীনতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে এই প্রকার আনুগত্য ও বীরত্বের দৃষ্টান্ত অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর মতো দেখা দেয়।

১৩৬. "এই শ্রেণীর লুঠেরার দল সেই সময়ে খ্রীস্টানদের (ফিরিঙ্গিদের) নাম ভীতিপ্রদ ক'রে তুলেছিল; শেষ পর্যন্ত মুঘল সম্রাটদের শক্তিশালী শাসনের ফলে উক্ত নামটি ঘৃণার বস্তু হয়েছিল" (স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের History of British India, ১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ)। তবে 'ফিরিঙ্গি' আখ্যা বিশেষতঃ ভারতের পর্তুগীজ বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হোত এবং 'নাসারা' (নাজারিন) শব্দ দ্বারা সাধারণভাবে খ্রীস্টানদের উল্লেখ করা হোত।

১৩৭. সেই বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধকারের মধ্যে ও সংকটকালে তিনি যে বীররাজপুত সৈন্যাধ্যক্ষদের অবাধ আনুগত্য লাভ করেছিলেন, তদ্দ্বারা সরফরাজ খানের সাধুতার আর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই ঘটনা দ্বারা সেই আঁধারের মধ্যে আলোর রেখা দেখা যায়।

১৩৮. রায় রায়ান আলমচাঁদ (সরফরাজ খানের পিতা শুজাউদ্দীন খানের আশ্রিত) শেষ পর্যন্ত নিজ পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিল। সেইজন্য তাঁর চরিত্র হাজী আহমদ ও জগৎশেঠের তুলনায় কিঞ্চিৎ কম বীভৎসরূপে দেখা যায়। ঘোর অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতা হাজী আহমদ ও জগৎশেঠের বিবেককে বিন্দুমাত্র দংশন করেছিল বলে মনে হয় না।

১৩৯. যুদ্ধজয়ের পর তৃতীয় দিনে আলীবর্দী মুর্শিদাবাদ নগরে প্রবেশ করেছিলেন। তিনি মেকিয়াভেলির মতো ছিলেন (অর্থাৎ অতি সুচতুর কূটনৈতিক ছিলেন)। সেইজন্য নগরে প্রবেশ করার পর তিনি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রথমে নফিসা বেগমের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন (নফিসা বেগম শুজাউদ্দীন খানের কন্যা ও সরফরাজ খানের ভগ্নী ছিলেন)। অতঃপর তিনি শুজাউদ্দীন খানের চেহেলসেতুন

প্রাসাদে এক দরবার করেন। যদিও ঘোর অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার জন্য প্রথমে লোকে ও কর্মচারীরা তাঁকে ঘৃণা করতো, তথাপি বহুমূল্য উপহারাদি দিয়ে তিনি তাদের শান্ত করেছিলেন ('সিয়ার উল-মুতাক্ষেরীন', ফার্সী সংস্করণ, ৪৯৪ পৃঃ)। তিনি নিজ জামাতা জয়েন-উদ-দীন খান হায়বত জংকে নিজের জায়গায় পাটনার (বা আজিমাবাদের) নায়েব-নাজিম পদে নিযুক্ত করেন ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ৪৯৯ পৃঃ)।

১৪০. ঘেরিয়ার যুদ্ধ—'সিয়ার-উল মুতাক্ষেরীনে'র ৪৯২-৪৯৩ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত এই যুদ্ধের বিবরণীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। যদিও 'সিয়ারে'র গ্রন্থ-কার আলীবর্দীর গোঁড়া অনুগামী ছিলেন ও তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, তথাপি এই যুদ্ধে সরফরাজ খানের কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষের বীরত্ব ও উৎসর্গীকৃত আনুগত্যের বিপুল প্রশংসা করেছেন। 'সিয়ার' অপেক্ষা 'রিয়াজে' এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বিবরণ অধিকতর বিশদ ও সঠিক। দিল্লী ধ্বংস ক'রে নাদির শাহের পারস্যে প্রত্যাবর্তনের প্রায় এগারো মাস ও শুজাউদ্দীন খানের মৃত্যুর প্রায় চৌদ্দ মাস পরে এই যুদ্ধ হয়েছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (ঙ)

১. আলীবর্দীর এই মর্যাদা-হানিকর ঘটনাটি 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে'র গ্রন্থকার (যার পিতা পাটনায় আলীবর্দীর জামাতা জয়েনউদ্দীন খানের অধীন উচ্চপদে নিয়োজিত ছিলেন) চাপা দিয়েছেন। কিন্তু 'রিয়াজে'র গ্রন্থকার নিরপেক্ষ হওয়ায় এটা চাপা দেন নাই।

২. এদের (সরফরাজ খানের সন্তানদের) কোনো বংশধর ঢাকার কোনো গলিতে আজও আছে, সে বিষয়ে সন্ধান একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার হবে।

৩. নওয়াজেশ আহমদ খান তখন জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকার ডেপুটি নাজিম ছিলেন।

৪. রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে বাদশাহ মুহম্মদ শাহ, নাদির শাহের প্রতি ঠিক সুবিচার করেন নাই। একথাও তাঁর বলা উচিৎ ছিল যে, আরাম ও বিলাসপ্রিয়তা, তাঁর নিজের ও তাঁর অব্যবহিত পূর্ববর্তীদের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব এবং মুঘল আমীর ও উজীরবর্গের অর্থলোভ ও দুর্নীতি, দলগত (বা গোষ্ঠীগত) ঈর্ষা ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভারতের গৌরবোজ্জ্বল তৈমুরীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল দিল্লীতে নৈতিক অসাড়তা দেখা দিয়েছিল ও দ্রুত দূরবর্তী প্রদেশগুলোতেও তা বিস্তারলাভ করেছিল। ভারতের মুসলমানেরা প্রথমে তাদের ইসলামী গুণাবলী ও তারপর সাম্রাজ্য হারিয়েছিল। নাদির শাহের আক্রমণ সাম্রাজ্যের ধ্বংসকে তরান্বিত করেছিল।

৫. সরফরাজ খানের ক্রোকী সম্পদ ও রাজস্ব আনয়নের জন্য বাদশাহ মুরাদ খানকে পাঠিয়েছিলেন ('সিয়ার', ৪৯৬ পৃঃ)।

৬. কমর-উদ-দীন খান ও নিজাম-উল-মুল্‌ক আসিফজাহের মতো উজীরগণও ভারতীয় মুসলিম ইতিহাসের এই অন্ধকার যুগে দুর্নীতিমুক্ত ছিলেন না, একথা উল্লেখ করতেও লজ্জা বোধ হয়।

৭. মুরশিদ কুলি খান (২য়) শুজা-উদ-দীন খানের এক জামাতা। শুজা-উদ-দীন খানের পুত্র মুহম্মদ তকি খানের মৃত্যুর পর মুরশিদ কুলি উড়িষ্যার ডেপুটি নাজিম পদে নিযুক্ত হন। আলীবর্দী ও তাঁর কুখ্যাত হাজী-ভ্রাতা প্রাক্তন উপকারী মনিবের বংশের কোনো যোগ্য পুরুষকে রেহাই না দেয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্প করেছিলেন। এই প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা ও (বিপক্ষের) মৃত্যুর পর সৌজন্য প্রদর্শন দ্বারা যে রাজত্বের সূচনা, তা বিধাতার অমোঘ নিয়মে হীনকলংকে পর্যবসিত হোতে বাধ্য। স্বল্পকালমধ্যে পাপী হাজী তার ফল পেয়েছিলেন। আফগান জনতা পাটনা আক্রমণ ও ধ্বংস করে এবং তাঁকে ও তাঁর পুত্র জয়েন-উদ-দীন খানকে অত্যাচার ও হত্যা করে। আলীবর্দী নিজেও মারাঠা দস্যুদের পুনঃপুনঃ আক্রমণে বিপর্যস্ত হন। মারাঠা দস্যুরা পঙ্গপালের মতো বারবার এই সুন্দর দেশ আক্রমণ ও ছারখার করতে থাকে। আলীবর্দীর উদ্যম, সাহস ও শক্তি তাঁকে বিধাতার অভিশাপ থেকে রক্ষা করতে পারে নাই। শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাধ্য হয়ে মারাঠাদের সঙ্গে হীনশর্তে সন্ধি স্থাপন করতে হয় ও কার্যতঃ উড়িষ্যা প্রদেশ তাদের ছেড়ে দিতে হয়। মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলাকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হয়। আলীবর্দীর অবৈধভাবে প্রাপ্ত মসনদ চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয় ও অন্যদের হাতে চলে যায়। সত্যিই, বিধাতার প্রতিশোধ অল্পকালের মধ্যে আলীবর্দীকে আক্রমণ করেছিল।

৭-ক. চিন রায়, দেওয়ান আলমচাঁদের পেশকার ছিলেন। আলমচাঁদের মৃত্যুর পর মহবত জং চিন রায়কে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন ('সিয়ার', ৪৯৫ পৃঃ)। চিন রায় অত্যন্ত সৎ ছিলেন। তাঁর

সম্বন্ধে মহবত জং-এর অত্যন্ত উচ্চধারণা ছিল ('সিয়ার', ৫৭৫ পৃঃ)।

৮. বাংলার নিজামত অবৈধভাবে দখল করার পর আলীবর্দী খানের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 'সিয়ার' থেকে নিম্নে দেয়া হলো ('সিয়ার', ৪৯৫ পৃঃ): কনিষ্ঠ জামাতা জয়েন-উদ-দীন আহমদ খানকে তিনি বিহার ও পাটনার সুবাদারের পদে নিযুক্ত করেন। জ্যেষ্ঠ জামাতা নওয়াজেশ মুহম্মদ খানকে জাহাঙ্গীর-নগরের ডেপুটি নিজামত, সিলহট, চাটগাঁ ও ত্রিপুরার ফৌজদারি দেন। দ্বিতীয় জামাতা সইদ আহমদ খানকে (মুরশিদ কুলি খানের পরাজয়ের পর) উড়িষ্যার ডেপুটি নিজামত দেন। জাহাঙ্গীর-নগরের (ঢাকার) নওয়ারা (বাদশাহী নৌবহর) তত্ত্বাবধায়কের পদ দেয়া হয় জয়েন-উদ-দীন আহমদ খানের পুত্র (আলীবর্দীর দৌহিত্র) মীর্জা মুহম্মদকে (সিরাজ-উদ-দৌলা শাহ কুলি খান বাহাদুরকে)। নওয়াজেশ মুহম্মদ খান সিরাজ-উদ-দৌলার ভ্রাতাকে পোষ্য-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন; তার নাম দেন 'ইকরাম-উদ-দৌলা পাদশাহ কুলি খান বাহাদুর', এবং জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকার সৈন্যবাহিনীর নাম মাত্র সৈনাপত্য দেন। আলীবর্দীর ভ্রাতা হাজী আহমদের এক জামাতা আতাউল্লাহ খানকে রাজমহল (আকবর-নগর) ও ভাগলপুরের ফৌজদার করা হয়। আলীবর্দীর সৎ-ভাই আল্লা ইয়ার খান, ভগ্নীপতি মীর জাফর খান এবং ফকিরউল্লা খান, নুরুল্লা বেগ খান, মুস্তফা খান প্রমুখ আত্মীয়দের মনসব, আমীরের মর্যাদা, উপাধি ও দেহরক্ষী দেয়া হয়। চিন রায়কে (দেওয়ান আলমচাঁদের অধীনে পেশকার) 'রায় রায়ান' উপাধি দিয়ে বাংলার ডেপুটি দেওয়ান পদে নিযুক্ত করা হয়। মহবত জং-এর পুরাতন পারিবারিক দেওয়ান রাজা জানকীরামকে 'বিবিধ বিভাগের' দেওয়ান পদ দেয়া হয়। 'সিয়ারে'র গ্রন্থকারের খালু আবদুল আলী খানকে (ইনি আলীবর্দীর আত্মীয়) নরহত ও বেহার পরগণাসহ মনসব দেয়া হয়।

৯. এই অকৃতজ্ঞতার পরিস্থিতি উদ্ভবের জন্য আলীবর্দী খান মহবত জং নিজেই দায়ী। তিনি বলপ্রয়োগ ও প্রতারণার যুগ আবার আরম্ভ করেছিলেন এবং অন্যরা তাঁকে সেই পন্থায় প্রতিদান দিয়েছিল। তিনি নিজের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণ দ্বারা অন্যদেরও অকৃতজ্ঞতা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

১০. ফার্সী চারণটি হচ্ছে—

"দওলহে হামা জে ইত্তেফাক খিজদ
বে-দওলতি আজ নফাক খিজদ।"

১১. আলীবর্দী ও তাঁর সুযোগ্য ভ্রাতা হাজী কখনো বিশ্বাসঘাতকতার অস্ত্র ত্যাগ করতে পারেন নাই। তাঁদের সন্তানদের উপর মীর-জাফর ও অন্যরা সেই একই পন্থায় প্রতিদান দিয়েছিল।

১২. বড়বাটি দুর্গ তৈরীর জন্য কয়েকজন রাজার নাম ও বিভিন্ন তারিখ উল্লেখ করা হয়। স্টার্লিং মনে করেন, রাজা অনঙ্গভীম দেব চতুর্দশ শতাব্দীতে এই দুর্গ তৈরী করেছিলেন। পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ, আলোক-স্তম্ভ, হাসপাতাল ও রাস্তা তৈরীর জন্য দুর্গের পাথর ব্যবহার করেছে। তবে, দুর্গের পরিখা ও প্রবেশদ্বার এখনো বিদ্যমান। ··· রাজা মুকুন্দ দেব এখানে নয়টি অঙ্গন বিশিষ্ট একটি প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। ··· মুসলমান গবর্নরেরা এই প্রাসাদ ত্যাগ করেন ও লালবাগে বাস করতে থাকেন। লালবাগ, শহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত (বর্তমানে কমিশনারের বাসভবন-রূপে ব্যবহৃত হয়) উইলসনের Early Annals of the English in Bengal, ১ম খণ্ড, ৪ পৃঃ দ্রঃ।

১৩. কটকে 'বক্‌রাবাদ' নামক একটি মহল্লা এখনো আছে—সম্ভবতঃ বাকির খানের নামানুসারে এই মহল্লার নাম রাখা হয়েছিল।

১৪. উড়িষ্যার মানচিত্রে বলেশ্বরের নিকটস্থ 'তাহির মুণ্ডা' পাহাড় নামে চিহ্নিত স্থানটিকে ভুলক্রমে 'তিলগড়ি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৫. বইতে 'জোন' নামটি স্পষ্টতঃ ভুলক্রমে উল্লিখিত হয়েছে। বলেশ্বর অথবা উড়িষ্যায় এই নামের কোনো নদী আমি খুঁজে পাই নাই।

সম্ভবতঃ বলেশ্বরের নিকটবর্তী 'নুনিয়াজুড়ি' নদীকে এই (জোন) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বলেশ্বর বুড়াবালুং নদীর তীরে অবস্থিত।

১৬. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' (৪৯৭ পৃঃ) বিবৃত হয়েছে যে, মুরশিদ কুলি খান বলেশ্বর বন্দর অতিক্রম ক'রে ভালোয়ার মৌজায় নদীতীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। 'সিয়ারে' আরো বিবৃত হয়েছে যে, শিবিরের একদিকে গভীর জঙ্গল ও অন্যদিকে গভীর ক্ষুদ্র নদী ছিল। শিবিরের চারিদিকে কামান-শ্রেণী সাজানো হয়েছিল। আলীবর্দী খান মেদিনীপুর ও জলেশ্বর অতিক্রম ক'রে বুড়াবালুং নদীর উত্তর তীরে ঘাঁটি স্থাপন করেন। মুরশিদ কুলি খানের ঘাঁটি দুর্ভেদ্য ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর জামাতা মীর্জা বাকির আলী খান সুরক্ষিত স্থান ত্যাগ করতঃ হঠকারিতার সঙ্গে বেরিয়ে আক্রমণ না করলে এবং আফগান সেনাপতি আবিদ খান তার পুরাতন উপকারী প্রভু মুরশিদ কুলি খানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আলীবর্দী খানের আফগান-সেনাপতি মুস্তফা খানের সঙ্গে যোগ না দিলে মুরশিদ কুলিকে স্থানচ্যুত করা সম্ভব হোত না। ধূর্ত আলীবর্দী খান ঘুষ দিয়ে মুরশিদ কুলির আফগান-সৈন্যদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করেছিলেন ('সিয়ার', ৪৯৭ পৃঃ)।

১৭. শেখ সাদী—পারস্যের বিখ্যাত কবি ও নীতিবিদ।

১৮. পুস্তকে ভুলক্রমে 'সবোরেখা' লেখা হয়েছে। হবে সুবর্ণরেখা নদী —এই নদীতীরে জলেশ্বর অবস্থিত।

১৯. ময়ূরভঞ্জ বর্তমানে উড়িষ্যার কমিশনারের অধীনস্থ একটি করদ-মহল।

২০. অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে বাংলার রাজনীতিতে মুসলমান মহিলাদের কার্যকরী প্রভাবের এটি আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। উল্লেখ্য যে, শক্তির অভাবে মুরশিদ কুলি খান প্রথমে আলীবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তাঁর পত্নী দুর্দানা বেগম ভ্রাতা সরফরাজ খানের পতনের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁকে

যুদ্ধ করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন। দুর্দানা বেগম ভয় দেখিয়েছিলেন যে, যদি মুরশিদ কুলি খান যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেন তা'হলে তাঁর স্থানে জামাতা মীর্জা বাকির আলী খানকে গদিতে বসিয়ে আলীবর্দীর সঙ্গে যুদ্ধ করা হবে। অবশেষে স্ত্রীর প্রভাবের দরুন মুরশিদ কুলি খান আলীবর্দী খানের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার সংকল্প করেন ('সিয়ার-উল-মুতক্ষেরীন', ফার্সী সংস্করণ, ৪৯৬ পৃঃ)।

২১. তখনো (অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) ভারতের মুসলমান মহিলাগণ যে বর্তমানকালের পর্দাপ্রথা অবলম্বন করেন নাই, এটি তার আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। শান্তি ও যুদ্ধের সময় তাঁরাও যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন, এ থেকে তা প্রমাণিত হয়। উল্লেখ-যোগ্য যে, আলীবর্দী খান যখন মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধলিপ্ত ছিলেন, তখন তাঁর বেগম প্রধান কুটনৈতিকের ভূমিকা অবলম্বন করে-ছিলেন। 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' (ফার্সী সংস্করণ, ৫৫০ পৃঃ) বর্ণিত হয়েছে যে, পাটনায় রঘুজী ভোঁসলার অধীনস্থ মারাঠা-দের সঙ্গে যুদ্ধের সময় একদিন আলীবর্দী খান উৎকণ্ঠিতভাবে বেগমের খাসকামরায় (শিবিরে) প্রবেশ করেন। বেগমের প্রশ্নের উত্তরে আলীবর্দী বলেন যে, তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা করেন। তখন বেগম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজ দায়িত্বে শান্তির প্রস্তাবসহ রঘুজীর শিবিরে দূত প্রেরণ করেন। রঘুজী এই প্রস্তাবে সম্মত ছিলেন ; কিন্তু তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা মীর হবিব তাঁকে বারণ করেন এবং বিপুল লুণ্ঠনের আশা দেখিয়ে সোজা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করার পরামর্শ দেন। বেগম নিশ্চয়ই অত্যন্ত সুক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ মহিলা ছিলেন ; নতুবা এরূপ সংকটকালে তাঁর সুচতুর স্বামী তাঁর উপর নির্ভর করতেন না।

২২. মানিকচাঁদ (কলকাতা বিজয়ের পর সিরাজ-উদ-দৌলা যাকে সেখানকার গবর্নর নিযুক্ত করেছিলেন) অত্যন্ত ধূর্ত ও সুবিধাবাদী ছিলেন ; অবস্থানুযায়ী বিচক্ষণতার সাথে তিনি তাঁর আনুগত্য

প্রকাশ করতেন। মানিকচাঁদ পরবর্তীকালের নবকৃষ্ণের আর এক সংস্করণ ছিলেন। জনৈক লেখক সম্প্রতি নবকৃষ্ণ কর্তৃক ইংরেজদের বিপুল সাহায্য করার উচ্চপ্রসংসা করেছেন। কিন্তু নবকৃষ্ণও মানিকচাঁদের পদাংক অনুসরণ ক'রে নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য হাওয়া বুঝে কাজ করতেন। মানিকচাঁদের এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্বন্ধে 'সিয়ারে' কোনো উল্লেখ নাই। 'সিয়ারে'র বর্ণনানুযায়ী আফগান সেনাপতি আবিদ খানের বিশ্বাসঘাতকতা ও মীর্জা বাকির আলী খানের হঠকারী আক্রমণকেই মুরশিদ কুলি খানের বিপর্যয়ের কারণ বলা হয়েছে। বলেশ্বরের নিকটে এই যুদ্ধে বাঢ়্হার সৈয়দগণ মুর্শিদ কুলি খানের পক্ষে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে মীর আলী আকবর ও মীর মুজতাহা আলী প্রমুখ কয়েকজন নিহত হন ; এবং মীর্জা বাকির আলী খান নিজেও গুরুতররূপে আহত হয়েছিলেন ('সিয়ার', ৪৯৭ পৃঃ দ্রঃ)।

২৩. 'সিয়ারে' বর্ণিত হয়েছে যে, বলেশ্বরের যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুরশিদ কুলি খান জামাতা মীর্জা বাকির আলী ও ২/৩ হাজার সৈন্যসহ বলেশ্বর পশ্চাদ্গমন করেন। সৈন্যদের বিশ্বাসঘাতকতার আশংকা ক'রে প্রকাশ করেন যে, তিনি শহরেই সুরক্ষিত ঘাঁটি স্থাপন করবেন ও সৈন্যদের কিছুদূরে শহরে আসবার রাস্তাগুলো পাহারা দেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেন এবং তিনি (মুরশিদ কুলি) জামাতাকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্র-তীরের দিকে সরে যান। এই সময় দৈবক্রমে তাঁর বন্ধু সুরাটের বণিক হাজী মোহসিনের বাণিজ্য-জাহাজ ও একটি নৌকা বন্দরে বাঁধা ছিল। মুরশিদ কুলি তখন জামাতা বাকির আলী, হাজী মোহসিন ও কয়েকজন চাকরসহ উক্ত জাহাজে উঠে মসৌলিপটম চলে যান। মসৌলিপটম পৌঁছে দুর্দানা বেগম ও তাঁর কন্যাকে আনবার জন্য মীর্জা বাকির আলীকে কটক প্রেরণ করেন।

২৪. এই সময় বাদশাহ মুহম্মদ শাহের অধীনে নিজাম-উল-মুল্ক আসফ-জাহ্ দক্ষিণের ভাইসরয় ছিলেন। দিল্লী সরকারের দুর্বলতার জন্য তিনি অর্ধ-স্বাধীনভাবে শাসন করছিলেন।

২৫. বলেশ্বর অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময় মুরশিদ কুলি খান স্ত্রী দুর্দানা বেগম, পুত্র ইয়াহিয়া খান ও তাঁর মালমাত্তা কটকের বড়াহুবাটি দুর্গে রেখে গিয়েছিলেন।

২৬. এই রাজার নাম হাফিজ কাদির—তিনি একজন মুসলমান ছিলেন (পরবর্তী টীকা এবং 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ফার্সী সংস্করণ, ৪৯৮ পৃঃ দ্রঃ)।

২৭. সিকাকোল বা চিকাকোল গঞ্জম জেলার অন্তর্গত ও পুরীর দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত। পূর্বে স্থলপথে উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণে যেতে হলে সিকাকোল বা চিকাকোল হয়ে চিল্কা হ্রদ অতিক্রম করতে হোত। 'সিয়ারে' বিবৃত হয়েছে যে, মসৌলিপটম পৌঁছে মুরশিদ কুলি খান তাঁর জামাতা মীর্জা বাকির আলী খানকে দুর্দানা বেগম ও তাঁর কন্যাকে উদ্ধার করার জন্য সিকাকোল ও গঞ্জম অভিমুখে প্রেরণ করেন। ইতিমধ্যে, মুরশিদ কুলি খানের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে তাঁর বন্ধু খুর্দার অন্তর্গত রডিপুরের রাজা হাফিজ কাদির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাঁর সেনাপতি মুহম্মদ মুরাদকে একদল সৈন্যসহ দুর্দানা বেগম ও তাঁর কন্যাকে উদ্ধার করার জন্য প্রেরণ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হাফিজ কাদির জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন (ইংরেজী অনুবাদকের মন্তব্য: এটা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, একজন মুসলমান এক সময় একটি হিন্দু মন্দিরের প্রধান ছিলেন ('সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ৪৯৮ পৃঃ দ্রঃ)। মুরাদ সমস্ত মালমাত্তাসহ বেগম ও তাঁর কন্যাকে উদ্ধার ক'রে গঞ্জম জেলার ইক্ষাপুরে নিয়ে আসেন। ইক্ষাপুরের গবর্নর আনোয়ার-উদ-দীন খান তাঁদের সমাদরে গ্রহণ করেন। এই-সময় বাকির আলী খান ইক্ষাপুর পৌঁছান এবং বেগমের সমস্ত সম্পদসহ মসৌলিপটম নিয়ে যান। মুরশিদ কুলি খান সেখান থেকে মালমাত্তাসহ তাঁদের সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণে যান ও তথাকার শাসনকর্তা আসিফ জাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন (সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন, ফার্সী সংস্করণ, ৪৯৮ পৃঃ)।

২৮. বেগম ও তাঁদের মূল্যবান দ্রব্যাদি সম্পর্কে 'সিয়ারে' প্রদত্ত বিবরণ ও 'রিয়াজে'র বিবরণীর মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। 'রিয়াজে' বলা হয়েছে যে, বেগমদের মালমাত্তা আলীবর্দী খানের সৈন্যাধ্যক্ষগণ দখল করেছিল। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, বেগমদের পরিণতি সম্বন্ধে 'রিয়াজে' কোনো উল্লেখ নাই। স্পষ্টতঃ 'রিয়াজে' প্রদত্ত বিবরণ অসম্পূর্ণ; এবং 'সিয়ারে' প্রদত্ত বিবরণ সঙ্গতিপূর্ণ ও ব্যাপক হওয়ায় ইহাই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

২৯. 'সিয়ারে' প্রদত্ত বিবরণ 'রিয়াজ' অপেক্ষা কিছুটা ভিন্ন। 'সিয়ারে' বলা হয়েছে যে, ব্যয়সংকোচের জন্য সওলাত জং সৈন্যদের বেতন হ্রাস করতে চেয়েছিলেন। তজ্জন্য মুর্শিদাবাদের সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ রোষ প্রকাশ করে। ফলে তাদের দল ভেঙ্গে দেয়া হয়। উড়িষ্যার সৈন্যগণ কম বেতন নিতে স্বীকার করায় এদের বহুসংখ্যক লোককে সৈন্যদলে নেয়া হয়। পরে শাহ ইয়াহিয়ার প্ররোচণায় সওলাত জং লম্পট হয়ে পড়েন এবং কটকের স্ত্রী-পুরুষদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করেন। ফলে তারা অত্যন্ত বিরক্ত হয়। মীর্জা বাকির আলী তখন দক্ষিণে ছিলেন। কটকের এই অবস্থা অবগত হয়ে তিনি মুরশিদ কুলি খানকে উড়িষ্যা আক্রমণ করতে বলেন। মুরশিদ কুলিকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে মীর্জা বাকির আলী নিজেই উড়িষ্যা আক্রমণের ব্যবস্থা করেন। প্রথমে তিনি কটকের সৈন্যগণ ও অধিবাসীদের বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেন। এরা তখন সেনাপতি গুজর খানকে হত্যা করে। বাকির আলী তখন দ্রুত অগ্রসর হয়ে সওলাত জং ও তাঁর পরিবারবর্গকে বরাহবাটি দুর্গে বন্দী করেন ও নিজে উড়িষ্যার গদিতে বসেন ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ফার্সী সংস্করণ, ৫০২ পৃঃ)।

৩০. মুদ্রিত ফার্সী সংস্করণের সম্পাদক 'আফওয়াযে কটক' (افواج کٹک)-এর ওপর و (ওয়াও) অক্ষর বসিয়েছেন—যদি তিনি বলেন পাণ্ডুলিপিতে ژا শব্দটি আছে, তবে আমি মনে করি, و (ওয়াও) অক্ষর

থাকলে অর্থ বোধগম্য হয় না ; পরন্তু পাণ্ডুলিপির j। (আজ) ঠিক।
এইমতো আমি অনুবাদ করেছি।

৩১. সওলাত জং-কে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে আলীবর্দীর কটক অভিযানের বিবরণীর জন্য 'সিয়ার' (ফার্সী সংস্করণ, ৫০৩-৫০৫ পৃঃ দ্রঃ)। 'সিয়ারে' বলা হয়েছে যে, মীর্জা বাকির আলী দক্ষিণের আসিফ-জাহের নিকট সাহায্য পাচ্ছেন আশংকা ক'রে তিনি মুস্তফা খান, শামসের খান, উমর খান, আতাউল্লাহ খান, হায়দর আলী খান, ফকিরউল্লাহ বেগ খান, মীর জাফর, মীর শরফ-উদ-দীন, শেখ মুহম্মদ মাসুম, আমানত খান, মীর কাজিম খান ও বাহাদুর আলী খানের মতো বাছাই সেনাপতি ও সৈন্যাধ্যক্ষদের নেতৃত্বে কুড়ি হাজার সৈন্যের এক বাহিনীসহ অগ্রসর হয়ে কটক শহরের বিপরীত দিকে মহানদী নদীর উত্তর তীরে পৌঁছান। মীর্জা বাকির আলী উক্ত নদীর দক্ষিণ তীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। আলীবর্দীর বৃহৎ সৈন্যবাহিনী দেখে মীর্জা বাকির আলীর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করে। 'রিয়াজে'র বর্ণনা থেকে মনে হয় আলীবর্দীর সৈন্যগণ জোবরা ঘাটে নদী পার হয়ে দ্রুত কটক পৌঁছায় এবং সাদা কাপড়-ঘেরা ও সাদা সুতো দিয়ে বাঁধা এক রথের মধ্য থেকে সওলাত জং-কে উদ্ধার করে। নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে সওলাত জং-এর উদ্ধার একটা অলৌকিক বা বিস্ময়কর ঘটনা।

৩২. পুস্তকে উল্লিখিত 'ছাপরা' স্থানীয়ভাবে 'জোবরা' ঘাট নামে পরিচিত। কটক শহরের মধ্যস্থলে মহানদীতে এই ঘাট অবস্থিত। ঘাটের সন্নিকটে একটি সমাধিসৌধ আছে।

৩৩. পুস্তকে যেটাকে 'কামহারিয়া' নদী বলা হয়েছে, সেটা সম্ভবতঃ মুদ্রণে অথবা পাণ্ডুলিপি পঠনে ভুলের জন্য কটক থেকে ৪০ ক্রোশ দূরবর্তী জাজপুরের নিচে 'ধুমরা' নদীর পরিবর্তে উল্লিখিত হয়েছে।

৩৪. 'লালবাগ' কাটজুড়ি নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনারের বাসভবন। মহানদী-তীরস্থ বড়বাটি দুর্গের

পরিবর্তে মুসলমান গবর্নরগণ নিজেদের বাসের জন্য লালবাগ তৈরী করেছিলেন।

৩৫. ... ...

৩৬. ঘটনার বৃত্তান্ত পাঠ করলে মনে হয়, হাজী মৃতের ভান করছিলেন ও তিনি অত্যন্ত ধূর্ত ছিলেন। কারণ তিনি তাড়াতাড়ি উঠে অন্য লোকের ঘোড়ায় চড়ে পলায়ন করেছিলেন।

৩৭. মীর মুহম্মদ আমিন আলীবর্দী খানের সতাতো ভাই ছিলেন। মীর জাফর তাঁর আপন ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলেন। আলীবর্দী বা তাঁর পিতা সৈয়দ ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন মীর্জা। সুতরাং আলীবর্দীর সতাতো ভাই মুহম্মদ আমিন পিতার দিক থেকে সৈয়দ ছিলেন না; সম্ভবতঃ মাতার দিক থেকে সৈয়দ ছিলেন। মাতা সৈয়দ-কন্যা হলে মুসলমানদের মধ্যে 'সৈয়দ' উপাধি গ্রহণ করার সাধারণ ও অনুমোদিত প্রথা আছে।

৩৮. (হাজীর পলায়নে) মীর জাফর ও তাঁর সঙ্গীদের কৌতুক-বোধ থাকলে তাঁরা দুঃখিত না হয়ে প্রাণভ'রে হাসতেন।

৩৯. খুর্দার অন্তর্গত রতিপুরের রাজা ও জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক হাফিজ কাদিরের বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে (সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন, ফার্সী সংস্করণ, ৪৯৮ পৃঃ ও পূর্ববর্তী টীকা দ্রষ্টব্য)।

৪০. সৈন্যাধ্যক্ষগণের ছাপ দেয়া অর্থের উল্লেখ করা হচ্ছে ('আইন-ই-আকবরী', ১ম খণ্ড, ২৫৫ পৃঃ; ব্লকম্যান 'দাগ' শব্দের অনুবাদ করেছেন 'ছাপ দেয়ার বা দাগ দেয়ার বিধান')।

৪১. 'সিয়ারে' উল্লিখিত হয়েছে, শেখ মাসুমের নাম "শেখ মুহম্মদ মাসুম পানিপটি"। আলীবর্দীর আফগান সেনাপতি মুস্তফা খানের (যিনি এই সময় সকল বিষয়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন) সোপারেশ অনুসারে তাঁকে সওলাত জং-এর স্থলে উড়িষ্যার ডেপুটি গবর্নরের পদে নিযুক্ত করা হয়। শেখকে একজন প্রবীণ সাহসী সেনাপতিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ('সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ৫০৫ পৃঃ)।

৪২. আমাকে বলা হয়েছে "চোয়ারস্" শব্দটি ভুল; হবে "চোয়ান"।

এরা জাতিতে ক্ষত্রিয়। 'খান্দাইতরা'ও মিশ্র ক্ষত্রিয়।
এদের বিপুল সংখ্যায় দেখা যায়।

৪৩. এই কাহিনী থেকে দেখা যায়, বাংলারাজ্যের একজন অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন নেতা ও স্তম্ভ (মীর হবিব) অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে আলীবর্দী কর্তৃক তার (মীর হবিবের) প্রভু মুরশিদ কুলি খানকে উড়িষ্যার গদিচ্যুত করায় এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা ও জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা ক'রে বাংলার মসনদ মারাঠাদের অধীন করার উদ্দেশ্যে মারাঠা দস্যুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে-ছিলেন। এটা একটা শিক্ষণীয় কাহিনী এবং তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের বুদ্ধিগত ও নৈতিক অধঃপতনের একটা দৃষ্টান্ত।

৪৪. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' (ফার্সী সংস্করণ, ৫০৭ পৃঃ) বিবৃত হয়েছে যে, এই সময় উক্ত গ্রন্থের লেখকের পিতা সৈয়দ হেদায়েত আলী খান বিহারে মঘার ফৌজদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যখন রামগড়ের গিরিপথে এক অভিযান পরিচালনা করছিলেন, সেই-সময় রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে ৪০,০০০ মারাঠা অশ্বারোহী সৈন্য তড়িৎবেগে উক্ত গিরিপথ অতিক্রম করে এবং পাচিট ও ময়ূরভঞ্জ অতিক্রম ক'রে মেদিনীপুরের সীমান্তে পৌঁছায়। রঘুজী ভোঁসলা ('রিয়াজে'র মুদ্রিত ফার্সী সংস্করণে ভুলক্রমে রঘুজী 'ঘোসলা' মুদ্রিত হয়েছে) রাজা শাহুর ভ্রাতুষ্পুত্র ও বেরার সুবার 'মকসদার' (সম্ভবতঃ গবর্নর বা প্রধান) ছিলেন; তাঁর রাজধানী ছিল মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে।

৪৫. লক্ষণীয় যে, আলীবর্দীর বেগম বলেশ্বরের যুদ্ধে হস্তীপৃষ্ঠে স্বামীর পাশে ছিলেন। আবার বর্ধমানের নিকটে মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ও তিনি তাঁর স্বামীর পাশে ছিলেন। তিনি যে কেবল সাহসী মহিলা ছিলেন তাই নয়; পরন্তু, নিশ্চয়ই এমন জ্ঞানী ছিলেন যে, আলীবর্দী এইরূপ সংকটকালে তাঁকে নিজের পাশে রাখতেন। আমরা আরো দেখেছি যে, লৌহ-মানব আলীবর্দী বাংলার নিজা-মত অবৈধভাবে দখল করার পর নফিসা বেগমের নিকট ক্ষমা

প্রার্থনা করেছিলেন। এই সকল ঘটনা থেকে এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত হবে না যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বাংলার মুসলমান মহিলাগণ বর্তমানের তুলনায় স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করতেন, স্বামীদের কাজে ব্যাপকতর অংশ গ্রহণ করতেন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কল্যাণকর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতেন।

৪৬. মুসাহিব খান মোহ্‌মন্দ নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইনি মোহ্‌মন্দ গোষ্ঠীর লোক ছিলেন।

৪৭. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' (ফার্সী সংস্করণ, ৫০৭-৫১৩ পৃঃ) ১১৫৫ হিজরীতে মারাঠাদের প্রথম বাংলা আক্রমণের বিশদ বিবরণ ও যে সকল কারণে তা সম্ভব হয়েছিল সেগুলো বিবৃত হয়েছে। প্রথম কারণ, আসিফ জাহের প্ররোচণা ('রিয়াজ' অনুসারে মীর হবিব, এবং এটাই অধিকতর সম্ভব; কারণ, আসিফ জাহের মতো উন্নতমনা ব্যক্তির পক্ষে একটি মুসলমান রাজ্যের বিরুদ্ধে মারাঠাদের লেলিয়ে দেয়া সম্ভব নয়)। দ্বিতীয় কারণ, আলীবর্দী খানের আফগান-সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষগণের, বিশেষতঃ মুস্তফা খানের অসন্তোষ; কারণ, সওলাত জং-কে উদ্ধার করার জন্য কটক অভিযানের পর আলীবর্দী বহু আফগান-সৈন্যদলকে বিদায় করেছিলেন। তৃতীয় কারণ, আলীবর্দী কর্তৃক ময়ূরভঞ্জের রাজাকে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হত্যা করা; মুস্তফা খান রাজার পক্ষে সোপারেশ করেছিলেন। 'সিয়ারে' আরো বিবৃত হয়েছে যে, ভাস্কর পণ্ডিত ২৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ (৪০,০০০ ব'লে প্রকাশ করা হয়েছিল) যখন পাচিট হয়ে বর্ধমানের নিকটবর্তী হন, তখন আলীবর্দী খান মাত্র চার বা পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও চার বা পাঁচ হাজার পদাতিক সৈন্যসহ উড়িষ্যা থেকে ফেরবার পথে মেদিনীপুর পৌঁছেছিলেন; অবশিষ্ট সৈন্যদের তিনি সওলাত জং-এর সাথে মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আলীবর্দী খান এই অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বর্ধমান পৌঁছান। ভাস্কর পণ্ডিত আলীবর্দীর সাহসের (বা বীরত্বের) কথা শুনে প্রস্তাব করেন যে, তাঁকে আতিথ্যের ব্যয়স্বরূপ দশ লক্ষ

দিলে তিনি নিজ দেশে ফিরে যাবেন। আলীবর্দী ঘৃণার সাথে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুদিন মারাঠারা আলীবর্দীকে বেশ বিপন্ন করেছিল। অবশেষে আলীবর্দী খান দৌহিত্র-সিরাজ-উদ-দৌলাকে সঙ্গে নিয়ে আফগান প্রধান সেনাপতি মুস্তফা খানের নিকট যান ও তাঁকে হয় মারাঠাদের বিতাড়ণে সাহায্য করতে অথবা দৌহিত্রসহ তাঁকে হত্যা করতে বলেন। মুস্তফা খান তখন অন্য আফগান সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও সৈন্যদের নিয়ে বিপুল সংখ্যাধিক্য মারাঠাদের সঙ্গে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন। তাতে আলীবর্দী খান কাটোয়ায় পৌঁছাতে সক্ষম হন ও এখানে মুর্শিদাবাদ থেকে সওলাত জং-এর নেতৃত্বে খাদ্যদ্রব্য ও আরো সৈন্য আলীবর্দীর সঙ্গে যোগ দেয়। কাটোয়ায় মুস্তফা খান যুদ্ধে ভাস্কর পণ্ডিতকে শোচনীয়-রূপে পরাজিত করেন। তখন ভাস্কর পণ্ডিত বীরভূম হয়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা মীর হবিব লুণ্ঠন ও বাংলা বিজয়ের আশা দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে বীরভূম থেকে কাটোয়া ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

৪৮. টিপাড়া ও গঞ্জ মুহম্মদ খান স্থানগুলো মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে অবস্থিত ছিল মনে হয়।

৪৯. মুরাদ আলী খান সরফরাজ খানের ভগ্নী নফিসা বেগমের পুত্র ও পরে সরফরাজ খানের জামাতা হয়েছিলেন। সরফরাজ খানের আমলে তিনি জাহাঙ্গীরনগরের ডেপুটি গবর্নর ছিলেন।

৫০. দুলাব (দুর্লভ) রাম, পেশকার রাজা জানকীরামের পুত্র। মহবত জং তাঁকে আবদুর রসুল খানের স্থলে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেছিলেন। মারাঠারা যখন উড়িষ্যা আক্রমণ করে তখন দুলাব রাম চরম ভীরুতা দেখিয়েছিলেন। মারাঠারা তাকে বন্দী করেছিল এবং বিপুল পরিমাণ মুক্তি-পণ দিয়ে তিনি খালাস হন। তিনি অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় সন্ন্যাসীদের সংসর্গে কালাতিপাত করতেন—এই সন্ন্যাসীরা মারাঠাদের গোয়েন্দা

বলে প্রমাণিত হয়েছিল ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ফার্সী সংস্করণ, ৫৪৫ পৃঃ)।

৫১. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' বিবৃত হয়েছে যে, (ফার্সী সংস্করণ, ৫১৪ পৃঃ) আলীবর্দী খানের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মুহম্মদ ইয়ার খান এই সময় হুগলী বন্দরের গবর্নর ছিলেন। মীর আবুল হোসেন ও মীর আবুল কাসেমের সঙ্গে গবর্নরের ঘনিষ্ঠতা ছিল; এরাই মীর হবিবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে গবর্নরকে আশ্বাস দান করায় তিনি মীর হবিবকে দুর্গে প্রবেশ করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্বক হুগলী দখল করার পর মীর হবিব শিশ্‌রাও নামক জনৈক মারাঠাকে তথাকার গবর্নর পদে নিয়োগ করেন এবং বাংলায় মারাঠাদের কার্য পরিচালনায় প্রধান প্রশাসকের ভূমিকা গ্রহণ ক'রে কখনো হুগলী ও কখনো কাটোয়ায় থাকতেন।

৫২. এর অর্থ এই যে, গঙ্গার পশ্চিমাঞ্চল (অর্থাৎ দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গ) থেকে সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা বাস্তত্যাগ করেন এবং পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে (অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে) মারাঠাদের হামলা না থাকায় তথায় বসবাস করতে থাকেন। যারা পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে মুসলমানদের তুলনামূলক সংখ্যাধিক্য সম্বন্ধে সব কাল্পনিক মতবাদ প্রকাশ করেন, তাদের উক্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করতে বলি এবং সমকালীন ইতি-হাস 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে'র বিবরণীর সারাংশ তাদের বিবে-চনার জন্য নিম্নে উল্লেখ করছি। 'সিয়ারে' বিবৃত হয়েছে যে, বাংলায় মারাঠা আক্রমণের ঢেউয়ের সামনে বর্ধমান, মেদিনীপুর, বলেশ্বর, কটক ও বীরভূম চাকলাসমূহ এবং রাজশাহীর কতক-গুলো পরগণা (সম্ভবতঃ নদীর দক্ষিণ দিকে), আকবরনগর (রাজ-মহল) সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছিল; কেবল মুর্শিদাবাদ ও গঙ্গার অপর দিকের অঞ্চলগুলো (অর্থাৎ, পূর্ব ও উত্তর দিকের অঞ্চল) শান্তিপূর্ণভাবে আলীবর্দী খানের অধিকারে ছিল। এমনকি বর্ষা-কালে মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা মারাঠা হামলার আশংকায় গঙ্গার অপর পারে (অর্থাৎ পূর্ব ও উত্তর দিকে)—যথা, জাহাঙ্গীর-

নগর বা ঢাকা, মালদহ, রামপুর-বোয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানে দলে দলে চলে যেতো। আলীবর্দী খানের জামাতা নওয়াব সাহামত জংও সপরিবারে গঙ্গা বা পদ্মার উত্তর তীরে রামপুর-বোয়ালিয়ার সন্নিকটে গোদাগাড়ি চলে গিয়েছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা পূর্ব অথবা উত্তরবঙ্গের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলার মুসলমান রাজধানী মুর্শিদাবাদের সন্নিকট পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় (সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন, ফার্সী সংস্করণ, ৫১৪ ও ৫৬৪ পৃঃ)।

৫৩. কাটোয়ায় মারাঠাদের পরাজয় হয়েছিল ১১৫৫ হিজরীতে। 'সিয়ারে' বিবৃত হয়েছে যে, কাটোয়ার পরাজয়ের পর মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত পাচিটের গিরিপথ দিয়ে জঙ্গলে পলায়ন করেন; কিন্তু পথ হারিয়ে নিজ দেশ নাগপুরে যেতে পারেন নাই। মীর হবিবের পরিচালনায় তিনি আবার বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে চন্দ্রকোনার জঙ্গল অতিক্রম ক'রে মেদিনীপুর পৌঁছান ও সেখান থেকে কটক গিয়ে উড়িষ্যার সুবাদার শেখ মাসুমকে যুদ্ধে হত্যা করেন। মহবত জং চিল্কা হ্রদের সীমা পর্যন্ত ভাস্কর পণ্ডিতকে তাড়িয়ে নিয়ে যান। কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত দক্ষিণে পশ্চাদগমন করতে সক্ষম হন। মহবত জং কটক ফিরে এসে শেখ মাসুমের ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল নবী খানকে উড়িষ্যার সুবাদার ও রাজা জানকীরামের পুত্র দুলাব রামকে তাঁর পেশকার নিযুক্ত ক'রে মুর্শিদাবাদ ফিরে আসেন (সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন, ফার্সী সংস্করণ, ৫১৯ পৃঃ)।

কটকের প্রায় ১১ মাইল উত্তরে মাসুমপুর নামক একটি গ্রাম আছে। এটি সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বাসস্থান। সম্ভবতঃ শেখ মাসুম পানিপত্তির নামানুসারে এই গ্রামের নাম হয়েছে। মাসুমপুর থেকে ছ'মাইল দূরে সালিহ্‌পুর নামক একটি গ্রাম আছে। এটিও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের বাসস্থান।

৫৪. আরবী বাক্যটি হচ্ছে :

'ইজা যা' আল-কদর বত্‌লুলবসর।'

৫৫. 'সিয়ারে' (৫৯২ পৃঃ) মাদারন ভাগিরথীর তীরে অবস্থিত বলা হয়েছে। ধূর্ত আলীবর্দী খান কিভাবে ভাস্কর পণ্ডিত ও অন্য মারাঠা সেনাপতিদের ফুসলিয়ে নিজ শিবিরে এনেছিলেন, উক্ত বিবরণ দেয়া আছে। এই বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে আলীবর্দীর প্রধান সহায়ক ছিলেন মুস্তফা খান ও রাজা জানকীরাম পেশকার। অবিশ্যি, বলতে হয়, মারাঠারাও তাদের নিজের অস্ত্রেই ঘায়েল হয়েছিল।

৫৬. 'সিয়ারে' (৫৩০ পৃঃ) লিখিত আছে, 'দুশমনদের হত্যা কর'।

৫৭. এই মারাঠা সেনাপতির নাম 'রঘুজী গয়েকয়াড়' ('সিয়ার', ৫৩১ পৃঃ)। মুস্তফা খান তাকেও শিবিরের মধ্যে ফুসলিয়ে আনবার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মারাঠা সেনাপতি অসাধারণ ধূর্ত ছিলেন বলে মনে হয়। তিনি বলেছিলেন, ভাস্কর পণ্ডিত ও আলী ভাই আলীবর্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে ফিরে আসবার পরে পরদিন সকালে তিনি আলীবর্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন।

৫৮. মুদ্রিত ফার্সী সংস্করণে 'দিক্‌নগর'—এই স্থানের অবস্থিতি আমি নির্দিষ্ট করতে পারি নাই।

৫৯. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' (৫৪৫-৫৪৮ পৃঃ) রঘুজী ভেঁাসলা কর্তৃক দ্বিতীয়বার মারাঠা আক্রমণের পরিষ্কার বিবরণ দেয়া আছ। দেখা যায়, এই সময় বাংলা সুবায় কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হওয়ায় দ্বিতীয় মারাঠা আক্রমণ সম্ভব হয়েছিল। প্রথমতঃ, আফগান প্রধান সেনাপতি ও আলীবর্দীর রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ মুস্তফা খানের সঙ্গে তাঁর বিরোধ হয় এবং আলীবর্দীর জামাতা আজিমাবাদের (পাটনার) সুবাদার জয়েন-উদ-দীন খানের সঙ্গে মুস্তফা খানের যুদ্ধ চলছিল। মীর হবিবের মতো মুস্তফা খানও রঘুজী ভেঁাসলাকে বাংলা আক্রমণের জন্য অস্বাভাবিক আমন্ত্রণ জানান এবং রঘুজী আলীবর্দীর আপোষহীন শত্রু ও মারাঠাদের

উৎসাহদাতা মীর হবিব দ্রুত কটক অভিমুখে অগ্রসর হন। এই সময় কটকের রাজা জানকীরামের পুত্র ভীরু দুলাব রাম উড়িষ্যায় আলীবর্দীর সুবাদার ছিলেন। আবদুর রসুল খানের পুত্র প্রাক্তন সুবাদার আবদুল নবি খান পদত্যাগ ক'রে মুস্তফা খানের সঙ্গে যোগদান করায় আলীবর্দী দুলাব রামকে উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিযুক্ত করেছিলেন। দুলাব রাম ভীরু, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও সম্ভবতঃ বিশ্বাসঘাতক ছিলেন (পরবর্তীকালে আলীবর্দীর দৌহিত্রের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়)। কটকে তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশতেন। এদের অনেকে রঘুজী ভোঁসলার গুপ্তচর ছিল। মারাঠাদের অগ্রগমনের সংবাদ শুনেই দুলাব রাম পলায়নের চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি ধৃত হন। এই সময় মীর আবদুল আজিজের নেতৃত্বে সৈয়দদের ক্ষুদ্র একটি দল বীরত্বের সঙ্গে বড়বাটি দুর্গ রক্ষার জন্য প্রায় একমাস কাল মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ করে। অবরুদ্ধ এই ক্ষুদ্র দলটির বীরত্ব ও অটল আনুগত্যের দরুন তৎকালীন নৈতিক অবনতির অন্ধকারে আলোরেখা দেখা যায়। রঘুজী ভোঁসলার বন্ধু মীর হবিবের স্তোকবাক্য ও ভীতিপ্রদর্শন এবং দুলাব রাম ও তাঁর নিজের ভ্রাতার অনুরোধের উত্তরে মীর আবদুল আজিজ এই বীরত্বপূর্ণ জওয়াব দিয়েছিলেন: "আমার কোনো ভাই নাই, অথবা অন্য কোনো প্রভু নাই। আমি একমাত্র মহবত জং-কে আমার প্রভুরূপে স্বীকার করি। জনকতক কাপুরুষ তোমাদের দলে যোগ দিয়েছে; কিন্তু আল্লার কসম, আমি যে নুন খেয়েছি তার মর্যাদা রক্ষার জন্য যতক্ষণ আমার শ্বাস থাকবে ততক্ষণ আমি দুর্গ আঁকড়ে থাকবো" ('সিয়ার', ৫৪৬ পৃঃ দ্রঃ)। কিন্তু একমাস অতীত হওয়ার পরেও কোনো সাহায্য না আসায় ও খাদ্যসামগ্রী নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় অবরুদ্ধ বিপর্যস্ত সৈন্যদল সম্মানজনক শর্তে আত্মসমর্পণ করে। রঘুজী ভোঁসলা বড়বাটি দুর্গ, সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ এবং মেদিনীপুর, হুগলী ও বর্ধমানের অধিকারী হন। আলীবর্দী এই সময় মুস্তফা খানের বিদ্রোহ দমনের জন্য পাটনায় ব্যস্ত ছিলেন।

মুস্তফা খান নিহত ও আফগান-বিদ্রোহ দমনের পর আলীবর্দী দ্রুত বাংলায় ফিরে আসেন। এই সময় রঘুজী বীরভূমে শিবির স্থাপন করেছিলেন। মৃত মুস্তফা খানের আফগান সহযোগীগণ তখন টিকারির জঙ্গলে মরণ-ফাঁদে অবরুদ্ধ ছিল; তারা রঘুজীর সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি দ্রুত তাদের উদ্ধারের জন্য বীরভূম ও খড়্গপুরের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথিমধ্যে লুঠ করতে করতে টিকারির দিকে অগ্রসর হন। মহবত জং দ্রুত তার পশ্চাদ্ধাবন ক'রে পাটনা পৌঁছান। মীর হবিবের পরামর্শ মতো পাটনা থেকে রঘুজী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন। আলীবর্দী নিরলসভাবে অতি দ্রুত তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। কাটোয়ায় আর একটি যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয়। জয় অসম্ভব বিবেচনা ক'রে ও স্বদেশে গোলযোগ উপস্থিত হওয়ার সংবাদ পেয়ে রঘুজী নাগপুর ফিরে যান। কিন্তু বন্ধু ও পরামর্শদাতা মীর হবিবকে ৩০০০ মারাঠা ও ৫০০০ আফগান সৈন্য দিয়ে বাংলায় রেখে যান ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ফার্সী সংস্করণ, ৫৫১ পৃঃ)। এই সময় দেশে এমনই ঘৃণ্য নৈতিক অধঃপতন হয়েছিল যে, ধর্মীয় বন্ধন অথবা জাতীয় মনোভাবের কোনোই চিহ্ন ছিল না। দেখা যাচ্ছে, এই সময় মুসলমান-আফগানেরা মীর হবিব ও মুস্তফা খানের (দু'জন মুসলমানের) নেতৃত্বে বাংলার মুসলমান রাজ্যের বিরুদ্ধে হিন্দু মারাঠা দস্যুদের সমর্থন করছিল। এই ঘটনা বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসের এক অন্ধকার অধ্যায় এবং বাংলা তথা ভারতের মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতা ও নৈতিক অসাড়তার পরিচয় দেয় ('সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ৫৫৬-৫৬৬ পৃঃ)।

৬০. বাদশাহ মুহম্মদ শাহ দক্ষিণের বাশদাহী বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ও বুরহান-উল-মুলুকের জামাতা অযোধ্যার সুবাদার সফদর জং-কে রঘুজী ভোঁসলার মারাঠাদের বিরুদ্ধে আলীবর্দীকে সাহায্য করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। বাদশাহী সাহায্য প্রার্থনা করার সময় আলীবর্দী নিম্নোক্ত উল্লেখ্য ও ভবিষ্যদ্বাণীপূর্ণ কথাগুলো

বাদশাহকে লিখেছিলেন : "বাদশাহীর প্রধান অর্থনৈতিক স্তম্ভ বাংলার পতন হলে মহামান্য বাদশাহের সাম্রাজ্যের আর কোনো জাঁকজমক থাকবে না" ('সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ৫১৬ পৃঃ)। এই কথাগুলো থেকে বুঝা যায়, পূর্বাপর বাংলাই ছিল সাম্রাজ্যের কামধেনু। সফদর জং-এর সঙ্গে আলীবর্দীর বনিবনাও না হওয়ায় তাঁকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। সুচতুর আলীবর্দী এদিকে বালাজী রাওয়ের অভিপ্রায় সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে সৌজন্যের সাথে তাঁকে বাংলা থেকে বিদায় করেন ('সিয়ার', ৫২২ ও ৫২৪ পৃঃ)। এই প্রসঙ্গে 'সিয়ারে' (৫২৪ পৃঃ) ভাগলপুরের মুহম্মদ গওস খানের পত্নী এক বীরাঙ্গনার উল্লেখ করেছেন ; ইনি বীরত্বের সাথে বালাজী রাওয়ের আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন।

৬১. দুলাব রামের পূর্বে আবদুর-রসুল খান উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। (পূর্বের টীকা দ্রষ্টব্য)।

৬২. সমস্ত ব্যাপারটি জয়েন-উদ-দীন খানের সুপরিকল্পিত কৌশলপূর্ণ পন্থা বলে মনে হয়। তিনি একজন দক্ষ সেনাপতি ছিলেন।

৬৩. 'আইন-ই-আকবরী'তে জগদীশপুরের উল্লেখ আছে (ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৪০০ ও ৪৯৮ পৃঃ)। এই স্থান আকবরের আমলে বিহারের তৎকালীন সর্ববৃহৎ জমিদার 'রাজা গজপতি' বা 'কার্চাইতের' সুরক্ষিত অবস্থিতি-স্থান ছিল। রাজত্বের ষোড়শবর্ষে আকবরের সেনাপতি শাহবাজ খান-ই-কম্বু জগদীশপুর আক্রমণ করেন ; রাজা পলায়ন করেন ; শাহবাজ খান জগদীশপুর অধিকার করেন ও রাজার সমগ্র পরিবারবর্গকে বন্দী করেন। গজপতির পুত্র শ্রীরামের দখলভুক্ত শেরগড়ও শাহবাজ অধিকার করেন। প্রায় এই সময় তিনি রোটাস দুর্গ অধিকার করেন।

৬৪. 'রিয়াজে'র ফার্সী সংস্করণে, সর্বত্র রঘুজী ভোঁসলার পরিবর্তে 'রঘুজী ঘোস্‌লা' আছে।

৬৫. রঘুজী ভোঁসলার পুত্র জানোজী কর্তৃক তৃতীয়বার মারাঠাদের বংলা আক্রমণের বিবরণী 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' (ফার্সী

সংস্করণ, ৫৫৫-৫৯২ পৃঃ) বিবৃত হয়েছে। অবিশ্যি এবারও প্রধান পরামর্শদাতা মীর হবিব তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জানোজী কটক পৌঁছান। এই সময় আলীবর্দী কর্তৃক নিয়োজিত উড়িষ্যার নতুন ডেপুটি সুবাদার মীর জাফর পথিমধ্যে মেদিনীপুর ছিলেন। মারাঠা আক্রমণের সংবাদ শুনে মীর জাফর (ইনি গোপনে আলীবর্দীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিলেন) বর্ধমানে পশ্চাদগমন করেন। মারাঠারা বর্ধমান পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কয়েকটি অমীমাংসিত যুদ্ধের পর জানোজী মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হন ও আশেপাশে লুঠপাট ক'রে মেদিনীপুর ফিরে যান। আলীবর্দী তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। ইতিমধ্যে জানোজীর প্রধান পরামর্শদাতা মীর হবিব মৃত মুস্তফা খানের দ্বারভাঙ্গাস্থ আফগান-সমর্থকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আলোচনা আরম্ভ করেন। পাটনার সুবাদার জয়েন-উদ-দীন খানকে এরা এক দরবারে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হত্যা করে। এবার মীর হবিবসহ জানোজী পাটনায় যান; আলীবর্দীও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেন। রাঢ়ের নিকটে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে মিলিত মারাঠা ও আফগান বাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত ক'রে আলীবর্দী সৈনাপত্যের চরম দক্ষতা প্রদর্শন করেন (এই প্রচণ্ড যুদ্ধের বিবরণীর জন্য 'সিয়ার', ৫৬৬ পৃঃ দ্রঃ)। মাতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জানোজী নাগপুর ফিরে যান। কিছুসংখ্যক মারাঠা ও আফগান-সৈন্যসহ মীর হবিবকে কটক ও মেদিনীপুরে রেখে যান ('সিয়ার', ৫৭৬ পৃঃ)। অল্পদিন পরে মীর হবিবের সাহায্যের জন্য জানোজী তাঁর ভ্রাতা মানোজীর নেতৃত্বে একটি মারাঠা সৈন্যদল প্রেরণ করেন (পুস্তকে ভুলক্রমে মানোজীর পরিবর্তে মোহন সিং উল্লিখিত হয়েছে)। আলীবর্দী মুর্শিদাবাদ থেকে কাটোয়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, ভদ্রক ও জাজপুর দিয়ে অগ্রসর হন। আফগান সৈন্যগণ মেদিনীপুর থেকে কটকের দিকে পশ্চাদগমন করে। আলীবর্দী পুনরায় কটকে প্রবেশ করেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ সেরন্দাজ খান, সৈয়দ নূর ও ধরম দাশকে হত্যা ক'রে বড়বাটি দুর্গ পুনরাধিকার করেন

('সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ৫৭৮ পৃঃ)। কিন্তু এই দুর্গ পুনরাধিকার নিতান্ত অস্থায়ী প্রমাণিত হয়েছিল। আলীবর্দী মুর্শিদাবাদ ফেরার পথে বলেশ্বরে ছিলেন, সেইসময় মীর হবিব মারাঠা ও আফগান-সৈন্যদের নিয়ে অতর্কিতে কটক আক্রমণ করেন ও আলী-বর্দীর ডেপুটি গবর্নর শেখ আবদুস সোবহানকে হত্যা করেন ('সিয়ার', ৫৭৬-৫৮০ পৃঃ ; 'সিয়ারে' কটক শহরের একটি উত্তম বর্ণনা পাওয়া যায়)। হাল্কাভাবে মারাঠা অশ্বারোহীরা সর্বদা চলতো ; কিন্তু আলীবর্দীর সৈন্যরা এভাবে চলতো না। যদিও সৈনাপত্যের দিক দিয়ে তৎকালে আলীবর্দী কেবল আসফজাহের নিচে ছিলেন, তথাপি বুয়র যুদ্ধে ইংরেজদের যেমন, তেমনি মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে আলীবর্দীকেও অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত আলীবর্দী অবশ্য জয়ী হয়েছিলেন ; কিন্তু তজ্জন্য তাঁকে বিপুল মূল্য দিতে হয়েছিল এবং বিজয়ের সুবিধা ভোগ করার জন্য তিনি অধিকদিন জীবিত ছিলেন না।

৬৬. আহসান কুলি খান—পুস্তকের আগের দিকের একাংশে এঁকে "হোসেন কুলি খান" নামে উল্লেখ করা হয়েছে ও এটাই ঠিক মনে হয় ('সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৪৯৫ পৃঃ)। হোসেন কুলি খান আলীবর্দী খানের জামাতা চাক্‌লা জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), সিলহট ও চিটাগাং-এর গবর্নর নওয়াজেশ মুহম্মদ খানের ডেপুটি ছিলেন।

৬৭. নওয়াজেশ মুহম্মদ খান জাহাঙ্গীরপুরের গবর্নর ছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি আলীবর্দী খানের অধীনে বাংলার প্রধান দেওয়ান ছিলেন এবং (শুজাউদ্দীনের ডেপুটি দেওয়ান আলমচাঁদের পেশকার) চীন রায় ডেপুটি দেওয়ান ছিলেন ('সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৪৯৫ পৃঃ)। পূর্বের টীকা দ্রষ্টব্য। চীন রায়ের মৃত্যুর পর ভিরুন দত্ত তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তারপর কিরতচাঁদ (আলম-চাঁদের পুত্র) ও উমেদ রায় ('সিয়ার' দ্রঃ)।

৬৮. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে'র (৫৬৬ পৃঃ) বিবরণী থেকে দেখা যায়,

মৃত মুস্তফা খানের সমর্থকগণ মীর হবিবের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং তাঁরই প্ররোচণায় পাটনার মর্মন্তুদ ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়।

'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে (ফার্সী সংস্করণ, ৫৫৯ পৃঃ)। আলীবর্দী খানের জামাতা পাটনার সুবাদার জয়েন-উদ-দীন খান কর্তৃক মৃত মুস্তফা খানের সমর্থক ও সহযোগী দ্বারভাঙ্গাস্থ আফগান সেনাপতিদের অভ্যর্থনার জন্য দরবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দরবার প্রায় সমাপ্তির পূর্বে জয়েন-উদ-দীন খান প্রধান আফগান সেনাপতিদের স্বহস্তে পান দিচ্ছিলেন। আবদুর রশিদ খান নামক আফগানদের সেনাপতি পান নেয়ার সময় বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক জয়েন-উদ-দীনকে পেটে ছোরা দিয়ে আঘাত করে। কিন্তু আবদুর রশিদের হাত কেঁপে উঠায় এই আঘাত সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় নাই। তখন মুরাদ শের খান নামক আর একজন কাপুরুষ হত্যাকারী জয়েন-উদ-দীন খানকে দ্রুত তরবারি দ্বারা আঘাত করায় তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। জয়েন-উদ-দীনের পরিবারের মহিলাদের ও সন্তানদের সাথে আফগানরা বর্বরোচিত ব্যবহার করে। এই সময় আহমদ শাহ আবদালী কর্তৃক ভারত আক্রমণ আরম্ভের বিষয় 'সিয়ারে' উল্লেখিত হয়েছে (৫৬১ পৃঃ)।

৬৯. তাঁর নাম আমেনা বেগম। তিনি আলীবর্দীর কন্যা ও জয়েন-উদ-দীনের স্ত্রী।

৭০. উপকারী-প্রভু শুজাউদ্দীন খানের স্মৃতি ও তাঁর পুত্র নওয়াব সর-ফরাজ খানের প্রতি হীন বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল হাজী পেয়েছিলেন।

৭১. এই লুণ্ঠন ও হত্যার বিবরণীর জন্য 'সিয়ার' (৫৬০-৫৬১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের এই ঘটনা থেকে উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের তুলনায় বিহারে মুসলমানদের সংখ্যাল্পতার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে কখনো এরূপ পাইকারী নরহত্যা হয়েছিল; অথবা কদাচিৎ হয়েছে। এই অঞ্চলগুলো মারাঠাদের

আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকায় পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গ এবং বিহার থেকে বাস্তুহারাগণ স্বাভাবিকভাবেই এখানে আশ্রয় নিয়েছিল।

৭২. 'সিয়ারে' (ফার্সী সংস্করণ, ৫৬৩ পৃঃ) বিবৃত হয়েছে যে, এই সময় মীর হবিব ও জানোজীর মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য আলীবর্দী খান আমানিগঞ্জে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এমন সময় শিবিরে আলীবর্দী খান জামাতার হত্যা এবং ভ্রাতা, কন্যা ও দৌহিত্রদের বন্দী হওয়ার সংবাদ পান। তিনি সেনাপতি ও কর্মচারীদের দরবারে আহ্বান করেন ও দুঃখের সাথে এই বিপর্যয়ের সংবাদ প্রকাশ করেন ও বলেনঃ "আমার উপর একটি পাথর পড়েছে এবং সেটি অত্যন্ত গুরুভার। আমার জামাতা নিহত হয়েছে ; আমার ভ্রাতা ও সন্তানসন্ততি হীন বন্দীদশায় আছে। আমার নিকট এখন জীবনের কোনোই মূল্য নেই। আমি এখন হত্যা করতে ও নিহত হতে চাই। ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের অভিপ্রায় কি? আপনারা আমার সাথী ও বন্ধু—আপনাদের মধ্যে কা'রা আমার প্রতিশোধ গ্রহণের অভিযানে যোগ দিতে চান?" উপস্থিত সকলে সানন্দে আলীবর্দী খানের আবেদনে সম্মত হন এবং যুদ্ধ করতে ও তাঁর সঙ্গে নিহত হওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেন।

৭৩. 'সিয়ারে'র বৃত্তান্ত থেকে দেখা যায় (৫৬৫ পৃঃ), মীর হবিব ও তার বন্ধুরা চম্পানগরের নদীতে আলীবর্দীকে বাধা দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করার পর জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে। আলীবর্দী মুঙ্গের দুর্গে গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করেন। তারপর টিকারির জমিদার রাজা সুন্দর সিং ও তিরহুতের জমিদার কামগার খান মুইন এসে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। মওলানা মীর মুহম্মদ আলী নামক জনৈক আউলিয়া এই সময় মুঙ্গেরে আলীবর্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন।

৭৪. 'সিয়ারে' (৫৬৭ পৃঃ) এই যুদ্ধের বিশদ বৃত্তান্ত দেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, আলীবর্দী খান ঘাটের সম্মুখে একটি

দ্বীপে সৈন্য সমাবেশ করেন। তাঁর একদিকে ছিল গঙ্গা নদী, অন্যদিকে গঙ্গার একটি শুক্‌নো শাখা। 'সিয়ারে' এই স্থানের নাম 'সরাইরানী' বলা হয়েছে। রাঢ়ের চারি ক্রোশ পশ্চিমে, গঙ্গা নদীর ধারে স্থানটি অবস্থিত।

'সিয়ারে'র (৫৬৬ পৃঃ) বর্ণনা থেকে দেখা যায়, মীর হবিব ও মারাঠারা আলীবর্দী খানকে আক্রমণের পন্থা সমন্বয়ের জন্য বিদ্রোহী আফগান শামশের খান ও সরদার খানের সঙ্গে পরামর্শ করেছিল। আফগানেরা ও মীর হবিবের নেতৃত্বে মারাঠারা এবার যুক্তভাবে আলীবর্দী খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; কিন্তু আলীবর্দী খানের দক্ষতর সৈনাপত্যের দরুন তারা শোচনীয়রূপে পরাজিত হয় ('সিয়ার', ৫৫৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৭৫. শামশের খান ও অন্য আফগানদের নারী ও সন্তানদের সঙ্গে সম্মান-জনক ব্যবহার ক'রে আলীবর্দী খান প্রশংসনীয় কাজ করেছিলেন। উদারভাবে তিনি তাদের কেবল যে ক্ষমা করেছিলেন তাই নয়, পরন্তু তাদের মুক্তি দেন ও তাদের ভরণপোষণের জন্য দ্বারভাঙ্গায় সম্পত্তি বরাদ্দ করেন ('সিয়ার', ৫৭০ পৃঃ)। আফগান মহিলাদের সম্বন্ধে 'বিবি' ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ তিনি ব্যবহার করতেন না। শামশের খান ও অন্য আফগানদের ব্যবহারে তীব্র উত্তেজনার কারণ থাকা সত্ত্বেও আলীবর্দী খান আফগান মহিলাদের পর্দা বা সম্মান সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করেছিলেন। নারীদের প্রতি তাঁর বীরোচিত আচরণ ও বিজয়ের পর ক্ষমা প্রদর্শন সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হয়ে যদি তিনি কৃতজ্ঞতার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন না করতেন ও অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় না নিতেন, তা'হলে তাঁকে একজন মহান ও অসাধারণ ব্যক্তিরূপে গণ্য করা যেতো।

৭৬. খান বাহাদুর—এঁ'র নাম ছিল ফখর-উদ-দীন হোসেন খান। পূর্নিয়ার ফৌজদার পদে তিনি তাঁর পিতা নওয়াব সয়েফ খানের

উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। আলীবর্দী খান তাঁকে বরখাস্ত করেন ও কিছুদিন প্রহরাধীনে মুর্শিদাবাদে রেখেছিলেন। মীর হবিব ও মারাঠাদের সাহায্যে তিনি দিল্লী পলায়ন করেন ও অল্পদিন পরে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ফার্সী সংস্করণ, ৫৮২ পৃঃ)।

৭৭. আতাউল্লাহ্ খান—আলীবর্দীর ভ্রাতা হাজী আহমদের জামাতা। আলীবর্দীর আমলে তিনি রাজমহল বা আকবরনগরের ফৌজদার ছিলেন।

৭৮. বাদশাহ মুহাম্মদ শাহ্ সফদর জং-কে অযোধ্যার সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। বাদশাহ আহমদ শাহের আমলে কমর-উদ-দীন খানের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এই সময় আহমদ শাহ আবদালী কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেন। ফররোখাবাদ ও মুরাদাবাদের রোহিলা-আফগানগণ এই সময় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজা নুল রায় নামক জনৈক কায়স্থকে সফদর জং অযোধ্যায় ডেপুটিরূপে নিযুক্ত করেন (সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন, ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৮৭৪, ৮৭৫ পৃঃ)।

৭৯. রাজা নুল রায় জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। প্রথমে তিনি নওয়াব উজীর সফদর জং-এর অধীনে একজন সামান্য কর্মচারী ছিলেন এবং পরে তাঁর অধীনে অযোধ্যার ডেপুটি সুবাদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। রোহিলাদের ঘাঁটি ফররোখাবাদ থেকে ২০ ক্রোশ দূরে কনৌজে তিনি বাস করতেন। নুল রায় ফররোখাবাদের রোহিলাদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করায় তারা তাঁকে হত্যা করে। হাজী আহমদের জামাতা আতাউল্লাহ্ খান এই যুদ্ধে নুল রায়ের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তিনিও নিহত হন। নওয়াব উজীর সফদর জং তাঁর ডেপুটি নুল রায়ের সাহায্যার্থে যে সৈন্যদল পাঠিয়েছিলেন, তারাও রোহিলাদের দ্বারা পরাজিত হয় (সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন, ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৮৭৬ পৃঃ)।

৮০. বড়বাটি দুর্গ অধিকারের বিবরণীর জন্য 'সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ২য়

খণ্ড, ৫৭৮ পৃঃ দ্রঃ।

৮১. মীর হবিব, যিনি প্রায় এক যুগেরও অধিক কাল মারাঠাদের পরিচালক, বন্ধু ও পরামর্শদাতা ছিলেন। রঘুজী ভোঁসলার পুত্র জানোজী অবশেষে তাঁকে হত্যা করেছিলেন। সূচনায় তাঁর অভিপ্রায় যতই নির্দোষ হোক না কেন, শেষে সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও জাতীয় বন্ধন ছিন্ন ক'রে সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন হয়ে মারাঠা দস্যুদের সঙ্গে যোগদান করায়, যোগ্য প্রতিফল যে তিনি পেয়েছিলেন, একথা অস্বীকার করা যায় না। ১১৬৬ হিজরীতে তাঁকে ফুসলিয়ে জানোজীর বাড়ী নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার সাথে হত্যা করার বিবরণ 'সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৫৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে। 'সিয়ারে' (৫৯২ পৃঃ) আরো বলা হয়েছে, মহবত জং ও মারাঠাদের মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর মহবত জং-এর পক্ষে মীর হবিব উড়িষ্যার গবর্নররূপে শাসন করেছিলেন এবং জনৈক মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে একদল মারাঠা সৈন্য কটকে রাখা হয়েছিল। মীর হবিবের পরে মসলিহ্-উদ-দীন মুহম্মদ খান উড়িষ্যার গবর্নর হয়েছিলেন; কিন্তু তিনি নিজেকে মারাঠাদের কর্মচারী মনে করতেন ও তাঁর মর্যাদা কম ছিল ('সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৫৯৩ পৃঃ)।

৮২. এই পুস্তকের বিবরণীর সাথে 'সিয়ারে'র বিবরণীর কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। 'সিয়ারে'র বিবরণী (৫৯২ পৃঃ) থেকে দেখা যায়, সন্ধি হওয়ার পর সদর উল-হককে যে পদের অধিকারী বলা হচ্ছে, মীর হবিব সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১১৬৫ হিজরীতে সম্পাদিত সন্ধির বিশদ বৃত্তান্ত 'সিয়ারে' (৫৯০-৫৯১পৃঃ) দেয়া আছে। 'সিয়ারে' বিবৃত হয়েছে যে, ১১৬৪ হিজরীতে মেদিনীপুরে পরাজয়ের পর মারাঠারা মীর হবিবের মাধ্যমে সন্ধির প্রস্তাব করেছিল। মহবত জং তখন ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ; শারীরিক অক্ষমতা ও ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত; দীর্ঘ দশ বৎসরকাল যাবত মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল; তাঁর রাজ্যের সমর্থকদের মধ্যে আফগান প্রধানেরা তখন

বিদ্রোহী ; সুদীর্ঘকালের যুদ্ধে জনসাধারণের অবর্ণনীয় দুর্দশা হয়েছিল। এই সকল কারণে মহবত জং অবশেষে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন। মীর হবিব ও মারাঠাদের পক্ষে মীর্জা সালেহ্ এবং মহবত জং-এর পক্ষে মীর জাফর সন্ধির শর্তাদি সম্বন্ধে আলোচনা করার পর স্থির হয়ঃ (১) মীর হবিব মহবত জং-এর অধীনে ও তাঁর প্রতিনিধিরূপে উড়িষ্যার ডেপুটি গবর্নর হবেন ; (২) দখল-কারী মারাঠা সৈন্যদের বেতনের পরিবর্তে মীর হবিব উড়িষ্যার রাজস্ব রঘুজী ভোঁসলাকে দেবেন ; (৩) রঘুজীর সৈন্যগণ মহবত জং-এর রাজ্য আক্রমণ করবে না, এই শর্তে উড়িষ্যার রাজস্বের অতিরিক্ত বাৎসরিক আরো বারো লক্ষ টাকা (সম্ভবতঃ অন্যান্য অঞ্চলের আয় থেকে) মীর হবিব মারাঠা রঘুজীকে দেবেন ; (৪) জলেসরের নিকটবর্তী সোনামুখিয়া (সুবর্ণরেখা) নদী উড়িষ্যা ও বাংলার সীমারেখা হবে ; এবং এই সময় মেদিনীপুরকে উড়িষ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৮৩. 'সিয়ারে'র গ্রন্থকার (তিনি মহবত জং-এর আত্মীয় ছিলেন) মহবত জং-এর প্রশংসা করেছেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬০৯-৬১১ পৃঃ)। তিনি বলেন, মহবত জং আরাম উপভোগ বর্জন করেছিলেন; নিয়মিত নামাজ পড়তেন ; মিতাচারী ছিলেন ; ও শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতেন। তিনি অল্পসময় নিদ্রা যেতেন ; অধিকাংশ সময় রাজকার্য করতেন অথবা যে-আলেমদের তিনি শ্রদ্ধা করতেন তাঁদের সঙ্গে থাকতেন। তাঁর মাত্র এক স্ত্রী ছিল ও এঁর প্রতি তিনি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি অসাধারণ সেনাপতি ও দূরদর্শী রাজনীতি-বিদ ছিলেন। যখন তাঁর আফগান সেনাপতি মুস্তফা খান এবং আত্মীয় সাহামত জং ও সাওলাত জং ইংরেজদের কলকাতা থেকে বিতাড়নের জন্য তাঁকে চাপ দিতেন, তখন মহবত জং বলতেন, "মুস্তফা খান একজন যোদ্ধা ; সেইজন্য তিনি সর্বদা যুদ্ধ চান, যাতে সর্বদা তাঁর কাজের প্রয়োজন হয়। ইংরেজরা আমার কি ক্ষতি করেছে যে আমি তাদের ক্ষতি করতে যাব ? স্থলে (মারাঠা)

অগ্নি এখনো নির্বাপিত হয় নাই ; তার উপর এই অগ্নি যদি সমুদ্রে বিস্তারিত হয়, কে তা নির্বাপিত করবে ?" ('সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৬১১ পৃঃ)। 'সিয়ারে'র গ্রন্থকারের এই উচ্চ-প্রশংসা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ হিসেবে মহবত জং-এর দাবী গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, প্রভুদের ও উপকারীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও গুরুতর বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্বারা তিনি বাংলায় যে-যুগের সূচনা করেছিলেন, স্বল্পকালমধ্যেই এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাঁর দৌহিত্রকে তার প্রতিফল ভোগ করতে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 'ইব্রাত-ই-আরবাব-ই-বসর' (অর্থাৎ চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের প্রতি উপদেশ) নামক একটি আকর্ষণীয় ক্ষুদ্র ফার্সী পুস্তক পাঠ করার যোগ্য। এই পুস্তকের প্রত্যেক বাক্যের শব্দগুলো এক করলে অর্থ হয় ১১৭০ (মীর জাফর ও তাঁর পুত্র মীরন কর্তৃক সিরাজ-উদ-দৌলাকে হত্যার তারিখ)। নওয়াব সরফরাজ খানের কোনো সমর্থক 'ইব্রাত' লিখেছিলেন বলে মনে হয়।

৮৪. 'সিয়ারে' (২য় খণ্ড, ৬২১ পৃঃ) উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিরাজ-উদ-দৌলা মসনদে আরোহণের পর মোহনলাল নামক জনৈক কায়স্থকে প্রধান দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন। এইরূপ একজন অজ্ঞাত পরিচয় হিন্দুকে বেসামরিক বিভাগের প্রধান পদে নিয়োগ করায় স্বভাবতই পুরানো অভিজাতশ্রেণীর, বিশেষতঃ মীর জাফরের মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। মীর জাফর মরহুম মহবত জং-এর অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের ও নিজে মসনদ দখল করার জন্য ষড়যন্ত্র করেন।

৮৫. এই অজ্ঞাত-পরিচয় উদ্ধত হিন্দু মোহনলালকে প্রধান উজীরের পদে নিয়োগ করার জন্য 'সিয়ার', 'ইব্রাত-ই-আরবাব-ই-বসর', ও 'রিয়াজে'র লেখকগণ সিরাজ-উদ-দৌলার নিন্দা করেছেন। এইজন্য পুরাতন আমীরদের মধ্যে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়েছিল ও ক্ষোভে সিরাজের অধীনতাপাশ ছিন্ন করতে ব্যাগ্র হয়ে উঠেছিলেন ('ইব্রাত-ই-আরবাব-ই-বসর', ২৬ পৃঃ ; 'সিয়ার-উল-মুতা-

ক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৬২১ পৃঃ দ্রঃ)।

৮৬. নওয়াব গোলাম হোসেন খান বাহাদুর ফার্সী ভাষায় 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন' নামক ভারতের একটি অতি উত্তম ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তিনি মীর জাফর ও ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দলভুক্ত ছিলেন। সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁকে রাজ্য থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছিলেন।

৮৭. নওয়াব নওয়াজেশ আহমদ খান সাহামত জং—তিনি আলীবর্দীর জামাতা ও জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকার) ডেপুটি গবর্নর ছিলেন। যদিও হিন্দু ডেপুটি দেওয়ানগণই প্রকৃতপক্ষে কার্যপরিচালনা করতেন, তথাপি তিনি নামে মাত্র বাংলার দেওয়ান ছিলেন। জাহাঙ্গীরনগর (বা ঢাকা) চাকলার ডেপুটি গবর্নর থাকাকালে সাহামত জং সেখানে রাজবল্লভকে ডেপুটি দেওয়ানের পদে নিয়োগ করেছিলেন।

৮৮. 'সিয়ার', 'ইব্রাত-ই-আরবাব-ই-বসর', ও 'রিয়াজে' উল্লিখিত হয়েছে যে, নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলা নিম্নোক্ত কার্যগুলো দ্বারা রাজত্ব আরম্ভ করেছিলেনঃ (১) ঘসেটি বেগমের সম্পদ লুণ্ঠন; (২) মীর জাফরকে বরখাস্তকরণ ও হিন্দু মোহনলালকে প্রধান উজীর পদে নিয়োগ; (৩) রাজবল্লভকে বন্দীকরণ; (৪) কলকাতা জয়; (৫) পুর্নিয়া জয়। নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায়, এর মধ্যে একমাত্র মোহনলালের নিয়োগ ব্যতীত অন্য কার্যগুলো অন্যায় হয় নাই—যদিও রাজনৈতিক সুবিবেচনাপ্রসূত হয় নাই। আলীবর্দীর দেওয়ান সাহামত জং-এর নিকট আমানত রাজকীয় সম্পদ তাঁর স্ত্রী ঘসেটি বেগমের দখল করার ও নিয়ে যাওয়ার কোনোই অধিকার ছিল না। সিরাজ আইনসঙ্গতভাবে আলীবর্দীর উত্তরাধিকারী হওয়ায় উক্ত সম্পদ পুনরাধিকার করা তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ছিল। আলীবর্দীর জীবিত-কালেও মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় মীর জাফর অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়েছিলেন ('সিয়ার' দ্রঃ)। সুতরাং,

সিরাজের পক্ষে তাকে সন্দেহ করা ও তাকে সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অপসারণ করা অযৌক্তিক হয় নাই। রাজবল্লভকে প্রহরাধীন রাখা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রয়োজন ছিল। কারণ, সাহামত জং-এর (ঢাকার প্রাক্তন ডেপুটি গবর্নর) জাহাঙ্গীর-নগরের (বা ঢাকার) এই ধূর্ত ডেপুটি দেওয়ান বা পেশকার হিসাব-নিকাশ পেশ করতে পারে নাই এবং এই ব্যক্তি বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করেছে বলে সিরাজ-উদ-দৌলার সন্দেহ করার কারণ ছিল। কৃষ্ণদাশ সমস্ত সম্পদসহ কলকাতা পালিয়ে যায়। সুতরাং সরকারী সম্পদ উদ্ধার ও বিদ্রোহী প্রজা কৃষ্ণদাশকে শাস্তি দেয়ার জন্য সিরাজকে বাধ্য হয়ে কলকাতা আক্রমণ করতে হয়েছিল—যদিও হয়তো সিরাজ কিঞ্চিৎ কম আবেগপ্রবণ হলে ও ইংরেজদের সঙ্গে কুটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা শুরু করলে তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু, স্মরণযোগ্য যে, নওয়াব নিজে ছিলেন নিতান্ত অল্পবয়স্ক ও তাঁর কোনো নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা ছিল না। পুর্নিয়া বিজয়েরও রাজ-নৈতিক প্রয়োজন ছিল। কারণ মীর জাফরের প্ররোচণায় শওকত জং বাংলার গদি দাবী করেছিলেন। কেবল মোহনলালের মতো অজ্ঞাত পরিচয় হিন্দুকে উচ্চতম বেসামরিক পদে নিয়োগ তাঁর পক্ষে অবিজ্ঞজনোচিত হয়েছিল। এইজন্য পুরাতন আমীরগণ বা অভিজাতশ্রেণী অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন এবং এই ভুঁইফোড়ের ঔদ্ধত্যে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

৮৯. 'সিয়ার' ও ইব্রাত-ই-আরবাব-ই-বসরে' এঁর (ইংরেজ প্রধানের) নাম মি. ড্রেক বলে উল্লিখিত হয়েছে।

৯০. সিরাজ-উদ-দৌলা কর্তৃক কলকাতা লুঠনের বিষয়টি 'ইব্রাত-ই-আরবাব-ই-বসর' (২৯ পৃঃ) ও 'সিয়ারে' (২য় খণ্ড, ৬২২ পৃঃ) উল্লিখিত হয়েছে; কিন্তু কোনো সমসাময়িক মুসলমান লিখিত ইতিহাসে 'অন্ধকুপের' ঘটনার উল্লেখ নাই—যদিও সিরাজের নামের সঙ্গে সাধারণতঃ এই ঘটনাকে জড়িত করা হয়।

৯১. 'সিয়ারে' প্রদত্ত বর্ণনা (ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৬২৪-৬৩২ পৃঃ) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অধিকতর নির্ভরযোগ্য; কারণ, 'সিয়ারে'র গ্রন্থকার এই সময় শওকত জং-এর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। 'সিয়ারে'র বিবরণী থেকে দেখা যায়, মীর জাফর বিপ্লব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বাংলার নওয়াব হওয়ার আশা দিয়ে বিদ্রোহে নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য শওকত জং-কে পত্র লিখেছিলেন। শওকত জং দাম্ভিক ও নির্বোধ ছিলেন। উক্ত পত্র পাওয়ার পর তিনি গজনী ও কান্দাহার পর্যন্ত রাজ্য বিস্তারের ও বাংলা জয়ের অদ্ভুত কল্পনার কথা প্রকাশ্যে বলেন। পূর্নিয়া দরবারের এই ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা রায় রাসবিহারির (রাজা জানকীরামের পুত্র ও দুলাব রামের ভ্রাতা) মারফতে এক পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত পত্রে তিনি শওকত জং-কে বাংলা নিজামতের অন্তর্ভূ'ত গণ্ডোয়ারা ও বীরনগরের জায়গীর রায় রাসবিহারির নিকট ছেড়ে দিতে বলেন। এই পত্র পাওয়ার পর শওকত জং তাঁর প্রধান পরামর্শদাতা 'সিয়ারে'র গ্রন্থকারের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সিয়ারের গ্রন্থকার শওকত জং-কে টাল-বাহানা করার, রায় রাসবিহারির সঙ্গে বাহ্যতঃ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করার, সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত করার ও বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত এইভাবে কালাতিপাত করার পরামর্শ দেন; এবং আরো বলেন যে, বর্ষাশেষে ইংরেজরাও সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে (সিয়ারের গ্রন্থকার ইংরেজদের আস্থা-ভাজন ছিলেন বলে মনে হয়) এবং তখন বিজয়ী দলের সঙ্গে শওকত জং-এর যোগদানের সুযোগ হবে। যাই হোক, শওকত জং এই পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। উপরন্তু, তিনি এক উদ্ধতপূর্ণ জওয়াবে সিরাজ-উদ-দৌলাকে জানান যে, তিনি (শওকত জং) বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারির সনদ লাভ করেছেন ও সিরাজ-উদ-দৌলা আনুগত্যহীনতার জন্য প্রাণদণ্ডের যোগ্য হয়েছেন; তবে, দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকার এক কোণে

শান্তভাবে বসবাস করতে দেয়া হবে। উক্ত পত্রের উত্তরে মোহনলালকে সঙ্গে নিয়ে এক সৈন্যবাহিনীসহ মনিহারির দিকে অগ্রসর হন। পাটনার সৈন্যবাহিনীসহ যোগদানের জন্য সিরাজ রামনারায়ণকে আদেশ করেন। মনিহারি ও নওয়াবগঞ্জের মধ্যস্থলে যুদ্ধ হয়। শওকত জং নির্বোধের মতো সুরক্ষিত ঘাঁটি ত্যাগ ক'রে জলাভূমির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়ায় পরাজিত ও নিহত হন। সিরাজ-উদ-দৌলা পূর্নিয়ার ফৌজদার পদে মোহনলালকে নিযুক্ত করেন এবং মোহনলাল নিজ পুত্রকে ডেপুটি ফৌজদাররূপে রেখে নওয়াবের সঙ্গে ফিরে আসেন।

উপরোক্ত বৃত্তান্ত দ্বারা আমি দেখাতে চেয়েছি যে, শওকত জং-এর সঙ্গে যুদ্ধের কারণ সিরাজ-উদ-দৌলা নন; পরন্তু, সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা বিপ্লব সৃষ্টির জন্য মীর জাফরের ষড়যন্ত্র এর কারণ এবং আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ ব্যতীত সিরাজের গত্যন্তর ছিল না।

৯২. 'সিয়ারে' (ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৬৩৩ পৃঃ) বিবৃত হয়েছে যে, কলকাতার ইংরেজ কুঠির প্রধান মি. ড্রেক অন্য কয়েকজন ইংরেজসহ দক্ষিণে আর্কট প্রদেশের অন্তর্গত মাদ্রাজে পলায়ন করেছিলেন। তখন ক্লাইভ মরহুম আসিফজা'র পুত্র দক্ষিণের নাজিম সালাবত জং-এর পক্ষে ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ ক'রে ফিরেছেন। মি. ড্রেক ও কলকাতা থেকে পলায়িত অন্য ইংরেজরা মাদ্রাজের কুঠির ইংরেজদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এতে সাব্যস্ত হয় যে, ক্লাইভ বাংলা থেকে পলায়িত ইংরেজদের সঙ্গে কলকাতা যাবেন এবং তারা যেভাবে বাঞ্ছনীয় মনে করেন সেই পন্থায় কলকাতা কুঠির ভিত্তি পুনরায় স্থাপন করার চেষ্টা করবেন। যদি আলোচনা ও অর্থ দিয়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ভালই; যদি না হয়, বলপ্রয়োগ করা যেতে পারে। অতঃপর ক্লাইভ অন্য ইংরেজদের নিয়ে মাদ্রাজ থেকে হুগলী নদীর মোহনায় এসে পৌঁছান। যেহেতু ইংরেজ প্রধানগণ অত্যন্ত বিজ্ঞ, সাহসী ও অভিজ্ঞ ছিলেন ও সব সংবাদ রাখতেন, সেইহেতু তারা সিরাজ-উদ-দৌলার নিকট

শান্তির প্রস্তাব করেন এবং মি. ড্রেকের অপরাধ ক্ষমা করার প্রার্থনা করেন ও কলকাতায় পূর্বের মতো কুঠি পুনরায় তৈরীর অনুমতি দিলে নওয়াবকে কয়েক লক্ষ টাকা দিতে চান। সিরাজ-উদ-দৌলা অত্যন্ত নির্বোধ ছিলেন এবং তাঁর সভাসদগণ অধিকতর নির্বোধ ছিলেন। তারা ইংরেজ জাতির সাহসিকতা ও বিজ্ঞতার কথা জানতেন না। সেইজন্য অসন্তুষ্টির ভয়ে কেউ ইংরেজদের এই শান্তি-প্রস্তাব নওয়াবকে অবগত করেন নাই। বিলম্ব হওয়ায় এবং বাংলার আমীরদের মধ্যে অসন্তুষ্টির সংবাদ পেয়ে ক্লাইভ যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ক্লাইভ তখন নওয়াবের কলিকাতাস্থ গবর্নর মানিকচাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মানিকচাঁদ পলায়ন করেন।

১৩. এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক মীর জাফর ছাড়াও দুলাব রাম (জানকী রামের পুত্র), জগৎশেঠ ও ঘসেটি বেগম (আলীবর্দীর জামাতা নওয়াজেশ মুহম্মদ খানের বিধবা) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন। ঘসেটি বেগম তাঁর লুক্কায়িত সরকারী অর্থ দিয়ে মীর জাফরকে সাহায্য করেছিলেন। প্রধান সেনাপতির পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ায় মীর জাফরের অসন্তোষ এবং লুক্কায়িত সরকারী সম্পদ বের ক'রে দিতে বাধ্য হওয়ায় ঘসেটি বেগমের ক্ষোভের কারণ কিছুটা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু দুলাব রাম, জগৎশেঠ, রামনারায়ণ, রাজবল্লভ ও অন্য হিন্দুদের কার্য-কলাপ হেঁয়ালির মতো বোধ হয়। কারণ, সরকারী সুযোগ-সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে সিরাজ-উদ-দৌলা অত্যন্ত হিন্দু-ঘেঁষা নীতি অবলম্বন করেছিলেন। মোহনলালের মতো একজন অখ্যাত হিন্দুকে উচ্চতম বেসামরিক পদে নিযুক্ত করার জন্যই প্রধানতঃ নওয়াবের মুসলমান সমর্থকগণ তাঁর বিরোধী হয়েছিলেন; নতুবা এই সংকট-কালে তাঁরা হয়ত নওয়াবের পক্ষে থাকতেন (ইব্রাত-ই-আরবাব-ই-বসর, ২৬ পৃঃ)।

১৪. 'সিয়ারে' উল্লিখিত হয়েছে যে, সিরাজ-উদ-দৌলা কর্তৃক কলকাতা

দখলের পর এই আমীর বেগ কয়েকজন ইংরেজ মহিলাকে সসম্মানে মি. ড্রেকের জাহাজে তুলে দেন। সেইজন্য আমীর বেগ ইংরেজদের আস্থাভাজন হয়েছিলেন। মঁসিয়ে ল'র চলে যাওয়ার পর মীর জাফর আরো তৎপরতার সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালান এবং তাঁর পক্ষ অবলম্বন করার জন্য ইংরেজদের প্ররোচিত করেন। এই ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের প্ররোচিত করার জন্য মীর জাফর কলকাতায় ক্লাইভের নিকট নিজ প্রতিনিধিরূপে আমীর বেগকে প্রেরণ করেন। সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে কতকগুলো প্রকৃত ও কাল্পনিক অভিযোগের বর্ণনা দিয়ে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও কর্মচারীর স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি (বা দরখাস্ত) মীর জাফর উক্ত মীর্জার মারফতে কলকাতায় পাঠান এবং তাতে সিরাজ-উদ দৌলার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য ইংরেজদের অনুরোধ করা হয়। জগৎশেঠ তাঁর কলকাতাস্থ প্রতিনিধি আমিনকে (সাধারণতঃ উমিচাঁদ নামে পরিচিত) এবং দুলাব রামও তাঁর প্রতিনিধিকে এই উদ্দেশ্যে ইংরেজদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে নির্দেশ দেন। মীর জাফর ক্লাইভকে লেখেন যে, ক্লাইভ কেবল ইংরেজ সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হলেই মীর জাফর ও তার সহযোগীরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন এবং এজন্য ক্লাইভকে তিন কোটি টাকা উপহার দেয়া হবে। ক্লাইভ তখন মীর জাফরের তাগিদে রাজী হয়ে পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হন ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৬৩৭ পৃঃ দ্রঃ)। এই সকল ঘটনা সম্পর্কে 'তারিখ-ই-মনসুরি'ও দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক ব্লকম্যান 'তারিখ-ই-মনসুরী' থেকে কয়েকটি মন্তব্য Journal of the Asiatic Society-তে (Part I, No. II, ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দ) প্রকাশ করেছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "চন্দননগরের ফরাসী গবর্নর এম. রেনল্টের প্রতি বিরাগবশতঃ টেরানিউ নামক জনৈক ফরাসী কর্মচারী বিশ্বাসঘাতকতা করে ও তার সাহায্যে চন্দননগর ক্লাইভ ও ওয়াটসনের হস্তগত হয় (উপরোল্লিখিত J. A. S., ৮৮ পৃঃ দ্রঃ)। চন্দননগরের পতনের পর মঁসিয়ে ল'

নামক জনৈক ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ নওয়াব সিরাজ-উদ-দৌলার দরবারে আসেন এবং 'তেলিঙ্গা' নামক একটি সৈন্যদল সজ্জিত করেন। সাম্প্রতিক সন্ধি অনুযায়ী ইংরেজদের বন্ধু বা শত্রুপক্ষকে নওয়াবেরও বন্ধু বা শত্রু গণ্য করার শর্তের অজুহাতে ইংরেজরা মঁসিয়ে ল'কে নওয়াব দরবারে রাখতে আপত্তি করে। কিছু পত্র আদান-প্রদানের পর ক্লাইভকে সন্তুষ্ট করার জন্য নওয়াব মঁসিয়ে ল'কে মুর্শিদাবাদ থেকে বিদায় দেন। এই সময় ক্লাইভ নওয়াবের অনুমতি না নিয়েই কলকাতায় বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম ও একটি টাকশাল তৈরী করেন। সিরাজ-উদ-দৌলা কর্তৃক দক্ষিণে এম. বুসির নিকট লিখিত কয়েকটি পত্র ইংরেজদের হস্তগত হয় এবং এরা সিরাজের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ করে। এই বিদেশীদের অসরল ব্যবহার এবং ধীর অথচ নিশ্চিত অগ্রগতির দরুন নওয়াবের ক্রোধ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। মুর্শিদাবাদের ইংরেজ রেসিডেণ্টকে ভয় দেখানো হয়। ক্লাইভের একটা চিঠি নওয়াব এক সময় ছিঁড়ে ফেলেন। অব্যবহিত পরে, অবিশ্বাসী সভাসদদের ভয়ে ও সামরিক বাহিনীর উপর আস্থাহীনতার জন্য নওয়াব খেলাত দিয়ে মি. ওয়াটসকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন এবং ক্লাইভের নিকট কৈফিয়ত দিয়ে পত্র লেখেন। কিন্তু, সিরাজ-উদ-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্রে ক্লাইভ ইতিপূর্বেই মীর জাফরের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। 'তারিখ-ই-মনসুরী' অনুসারে মীর মুহম্মদ জাফর, আমিনচাঁদ রাউরা (উমিচাঁদ নামে সাধারণতঃ পরিচিত) ও খাজা উজির এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু, 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন' অনুযায়ী মীর মুহম্মদ জাফর, রাজা দুলাব (দুর্লভ) রাম ও জগৎশেঠ এই ষড়যন্ত্র করেছিলেন। কলকাতায় এদের প্রত্যেকের প্রতিনিধি (এজেণ্ট) ছিল। মি. ওয়াটসের মাধ্যমে ক্লাইভ ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। অতঃপর গ্রন্থকার উমিচাঁদকে ক্লাইভের প্রতারণার বৃত্তান্ত দিয়েছেন—যা বাংলার সকল ইতিহাসে পাওয়া যায়।"

"১৭৫৭ সালের জুন মাসের গোড়ার দিকে ক্লাইভ কলকাতা থেকে রওয়ানা হয়ে ১৭ তারিখে পলাশীর দক্ষিণে অবস্থিত ক্ষুদ্র কাটোয়া শহরে পৌঁছান ও সেখানকার দুর্গ অধিকার করেন।

২১শে জুন অপরাহ্ণ ৪টার সময় ক্লাইভ কাটোয়া থেকে রওয়ানা হয়ে হুগলী (নদী) পার হন এবং ২৩শে জুন সকালে পলাশীর প্রান্তরে শিবির স্থাপন করেন। নওয়াবের সৈন্যবাহিনী তখন দেখা যাচ্ছিলো। কামান থেকে গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়। ইংরেজরা সিরাজ-উদ-দৌলার শিবিরগুলো আক্রমণ করে; কিন্তু, নওয়াবের অন্যতম বিশ্বস্ত আমীর মীর মদন ('থর্নটন', ১ম খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠায় 'মুদুম' খান বলা হয়েছে) বীর বিক্রমে বাধা দেন। বেলা প্রায় ১২টার সময় মীর মদনকে কামানের একটি গোলার আঘাতে আহত অবস্থায় সিরাজ-উদ-দৌলার শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। মোহনলাল এই সময় মীর মদনের স্থান গ্রহণ করায় যুদ্ধ চলতে থাকে। কিন্তু চরম নিষ্পত্তি হয় না। ষড়যন্ত্রের ভয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা এই সময় মীর জাফরকে শিবিরে ডেকে পাঠান। মীর জাফর যুদ্ধে কোনোই অংশগ্রহণ করেন নাই। নওয়াবের ঐকান্তিক অনুরোধে অবশেষে নওয়াব কর্তৃক মোহনলালকে অবিলম্বে যুদ্ধ থেকে বিরত করার শর্তে মীর জাফর পরদিন সকালে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন। সিরাজ-উদ-দৌলা সম্মত হন এবং মোহনলাল শিবিরে ফিরে আসেন। সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা নিরাশ হয়ে পলায়ন করতে থাকে। সন্ধ্যার পূর্বেই নওয়াবের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই প্রকার যুদ্ধে ইসলাম ভারত হারিয়েছিল" (ব্লকম্যানের 'তারিখ-ই-মনসুরী' সম্পর্কে উপরোল্লিখিত মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

ক্লাইভ কর্তৃক সিরাজ-উদ-দৌলার সঙ্গে সন্ধির শর্তভঙ্গ সম্বন্ধে 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' প্রদত্ত ব্যাখ্যায় (২য় খণ্ড, ৬৩৭ পৃঃ) কৈফিয়তের সুর আছে। 'সিয়ারে' বলা হয়েছে, "ইংরেজরা মীর জাফরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল; কিন্তু যেহেতু এই বিজ্ঞ

জাতি যথেষ্ট কারণ ব্যতীত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় না, অথবা সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে না, সেইহেতু এরা (ইংরেজরা) নিশ্চয়ই নওয়াবের সঙ্গে পত্র বিনিময় দ্বারা সন্ধির শর্তভঙ্গ সম্বন্ধে উত্তম কারণ দেখিয়েছিল (যা গ্রন্থকার অবগত নন) ; নওয়াব কর্তৃক কলকাতা দখলের জন্য ইংরেজদের যে ক্ষতি হয়েছিল সেই খেসারত দিতে বিলম্ব, সম্ভবতঃ কারণস্বরূপ দেখানো হয়েছিল।"

আমি এবারে' সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন' থেকে যুদ্ধের বিবরণ (২য় খণ্ড, ৬৩৮ পৃঃ) সংক্ষেপে দিচ্ছি। ক্লাইভের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রে সিরাজ-উদ-দৌলা অসন্তুষ্ট কর্মচারীদের (সেনাপতিদের) সঙ্গে বিরোধ দূর করার চেষ্টা করেন। এরা বাহ্যতঃ আনুগত্য প্রকাশ করে ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্র করছিল। প্রতিরোধ-প্রাকার ও ঘাঁটি তৈরী তত্ত্বাবধানের জন্য সিরাজ-উদ-দৌলা আগেই (বিশ্বাসঘাতক) রাজা দুলাবরামকে প্রেরণ করেন ; এবং স্বল্পকাল পরে বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষদ্বয় মীর মদন ও মোহনলাল এবং বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরকে নিয়ে নওয়াব নিজে তথায় (পলাশী) যান। ক্লাইভও অল্পসংখ্যক ইংরেজ ও তেলেঙ্গি—আন্দাজ দু'হাজার—সৈন্য নিয়ে পলাশী পৌঁছান। ক্লাইভ কামান থেকে গোলাবর্ষণ ক'রে যুদ্ধ আরম্ভ করেন। মীর জাফর দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। অপরাহ্ণ প্রায় তিনটা পর্যন্ত মীর মদন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন এবং মোহনলালসহ ক্লাইভের (সৈন্যদের) অবস্থিতি স্থানের নিকটবর্তী হন। কথিত হয় যে, মীর মদনের বীরত্ব লক্ষ্য ক'রে ক্লাইভ নিরাশ হয়ে উমিচাঁদকে ভৎ'সনা করেন ; কারণ এরা ক্লাইভকে বলেছিলেন, সকলেই নওয়াবের প্রতি অসন্তুষ্ট ও কেউই তাঁর পক্ষ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ করবে না। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় কামানের গোলার আঘাতে মীর মদন আহত হন এবং তাঁকে সিরাজ-উদ-দৌলার শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মীর মদনের মৃত্যু হয়। এই সময় সিরাজ-উদ-দৌলা উৎকণ্ঠিত হয়ে মীর জাফরকে ডেকে পাঠান ও তাঁকে যুদ্ধ করার জন্য মিনতি করেন।

এমনকি, মীর জাফরের সামনে পাগড়ী রেখে নওয়াব বলেন, "আমি আমার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত। আপনার সঙ্গে আমার আত্মীয়-তার নামে এবং আমার মাতামহ মহবত জং-এর নিকট আপনি যে উপকার পেয়েছেন তার নামে আমার জীবন ও সম্মান রক্ষার জন্য আপনার নিকট মিনতি করছি।" এই করুণ আবেদনেও প্রধান ষড়যন্ত্রকারীর হৃদয় গলে নাই, বন্ধুত্বের মুখোশে তিনি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ মতলব ঢেকে রাখেন এবং এই মিথ্যা উত্তর দেন: "আজ দিন অবসানপ্রায়; আর যুদ্ধের সময় নাই; আজ যুদ্ধ বন্ধ করার আদেশ দিন; আগামীকাল আমি সমগ্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনার পক্ষ অবলম্বন ক'রে যুদ্ধ করব।" সিরাজ-উদ-দোলা মীর জাফরের ফাঁদে পা দিয়ে দেওয়ান মোহন-লালকে ফিরে আসতে সংবাদ দেন। মীর মদনের মৃত্যুর পর মোহনলাল যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলে পাঠান যে, তিনি এখন ঘোর যুদ্ধে ব্যস্ত, এতেই ভাগ্য নির্ধারিত হবে; সুতরাং এখন তাঁর ফিরবার সময় নাই। সিরাজ-উদ-দোলা আবার মীর জাফরের সঙ্গে পরামর্শ করেন। মীর জাফর ধূর্তের মতো পূর্ব-পরামর্শের পুনরুক্তি করেন। তখন মোহনলালকে ফিরে আসবার আদেশ দেয়া হয়। মোহনলালের প্রত্যাবর্তনে সিরাজের সৈন্য-বাহিনীর উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সৈন্যরা চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সিরাজ-উদ-দোলা তখন দ্রুত মুর্শিদাবাদ ফিরে আসেন ও কিছুক্ষণ মনসুরগঞ্জে অবস্থানের পর নিজেকে মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক সভাসদগণ দ্বারা পরিবৃত দেখে বেগমগণ ও সোনা নিয়ে ভগবানগোলা যাত্রা করেন। সেখান থেকে নৌকা-যোগে আজিমাবাদ রওয়ানা হন এবং ম'সিয়ে ল'কে তাঁর সঙ্গে যোগদানের জন্য এক পত্র প্রেরণ করেন। ল' পৌঁছাবার পূর্বেই তিনি পাটনা অভিমুখে রওয়ানা হন। বেগমগণ ও সন্তানেরা কয়েকদিন যাবত অনাহারে থাকায় তিনি রাজমহলে নেমে দান শাহ নামক এক ফকিরের বাড়ী যান। ফকির বাহ্যতঃ খিচুড়ি

তৈরী ক'রে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়; কিন্তু পূর্বের অসদ্ব্যবহারের জন্য নওয়াবের প্রতি তার ক্রোধ ছিল। ফকির সিরাজের উপস্থিতির সংবাদ তৎক্ষণাৎ রাজমহলে মীর জাফরের ভ্রাতা মীর দাউদের নিকট পাঠায়। মীর দাউদ ও মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিম এসে সিরাজকে বন্দী ক'রে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যান। সেখানে মীর জাফর ও তার পুত্র মীরন সিরাজকে হত্যা করেন। সিরাজের মৃতদেহ হাতীর পিঠে চাপিয়ে শহরে ঘুরিয়ে প্রদর্শন করা হয়। 'সিয়ারে'র গ্রন্থকার এক বেদনাদায়ক কবিতা দ্বারা সিরাজ-উদ-দৌলার হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সমাপ্ত করেছেন।

'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', 'রিয়াজ-উস-সালাতীন', 'ইব্রাত-ই-আরবাব-ই-বসর' ও 'তারিখ-ই-মনসুরি' সম্পর্কে অধ্যাপক ব্লকম্যানের মন্তব্যের সঙ্গে ওর্মের 'History of the Military Transactions of the English', Mills' 'British India' ও 'Thornton's 'British India' র সঙ্গে লাভজনকভাবে তুলনা করা যায় (অধ্যাপক ব্লকম্যান ১৮৬৭ সালের J. A. S., Part I, No. 2, ৮৬ পৃষ্ঠায় এই প্রস্তাব করেছেন)।

৯৫. ফার্সী সংস্করণে এই শব্দটি (বাবনিয়া) সঠিকভাবে মুদ্রিত হওয়া সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই।

৯৬. 'সিয়ারে' 'দানা শাহ'।

৯৭. পূর্বতন টীকায় আমি সিরাজ-উদ-দৌলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখ করেছি।

'ইব্রাত-ই-আরবাব-ই-বসরে' সিরাজ-উদ-দৌলাকে "লঘুচিত্ত, একগুঁয়ে, বদ-মেজাজ, অধীর ও বদ-জবান এবং কাউকে রেহাই দিয়ে কথা বলতেন না" বলা হয়েছে। 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' (২য় খণ্ড, ৬২১ পৃঃ) বলা হয়েছে, "সিরাজ-উদ-দৌলার কর্কশ ও অভদ্র কথাবার্তা, এবং সরকারী কর্মচারীদের ঠাট্টা ও উপহাস করায় সকলের মনে ক্ষোভ ছিল।" কেবল এগুলোই যদি তাঁর অপরাধ হয়, তাঁর পাপের তালিকা যদি এতেই সীমাবদ্ধ থাকে,

তবে সিরাজ-উদ-দৌলা সম্পর্কে প্রচলিত সাধারণ ধারণা পরিবর্তন করতে হয়।

'ইব্রাত-ই-আরবাব-ই-বসরে'র লেখক সিরাজের বেদনাদায়ক পরিণতির ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ দেয়ার চেষ্টা করেছেন (৩২ পৃঃ)। এই গ্রন্থকার মোটের উপর বলেন যে, সিরাজ-উদ-দৌলা উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর মাতামহের নিকট যে ষড়যন্ত্র ও দুর্ভাগ্য পেয়েছিলেন, তারই শিকার হয়েছেন। আলীবর্দীর উপকারী নওয়াব শুজাউদ্দীন খানের পুত্র নওয়াব সরফরাজ খানকে হত্যা ক'রে বাংলায় যে হিংস্র ষড়যন্ত্র ও গুপ্তবিশ্বাসঘাতকতার যুগ আরম্ভ করেছিলেন, বিধাতার অমোঘ নিয়মে তারই প্রতিফল তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জীবন অপেক্ষা প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলার মাধ্যমে। 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' (২য় খণ্ড, ৬৩৩ পৃঃ) উল্লিখিত হয়েছে যে, "সিরাজ-উদ-দৌলা ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করেছিলেন ; সুতরাং প্রকৃতির বিধানে পতন অনিবার্য হয়েছিল।" এই উক্তি থেকে বুঝা যায়, সিরাজ-উদ-দৌলার দুর্ভাগ্য তাঁর অক্ষমতার জন্য নয় (অর্থাৎ, তিনি অক্ষম ছিলেন সেই কারণে তাঁর এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হয়েছিল, এ-ধারণা সত্য নয়)।

বাংলার ইতিহাসের এই বিপ্লবের ফলে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম শাসনের স্থানে ইংরেজরা এদেশে সর্বময় কর্তা হয়েছিল। এই পরিণতিকে জনসাধারণের কল্যাণার্থে বিধাতার কল্যাণময় দানরূপে গণ্য করা যেতে পারে। স্পষ্টতঃ তৎকালে বাংলার জনসাধারণ নৈতিক অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছেছিল ; অকৃতজ্ঞতা ও বিশ্বাসঘাতকতার বিষ সর্বত্র প্রবেশ করেছিল ; মিথ্যাচার ও অর্থ-গৃধ্নুতা তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে বাসা বেঁধেছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও অর্থলোভের মোহে তারা তাদের রাজার যৌবন-সুলভ ত্রুটি ও পারিবারিক ঈর্ষার সুযোগ নিয়েছিল ; তারা সর্ব-

প্রকার কৃতজ্ঞতার ও সম্মানের মনোভাব ত্যাগ ক'রে নওয়াবের বিশ্বাসঘাতক আত্মীয় মীর জাফরের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করেছিল। এই কারণে তাদের নৈতিক অধঃপতন রোধের জন্য মুসা পয়গম্বরের মতো একজন রক্ষাকর্তার প্রয়োজন হয়েছিল। দেশের পাপ দূর ক'রে জনসাধারণকে উদ্ধার ও সংস্কারের জন্য বিধাতা তাই সাগর-পার থেকে ইংরেজদের মাধ্যমে উদ্ধারকর্তা প্রেরণ করেছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ (চ)

১. 'সিয়ারে'র (২য় খণ্ড, ৬৪০ পৃঃ) বিবরণী দ্রষ্টব্য। পলাশীর যুদ্ধের পর মীর জাফর ও ক্লাইভ যুদ্ধক্ষেত্রে পরামর্শ করার পর উভয়ে একত্রে মুর্শিদাবাদ প্রবেশ করেন। মীর জাফর মনসুরগঞ্জে অবস্থিত সিরাজ-উদ-দৌলার বাসভবন দখল করেন এবং তারপর পূর্ব-স্বীকৃতিমতে দুলাব রাম, ক্লাইভ ও নিজের মধ্যে মূল্যবান দ্রব্য ও অর্থাদি ভাগ ক'রে নেয়ার জন্য নিজামতের খাজাঞ্চিখানায় যান। এই সময় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে দুলাব (দুর্লভ) রামই মীর জাফরের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট সহযোগী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের বন্ধুত্ব অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। অল্পদিন পরে দুলাব রাম সিরাজ-উদ-দৌলার ভ্রাতা মীর্জা মেহ্দিকে মসনদে বসাবার মতলব করেন ('সিয়ার', ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৬৪৪ পৃঃ)।

২. খাদেম হোসেন খান সম্পর্কে 'সিয়ার' (২য় খণ্ড, ৬৪৫ পৃঃ) দেখুন। খাদেম হোসেন খানের পিতা সৈয়দ খাদেম আলী খান মীর জাফরের ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু খাদেম হোসেন মীর জাফরের এই ভগ্নীর গর্ভজাত ছিলেন না; তিনি (খাদেম হোসেন) খাদেম আলীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত ছিলেন। মীর জাফর আয়েশ ও ফুর্তিপ্রিয় ছিলেন, খাদেম হোসেন এতে তাঁর প্রিয় সঙ্গী ছিলেন।

৩. মীর জাফর বাংলার সুবাদার পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। নিজামতী মসনদে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজকার্য পুত্র মীরন ও অন্যদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি ভোগবিলাসে মগ্ন হন। মীরনের দেওয়ান রাজবল্লভের হাতে পড়ে জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকা। মরহুম সাহামত জং-এর আমলে এই রাজবল্লভ সাহামত জং-এর দেওয়ান

হোসেন কুলি খানের পেশকার ছিল। বাংলার রাজস্ব থেকে নগদ অর্থ দেয়ার পরিবর্তে বর্ধমান ও আরো কয়েকটি জেলা ইংরেজদের বরাদ্দ ক'রে দেয়া হয়। ইংরেজদের প্রভূত পরিমাণে সাহায্যকারী মীর বেগকে হুগলী বরাদ্দ করা হয়। রাজা রামনারায়ণ বিহারের সর্বময় প্রশাসক হন। খাদেম হোসেন খানকে পুর্নিয়া বরাদ্দ করা হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৫১ পৃঃ দ্রঃ)। 'সিয়ারে' বিবৃত হয়েছে যে, মীর জাফরের মসনদে আরোহণের অল্পদিন পরে লোকে তাঁর ও তাঁর পুত্র মীরনের কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল ও সিরাজ-উদ-দৌলার কালের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতো। মীর জাফরের আমল থেকে সিরাজ উদ-দৌলার আমলকে তারা শ্রেয় মনে করতো ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৬৫৬ পৃঃ)।

৪. এর বিশদ বৃত্তান্ত 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৬৫৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তাতে দেখা যায়, বিহার ও বাংলার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মীর জাফর ও মীরনের কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে এলাহাবাদের সুবাদার মুহম্মদ কুলি খানের নিকট পত্র লিখতে আরম্ভ করেন (মুহম্মদ কুলি খান শুজা-উদ-দৌলার চাচাতো ভাই ও সফদর জং-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন)। মুহম্মদ কুলি খান তাঁর চাচাতো ভাই অযোধ্যার সুবাদার শুজা-উদ-দৌলার সঙ্গে পরামর্শ করেন। শুজা-উদ-দৌলা মনে মনে মুহম্মদ কুলির প্রতি বিরূপ ছিল ও তাঁর ধ্বংস কামনা করতেন। তিনি মুহম্মদ কুলি খানকে মিথ্যা পরামর্শ দেন এবং বিহার আক্রমণ করতে ও শাহজাদা আলী গওহরকে (অন্য নাম শাহ আলম—বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের উত্তরাধিকারী) সঙ্গে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন। এই সময় ইমাদ-উল-মুল্‌ক কর্তৃক বিপর্যস্ত হয়ে আলী গওহর ঘাটুরার অন্তর্গত মীরনপুরে নজিব-উদ-দৌলা নজিব খান আফগানের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য প্রথমে বিহারের ডেপুটি গবর্নর রামনারায়ণ পাটনার ইংরেজ কুঠির প্রধান মি. আমিয়টের সঙ্গে পরামর্শ করেন ও আলী গওহরের আক্রমণের প্রতিরোধের জন্য ইংরেজদের

সাহায্যদানের প্রস্তাব করেন। মি. আমিয়ট বলেন যে, তিনি কোনো চরম উত্তর দিতে অক্ষম। বাংলার নাজিম মীর জাফর অথবা ইংরেজদের নিকট থেকে সাহায্য না পাওয়ায় রামনারায়ণ উৎকণ্ঠিত হয়ে শাহজাদা গওহর ও মুহম্মদ কুলি খানের সঙ্গে রাজনৈতিক সৌজন্য প্রদর্শন করতে আরম্ভ করেন ও দরবারে উপস্থিত হয়ে শাহজাদার আনুগত্য স্বীকার করেন। শাহজাদা ও মুরশিদ কুলি খান উভয়ে আশ্বস্ত হয়ে রামনারায়ণকে আজিমাবাদ ফিরে যেতে দেন। অব্যবহিত পরে মীরন ও ইংরেজদের আগমনের সংবাদ পেয়ে রামনারারণ আনুগত্যের মুখোশ ত্যাগ করেন। শাহজাদা ও মুহম্মদ কুলি খান পাটনা অবরোধ ও দুর্গ আক্রমণ করেন। আক্রমণের চাপে রামনারায়ণ আত্মসমর্পণ ক'রে পলায়নের উদ্যোগ করছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে শুজা উদ-দৌলা হীনকৌশল অবলম্বন ক'রে এলাহাবাদ দুর্গ অধিকার করার সংবাদ পেয়ে মুহম্মদ কুলি খান ও শাহজাদা গওহর পাটনা অবরোধ ত্যাগ ক'রে এলাহাবাদের দিকে ফিরে যান ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৬৯ পৃঃ)। এই সময় মঁসিয়ে ল' শাহজাদার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে পাটনা আক্রমণ করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু শাহজাদা অর্থাভাবে পাটনা আক্রমণ করতে অক্ষমতা জানান। এই সময় শুজা-উদ-দৌলা তাঁর চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে হীন বিশ্বাসঘাতকতার পরিবর্তে তাঁকে সাহায্য করলে বিহারের অবস্থা অন্যরূপ হতে পারত। এ সম্বন্ধে 'সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৭০ পৃষ্ঠায় মঁসিয়ে ল'র মন্তব্য দেখুন। শুজা-উদ দৌলার আদেশ অনুসারে বানারসে মুহম্মদ কুলি খানের অগ্রগতি রোধ করা হয় এবং শাহজাদা ও মঁসিয়ে ল'কে মীর্জাপুর হয়ে ছতরপুর দিয়ে বুন্দেলখণ্ড অভিমুখে যেতে দেয়া হয়। মুহম্মদ কুলি খানকে শুজা-উদ-দৌলার নিকট নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। ইতিমধ্যে কর্নেল ক্লাইভকে সঙ্গে নিয়ে মীরন পাটনা পৌঁছান; রামনারায়ণ তাঁদের নিকট হাজির হন; এবং 'সিয়ারে'র লেখক গোলাম হোসেন

খানের মাধ্যমে শাহজাদা আলী গওহরের সঙ্গে বাহ্যতঃ কূটনৈতিক পত্রালাপ শুরু হয়।

স্বল্পকাল পরে তিরহুত-সামাইয়ের জমিদার দিলীর খান ও কামগার খানের আমন্ত্রণে শাহজাদা আলী গওহর পুনরায় বিহার আক্রমণ করেন। এবারে ক্যাপ্টেন কক্‌রেনের অধীনে ইংরেজ সৈন্য রামনারায়ণকে সাহায্য করে। মি. আমিয়ট তখন পাটনা কুঠির প্রধান ছিলেন এবং ডক্টর ফুলার্টন কুঠির চিকিৎসক ছিলেন। 'সিয়ারে'র লেখক গোলাম হোসেন ফুলার্টনের বন্ধু ছিলেন ও এই সময় তাঁর গৃহে অতিথি হয়েছিলেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৭৬ পৃঃ)। এই সময় ইমাদ-উল-মুল্‌কের আদেশে বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরকে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে হত্যা করা হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৭৬ পৃঃ)। গোলাম হোসেন খানের পিতা তখন বিহার প্রদেশের হোসেনাবাদে থাকতেন। আলী গওহর তাঁর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ১১৭৩ হিজরীতে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন এবং শুজা-উদ-দৌলাকে উজীর ও নজীব-উদ-দৌলাকে সেনাপতি পদে নিয়োগ করেন। অতঃপর কামগার খান মুইন, আসালত খান ও দিলীর খান বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে বিহার আক্রমণ করার জন্য প্রলুব্ধ করেন। এই সময় রামনারায়ণ 'ধানা' নদীর তীরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। শাহ আলম এই যুদ্ধে রামনারায়ণকে পরাজিত করেন ও রামনারায়ণ আহত হন। ক্যাপ্টেন কক্‌রেন ও মি. বারওয়ালের নেতৃত্বে যে ইংরেজ সৈন্যরা রামনারায়ণকে সাহায্য করছিল, তারাও পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হয়। পাটনা বাদশাহের হস্তগত হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৭৮ পৃঃ)। এই যুদ্ধে উমর খানের পুত্রদ্বয় দিলীর খান ও আসালত খান বীরত্বের সাথে যুদ্ধ ক'রে নিহত হন। অল্পকাল পরে কর্নেল ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্যগণসহ মীরন উপস্থিত হন। বাদশাহের পক্ষে কামগার খান, কাদিরদাদ খান ও গোলাম শাহ সেনাপতি ছিলেন। কাদিরদাদ খান সাহসের সাথে মীরনের সৈন্যবাহিনীকে পশ্চাদ্দিক

থেকে আক্রমণ করেন; বীরবিক্রমে যুদ্ধ ক'রে মুহম্মদ আমিন খানকে (মীরনের মাতুল) হত্যা করেন। মীরনকেও আহত করেন এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করেন। মীরন পলায়ন করেন। এরপর ইংরেজরা কামান থেকে গোলাবর্ষণ করতে থাকে; একটি গোলার আঘাতে কাদিরদাদ নিহত হন। এরপর মীরন বিজয়ী হন। কামগার খান বাদশাহকে সঙ্গে নিয়ে বিহার অভিমুখে অগ্রসর হন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৮০ পৃঃ)। অতঃপর কামগার খান ও বাদশাহ অতর্কিতে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের মতলব করেন ও বর্ধমান অভিমুখে অগ্রসর হন। মীর জাফরও নিজের সৈন্যগণ ও ইংরেজ সৈন্যসহ বর্ধমান অভিমুখে অগ্রসর হন। কামগার খান তখন বাদশাহকে নিয়ে আজিমাবাদের দিকে অগ্রসর হন এবং মঁসিয়ে ল' এই সময় পৌঁছান ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৮০ পৃঃ)। এই সময় খাদিম হোসেন খান ও দুলাব রাম (ইনি তখন তাঁর পুরাতন সহযোগী-ষড়যন্ত্রকারী মীর জাফরের উপর বিতৃষ্ণ হয়ে উঠেছিলেন) গোপনে বাদশাহকে সাহায্য পাঠান। বাদশাহ ও কামগার খান তখন মঁসিয়ে ল' ও জয়েন-উদ-দীন খানের সাহায্যে পাটনা দুর্গ আক্রমণ করেন। অত্যন্ত তৎপরতার সাথে বারবার আক্রমণের ফলে দুর্গের পতন যখন আসন্ন, এমনি সময় ক্যাপ্টেন নক্সের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সময়মত উপস্থিত হওয়ার ফলে অবরোধ উঠিয়ে নেয়া হয়। বাদশাহ ও কামগার খান তখন পাটনা থেকে কিছুদূর গিয়ে রাজস্ব সংগ্রহ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে মীরনের প্রতি পূর্ব-শত্রুতাবশতঃ খাদিম হোসেন পাটনা আক্রমণের জন্য এক বৃহৎ সৈন্যদলসহ হাজিপুর পৌঁছান। কিন্তু ক্যাপ্টেন নক্স সিতাব রায়ের সাহায্যে তাদের পরাজিত করেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৮৫ পৃঃ)। অব্যবহিত পরে কর্নেল ক্লাইভ ও ইংরেজ-সৈন্যদলসহ মীরন উপস্থিত হওয়ায় খাদিম হোসেন তাদের মিলিত সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ করার অক্ষমতা উপলব্ধি ক'রে বেথিয়ার দিকে পশ্চাদ্গমন করেন এবং সেখানে এক রাত্রে শিবিরে ঘুমন্ত অবস্থায় বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু

হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৫৮ পৃঃ)।

৫. মুদ্রিত ফার্সী সংস্করণ স্পষ্টতঃ মুঙ্গের জেলার 'চাকাই' স্থলে 'যাকাই' ছাপানো হয়েছে। 'চাকাই' এই পথে পড়ে।

৬. 'খাস্তি' বা 'কণ্টাই' (কাঁথি) মেদিনীপুর জেলায়। আমার মনে হয় ফার্সী সংস্করণ ছাপার সময় ভুলে 'খাস্তি' ছাপানো হয়েছে। বিহার থেকে বর্ধমানের পথে 'খাস্তি' পড়ে না। সম্ভবতঃ 'কাঁদি' হবে।

৭. অর্থাৎ, দামোদর নদী।

৮. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' 'আমানাহ্ বেগম'।

৯. জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকার ফৌজদার জসরত খানের প্রসংশায় অন্ততঃ বলতে হয় যে, তিনি এই নারকীয় বা বীভৎস হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেন ও পদত্যাগ করতে চান। 'সিয়ার' থেকে দেখা যায়, মীর জাফর পরে জসরত খানকে ধাপ্পা দিয়েছিলেন এবং তাঁকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, মীরন বিহারে চলে যাওয়ায় বেগমদের মুর্শিদাবাদে নিরাপদে রাখা যাবে ও এই ধাপ্পা দিয়ে মীর জাফর বেগমদের বাকির খানের হাওয়ালে ক'রে দেয়ার জন্য জসরত খানকে রাজী করেছিলেন।

১০. এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের দ্বারা পর্যাপ্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, মীর জাফর ও মীরন ঘৃণ্য অত্যাচারী ছিলেন। বহুনিন্দিত সিরাজ-উদ-দৌলার কার্যাবলীর মধ্যে এরূপ বীভৎস ঘটনার তুলনা বা দৃষ্টান্ত নাই ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৬৮৯ পৃঃ দ্রঃ)। আরো দেখা যায়, আমিনা বেগম নদীতে ঝাঁপ দেয়ার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁকে ও তাঁর ভগ্নীকে এরূপ অমানুষিক বর্বরতার সাথে হত্যা করার জন্য যেন বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হয়। 'সিয়ারে' আরো বিবৃত হয়েছে, যে-রাত্রে আলীবর্দী খান মহবত জং-এর কন্যাদ্বয়ের—ঘসেটি বেগম ও আমিনা বেগম (যথাক্রমে সাহামত জং ও হায়বত জং-এর বেগম)—ঢাকার সন্নিকটে পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়, সেই রাত্রেই মীরনেরও শিবিরে

বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়।

১১. 'সিয়ারে'র বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, এখানে গণ্ডক নদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. রাজবল্লভ ঢাকার অধিবাসী। হোসেন কুলি খান যখন ঢাকায় সাহামত জং-এর দেওয়ান ছিলেন, তখন রাজবল্লভ তাঁর পেশকার ছিলেন।

১৩. 'সিয়ার' থেকে দেখা যায়, মঁসিয়ে ল'র কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

১৪. মীর কাসিম মীর জাফরের অন্যতম জামাতা ছিলেন। তাঁকে রংপুরের ফৌজদারি ছাড়াও পূর্নিয়ার ফৌজদারি দেয়া হয়। মীর কাসিম কোনো রাজকীয় কার্যে কলকাতা গিয়েছিলেন। সেইসময় ক্লাইভের স্থলাভিষিক্ত কলকাতার গবর্নর মি. ভন্সিটার্টের মনে তাঁর সম্বন্ধে উত্তম ধারণা জন্মায়। এই সময় সৈন্যদের বেতন বাকী থাকায় তারা মীর জাফরকে তাঁর প্রাসাদে ঘেরাও করে। কলকাতার ইংলিশ কাউন্সিলের সাহায্যে অযোগ্য মীর জাফরের স্থলে মীর কাসিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নাজিম হন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৯৫ পৃঃ)। কলকাতার গভর্নর মি. ভন্সিটার্ট ও তাঁর কাউন্সিলস্থ সহযোগী মি. হেস্টিংসের আনুকুল্যে মীর কাসিম গদি দখল করতে পেরেছিলেন। এঁরা দু'জনেই মীর কাসিমের মসনদে আরোহণের সময় মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলেন। মীর জাফর কলকাতায় প্রহরাধীন ছিলেন।

১৫. 'সিয়ারে' উক্ত হয়েছে যে, মীর কাসিমের পিতার নাম সৈয়দ মর্তুজা; এর পিতার নাম ইমতিয়াজ খান ওরফে 'খালিস'।

১৬. মীর জাফর সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছিল। যেদিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন, দেখা যায়, বহুনিন্দিত সিরাজ-উদ-দৌলা থেকেও তিনি নিকৃষ্ট ছিলেন। সিরাজ অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধি ও অন্তরের দিক দিয়ে মীর জাফর অনেক নীচে ছিলেন। সেনাপতি অথবা প্রশাসক হিসেবে মীর জাফর অপেক্ষা সিরাজ অধিকতর যোগ্য ছিলেন। মানুষ হিসাবে মীর

জাফর অথবা তাঁর কুখ্যাত পুত্র মীরন অপেক্ষা সিরাজ অনেক ভাল ছিলেন। 'সিয়ারে' বলা হয়েছে, বিপ্লবের অল্পদিন পরে মীর জাফরের পূর্বতন সমর্থকগণ দুঃখ প্রকাশ ক'রে সিরাজের আমলকে ফিরে চাইতো। দুলাব রাম ও জগৎশেঠের মতো সহযোগী ষড়যন্ত্র-কারীদের বন্ধুত্ব রক্ষা করার মতো যোগ্যতা মীর জাফরের ছিল না। বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও নিজামতের মসনদ প্রাপ্তির পর মীর জাফর ভোগ-সম্ভোগে লিপ্ত হয়ে পড়েন ও রাজকার্যে অবহেলা করতে থাকেন। মি. ভন্সিটার্ট ও মি. হেস্টিংস প্রথমে মীর জাফরের নাজিম পদবী ও মর্যাদা রক্ষা ক'রে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মীর কাসিমকে প্রধান প্রশাসক বা এডমিনিস্ট্রেটর-জেনারেলরূপে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু মীর জাফর এই ব্যবস্থায় সম্মত না হওয়ায় তাঁকে বন্দী হিসেবে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং মীর কাসিমকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নওয়াব নাজিমরূপে ঘোষণা করা হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৬৯৫ পৃঃ)।

১৭. বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হওয়ায় রাজবল্লভ এই সময় পাটনায় মীরনের সৈন্যবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ছিল।

১৮. 'সিয়ারে' (ফার্সী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৭১১ পৃঃ) দেখা যায়, তিরহুত, শাহাবাদ ও আজিমাবাদের অভিযান সমাপ্তির পর এবং রাম-নারায়ণ ও রাজবল্লভকে কারারুদ্ধ ক'রে তাদের স্থলে রাজা নওবত রায়কে পাটনার ডেপুটি সুবাদারের পদে নিযুক্ত ক'রে মীর কাসিম ১১৭৫ হিজরীতে মুঙ্গের যান ও সেখানে বাস করতে থাকেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭১১ পৃঃ)। সপ্তাহে দু'দিন নওয়াব নিজে বিচার করতেন ; নিজে প্রতিটি রাজকার্য দেখতেন ; যত দরিদ্রই হোক প্রত্যেকের অভিযোগ ধীরভাবে শুনতেন ; বিচারে ঘুষ অথবা দুর্নীতি বরদাশ্‌ত করতেন না। প্রজাদের সুখ ও সৈন্যদের আরামের প্রতি তিনি সর্বদা তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন। সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী তৈরী করেছিলেন। শত্রু ও অন্যায়কারীদের নিকট তিনি ভীতিপ্রদ ছিলেন। রাজকার্যের সকল ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ প্রভাব

দেখা যেতো। শত্রু-মিত্রসকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। এমনকি ইংরেজরাও তাঁকে দেশের শক্তিরূপে গণ্য করতো—মীর জাফরের মতো ছায়া মনে করতো না। তিনি বিদ্যা ও বিদ্বানদের সম্মান করতেন; বিদ্বান, আলেম ও আউলিয়াদের সঙ্গ ভালবাসতেন। কেবল সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি আর্মেনীয় দুর্বৃত্ত গুরগন খানকে অগাধ বিশ্বাস করেই তিনি মারাত্মক ভুল করেছিলেন। গুরগন খান ভিতরে ভিতরে তাঁর ধ্বংসসাধনে দৃঢ়সংকল্প ছিল। এই মারাত্মক ভুলের জন্যই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁকে বিবাদে লিপ্ত হোতে হয় ও ফলে তাঁর শক্তির পক্ষে মারাত্মকরূপে ক্ষতিকর হয়েছিল ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ৭১২ পৃঃ দ্রঃ)।

১৯. দেখা যায় যে, ইংরেজ সেনাপতি মেজর কার্নাক বাদশাহের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতঃ বাদশাহকে পাটনা আসতে প্রলুব্ধ করেন। এই সময় ভারতের রাজনৈতিক দাবার ছকে দ্রুত অদ্ভুত ও পরিবর্তনশীল গুটির চাল চলছিল। ঐতিহ্য ও ভাবাবেগের পরিবর্তে প্রত্যেকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৎপর হয়ে উঠেছিল ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭০০, ৭০৩-৭০৪ পৃঃ দ্রঃ)। এই সময় আহমদ শাহ আবদালী অবার ভারত আক্রমণ ক'রে মারাঠাদের পরাজিত করেন এবং শুজা-উদ-দৌলা, নজিব-উদ-দৌলা ও অন্য আফগানদের তাঁর (আবদালীর) শ্যালক বাদশাহ শাহ আলমের প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশ দিয়ে যান ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭০৬ পৃঃ দ্রঃ)।

২০. এই মন্তব্যের সমর্থনে কোনো প্রমাণ নেই। বরঞ্চ দেখা যায় যে, আহমদ শাহ আবদালী মারাঠাদের শোচনীয়রূপে পরাস্ত ক'রে ফিরে যাওয়ার সময়ের নির্দেশ অনুযায়ী অযোধ্যার সুবাদার শুজা-উদ-দৌলা শাহ আলমকে অভ্যর্থনা করায় ও তাঁকে দিল্লীতে তাঁর পৈতৃক সিংহাসনে বসাবার জন্য অযোধ্যার সীমান্তে এসেছিলেন (সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন, ২য় খণ্ড, ৭০৫-৭০৬ পৃঃ দ্রঃ)।

২১. এই সময় প্রশাসনিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। নওয়াব

মীর কাসিম বিহারের ডেপুটি সুবাদার রামনারায়ণের নিকট হিসাব তলব করেন। রামনারায়ণ বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করার অপরাধে দোষী হওয়ায় নওয়াব তাকে বরখাস্ত ও কারারুদ্ধ করেন; সেইসঙ্গে তার সমস্ত সম্পত্তি ও মালমাত্তা বাজেয়াফত করেন। রামনারায়ণের সহকর্মী সেতাব রায়কেও সন্দেহ করা হয়; নওয়াব তাকেও বরখাস্ত করেন। নওয়াব বিহারের শাসনব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করেন ও রাজবল্লভকে সেখানে ডেপুটি হিসেবে রাখেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭০৭ পৃঃ)। পরে রাজবল্লভকে কারারুদ্ধ করা হয় ও রাজা নওবত রায়কে উক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়। অল্পদিন পরে তার স্থলে মীর মেহ্দি খানকে নিযুক্ত করা হয়। গুরগন খান নামক জনৈক আর্মেনীয়কে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয় এবং নওয়াব তার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালীন ঘটনায় এই আর্মেনীয় বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়। নওয়াব বহুসংখ্যক গুপ্তচর নিযুক্ত করেন ও সকল সংবাদ রাখতেন। মীর মেহ্দি খানকে তিরহুতের এবং মুহম্মদ তকি খানকে বীরভূমের ফৌজদার নিযুক্ত করেন।

২২. নওয়াব কাসিম আলী ও ইংরেজদের মধ্যে এই কারণে (ইংরেজদের নিকট শুল্ক দাবী করায়) বিবাদ আরম্ভ হয়। 'সিয়ারে' (২য় খণ্ড, ৭১৫ পৃঃ) গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহের বিশদ বিবরণ আছে। ১১৭৬ হিজরীতে ইংরেজ কোম্পানীর কলিকাতাস্থ তৎকালীন গবর্নর মি. ভন্সিটার্ট মুঙ্গেরে নওয়াবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও বহু বিষয়ে আলোচনা করেন। নওয়াব তখন মি. ভন্সিটার্টকে জানান যে, ইংরেজ কোম্পানীর নামে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্য দেশের অভ্যন্তরে বিনা শুল্কে চালানো হচ্ছে ও তজ্জন্য সরকারের গুরুতর ক্ষতি হচ্ছে; এমতাবস্থায় ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিজস্ব বাণিজ্য ব্যতীত অন্য সকলের শুল্ক দেয়া উচিৎ। মি. ভন্সিটার্ট নওয়াবকে অনুরোধ করেন যে, তাঁর (ভন্সিটার্টের) কলকাতা ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত তাড়াতাড়ি

যেন কিছু করা না হয় এবং আরো বলেন যে, কলকাতা ফিরে তিনি এ সম্বন্ধে আদেশ জারী করবেন ও নওয়াবকেও সংবাদ দেবেন। এই কথায় নওয়াবের বিশ্বাস হয় যে, তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা হবে। সেইজন্য বিনা শুল্কে যাতায়াতের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখার জন্য তিনি তাঁর আমিলদের আদেশ দেন এবং আরো জানান যে, বিশদ ও সম্পূর্ণ হুকুম পরে জানানো হবে। আমিলগণ এই আদেশ অনুসারে কয়েকটি ক্ষেত্রে মাল নিয়ে যাওয়া বন্ধ করে। ফলে পাটনা কুঠির মি. এলিসন ও ঢাকা কুঠির মি. ব্যাটেসন কয়েকজন আমিলকে গ্রেফতার ক'রে কলকাতায় পাঠায়। এই সংবাদ প্রাপ্তির পর নওয়াব এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ইংরেজদের গোমস্তাদের গ্রেফতার করার হুকুম দেন এবং সকল (দেশী বিদেশী সকল বণিকের) শুল্ক বাতিল ক'রে দেন। কারণস্বরূপ নওয়াব বলেন যে, যেখানে ধনী ব্যবসায়ীদের শুল্ক মাফ, সেখানে দরিদ্র ব্যবসায়ীরা যারা সরকারী রাজস্বের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র দিয়ে থাকে, তাদের নিকট শুল্ক আদায় করা অন্যায়। এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য কলকাতার কাউন্সিল মি. আমিয়টকে দূতস্বরূপ মুঙ্গের প্রেরণ করে। মি. ভন্সিটার্টের এক বন্ধুত্বপূর্ণ পত্র দ্বারা কলকাতা কাউন্সিলের দাবী স্বীকার করার জন্য নওয়াবকে অনুরোধ করেন। নওয়াব সেনাপতি গুরগন খানের সঙ্গে পরামর্শ করেন। গুরগন খান নওয়াবকে মি. ভন্সিটার্টের পরামর্শ না শোনার পরামর্শ দেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৬০ পৃঃ)। ইতিমধ্যে গুরগন খান নেপাল বিজয়ের উদ্দেশ্যে এক ব্যর্থ অভিযানে নওয়াবের সৈন্যবাহিনীর শ্রেষ্ঠ অংশ ধ্বংস করেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭১৭ পৃঃ)। ইংরেজদের অবৈধ কার্যের প্রতিকারের জন্য নওয়াব উজীর শুজা-উদ-দৌলা ও বাদশাহের সাহায্য প্রার্থনা করেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭১৮ পৃঃ)। নওয়াব আরো তাঁর সুযোগ্য ও অনুগত বীরভূমের ফৌজদার মুহম্মদ তকি খানকে জগৎশেঠ মাহ্‌তাব রায় ও তাঁর ভ্রাতা মহারাজা স্বরূপচাঁদকে (এরা জগৎশেঠ ফতেহ্‌চাঁদের পৌত্র) উপযুক্ত প্রহরাধীনে মুর্শিদাবাদ থেকে

মুঙ্গের পাঠাতে আদেশ দেন। এই আদেশ অনুযায়ী মুহম্মদ তকি খান তাদের মুঙ্গের প্রেরণ করেন। সেখানে তাদের প্রহরাধীনে রাখা হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭২১ পৃঃ)। মি. আমিয়ট মুঙ্গের আসছেন শুনে নওয়াব মীর আবদুল্লা ও (সিয়ারেব গ্রন্থকার) গোলাম হোসেন খানকে মি. আমিয়টের আসার উদ্দেশ্য জানতে পাঠান। কারণ, এঁদের সঙ্গে মি. আমিয়টের ঘনিষ্টতা ছিল ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭১২ পৃঃ)। মি. আমিয়টের দৌত্য ব্যর্থ হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৪২ পৃঃ)।

২৩. 'রিয়াজে'র বিবরণী সম্পূর্ণ ঠিক নয়। প্রকৃত ঘটনা 'সিয়ারে' বর্ণিত হয়েছে। 'সিয়ারে'র লেখক এই সকল ঘটনায় অংশগ্রহণ করে-ছিলেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭২৫ পৃঃ)। দেখা যায় যে, মি. আমিয়টের ফিরবার পর কলকাতা কাউন্সিল কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই মি. আমিয়ট নিজ দায়িত্বে পাটনা কুঠির প্রধান মি. এলিসনকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোতে লিখেছিলেন। কলকাতা কাউন্সিল কর্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বেই গোপনে সমস্ত ইংরেজ রেজিমেণ্টগুলোকে কুঠিতে একত্রিত ক'রে হঠাৎ পাটনা দুর্গ আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণের জন্য নওয়াবের দুর্গস্থ সৈন্যগণ প্রস্তুত ছিল না ও তারা আশ্চর্যান্বিত হয়। দুর্গ আংশিকভাবে ইংরেজদের হস্তগত হয় ও ইংরেজ সৈন্যরা দুর্গের গৃহসমূহ লুণ্ঠন করে ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭২৬ পৃঃ)। নওয়াব দ্রুত মুঙ্গের থেকে সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করেন। সাহায্যার্থে প্রেরিত সৈন্যদের নিয়ে নওয়াবের পাটনাস্থ ডেপুটি সুবাদার মীর মেহ্‌দি খান দুর্গ আক্রমণ ক'রে পুনরুদ্ধার করেন ও ইংরেজদের কুঠিও দখল করেন। তখন ডাক্তার ফুলার্টন এবং অন্য ইংরেজদের ও সৈন্যদের নিয়ে মি. এলিসন ছাপরা পলায়ন করেন ও সেখান থেকে সরজু যান। সারনের ফৌজদার বাঙালী রামনিধি ও ফরাসী সোমরু সেখানে তাদের বন্দী ক'রে মুঙ্গের নিয়ে আসেন। মুঙ্গেরে তাদের কারারুদ্ধ করা হয়। এরপর ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭২৭ পৃঃ দ্রঃ) ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ

আরম্ভ হওয়ার সংবাদ নওয়াব সকল ফৌজদার ও সেনাপতিদের জানান এবং যেখানেই ইংরেজদের পাওয়া যাবে সেখানেই তাদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। উক্ত হুকুম অনুসারে মি. আমিয়টকে মুর্শিদাবাদে হত্যা করা হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭২৭ পৃঃ)। নওয়াব 'বিশেষ একটা দিনে' ইংরেজদের হত্যা করার অথবা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে তাদের হত্যা করার হুকুম দিয়েছিলেন ব'লে 'রিয়াজে'র বর্ণনা, অধিকতর প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য 'সিয়ারে'র বর্ণনার সঙ্গে মিলে না।

২৪. কোন্ যুদ্ধের কথা এখানে রিয়াজ উল্লেখ করেছেন, তা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে না। পূর্বোক্ত টীকা থেকে দেখা যাবে যে, প্রথম যে যুদ্ধে নওয়াবের সৈন্যরা জয়ী হয়েছিল, সেটা ইংরেজরা অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা পাটনা দুর্গ দখল করার পর উক্ত দুর্গ পুনর্দখলের জন্য হয়েছিল। 'সিয়ারে' প্রদত্ত বর্ণনা থেকে এটা দেখা যায় না যে, এই বিজয়ের পরই নওয়াব 'সকল ইংরেজকে' হত্যা করেছিলেন। পরন্তু, নওয়াব ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সংবাদ তাঁর কর্মচারীদের জানিয়েছিলেন এবং সর্বত্র ইংরেজ নিধনের আদেশ তাঁর কর্মচারীদের দিয়েছিলেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭২৭ পৃঃ)। উক্ত আদেশ অনুসারে মুর্শিদাবাদে মি. আমিয়টকে হত্যা ও কাসিমবাজার কুঠি লুঠ করা হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭২৭-৭২৮ পৃঃ)। তারপর ইংলিশ কাউন্সিল কলকাতায় সমবেত হয়ে নওয়াবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মীর জাফরকে (যিনি কলকাতায় প্রহরাধীন ছিলেন) বাংলার নওয়াব নাজিম-রূপে ঘোষণা করে ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৬৮-৭৬৯ পৃঃ)। ইতি-মধ্যে নওয়াব বীরভূমের ফৌজদারকে (মুহম্মদ তকি খানকে) ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হোতে নির্দেশ দেন এবং জাফর খান, আলম খান, শেখ হায়বতউল্লাহ ও অন্য সেন্যাধ্যক্ষদের মুহম্মদ তকি খানের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। উক্ত তিনজন সৈন্যাধ্যক্ষ মুর্শিদাবাদ গিয়ে ডেপুটি নাজিম সৈয়দ মুহম্মদ খানের

নিকট থেকে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পলাশী ও কাটোয়ায় শিবির স্থাপন করে ; অন্যদিকে মুহম্মদ তকি খান সসৈন্যে বীরভূম থেকে কাটোয়া যান ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭২৮ পৃঃ)।

২৫. নওয়াব মীর কাসিম পাটনা দুর্গ পুনর্দখলের জন্য যুদ্ধে মাত্র একবারই জয়ী হয়েছিলেন। এই সকল ঘটনা সম্পর্কে 'রিয়াজে'র বিবরণী 'সিয়ারে'র বিবরণীর মতো বিশদ বা পরিষ্কার নয়। 'সিয়ারে'র লেখক গোলাম হোসেন খান এই সকল ঘটনায় হয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, অথবা প্রত্যক্ষ দেখেছিলেন। 'সিয়ার' থেকে দেখা যায়, পাটনা দুর্গ পুনর্দখলের পর ইংরেজদের সঙ্গে নওয়াবের সৈন্যদের পরবর্তী যুদ্ধ হয়েছিল কটোয়ায়। বীরভূমের ফৌজদার মুহম্মদ তকি খান বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করা সত্ত্বেও কোনো ফল হয় নাই। কারণ, মুর্শিদাবাদের ডেপুটি নাজিম সৈয়দ মুহম্মদ খান আক্রোশবশতঃ তাঁকে সাহায্য করেন নাই ; এমনকি, জাফর খান, আলম খান ও শেখ হায়বতউল্লাহ্‌কেও বাধা দিয়েছিলেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭২৯-৭৩১ পৃঃ)। এরপর ইংরেজরা মীর জাফরকে নিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৩১ পৃঃ)। মুহম্মদ তকি খানের মতো বীর সেনাপতির পতনে নওয়াব অস্থির হয়ে ওঠেন। তখন তিনি দ্রুত সোমরু, আর্মেনীয় মালাকর ও আসাদউল্লার নেতৃত্বে সৈন্য প্রেরণ করেন ও তাদেরকে সুতির যুদ্ধে পরাজিত সৈন্যদের সঙ্গে কটোয়ায় মিলিত হোতে নির্দেশ দেন। ইংরেজ সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন মেজর এডাম্‌স। সুতির যুদ্ধে নওয়াবের সৈন্যগণ পরাজিত ও ইংরেজরা জয়ী হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৩২-৭৩৩ পৃঃ)।

সুতির যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে নওয়াব তাঁর বেগমদের ও সন্তানদের রোটাস দুর্গে পাঠিয়ে দেন এবং সেনাপতি আর্মেনীয় গুরগন খানকে নিয়ে আধুয়ানালার তীরে অবস্থিত তাঁর সৈন্যদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। আধুয়ানালা নামক ক্ষুদ্র নদী রাজমহলের উত্তরে, পাহাড় থেকে বেরিয়ে গঙ্গায় মিশেছে। এই

স্থানটি রণকৌশলের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্ভেদ্য বলে পরিগণিত ছিল। একটি মাত্র গুপ্তপথ দিয়ে এখানে পৌঁছানো যায় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৩৪ পৃঃ)। ১১৭৭ হিজরীর ২৪শে মুহররম তারিখে নওয়াব মুঙ্গের দুর্গ থেকে যাত্রা করেন। কর্মচারীগণের ও বন্দীদের বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ ক'রে (গুরগন খান তাঁর সন্দেহে ইন্ধন জুগিয়েছিল) নওয়াব মুঙ্গের ত্যাগের পূর্বে বিহারের প্রাক্তন নায়েব সুবাদার রাজা রামনারায়ণ, নওয়াব সাহামত জং-এর প্রাক্তন দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ, রায় রায়ান উমেদ রাম, রাজা ফতেহ্ সিং, টিকারীর জমিদার রাজা বুনিয়াদ সিং, শেখ আবদুল্লা ও অন্য বন্দীদের হত্যা করেন। রামনারায়ণের গলায় বালুকাপূর্ণ কলসী বেঁধে মুঙ্গের দুর্গের নিচে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। এই হত্যাকাণ্ডেও সন্তুষ্ট না হয়ে পাটনা কুঠির মি. এলিসন, ডাক্তার ফুলার্ট'ন ও অন্য ইংরেজ বন্দীদেরও হত্যা করার জন্য নওয়াবকে প্ররোচিত করে। নওয়াব তাদের হত্যা করতে অস্বীকার করেন ও তাদের পাহারা দেয়ার অতিরিক্ত প্রহরী বরাদ্দ করেন। কামগার খান মুইন চম্বানগর নালায় শিবির সন্নিবেশ কবেছিলেন। তিনিও নওয়াবের সঙ্গে যোগ দিতে আসেন; কিন্তু বিশ্বাসঘাতক গুরগন খান তাঁকে বীরভূম পাঠিয়ে দেয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৩৫ পৃঃ)। এই সময় পুর্নিয়ার নওয়াব সইফ খানের পুত্র মীর রুজ-উদ-দীন নওয়াব মীর কাসিমের সৈন্যবাহিনী ত্যাগ ক'রে পুর্নিয়া চলে যান ও সেখানকার প্রভু হয়ে বসেন এবং মীর জাফর আলী খান ও ইংরেজদের সঙ্গে পত্রবিনিময় আরম্ভ করেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৩৬ পৃঃ)। আধুয়ায় নওয়াবের সৈন্যরা প্রায়ই রাত্রিকালে গুপ্তপথে বেরিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের বিপর্যস্ত ক'রে তুলতো। একবার তারা মীর জাফরের শিবির পর্যন্ত আক্রমণ করেছিল (মীর জাফর ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে আধুয়া এসেছিলেন)। মীর জাফর পলায়নের উদ্যোগ করছিলেন; সেইসময় ইংরেজ সৈন্যগণ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে

আসে। এই সকল ধ্বংসকর নৈশ-আক্রমণের ফলে ইংরেজ সৈন্যগণের মধ্যে আতংক উপস্থিত হয় এবং আক্রমণের গুপ্তপথের সন্ধান তারা কোনো মতেই স্থির করতে পারছিল না। জনৈক ইংরেজ সৈনিক বহুদিন পূর্বে ইংরেজ সৈন্যদল ত্যাগ ক'রে নওয়াবের অধীনে চাকরী নিয়েছিল। সে এই সময় উক্ত গুপ্তপথের সন্ধান ইংরেজদের দেয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৩৭ পৃঃ) এবং আধুয়ায় নওয়াবের ঘাঁটিতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই ব্যক্তির সাহায্যে কর্নেল গডার্ড একটি ইংরেজ রেজিমেণ্ট নিয়ে রাত্রিকালে নওয়াবের সুরক্ষিত ঘাঁটিতে প্রবেশ করে। ঘাঁটিটি দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত এবং সেখানে যাওয়ার গুপ্তপথ ইংরেজদের অজ্ঞাত কল্পনা ক'রে নওয়াবের সৈন্যরা নিজেদের নিরাপদ মনে ক'রে অসতর্ক ছিল। আসাদউল্লাহ খানের অধীনস্থ নওয়াবের সৈন্যবাহিনী, ফরাসী সোমরু এবং আর্মেনীয় মাল্‌ফার ও এণ্টনি ইংরেজদের নৈশ-আক্রমণের ফলে বিহ্বল ও পরাজিত হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৩৮ পৃঃ)। ১১৭৭ হিজরীর ২৬শে সফর তারিখে নওয়াবের সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই বিপর্যয়ের সংবাদ দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে নওয়াবের নিকট পৌঁছায়। তিনি তখন মুঙ্গের দুর্গে চলে যান। সেখানে দুই বা তিন দিন থাকার পর গুরগন খানের পোষ্য ও আশ্রিত আরব আলী খানের নিকট মুঙ্গের দুর্গের ভার দিয়ে গুরগন খান ও অন্যদের নিয়ে মুঙ্গের ত্যাগ ক'রে রহুয়ানালা পৌঁছান। এই সময় আলী ইব্রাহীম খান নামক জনৈক নেতৃস্থানীয় আমীর মেসার্স এলিসন, জি. লুশিংটন ও অন্য ইংরেজ বন্দীদের মুক্তি দেয়ার অথবা অন্ততঃ তাদের স্ত্রীদের নৌকাযোগে মেজর এডামসের নিকট পৌঁছে দেয়ার পরামর্শ দেন। নওয়াব তখন আলী ইব্রাহীম খানকে গুরগন খানের সঙ্গে আলোচনা করতে বলেন। নওয়াবের শনিগ্রহ এই আর্মেনীয় বলে যে, নৌকা পাওয়া যায় না এবং আলী ইব্রাহীম খানের মনুষ্যত্বপূর্ণ পরামর্শে কর্ণপাত করলো না। জনকতক অশ্বারোহী সৈন্যের বেতন বাকী থাকায় তারা রাস্তায় গুরগন খানকে হত্যা করে। নওয়াব

রহুয়ানালা থেকে রাঢ় যান। সেখানে জগৎশেঠ ও তাঁর ভ্রাতা স্বরূপচাঁদকে নওয়াবের আদেশে হত্যা করা হয়। সেখান থেকে নওয়াব পাটনা যান ও জানতে পারেন যে, মুঙ্গের দুর্গের অধ্যক্ষ গুরগন খানের অনুগত আয়ুব আলী খান ঘুষ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ইংরেজদের নিকট দুর্গ সমর্পণ করেছে ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৪১ পৃঃ)। নওয়াব ক্রুদ্ধ হন ও তাঁর মন সন্দেহে পূর্ণ হয় এবং অত্যন্ত বিরক্ত হন। তিনি তখন ফরাসী জাতীয় সোমরুকে ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করার আদেশ দেন। ইংরেজদের সমধর্মী হওয়া সত্ত্বেও এই সোমরু ১১৭৭ হিজরীর রবিউল-আউয়ালের শেষ রাত্রে মহবত জং-এর ভ্রাতা হাজী আহমদের বাড়ীতে অবস্থানকারী ইংরেজ বন্দীদের গুলি ক'রে হত্যা করে। তখন থেকে এই বাড়ী পাটনায় ইংরেজদের গোরস্তানরূপে ব্যবহৃত হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৩৯ পৃঃ)। ডাক্তার ফুলার্ট'ন ব্যতীত আর কেউ রেহাই পায় নাই। নওয়াব ফুলার্টনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভি-যোগ করেন ; ফুলার্ট'ন অস্বীকার করেন। নওয়াব তাকে রেহাই দেন। পরে ডাক্তার ফুলার্ট'ন হাজিপুর পালিয়ে গিয়ে ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৪১ পৃঃ)। ইংবেজরা এরপর পাটনা আক্রমণ করে ও তথাকার দুর্গ অধিকার করে ('সিযার', ২য় খণ্ড, ৭৪২ পৃঃ)। নওয়াব অতঃপর কর্মনাশা নদী পার হয়ে নওয়াব উজীর সুজা-উদ-দৌলার এলাকায় প্রবেশ করেন ('সিয়ার', ৭৪৩ পৃঃ)। নওয়াব মীর কাসিম এলাহাবাদের নিকটে নওয়াব উজীর শুজা-উদ-দৌলা ও বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করে এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে ইংরেজ বিতাড়ণের জন্য সাহায্য করতে তাঁদের রাজী করান ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৪৫ পৃঃ)। বাদশাহ, নওয়াব উজীর ও নওয়াব মীর কাসিম বিহার আক্রমণের উদ্দেশ্যে বানারস পর্যন্ত এসে শিবির স্থাপন ক'রে কয়েকদিন অপেক্ষা করেন ('সিয়ার', ৭৩৬ পৃঃ)। নওয়াব উজীর শুজা-উদ-দৌলার আগমনে ভীত হয়ে ইংরেজরা

মীর জাফরসহ (এরা মীর কাসিমের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল) বক্সার থেকে পাটনায় পশ্চাদ্গমন করে। নওয়াব উজীর শুজা-উদ-দৌলা নিজের ও মীর কাসিমের মিলিত বিরাট সৈন্যবাহিনী-সহ ফুলওয়ারীর সন্নিকটে ইংরেজদের নাগাল ধরেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৪৯ পৃঃ)। কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী বিপর্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও মীর কাসিম ও শুজা-উদ-দৌলার মধ্যে মিলিত ব্যবস্থা গ্রহণ না করার দরুন চরম মীমাংসা হয় নাই। এই সময় যে মীর মেহ্দি খান, যিনি মীর কাসিমের পক্ষে বীরত্বসহকারে যুদ্ধ ক'রে ইংরেজদের হাত থেকে পাটনা দুর্গ পুনরাধিকার করেছিলেন, সেই মেহ্দি খান তাঁর পুরাতন প্রভু মীর কাসিমকে ত্যাগ ক'রে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৫০ পৃঃ)।

নওয়াব উজীর তখন মীর কাসিমসহ বক্সারে প্রত্যাগমন করেন ('সিয়ার', ৭৫১ পৃঃ)। এই সময় ডাক্তার ফুলার্ট'ন 'সিয়ারে'র, গ্রন্থকার গোলাম হোসেন খানকে গুপ্তচররূপে ব্যবহার করেন এবং ইংরেজদের সাহায্য করতে ও নওয়াব উজীরের পক্ষ ত্যাগ করতে বাদশাহকে রাজী করার জন্য ফুলার্ট'ন গোলাম হোসেনকে পত্র লেখেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৫১ পৃঃ)। গোলাম হোসেন খান ও তাঁর পিতা (মুঙ্গের জেলার হোসেনাবাদের জায়গীরদার) হেদায়েত আলী খানের অবস্থা এই সময় অদ্ভুত ছিল। তারা একদিকে ফুলার্ট'ন ও ইংরেজদের এবং অন্যদিকে মীর কাসিম ও নওয়াব উজীর উভয়পক্ষের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। উভয় বিরোধী দলের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব ছিল এবং উভয়ের উপরই তাদের প্রভাব ছিল। তাঁরা বাদশাহের সঙ্গে গোপনে পত্রালাপ করেন ও ইংরেজদের সাহায্য করতে তাঁকে প্রবুদ্ধ করেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৫১ পৃঃ)। গোলাম হোসেন খান এই সময় ইংরেজদের গুপ্তচরের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তার সঙ্গে মেজর কার্নাক, ডাক্তার ফুলার্ট'ন ও মীর জাফরের এক বৈঠক হয় এবং গোলাম হোসেন ও অন্য গুপ্তচরদের মারফতে বাদশাহের নিকট

উত্তর প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে শুজা-উদ-দৌলার সঙ্গে মীর কাসিমের বিরোধ উপস্থিত হয় ('সিয়ার', ৭৫২ পৃঃ)। মীর কাসিম এবার ফকিরি অবলম্বন করেন। কিন্তু নিজের সম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেখে শুজা-উদ-দৌলা তাকে ফকিরি ত্যাগ করতে অনুরোধ করেন এবং মীর কাসিমও তাতে সম্মত হন। স্বল্পকাল পরে পাটনার হত্যাকাণ্ডের নায়ক কুখ্যাত সোমরু বিদ্রোহ করে। মীর কাসিম তার পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তাকে বিদায় দেন। অতঃপর এই কুখ্যাত ফরাসী সোমরু তার পূর্ব প্রভু মীর কাসিমের সমস্ত কামান ও গোলাবারুদসহ শুজা-উদ দৌলার অধীনে চাকরী নেয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৫৫ পৃঃ)। নওয়াব উজীর নির্লজ্জভাবে তাঁর আশ্রিত মীর কাসিমকে কারারুদ্ধ করেন। একমাত্র পুরাতন বীর ও বিশ্বস্ত কর্মচারী আলী ইব্রাহীম খান ব্যতীত অন্য সকলে মীর কাসিমকে ত্যাগ করে। সেই বিশ্বাসঘাতকতার কালে আলী ইব্রাহীম খানের বিশ্বস্ততা একটা অসাধারণ ব্যাপার। শুজা-উদ-দৌলা যখন মীর কাসিমের নিন্দা করেন এবং মীর কাসিম আলী ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে কথা বলা সত্ত্বেও তিনি মীর কাসিমের পক্ষ অবলম্বন ক'রে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তখন আলী ইব্রাহীম যে পুরুষোচিত ও মর্যাদাপূর্ণ উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে নওয়াব উজীরের চক্ষেও অশ্রু দেখা দিয়েছিল। আলী ইব্রাহীম বলেছিলেন, "জ্ঞানতঃ আমি আমার প্রভুর (মীর কাসিমের) কর্তব্যের প্রতি কখনো ত্রুটি করি নাই—কেবল একবার ব্যতীত, পাটনার ঘটনাবলীর পর যখন তাঁর অন্য সকল কর্মচারী তাঁকে দক্ষিণে নিয়ে মারাঠাদের সাহায্য নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিল, তখন কেবল একমাত্র আমিই তাঁকে নওয়াব উজীরের ও বাদশাহের নিকট আশ্রয় নিতে জেদ করেছিলাম" ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৫৭ পৃঃ)। সেইসময় পাটনার ইংরেজ সেনাপতি রোটাস দুর্গ ইংরেজদের হস্তগত হওয়ার জন্য প্রভাব বিস্তার করতে ডাক্তার ফুলার্টনের মাধ্যমে 'সিয়ারে'র লেখক গোলাম হোসেন খানকে লেখেন। মীর কাসিমের অধীনস্থ

উক্ত দুর্গের সৈন্যাধ্যক্ষ রাজা শাহুমেলকে গোলাম হোসেন খান প্ররোচিত ক'রে রোটাস দুর্গ ইংরেজ সৈন্যদের নিকট সমর্পণ করতে রাজী করান ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৫৮ পৃঃ)। এবার মীর জাফর মুর্শিদাবাদ ফিরে আসেন এবং ১১৭৮ হিজরীর ১৪ই শাবান তারিখে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয় ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৫৮-৭৫৯ পৃঃ)। মীর জাফর কলকাতা রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তাঁর ভ্রাতা মীর মুহম্মদ কাজিম খানকে পাটনার ডেপুটি নাজিম এবং রামনারায়ণের ভ্রাতা ধিরাজ নারায়ণকে তাঁর অধীনে দেওয়ান নিযুক্ত করেছিলেন। মীর জাফর তাঁর দেওয়ানরূপে নন্দকুমারকে নিযুক্ত করেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৫৯ পৃঃ) এবং রাবেয়া বেগম ও আতাউল্লাহ্ খান সাবেত জং-এর জামাতা ঢাকার (জাহাঙ্গীরনগরের) ডেপুটি নাজিম মুহম্মদ রেজা খানকে কারারুদ্ধ করেন। শুজা-উদ-দৌলার শক্তি ও মর্যাদা এবং বাদশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার দরুন নিন্দিত হওয়ার ভয়ে মীর জাফর ও ইংরেজরা উভয়েই নওয়াব উজীর ও বাদশাহকে বিহার প্রদেশ ছেড়ে দিয়ে ও বাংলার জন্য একটা নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়ে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে উদগ্রীব হয়ে ওঠে ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৬০ পৃঃ)। কিন্তু নওয়াব উজীরের সমগ্র এলাকার উপর প্রভুত্ব করার উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরুন উক্তরূপ আপোস সম্ভব হয় নাই। কলকাতায় মীর জাফরের জীবিতকালেই মেজর মনরো ইংরেজ বাহিনীর সেনাপতিরূপে মেজর কার্নাকের স্থলাভিষিক্ত হন এবং শুজা-উদ-দৌলার কলকাতা কাউন্সিলের নিকট প্রেরিত পত্র অপমানজনক হওয়ায় ১১৭৮ হিজরীর সফর মাসে তাঁর (নওয়াব উজীরের) বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে বক্সার পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার জন্য কাউন্সিল মেজর মনরোকে নির্দেশ দেয়।

নওয়াব উজীর ও তাঁর সৈন্যগণ নিজেদের নিরাপদ মনে ক'রে আরাম-আনন্দ উপভোগে লিপ্ত ছিল—যেন তারা বনভোজন করতে এসেছিল। মেজর মনরোর উপস্থিতির পর নওয়াব উজীর একটি ঝিলের উত্তর-পশ্চিম দিকে তাড়াতাড়ি সৈন্যসমাবেশ করেন।

ইংরেজ সৈন্যগণ ঝিলের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে স্থান নিয়েছিল। নওয়াব উজীর সোমরু ও মাদাককে ৮টি কামান ও মীর কাসিমের ৮টি রেজিমেণ্টসহ সম্মুখভাগে সমাবেশ করেন। নওয়াব উজীরের সৈন্যবাহিনী তিন অংশে বিভক্ত ছিল। নওয়াব উজীর নিজে দক্ষিণ অংশ পরিচালনা করছিলেন এবং মধ্যভাগে ছ'হাজার মুঘল সৈন্য নিয়ে শুজা কুলি খান নেতৃত্ব করছিলেন। বাম অংশ ছিল নওয়াব উজীরের অধীনস্থ অযোধ্যা ও এলাহাবাদের ডেপুটি সুবাদার রাজা বেনী বাহাদুরের অধীনে। সৈন্যবাহিনীর বাম অংশ ছিল গঙ্গার তীরে; উভয়পক্ষ থেকে জোর কামানের গোলাবর্ষণ দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং উভয়পক্ষেরই বিপুল ক্ষতি হোতে থাকে। অতঃপর নওয়াব উজীর তাঁর মুঘল ও দুরানী সৈন্যদের নিয়ে নিজ গোলন্দাজ বাহিনীর দক্ষিণ দিকে মেজর মনরোর অশ্বারোহী সৈন্যদের ও শিবির আক্রমণ করেন এবং ইংরেজ সৈন্যদের ব্যাপক ধ্বংস করতে থাকেন। ইংরেজ সৈন্যগণ তখন ভীষণ চাপে পড়েছিল। মেজর মনরো সংকটাপন্ন পরিস্থিতি উপলব্ধি করে ও সম্মুখস্থ কর্দমাক্ত ঝিলের উপর দিয়ে সম্মুখ আক্রমণ অসম্ভব গণ্য ক'রে দ্রুত একদল সৈন্যকে ক্যাপ্টেন ন্যানের নেতৃত্বে নদীর দিক থেকে শুজা-উদ-দৌলার বাম ভাগে রাজা বেনী বাহাদুরের নেতৃত্বাধীন সৈন্যদের আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। এই ইংরেজ সৈন্যদল ধীরে অগ্রসর হয়ে ময়দানে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেখানে রাজা বেনী বাহাদুরের সৈন্যরা ছিল সেখানে পৌঁছায়। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে এক প্রাচীরের আড়ালে লক্ষ্ণৌর শেখ গোলাম কাদির ও অন্য শেখজাদাগণ বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইংরেজ রেজিমেণ্ট ধীরে সতর্কভাবে ও নিজেদের অস্তিত্ব গোপন রেখে প্রাচীরের ওপরে ওঠে। প্রাচীরের নীচে দণ্ডায়মান সৈন্যদের ওপর যখন ইংরেজ সৈন্যরা পাথর ফেলতে আরম্ভ করে, তখন তাদের নিদ্রাভঙ্গ হয়। কেবল তখনই শেখ গোলাম কাদির, তার আত্মীয়-গণ ও অনুসারীরা ইংরেজ সৈন্যদের উপস্থিতি অবহিত হয়ে যুদ্ধার্থে

দণ্ডায়মান হয়। কিন্তু শেখগণ যুদ্ধার্থে সৈন্যসমাবেশের পূর্বেই ইংরেজ সৈন্যগণ বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করে; তাতে গোলাম কাদির ও তার আত্মীয়রা নিহত হয় ও অন্যরা পলায়ন করে। এই সময় রাজা বেনী বাহাদুর দিল্লীর জনৈক আমীর গালিব খানকে "কি করা কর্তব্য" জিজ্ঞাসা করেন। গালিব খান উত্তর দেন যে, যদি রাজা নিজ সম্মান রক্ষা করতে চান তাহলে যুদ্ধ ক'রে মৃত্যুবরণ করা উচিৎ, নতুবা তার পলায়ন করা উচিৎ। এরপর রাজা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করেন; কিন্তু পরে মৃত্যুবরণ করা সম্পর্কে মত পরিবর্তন ক'রে পালিয়ে যান। ইতিমধ্যে গোলাম কাদির ও রাজা বেনী বাহাদুরের সৈন্যদের দিকে কামানের শব্দ শুনে শুজা কুলি খান ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, রাজার সৈন্যরাই কামানের গোলা ছুঁড়ছে এবং রাজাই তা'হলে বিজয়ের সম্মান লাভ করবেন। প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে সন্ধান না করেই শুজা কুলি খান সসৈন্যে সোমরু ও মাদাকের সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হন; ফলে সোমরু ও মাদাককে গোলাবর্ষণ বন্ধ করতে হয়। শুজা কুলি খান কর্দমাক্ত ঝিলের উপর দিয়েই অগ্রসর হচ্ছিলেন। ইংরেজ গোলন্দাজরা তখন আরো দ্রুত গোলাবর্ষণ করতে থাকে; ফলে শুজা কুলি খান ও তাঁর সৈন্যগণ অকারণে জীবনবিসর্জন দেয়। বেনী বাহাদুর পলায়ন করায় ও শুজা কুলি খান মধ্যভাগ থেকে অগ্রসর হওয়ায় সেই শূন্যস্থান দিয়ে ইংরেজ সৈন্যরা নওয়াব উজীরের পার্শ্বভাগ আক্রমণ করে। নওয়াব উজীরের সৈন্যরা এই চাপে ছত্রভঙ্গ হোতে থাকে। তিনি নিজে কিছুক্ষণ প্রতিরোধ করেছিলেন; কিন্তু সৈন্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত দেখে অবশেষে এলাহাবাদে পশ্চাদ্গমন করেন। ইংরেজ সৈন্যগণ এবং সেইসঙ্গে নওয়াব উজীরের মুঘল ও দুরানী সৈন্যগণ তাঁর শিবিরগুলো লুঠ করতে আরম্ভ করে। নওয়াব উজীর বন্দী মীর কাসিমকে যুদ্ধের আগের দিন মুক্তি দিয়েছিলেন। যুদ্ধের পর মীর কাসিম বানারস পলায়ন করেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৬১-৭৬৩ পৃঃ)।

পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষা ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দের বক্সারের যুদ্ধে শাসক-শক্তি হিসেবে বাংলায় ইংরেজদের স্থান দৃঢ়তর হয়। অল্পদিন পরে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ্ শাহ্ আলম ইংরেজদের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী দেন ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭৭৩ পৃঃ)।

উপরোক্ত তিনটি সুবার রাজস্ব থেকে ইংরেজরা বাদশাহকে বাৎসরিক ২৪ লক্ষ টাকা দেয়ার চুক্তি করেছিল।

এই টীকায় সমকালীন ইতিহাস 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে' বর্ণিত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে দিলাম। 'সিয়ারে'র গ্রন্থকার এই সকল ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে অথবা দর্শকরূপে জড়িত ছিলেন। টীকাটি দীর্ঘ হয়েছে ; কিন্তু যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে বাংলার শাসনক্ষমতা মুসলমানদের হাত থেকে ইংরেজদের হাতে চলে যায়, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেয়া উচিৎ মনে করছি।

২৬. সম্ভবতঃ খড়কপুর নামক স্থানের নাম ফার্সী সংস্করণে ভুল পঠন অথবা ভুল মুদ্রণের জন্য 'খিরাহ্পুর' ছাপা হয়েছে।

২৭. 'সিয়ারে' শেখ হেদায়েত উল্লার নাম 'শেখ হায়বত উল্লাহ' বলা হয়েছে ('সিয়ার', ২য় খণ্ড, ৭২৮ পৃঃ ও পূর্বের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৮. ডাঁইহাট নিশ্চয়ই কাটোয়ার কোনো বাজারের নাম হবে।

২৯. মীর কাসিম কিছুদিন রোহিলাদের এলাকায় ছিলেন। পরে আফগান এলাকার উতরছানাইদি ত্যাগ ক'রে তিনি রানা গহদের এলাকায় চলে যান। সেখান থেকে রাজপুতানা যান। রাজপুতানা থেকে আগ্রা ও দিল্লীর মধ্যবর্তী এলাকায় আসেন এবং এখানে দুঃস্থ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় ('সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ৩য় খণ্ড, ৯৩৩ পৃঃ দ্রঃ)।

৩০. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৭৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩১. 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন', ২য় খণ্ড, ৭৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩২. 'সিয়ারে' (২য় খণ্ড, ৭৮১ পৃঃ) উল্লেখ আছে "২৪ লক্ষ"—১৬ লক্ষ নয়।

৩৩. ইংরেজরা এ দেশকে ৪ ভাগে বিভক্ত করেছিল। যথা : (১) জিলা কলকাতা ; (২) জিলা বর্ধমান ; (৩) জিলা রাজশাহী-মুর্শিদাবাদ ; (৪) জিলা আজিমাবাদ (পাটনা) ; এবং প্রত্যেক জিলায় সকাউন্সিল এক একজন ইংরেজ জিলাদার নিযুক্ত করেছিল।

৩৪. অর্থাৎ, ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ।

পঞ্চম পর্ব ঃ চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১. হাণ্টারের History of British India, ১ম খণ্ড, ২৯ পৃঃ দ্রঃ। ডক্টর হাণ্টার লিখেছেন, "স্যারাসেন আরবগণ ইসলামের বিজয়-সূচক আবেগে প্রণোদিত হয়ে ইন্দো-সিরীয় পথের দেশগুলো জয় করে (৬৩২ ৬৫১ খ্রীঃ) এবং শীঘ্রই এর মূল্য উপলব্ধি করে। তারা যেমন যোদ্ধার, তেমনি ব্যবসায়ীর জাতি ছিল। খলিফাদের অধীনে বসরা ও বাগদাদ ভারতীয় বাণিজ্যের সমৃদ্ধ কেন্দ্র হয়ে ওঠে"। স্যারাসেনরা ৬৩২-৬৫১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইজিপ্ট, সিরিয়া, ও পারস্য জয় করে। উক্ত ইতিহাসের ২৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় লে. কর্নেল কণ্ডারের লেখা The Jews Under Rome শীর্ষক এক প্রবন্ধে প্রাচ্যের সঙ্গে ইহুদীদের বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনার প্রতি ডক্টর হাণ্টার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ডক্টর হাণ্টার আরো বলেন (৪৫ পৃঃ), "ক্যাণ্টনে আরবদের যে বাণিজ্যিক উপনিবেশ ছিল, সেখানে সপ্তম শতাব্দীর গোড়ায় পয়গম্বর মুহম্মদের (দঃ) এক চাচা ছিলেন।" ডক্টর হাণ্টার ৪৬ পৃষ্ঠায় আরো বলেন, "বাণিজ্যিক বিরোধের দরুনই মুসলমানেরা সর্বপ্রথম একটি ভারতীয় প্রদেশ দখল করেছিল। সিংহল থেকে (আরবের দিকে) যাওয়ার সময় সিন্ধু-নদের মোহনায় আরব বণিকদের ও তীর্থযাত্রীদের উপর নির্যাতনের প্রতিবাদে খেসারত দাবী ক'রে কাসিম সিন্ধুরাজ্যের বিরুদ্ধে নৌ-অভিযান পরিচালনা করেন। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীকাল ভারত মহাসাগর ইসলামী রাজ্যের বহির্ভাগরূপে পরিগণিত ছিল। আরব ভৌগোলিকগণ পারস্য উপসাগর থেকে চীন পর্যন্ত সমস্ত পথটিকে সাতভাগে বিভক্ত ক'রে প্রত্যেক অংশকে স্বতন্ত্র নাম

দিয়েছিলেন। চীনের গাস্‌পুয়ার বন্দর ছিল আরবদের পূর্ব সীমান্ত। চতুর্দশ শতাব্দীর রাজবংশীয় ভৌগোলিক আবুল ফেদা (১২৭৩-১৩৩১) আরব ও চীনের মধ্যে মালাক্কাকেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে উল্লেখ করেছেন এবং মুসলমান, ইরানী, হিন্দু ও চীনা সকলেই এখানে (বাণিজ্যের জন্য) আসতো। আমাদের যুগের (অর্থাৎ খ্রীস্টীয় যুগের) প্রথম শতাব্দীতে আরবীয় ও ইহুদীরা বোম্বাই উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এবং তাদের বংশধরেরা বিশিষ্ট সম্প্রদায় হিসেবে আজও সেখানে বাস করছে। বাগদাদের খলিফাদের আমলে—সম্ভবতঃ খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতে—নাবিক সিন্দাবাদের সমুদ্রযাত্রা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের জনপ্রিয় রমন্যাস।" এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের আবির্ভাব-কাল থেকে বাংলাসহ ভারতের উপর স্যারাসেন আরবদের বাণিজ্যিক প্রভাব ছিল।

২. দিল্লীর বাদশাহ জালালউদ্দীন খালজির আমলে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খালজির প্রতিভার ফলে মুসলমানেরা প্রথমে দক্ষিণে (দাক্ষিণাত্যে) বিজয়ী হয় (তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, ১৭০ পৃঃ)।

৩. "সাড়ে চার শতাব্দীকাল অস্তিত্বে থাকার পর ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য তেলিকোটের যুদ্ধে মুসলমানদেব অধীনস্থ হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমান ভাগ্যান্বেষীদের সংযোগের ফলে বাহ্‌মনি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; ১৪৮৯ খ্রীস্টাব্দে তা ভাংতে আরম্ভ করে এবং ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ সম্পূর্ণরূপে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। যখন এই শক্তিশালী রাজ্য অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে দক্ষিণ-ভারতে পাঁচটি মুসলমান রাজ্যে বিভক্ত হোতে চলেছে, সেইসময় পর্তুগীজরা ভারতে আসে। এই সময় (১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে, যখন ভাস্কো-দা-গামা ভারতে অবতরণ করেন) উত্তর-ভারতের আফগান বাদশাহী প্রায় বিলুপ্তির পথে" (ডক্টর হাণ্টারের History of British India, ১ম খণ্ড, ১০১-১০২ পৃঃ দ্রঃ)।

৪. ১৪৮৭ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগালবাসী কোভিলহাম সর্বপ্রথম ভারত

আবিষ্কার করেছিলেন। এডেন থেকে তিনি আরবদের জাহাজে মালাবার উপকূলে এসেছিলেন ও সেখানে কিছুকাল ছিলেন। ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মে তারিখে ভাস্কো-দা-গামা কালিকট পৌঁছান (ডক্টর হাণ্টারের History, ১ম খণ্ড, ৮৭-৮৮ পৃঃ দ্রঃ)।

৫. আমার মনে হয় ইউরোপীয়রা কান্দ্রিনাকে 'কন্‌লন' অথবা 'কালিকোলন' বলতো। কন্‌লন, কালিকোলন, কোচিন্‌ ও কালিকটের জন্য উক্ত ইতিহাসের ৯৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র দেখুন। ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৭) তাঁর দেখা পাঁচটি প্রধান বন্দরের মধ্যে কুইলন ও কালিকটের নাম করেছেন (উক্ত ইতিহাসের ৪৮ পৃঃ, ২য় টীকা দ্রঃ)।

৬. ডক্টর হাণ্টার বলেন যে, মালাবারের প্রধানগণ তাদের বন্দরগুলোতে বাণিজ্যরত বহু জাতির লোকের ধর্ম সম্বন্ধে সহনশীল ছিলেন। বিদেশী উপনিবেশগুলো সম্বন্ধে উল্লেখ করার সময় আবু জয়েদ বলেছেন যে, রাজা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করতে অনুমতি দিতেন (মিরাফের আবু জয়েদ-উল-হাসান স্যার হেনরি ইলিয়টের History of India, অনুবাদ করেছিলেন)। মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদী, অগ্নিউপাসক—সকলেই মালাবারের বন্দরগুলোতে সাদরে স্থান পেতো। খ্রীস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ইহুদীরা, ৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে সেণ্ট টমাসের খ্রীস্টানরা, প্রাক-ইসলাম ও ইসলামোত্তর কালের আরব বণিকগণ (মোপলারা) মালাবার উপকূলে বসতি স্থাপন করেছিল (ডক্টর হাণ্টারের History, ১ম খণ্ড, ৯৮-১০০ পৃঃ দ্রঃ)।

৭. কালিকটের জামোরিন পর্তুগীজদের সদয়ভাবে গ্রহণ করেন। কিন্তু বিদেশী আরব বণিকগণ তৎকালে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। পর্তুগীজদের নতুন সমুদ্রপথ—আরবদের লোহিত সাগরস্থ সমুদ্রপথ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আরবরা আশংকা করে। সেইজন্য আরব বণিকেরা জামোরিনের সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ও এর ফলে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হওয়ার উপক্রম হয় (হাণ্টারের History, ১ম খণ্ড, ১০৩ পৃঃ)। কিন্তু 'রিয়াজে'র

বিবরণী থেকে দেখা যায়, পর্তুগীজদের পক্ষ থেকে প্রথমে উত্তেজনার (বা প্ররোচণার) কারণ ঘটেছিল; কারণ, পর্তুগীজরা ধর্মযুদ্ধের মনোভাব নিয়ে এসেছিল।

৮. ইংরেজী ইতিহাসে 'সামরি'কে 'জামোরিন' বলা হয়। এটা তামিল ভাষার 'সামুরি' শব্দের ইউরোপীয় রূপ। 'সামুরি' অর্থ 'সমুদ্রের পুত্র' (হাণ্টারের History of British India, ১ম খণ্ড, ৯৫ পৃঃ)।

৯. 'কুচিন' বা 'কোচিন'। হাণ্টারের ইতিহাসের ১ম খণ্ডের ১০৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ, 'দা-গামা' কালিকট থেকে রওয়ানা হয়ে কিছুদিন কেন্নানোরে অপেক্ষা করেছিলেন।

১০. ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগালের রাজা ইমানুয়েল ১৩টি জাহাজের একটি নৌবহর পেদ্রো আলভারেজ কেলারেলের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। জামোরিন এদের সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন। এরা মশলা ক্রয়ের জন্য কালিকটে সমুদ্রতীরে একটি কুঠি স্থাপন করে। পেদ্রো একটি আরবীয় জাহাজ ও মুসলমানদের একটি জাহাজ বলপূর্বক দখল করে। আরব বণিকগণ ক্রুদ্ধ হয়ে পর্তুগীজদের কালিকটের কুঠি ধ্বংস করে এবং প্রধান এজেন্ট ও অন্য ৫৩ জনকে হত্যা করে। পেদ্রো কেলারেল আরব বণিকদের ১০টি জাহাজ পুড়িয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেয় এবং কোচিনের দিকে চলে যায় ও পথে কালিকটের দু'টো জাহাজ পুড়িয়ে দেয়। কেলারেল কোচিনের রাজার সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সন্ধি স্থাপন করে এবং তাঁকে কোনো সময় জামোরিন করার প্রতিশ্রুতি দেয় ও কোচিনে একটি কুঠি স্থাপন করে। কুইলন ও কান্নানোরের রাজাদের নিকট থেকেও কেলারেল বন্ধুত্বসূচক আহ্বান পায় (হাণ্টারের History, ১ম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ)। মুসলমানদের একটি মসজিদ ধ্বংস ক'রে কেলারেল যে বর্বর ধর্মান্ধতার পরিচয় দিয়েছিল,—এই আচরণ, আরবের মুসলমানরা ফেলিস্তিন বিজয়ের পর, ওমর জেরুজালেম পরিদর্শনের সময় খ্রীস্টানদের গীর্জাসমূহের পবিত্রতা যে ভাবে রক্ষা করেছিলেন, তার

সম্পূর্ণ বিপরীত (স্যার উইলিয়ম ম্যুরের Annals of Early Caliphate, ২১০ পৃঃ দ্রঃ)।

১১. ধর্মযুদ্ধের মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরবদের বাণিজ্য ধ্বংস ও অস্ত্র-বলে একচেটিয়া (বাণিজ্যের) অধিকার লাভ করাই ছিল পর্তুগীজ সরকারের লক্ষ্য।

১২. পর্তুগীজ খ্রীস্টানদের ফিরিঙ্গি বলা হয়। ফিরিঙ্গি শব্দের উৎপত্তি ও অর্থের জন্য ডক্টর হাণ্টারের History of British India, ১ম খণ্ড, ১৮৪ পৃঃ দ্রঃ। ডক্টর হাণ্টার বলেন, "এইরূপে এই অর্থ-গৃধ্নু পঙ্গপালকে ভারতে ছেড়ে দেয়ার দরুন খ্রীস্টান জাতির ফিরিঙ্গি নাম ভীতিপ্রদ হয়ে ওঠে; অবশেষে মুঘল সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় শাসনের ফলে এটি একটি ঘৃণ্য আখ্যা হয়ে যায়।"

১৩. ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে ভারত মহাসাগর অঞ্চলের পর্তুগীজ নৌ-সেনাপতি ভাস্কো-দা-গামা ২০টি জাহাজ নিয়ে দ্বিতীয়বার ভারতে এসেছিলেন। কালিকটে গোলাবর্ষণ দ্বারা তিনি আরবদের বাণিজ্য জাহাজগুলো ধ্বংস করেন। কোচিন, কান্নানোর, কুইলন ও বাটিকালায় তিনি কুঠি স্থাপন করেন। অবিস্মরণীয় বর্বরতার জন্য দা-গামার সাফল্য কলংকিত হয়েছে। তার বীভৎস বর্বরতার বিশদ বিবরণীর জন্য হাণ্টারের History, ১ম খণ্ড, ১০৯, ১৩৯, ১৪০ ও ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১৫০৩ সালে দা-গামা লিসবনে ফিরে যায়। এই ধর্মান্ধ খ্রীস্টানের বর্বরতার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য জামোরিন ও আরব বণিকগণ অতিশয় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা কোচিনের রাজাকে আক্রমণ করেন ও রাজধানী দখল ক'রে সেখানকার পর্তুগীজ কুঠিয়ালদের সমর্পণ করতে বলেন। কোচিনের রাজা ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পুনরায় পর্তুগীজ সাহায্য-কারী জাহাজ না পৌঁছা পর্যন্ত বীরত্বসহকারে আক্রমণ প্রতিরোধ করেন (হাণ্টারের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১১০ পৃঃ)। এই পর্তুগীজ নৌবহর আলফন্সো দা আলবুকার্ক ও তার ভ্রাতা ফ্রান্সিস্কো দা আলবুকার্কের অধীনে ছিল। আলবুকার্ক ভ্রাতৃদ্বয় কোচিনে একটি

দুর্গ তৈরী করেন; কুইলনে একটি কুঠি স্থাপন করেন এবং জামোরিনকে কঠোর শাস্তি দেন। আলফন্সো ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে লিসবন ফিরে যান; তাঁর ভ্রাতা স্বীয় নৌবহরসহ পথে হারিয়ে যান (হাণ্টারের History, ১ম খণ্ড, ১১১ পৃঃ)।

১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে লোপো সোয়ারেজ দা আল্‌বার গেরিয়ার নেতৃত্বে পরবর্তী অভিযান প্রেরিত হয়। "যে সকল বন্দরে আরবদের প্রভাব ছিল সেইগুলোকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার নীতি তিনি চালিয়ে যান। কালিকটের একাংশ তিনি ধ্বংস করেন ও ক্রাঙ্গানোর পুড়িয়ে দেন।" সোয়ারেজ মালাবার উপকূলে আরব-প্রাধান্য ভেঙ্গে দেন। ১৫০৫ সালে পর্তুগালের রাজা ইমানুয়েল ডন ফ্রান্সিস্কো দ্য আলমিডাকে ভারতে পর্তুগীজ ভাইসরয়রূপে প্রেরণ করেন। তার প্রধান কর্তব্য ছিল মালাবার উপকূলের আরব বণিকদের সমর্থক রাজাদের ভীতিপ্রদর্শন ক'রে স্বপক্ষে আনয়ন, তীরবর্তী পর্তুগীজ কুঠিগুলোকে সুদৃঢ় করা। তাঁর তৃতীয় কর্তব্য ছিল—মুসলিম নৌশক্তি, কালিকটস্থ আরব বণিকদের এবং প্রাচ্যে পর্তুগাল প্রভাবের পক্ষে ভীতিজনক মিসরের মামেলুক সুলতানদের নিয়মিত নৌবহর ধ্বংস করা। মধ্যযুগীয় খ্রীস্টান দেশসমূহ ও ইসলামের মধ্যে সুদীর্ঘকালের বিরোধের এটিই তৃতীয় ও শেষ অধ্যায়। চার বৎসরের (১৫০৫-১৫০৯) মধ্যে আলমিডা মালাবারের বন্দরগুলোতে আরব মুসলমানদের শক্তি ধ্বংস করেন; জামোরিনকে পরাজিত এবং তাঁর (জামোরিনের) ৮৪টি জাহাজ ও যুদ্ধের জন্য ব্যবহৃত ১২৩টি ছিপ নৌকা ধ্বংস করেন এবং ৩০০০ মুসলমানকে হত্যা করেন (হাণ্টারের History, ১ম খণ্ড. ১১৬ পৃঃ)।

১৪. "১৫০৮ খ্রীস্টাব্দে মিসরের মামেলুক সুলতান নৌ-সেনাপতি আমীর হোসেনের নেতৃত্বে এক বিরাট অভিযান প্রেরণ করেন। আমীর হোসেন বোম্বাইয়ের উত্তরাঞ্চলের উপকূলবর্তী মুসলিম নৌবহরের সঙ্গে যোগদান করেন এবং দক্ষিণ কালিকটের নৌবহরের

সঙ্গে যোগদানের চেষ্টা করেন। পর্তুগীজ ভাইসরয়ের পুত্র লোরেন্সো আলমিডা এতে বাধা দেন; কিন্তু তিনি বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। বিজয়ী মুসলমানের বীরোচিত মনোভাব নিয়ে তাকে সসম্মানে কবরস্থ করেন এবং মাত্র ২২ বৎসর বয়সে অক্ষয় গৌরব অর্জন করার জন্য এক সম্মানজনক পত্র দ্বারা তাঁর পিতাকে অভিনন্দন জানান। ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে আলমিডা (বড়) ডিউয়ের নিকটে মিলিত মুসলিম নৌবহরকে পরাজিত করেন ও ৩০০০ লোককে হত্যা করেন। মিসরে তুর্কীদের আক্রমণের দরুন কায়রোর মামেলুক সুলতান আর কোনো অভিযান পাঠাতে পারেন নাই।

(তুর্কীরা ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দে মামেলুক সুলতানদের নিকট থেকে মিসর কেড়ে নিয়েছিল।)

১৫০৯ খ্রীস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে ডিউয়ের নিকটে আলমিডার বিজয়ের ফলে এশিয়ায় খ্রীস্টান-জগতের নৌ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী শতাব্দীতে ভারত মহাসাগর পর্তুগীজদের অধীনস্থ হয় (হাণ্টারের History of British India, ১ম খণ্ড, ১১৭-১১৮ পৃঃ দ্রঃ)।

"১৫০০ থেকে ১৫০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচ বৎসর কালের অভিযানে পর্তুগীজরা মালাবার উপকূলে অস্ত্রবলে বাণিজ্যিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরবর্তী পাঁচ বৎসর কালের (১৫০৫-১৫০৯) মধ্যে তারা ভারত মহাসাগরের প্রভু হয়ে ওঠে। পরবর্তী ছয় বৎসরের (১৫০৯-১৫১৫) মধ্যে আলফন্সো দা আলবুকার্কের নেতৃত্বে পর্তুগীজরা ভারতীয় উপমহাদেশে স্থানীয় শক্তির পর্যায়ে উন্নীত হয়" (হাণ্টারের History of British India, ১১২ পৃঃ)।

১৫. মুদ্রিত ফার্সী সংস্করণে, তুর্কী সুলতানদের উপাধি 'খাকান' শব্দটি ভুলক্রমে অথবা ভুল পঠনে 'খানকান' মুদ্রিত হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ, মিসরের মামেলুক সুলতানগণ।

১৭. সম্ভবতঃ 'কনজন'।

১৮. আলবুকার্ক (১৫০৯-১৫১৫) ভারতে পর্তুগীজ ভাইসরয়রূপে আলমিডার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন।

১৯. ইউসুফ আদিল শাহ বিজাপুরের সুলতান ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বাহ্‌মনি রাজ্য ভেঙ্গে যে পাঁচটি রাজ্য গঠিত হয়েছিল, বিজাপুর তন্মধ্যে একটি।

পর্তুগীজরা গোয়া দুর্গ ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে দখল করেছিল। আলবুকার্কের নিকট জলদস্যু-সরদার তিমোজু প্রস্তাব করে যে, গোয়ার প্রভুর (বা মালিক) মৃত্যু হওয়ায় (প্রকৃতপক্ষে অনুপস্থিত থাকায়) উক্ত স্থান (গোয়া) দখল করা উচিত। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সহজেই তারা উক্ত স্থান দখল করে। ওসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় আমুরাদের এক পুত্র বিজাপুরের ন্যায্য মালিক বা সুলতান ছিলেন। বহু রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক অভিযানের পর তিনি দক্ষিণ ভারতের বিজাপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উপরোক্ত সংবাদ শুনে তিনি দ্রুত বিজাপুর আসেন ও মে মাসে পর্তুগীজদের তাড়িয়ে দেন। সুলতান বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য রাজ্যের অভ্যন্তরে যাওয়ায় পর্তুগীজরা ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে জলদস্যু তিমোজুর সাহায্যে পুনরায় গোয়া দখল করে। পরে (ডিসেম্বর মাসে) রাজ্যের ন্যায্য রাজা ইউসুফ আদিল শাহের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র নাবালক ছিলেন (হাণ্টারের History, ১ম খণ্ড, ১৫২-১৫৩ পৃঃ)।

২০. 'কাদাতক্রোর'—অর্থাৎ ক্রাঙ্গানোর (হাণ্টারের History, ১ম খণ্ড, ৯৬ পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

২১. ترسا (তর্‌সা) শব্দের অর্থ—খ্রীস্টান ও অগ্নি-উপাসক উভয়ই। শেষোক্ত অর্থে পার্সী সম্প্রদায়।

২২. ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে তুরস্কের বাদশাহ মহান সোলায়মান এডেন দখল করেন (হাণ্টারের History, ২য় খণ্ড, ১৪৭ পৃঃ)। পূর্বাঞ্চলীয় প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল এখনো মুসলমানদের নিকট 'রুম' নামে পরিচিত।

"মুসলমানেরা পর্তুগীজদের 'ধর্মান্ধ যুদ্ধের' বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। প্রথমে ভারতীয় বন্দরসমূহের আরবরা নিজেদের ধর্মের পক্ষে যোদ্ধা সরবরাহ করে। তারপর কায়রোর মামেলুক সুলতান অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করেন। যতদিন পর্তুগীজদের দ্বারা লোহিত সাগর বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকবে, ততদিন মিসর বিজয় অসম্পূর্ণ থাকে এই মনে ক'রে তুর্কী সাম্রাজ্যের বিশাল শক্তি সর্বশেষে এতে অংশগ্রহণ করে। ভারতীয় বন্দরসমূহের আরবরা ক্রুশের পক্ষের (খ্রীস্টান) বীরদের নিকট পরাজিত হয়। উত্তর দিক থেকে ওসমানীয়দের (ওসমানীয় সাম্রাজ্যের) চাপে মিসরের মামেলুক সুলতান প্রাচ্যে (বা পূর্বদিকে) পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হোতে পারেন নাই। কিন্তু তুর্কীরা বা রুমিরা এশিয়ায় খ্রীস্টানদের বিজয়ের জোয়ার ফিরিয়ে দেয় (বন্ধ করে)। 'রুমিরা আসছে'—এই শব্দ আলবুকার্ককে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছিল, তার স্থলাভিষিক্ত-গণের কানেও এই চীৎকার বরাবর প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যখন পর্তুগীজরা মালাবার উপকূলের পথে মুসলিম জাহাজ চলাচল বন্ধ করলো, তখন আরবদের জাহাজ এডেন থেকে মালদিব দ্বীপ ও সমুদ্রের আরো বাইরের পথ ধরে সিংহলের দক্ষিণ দিয়ে সাহসের সঙ্গে যাতায়াত আরম্ভ করলো। যখন পর্তুগীজরা ভারত সাগরের উত্তর দিকের প্রবেশদ্বার ডিউ সুদৃঢ়ভাবে দখল করলো, তখন তুর্কীরা পারস্য উপসাগরের পশ্চিম দিকস্থ পর্তুগীজ কুঠিসমূহ অনবরত আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলো। লোহিত সাগরের যুদ্ধে পর্তুগীজরা প্রায়ই প্রতিহত হয় এবং তাদের সাময়িক এডেন বিজয় শেষ পর্যন্ত চিরকালের জন্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। লিসবন দরবার তুর্কীদের সঙ্গে কয়েক বৎসরের জন্য আপোষ করার চেষ্টা করে। ১৫৪১ খ্রীস্টাব্দে গমের বদলে মরিচ এবং এডেন ও লোহিত সাগরস্থ আরবীয় বন্দরগুলোতে প্রবেশের অনুমতি পাওয়ার পরিবর্তে ভারত মহাসাগরে মুসলমানদের জাহাজ চলাচলের অনুমতিপত্র দেয়ার প্রস্তাব করে। কিন্তু এই অসৎ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। চার

বৎসর পরে ১৫৪৫ সালে তুর্কীরা সাহসিকতার সাথে পর্তুগীজদের ডিউ আক্রমণ করে; ১৫৪৭ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী সৈন্যরা পর্তুগীজ মালাক্কায় উপস্থিত হয়; ১৫৫১ খ্রীস্টাব্দে ও ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী নৌবহর মস্কট আক্রমণ করে। ইংরেজদের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী শতাব্দীতে ভারত মহাসাগরে আধিপত্যের জন্যে মুসলিম ও খ্রীস্টান দেশসমূহের মধ্যে সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা আমার বর্তমান লক্ষ্য। উভয়পক্ষের বহু বীরত্বব্যঞ্জক কার্যের উল্লেখ ক'রে এই প্রাথমিক পরিচ্ছেদগুলো বড় করতে আমি সাহস করি না" (হাণ্টারের History of British India, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃঃ)।

২৩. অর্থাৎ, 'ওরমুজ'।

২৪. ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে আলবুকার্কের নেতৃত্বে পর্তুগীজরা মালাক্কা অধিকার করেছিল (হাণ্টারের History, ১ম খণ্ড, ১২৭ পৃঃ)।

২৫. ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজরা গোয়া দখল করার পর দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতীয় উপকূলে পর্তুগীজদের নৌ-প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং মালাবারের সংলগ্ন সামুদ্রিক অঞ্চলে খ্রীস্টানদের অনুমতিপত্র ব্যতীত মুসলমানদের কোনো জাহাজ যাতায়াত করতে পারতো না (হাণ্টারের History of British India, ১ম খণ্ড, ১২৬ পৃঃ)।

২৬. আলবুকার্কের আমল থেকে এশিয়ায় ক্যাথলিকবাদ ও ইসলামের মধ্যে বিরোধ সুপ্রকট হয়ে উঠেছিল। আল্লাহ্ অথবা ঈশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করছে বলে উভয়পক্ষই দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো। ১৫০৭ খ্রীস্টাব্দে গবর্নর পদে যোগদানের পূর্বে আলবুকার্ক ঘোষণা করেছিলেন," মুরদের (বা মুসলমানদের) সাহস ভেঙ্গে দেয়ার জন্যে আমি যীশুখ্রীস্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করি।" ১৫৩৯ সালে মুসলমানদের এশতেহারে ঘোষণা করা হয়েছিল, "আমরা আল্লার নৈকট্য ব্যতীত আর কিছু চাই না।" তাতে পর্তুগালের খ্রীস্টানদের আক্রমণাত্মক কার্যাবলীর নিন্দা করা হয় এবং জনৈক ভারতীয় রাজাকে এই বলে সতর্ক করা হয় যে, "যদি তিনি তাদের সঙ্গে যোগ না দেন তা'হলে তাঁর আত্মা দোজখে যাবে" (সুলায়মান

পাশা কর্তৃক কাম্বের শাসনকর্তার নিকট ১৫৩৯ সালের ৭ই মে তারিখের পত্র)। হাণ্টারের History, ১ম খণ্ড, ১২৯-১৩০ পৃঃ।

২৭. ভারতের (হিন্দুস্তানের) বাদশাহ আকবর— জন্ম ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দ। রাজত্বকাল ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীস্টাব্দ। রানী এলিজাবেথের সমসাময়িক।

২৮. বৈরাম খানের পুত্র আবদুর রহিম খান-ই-খানান ৯৬৪ হিজরীতে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৯৮৪ হিজরীতে তাঁকে গুজরাটে নিযুক্ত করা হয়। শর্কিজের যুদ্ধে গুজরাটের সুলতান মুজাফফরকে পরাজিত ক'রে তিনি আকবরের পক্ষে গুজরাট জয় করেন। তাঁর প্রধান কাজ হ'ল ঃ গুজরাট ও সিন্ধু জয় এবং বিজাপুরের সুহেল খানকে পরাজিত করা (আইন-ই-আকবরী— ব্লকম্যানের অনুবাদ, ১ম খণ্ড, ৩৩৪ পৃঃ)।

২৯. ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নিকট লিখিত প্রথম জেমসের এক পত্র নিয়ে সুরাটে অবতরণ করেন (জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল ১৬০৫-১৬২৭ খ্রীস্টাব্দ)। উক্ত পত্র নিয়ে তিনি আগ্রার দরবারে যান। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে স্যার হেনরি মিডলটন সোয়ালিতে অবতরণ করেন। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন বেস্ট সুরাটের নিকটে পর্তুগীজ নৌবহর পরাজিত ক'রে মুঘল গবর্নরের প্রশংসা লাভ করেন। ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে গবর্নর ইংরেজদের সুরাটে বাস করার অনুমতি দেন। ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে ডাউন্টনের সমুদ্র-যুদ্ধ পর্তুগীজদের উপর ইংরেজ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম জেম্‌স্ স্যার টমাস রো-কে মহান মুঘলের দরবারে দূত-স্বরূপ প্রেরণ করেন। মক্কা যাওয়ার প্রধান যাত্রাস্থান ছিল সুরাট। হজ্জে যাওয়ার সমুদ্রপথে পর্তুগীজ নৌবহর গোলোযোগ সৃষ্টি করতো। এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীর নৌবহর ধ্বংস করবে মনে ক'রে বাদশাহী দরবার সানন্দে স্যার টমাস রো-কে বাণিজ্য করার আবেদন মঞ্জুর করেন। ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে রো' ইংরেজদের সুরাটে বসবাসের ও দেশের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে যাতায়াতের

অনুমতিপত্র লাভ করেন। ১৬১৮ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের তৎকালীন মুঘল ভাইসরয় শাহজাদা খুররমের (পরে বাদশাহ শাহজাহান) নিকট অনুরূপ অনুমতিপত্র লাভ করেন। ইংরেজরা তাদের সদ্ব্যবহার দ্বারা ক্রমশঃ সমুদ্রপথের পাহারাদার, মুসলমান তীর্থযাত্রীদের সমুদ্রপথের প্রহরী ও মহান মুঘলের 'রাজস্বের নিশ্চিত উৎস' হয়। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে তারা ভারতে একটি প্রেসিডেন্সি গঠনের ও সেটা সুরাটে প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে (হাণ্টারের History of India, ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ দ্রঃ)।

৩০. আকবর গুজরাট ও কাম্বে উপসাগরের উপকূলবর্তী প্রদেশসমূহ ১৫৭২-১৫৯২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জয় ও পুনর্জয় করেন। ১৫৯৩ খ্রীস্টাব্দে এই অঞ্চলগুলো চরমভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গুজরাটের রাজধানী ছিল সুরাট। পশ্চিম উপকূল থেকে মক্কা-যাত্রীদের জাহাজে চড়বার প্রধান স্থান ছিল সুরাট। প্রাচীন সৌরাষ্ট্রের বর্তমান রূপ সুরাট এবং গুজরাট ছাড়াও কাঠিওয়াড়ের অংশ এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল (হাণ্টারের History, ২য় খণ্ড, ৪৭ পৃঃ এবং তৎকর্তৃক কানিংহামের Ancient Geography of India-র উল্লেখ দ্রষ্টব্য)।

৩১. মাদ্রাজ উপকূলে (১৬১১-১৬৫৮) ইংরেজদের প্রথম বসতি স্থাপন সম্পর্কে হাণ্টারের History of British India, ২য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। মুসলিম গোলকুণ্ডা রাজ্যের প্রধান বন্দর মসৌলি-পটমে ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন হিপ্পেনের অধীনে ইংরেজরা মাদ্রাজ উপকূলে প্রথম বসতি স্থাপন করে। ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা মসৌলিপটম বন্দোবস্তি সম্বন্ধে গোলকুণ্ডার সুলতানের নিকট থেকে ফরমান পায়। ১৬৩৯ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা ফ্রান্সিস ডে'র অধীনে মাদ্রাজে একটি কুঠি স্থাপন করে। ১৬৫৩ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজকে স্বাধীন প্রেসিডেন্সি করা হয়। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী বাংলা ও কোরমণ্ডল উপকূলের সমস্ত কুঠি বা বসতি মাদ্রাজের ফোর্ট সেন্ট জর্জের এলাকাভুক্ত বলে ঘোষণা করে।

৩২. বাংলায় ইংরেজদের বসতি স্থাপনের (১৬৩৩-১৬৫৮) বিবরণের জন্যে হান্টারের History of British India ২য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ এবং উইলসনের Early Annals of the English in Bengal, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

পর্তুগীজরা মুসলমানদের উপর অত্যাচার করার দরুন বাদশাহ শাহজাহানের আদেশে কাসিম খান হুগলীর পর্তুগীজ বসতি ধ্বংস করেন ও তাদের বাংলা থেকে বহিষ্কার করে দেন। মসৌলি-পটম কুঠির ইংরেজ কোম্পানীর এজেণ্ট এই সুযোগ গ্রহণ করে এবং ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দে গঙ্গার মোহনায় উর্বর অঞ্চলে ব্যবসার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে আটজন ইংরেজকে একটি দেশী নৌকাযোগে পাঠান। কার্টরাইটের নেতৃত্বে এরা উড়িষ্যার হরিশপুরে পৌঁছায় এবং নিরীহভাবে কটকস্থ বড়বাটি দুর্গে মালকান্দির দরবারে উপস্থিত হয়। সেখানে আগা মুহম্মদ জামান নামক উড়িষ্যার মুঘল ডেপুটি গবর্নর বাস করতেন। পারস্যদেশীয় উড়িষ্যার এই ভদ্র ডেপুটি গবর্নর ইংরেজদের আম-দরবারে সাক্ষাৎদান করেন এবং অমায়িকভাবে কার্টরাইটের দিকে মাথা হেলিয়ে পা থেকে জুতো খুলে ইংরেজ ব্যবসায়ীকে পদচুম্বন করার জন্য পা বাড়িয়ে দেন। কার্টরাইট দু'বার অস্বীকার করার পর চুম্বন করার ভান করে (হাণ্টারের History, ২য় খণ্ড, ৮৯ পৃঃ)। ১৬৩৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে তারিখে ইংরেজদের ব্যবসা করার অনুমতিপত্র মোহরাঙ্কিত ক'রে দেন (এই হুকুমনামার জন্যে উইলসনের Early Annals of the English in Bengal, ১ম খণ্ড, ১১-১২ পৃঃ দ্রঃ)। উড়িষ্যায় ইংরেজদের বাণিজ্য ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত এক ফরমান দ্বারা আরম্ভ হয় বলে বলা হয়। উক্ত ফরমান দ্বারা ইংরেজদের বাণিজ্য সুবর্ণরেখা নদীর পুরাতন মোহনার নিকটে পিপলিতে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। ১৬৩৩ সালের ৬ই মে তারিখে ইংরেজরা কটক জেলার জগৎসিংপুরের নিকটে হরিহরপুরে একটি বাড়ী তৈরী করে। এটি বাংলার তদানীন্তন লেফটেনেণ্ট গবর্নরের

এলাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম কুঠি। ১৬৩৩ সালের জুন মাসে কার্টরাইট বলেশ্বরে একটি কুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা হুগলীতে কুঠি প্রতিষ্ঠা করে। গ্যাব্রিয়েল বাউটন নামক জনৈক ইংরেজ ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার তৎকালীন মুঘল ভাইসরয় শাহ্ শুজার শল্যচিকিৎসক ছিলেন (শাহ্ শুজা তখন রাজমহলে বাস করতেন) এবং শাহ্ শুজার দরবারে প্রভাব বিস্তার ক'রে ইংরেজদের আরো সুযোগ লাভের ব্যবস্থা করেন। এই অনুসারে ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজরা তিন হাজার টাকা দিয়ে বাংলায় বিনা শুল্কে ব্যবসা করার 'নিশান' বা 'অনুমতিপত্র' পায়।

৩৩. মহামান্য বাদশাহ আওরঙ্গজেব ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ইংরেজদের একটি আবেদন মঞ্জুরপূর্বক এক ফরমান জারি করেন। উক্ত ফরমানে বলা হয়, "ইংরেজরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বশ্যতা স্বীকার ক'রে তাদের দুষ্কর্মের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করায়, এবং দেড় লক্ষ টাকা জরিমানা ও সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ফেরত দিতে এব আর কখনো এরূপ লজ্জাকর ব্যবহার করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দেয়ায়, বাদশাহ তাদেরকে ব্যবসায়ের জন্যে নতুন লাইসেন্স দেয়ার কথা স্বীকার করছেন এবং সেইসঙ্গে দুষ্ক্রিয়াকারী মি. চাইল্ডকে বহিষ্কার করা হল' (হান্টারের History, ২য় খণ্ড, ২২৬ পৃঃ)। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে চার্নক মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে তৃতীয়বার কলকাতায় জাহাজ নোঙর করেন।

৩৪. অর্থাৎ, বোর্ড অব রেভিনিউ বা সদর বোর্ড।

৩৫. এই বিজয় ও তৎপর সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি সম্পর্কে পূর্বের টীকা ও 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীন' দ্রষ্টব্য।

৩৬. এই ইতিহাসের শেষদিকের ছত্রগুলো থেকে 'রিয়াজে'র গ্রন্থকারকে অত্যন্ত উদার ও সার্বজনীন নীতিবাদী বলে মনে হয়। নতুন ইংরেজ শাসকবর্গের সঙ্গে 'সিয়ার-উল-মুতাক্ষেরীনে'র ইংরেজদের তুলনা ক'রে দেখুন